মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন

হোসনে আরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, হোসনে আরা কর্তৃক উপস্থাপিত ‘মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে রচিত আমার ‘মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(হোসনে আরা)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

প্রসঙ্গকথা	২
অবতরণিকা	৪
প্রথম অধ্যায় : প্রসঙ্গ : ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠী	৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর জীবন ও সাহিত্য	১৮
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন ও মহাশ্বেতা দেবী	৩০
চতুর্থ অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে আদিবাসী জীবন	৩৮
প্রথম পরিচ্ছেদ : *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন* ও *মৃত্যু*	৪০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অরণ্যের অধিকার	৫৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর	৭৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অপারেশন ? বসাই টুডু	৯৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অক্লান্ত কৌরব	১০৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শালগিরার ডাকে	১১৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ : হুলমাহা	১৩০
অষ্টম পরিচ্ছেদ : সুরজ গাগরাই	১৪৯
নবম পরিচ্ছেদ : জঙ্গল	১৬১
দশম পরিচ্ছেদ : টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা	১৬৮
একাদশ পরিচ্ছেদ : প্রথম পাঠ	১৮৪
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ক্ষুধা	১৯৩
পঞ্চম অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে আদিবাসী জীবন	২০৬
ষষ্ঠ অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী ভাষা	২৯১
উপসংহার	৩১১
গ্রন্থপঞ্জি	৩১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আমার পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ‘মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন।’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর তত্ত্বাবধানে আমি গবেষণাপত্রটি রচনা করেছি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে আমার তত্ত্বাবধায়কের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন আমার গবেষণাপত্রের বিষয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের সূত্রপাত হয়েছিল ছাত্রজীবনেই ; এ বিষয়ে গবেষণার কাজ তাই আমার জন্য আনন্দদায়ক হয়েছে।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও উৎসাহ এবং বই দিয়ে সহায়তা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, সহকর্মী বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, সহকারী অধ্যাপক সোহানা মাহবুব ও মোমেনুর রসুল। আদিবাসী ভাষা বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার। পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক গেইলান পিয়ারী তারান্নুম দানা, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাজমা খাতুন এবং গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ভদ্রেশু রীটা গবেষণাপত্র তৈরিতে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। এ সূত্রে তাদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি কৃতজ্ঞ স্বয়ং মহাশ্বেতা দেবী ও তাঁর পুত্রবধূ প্রণতি ভট্টাচার্যের কাছেও। মহাশ্বেতা দেবীর পুত্র প্রয়াত বিজন ভট্টাচার্যের বাড়িতে একাধিকবার দীর্ঘসময় অবস্থানকালে তাদের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয় আতিথিয়েতা পেয়েছি, তা ভুলবার নয়। তবে দুর্ভাগ্যবশত, সে-সময় জরা-বার্ধক্যের কারণে মহাশ্বেতা দেবী প্রায় স্মৃতিহীন ; সেকারণে বক্ষ্যমাণ বিষয় সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর আমি তাঁর কাছ থেকে পাইনি। তবে তাঁর সান্নিধ্যে কাটানো সময়, কথা-গানে মুখর সন্ধ্যাগুলো ব্যক্তি মহাশ্বেতার অপরাজেয় সত্তার অনুভব দিয়েছে আমাকে। তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের কিছু তথ্য পেয়েছি তাঁর পুত্রবধূ প্রণতি ভট্টাচার্যের কাছ থেকে, যা আমাকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করেছে এ গবেষণাকর্মে।

আমার বাবা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও মা সাহেরা খাতুনের অবিশ্রান্ত তাগিদ ও সহযোগিতায় অভিসন্দর্ভটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। পারিবারিক জীবনের অনেক দায় বহন করে তারা আমাকে সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন গবেষণা কাজটি সমাপ্ত করার ; শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি তাদের অবদানকে। আমার আত্মজা আনন্দিতা করবী ও অতন্দ্রিলা জয়তী দীর্ঘদিন অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করেছে গবেষণা কাজের সমাপ্তির জন্য ; তাদের ধৈর্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এ দুরূহ কাজটি সম্পাদন করতে। এ সূত্রে আমার পরিবারের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই কাজটি শেষ করার সুযোগ দেবার জন্য।

গবেষণাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। সে-সূত্রে উক্ত গ্রন্থাগারদ্বয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

হোসনে আরা
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

বাংলা সাহিত্যে মানবিকতাকে শিল্পের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে যে কয়জন সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছেন, মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। জীবন-বিচ্ছিন্ন ভাবকল্পনা বা নিছক প্রণয়ের অর্ধকল্পিত উপাখ্যান নয়, প্রবলভাবেই জীবন-সম্পৃক্ত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা সমগ্র জীবন মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি প্রবল দায়বোধে সাহিত্য-রচনা করেছেন। মধ্যবিত্তসুলভ রোম্যান্টিক মানসিকতায় আদিবাসী-ব্রাত্য-জীবনের উপরিতলের কাঠামো নয়, তাদের জীবনের গভীর অন্তরঙ্গ বাস্তব পরিচয় কথাসাহিত্যের আধারে বাণীবদ্ধ করে পাঠক সমাজকে সচকিত করেছেন তিনি। সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা-শবর, ওঁরাও প্রভৃতি আদি জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা, নিপীড়ন-যন্ত্রণা, স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে শব্দরূপ দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারার সৃজন করেছেন। মহাশ্বেতার পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে বিষয় হিসেবে আদিবাসী জীবন অবলম্বিত হয়েছে কিন্তু সে-জীবনের অন্দরমহলের কথা তাঁর লেখায় যেভাবে এসেছে, অন্যত্র তা বিরল – এ ধারার সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিংসবাদিত।

সাম্প্রতিক বিশ্বে 'আদিবাসী' শব্দটির সঙ্গে শোষণ-নিপীড়ন-অবহেলা শব্দগুলো খুব বেশি সম্পর্কিত। বিতর্কিত ইউরোপীয়দের কথিত সভ্যতার ধারক আধুনিক মানুষেরা, অরণ্যচারী বা অনগ্রসর কৌম জাতিসত্তার অধিকারী আদিবাসীদের অসভ্য বলে দূরে সরিয়ে আত্মতৃপ্তি বা অহমিকাবোধে নিজেদের উন্নত ভাবতে পারে ; কিন্তু আদিবাসীদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিশ্লেষণে 'অসভ্য' অভিধাটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাস আর্যসভ্যতার আগ্রাসী ইতিহাস হলেও হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো সাক্ষ্য দেয় যে, আর্য-আগমনের পূর্বেই ভারতে সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতা গড়ে তুলেছিল দ্রাবিড়সহ অন্য অনার্যরা। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম জনযুদ্ধের (১৭৭০ সালে চুয়াড় বিদ্রোহ) ডাকও এসেছিল আদিবাসীদের কাছ থেকেই। সিধু-কানুর সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) বা হুলকে এ উপমহাদেশের প্রথম ইংরেজ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত অনেক আদিবাসী বিদ্রোহ – মুণ্ডা বিদ্রোহ, খেরোয়ার বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ প্রভৃতি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মর্যাদাপূর্ণ স্থান পায়নি। আদিবাসী জীবনের এ অলিখিত গৌরবের ইতিহাসকে কথাসাহিত্যে ঠাঁই দিয়েছেন মহাশ্বেতা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়।

আদিবাসীদের জীবনবৃত্তকে শিল্পের প্রাকারে প্রবিষ্ট করে মহাশ্বেতা চেনা মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন বৃহত্তর ভারতের প্রান্তিক মানুষের দিকে। বহুপ্রজ এই সাহিত্যিক

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধশতক ধরে রচনা করেছেন শতাধিক গল্প ও উপন্যাস, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোর-উপযোগী গল্প ও উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং বেশ কিছু অনুবাদগ্রন্থ। তাঁর রচনাগুলোকে বিন্যস্ত করে এ পর্যন্ত ২০ খণ্ডের রচনাসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকাশের অপেক্ষায় আছে আরও বহু অগ্রন্থিত গল্প-উপন্যাস। এ পর্যন্ত ১৬টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস-নাটক। বিগত এক দশকে তাঁর সাহিত্যকেন্দ্রিক একাধিক গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং গ্রন্থাকারেও কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর আদিবাসীকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসও গবেষণার বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বস্তুত মহাশ্বেতা এমনই একজন লেখক, যাকে নিয়ে কিছু গবেষণা হলেও তাঁর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন সহজ নয়। ব্যক্তি মহাশ্বেতার অপরাজেয় প্রতিমূর্তি এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম – দুই-ই বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার প্রেরণা হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। মহাশ্বেতা সম্পর্কিত প্রায় সব আলোচনা-সমালোচনা এবং তাঁর সাহিত্য-নির্ভর বেশ কিছু অভিসন্দর্ভ বিশ্লেষণ করে, এ সম্পর্কিত অনুক্ত বিষয়গুলো আলোচ্য অভিসন্দর্ভে নতুন দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভ উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি ব্যতীত মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে :

প্রথম অধ্যায় : প্রসঙ্গ : আদিবাসী জনগোষ্ঠী

দ্বিতীয় অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর জীবন ও সাহিত্য

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন ও মহাশ্বেতা দেবী

চতুর্থ অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে আদিবাসী জীবন

পঞ্চম অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে আদিবাসী জীবন

ষষ্ঠ অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী ভাষা

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়ে 'আদিবাসী' অভিধাটির সংজ্ঞায়নের পাশাপাশি ভারতের আদিবাসীদের সাধারণ এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিচয় সীমিত পরিসরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখকের ব্যক্তি-পরিচয়ের উল্লেখপূর্বক তাঁর মানস-প্রবণতার অনুসন্ধান করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে এ যাবৎকালে

রচিত আদিবাসীকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসের ধারা অনুসন্ধানের পাশাপাশি সে-ধারায় মহাশ্বেতার অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে বিধৃত আদিবাসী-জীবনের স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে। তাঁর রচিত শতাধিক উপন্যাস থেকে বারোটি উপন্যাস নির্বাচন করে এ অধ্যায়টি রচিত হয়েছে। এ বারোটি উপন্যাসে লেখক আদিবাসী-জীবনকে কাহিনির কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত সাঁইত্রিশটি গল্পের পরিসরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে তাঁর কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত আদিবাসী ভাষা সম্পর্কিত একটি আলোচনা। মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে বিন্যস্ত আদিবাসী-জীবন সম্পর্কিত সামগ্রিক মূল্যায়ন সংক্ষেপে ধারণ করা হয়েছে উপসংহারে।

বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্রের বিশটি খণ্ড প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। রচনাসমগ্রে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, আদিবাসী-জীবনকেন্দ্রিক একটি উপন্যাস (ব্যাধখণ্ড : ১৯৯৪) এবং তিনটি গল্প (সংরক্ষণ, শেষ সামানিন, ঝুক্কু ঝুক্কু ঝুক ঝুক আ গিলা গাড়ি) এ অভিসন্দর্ভের আলোচনায় গ্রহণ করা হয়নি। গল্প-উপন্যাস নির্বাচনকালে আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী অন্ত্যজ হিন্দুদের পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণে কিছু সমস্যা হয়েছে। লেখক অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণিগত সাম্যে এদের মিলিয়ে দেখেছেন। দুসাদ ও ওঁরাওদের জীবনে পার্থক্য খুব সামান্য ; একদিকে ভারতের সংবিধানে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাওদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী উল্লেখ করে ডোম, দুসাদদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান অস্বীকার করা হয়েছে ; অন্যদিকে ডোম, দুসাদ প্রভৃতি হরিজনদের সিডিউল্ড ট্রাইবের অন্তর্ভুক্ত করে আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের একীভূত করা হয়েছে। তবুও সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, লোধাশবর, খেড়িয়া, কোর্‌কু, নাগেসিয়া প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে, এ অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে আদিবাসী সম্পর্কিত ধারণাকে স্পষ্ট করা হয়েছে এবং সে-অনুযায়ী কারা আদিবাসী অভিধার আওতাভুক্ত তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

'মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন' শিরোনামের এ অভিসন্দর্ভে মূলত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analytical Method) অবলম্বিত হয়েছে, দু'একটি রচনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি (Comperative Method) ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) ব্যবহৃত হয়েছে। কথাসাহিত্যভুক্ত আদিবাসী জীবন বিশ্লেষণে সীমিত পরিসরে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক পাঠ অবলম্বিত হয়েছে। উত্তর-উপনিবেশ, উত্তরাধুনিক, নিম্নবর্গীয় তত্ত্ব-নির্ভর কিছু বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিন্তু অভিসন্দর্ভের শিরোনামের প্রতি লক্ষ রেখে আদিবাসী জীবনের বিশ্লেষণই প্রাধান্য পেয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বানান-রীতি অনুসৃত হয়েছে। তবে লেখকের রচনায় বা সমালোচকের উদ্ধৃতিতে মূল বানানটি রাখা হয়েছে, কোনো পরিবর্তন হয়নি। সে-কারণে তির, তীর ; বিরসা, বীরসা – দুই বানানই অভিসন্দর্ভে পাওয়া যাবে ; মহাশ্বেতা দেবী নিজেও বিভিন্ন রচনায় দু'ধরনের বানান লিখেছেন। তবে বর্তমান অভিসন্দর্ভে যেহেতু আকরগ্রন্থ হিসেবে তাঁর রচনাসমগ্র গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে বানানরীতিতে এক ধরনের সাম্য পাওয়া যায়। মুণ্ডা, মুন্ডা ; দুই বানানই যেহেতু শুদ্ধ বলে বিবেচিত এবং লেখক নিজে 'মুণ্ডা' বানানটি ব্যবহার করেছেন ; তাই এ অভিসন্দর্ভেও 'মুণ্ডা' গৃহীত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্য পরিমাণ ও গুণগত বিচারে এত বিশাল যে একটিমাত্র অভিসন্দর্ভে তাকে ধারণ করা দুরূহ। সমগ্র মহাশ্বেতা নয়, তাঁর আদিবাসী জীবন ভিত্তিক কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত আদিবাসী জীবনকে তাঁর চোখ দিয়ে দেখার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এ অভিসন্দর্ভে। বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে আদিবাসী জীবন সম্পর্কিত নানা তথ্য ও মূল্যায়নকে পাশে রেখে এ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ কারণে কোথাও কোথাও কেবল বর্ণনাধর্মিতা মুখ্য হয়েছে, প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে Text থেকে ; এ দায় স্বীকার করে বিনীতভাবে বলতে হচ্ছে – মহাশ্বেতা দেবী অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসী জীবনকে এত বেশি তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ সহযোগে গল্প-উপন্যাসে গ্রথিত করেছেন যে, গবেষকের পক্ষে তা উদ্ধৃত করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না।

প্রথম অধ্যায়

প্রসঙ্গ : আদিবাসী জনগোষ্ঠী

১.১

মানব ইতিহাসের সুদীর্ঘ যাত্রাপথ নানা জাতি, গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিলয়ে সমাচ্ছন্ন। পিঠ-ওলা ছুরির কারিগরি সমেত প্রায় ৯০,০০০ হাজার বছরের মানুষের কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ (জীবাশ্ম) থেকে হাজার হাজার বছরের পথ পেরিয়ে আজকের যুগে পৌঁছেছি আমরা। হাজার বছরের এই চলার পথে আজ থেকে ৬০,০০০ বছরের বেশি আগে আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পড়া আধুনিক মানুষেরা (Homo Erectus) ভারতবর্ষের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো (ইরফান ২০০৪: ৩৩)। পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ তার টিকে থাকার অবিরাম সংগ্রামে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে মানবসভ্যতার বীজ। ইতিহাস ও পুরাণের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে মানবসভ্যতার নিরলস সংগ্রামের, মানুষ হয়ে টিকে থাকার কাহিনি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্যদের আগমনকে বিশেষভাবে নবসভ্যতার সূচনা বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এ ভূমে অনার্য বা প্রাগার্য জাতির অবস্থান এবং অবদানকে অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। নৃতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অতীতের ধূসর জগতের আবরণ সরিয়ে ইতিহাস খুঁড়ে এই অনার্য, প্রাগার্য জাতির অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং করছেন বহুকাল ধরেই। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, আর্য-আগমনের পূর্বেই ভারতভূমে সমৃদ্ধ নগর সভ্যতা নির্মাণ করেছিল অনার্য দ্রাবিড়সহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী।[১] এ দেশে আর্যদের আগমন ঘটে মোটামুটি সাড়ে তিন হাজার বছর আগে।[২] আর্য-ভাষী জাতি বলতে বোঝায় ইন্দো-ইউরোপীয় নরগোষ্ঠী (আদি-নর্ডিক)। এদের আগমনের পূর্বে নেগ্রিটো, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর এ দেশে আগমন ঘটে।[৩] এ ব্যাপারে ইতিহাস ছাড়াও পুরাণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য ও অনার্যের রাজনৈতিক সংঘর্ষের উদাহরণ দেওয়া যায় রামায়ণের কাহিনি থেকে। রাম-রাবণের যুদ্ধ মূলত আর্য-অনার্যের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব – যে যুদ্ধে অনার্য রাবণকে পরাস্ত করে রাম আর্য-সভ্যতার ভিত শক্ত করেন।

১.২

বৈদিক (১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব) ও বৈদিকোত্তর কালে প্রায় এক হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে আগমন ঘটেছিল বহুজাতির মানুষের। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ অব্দে আকিমেনিডগণ (Achaemenid) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দখল করে এ ভূমে তাদের শাসন কায়েম করে।[৪] খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ম্যাসিডোনীয় গ্রিকগণ ভারত আক্রমণ করেছিল, যদিও শেষাবধি তারা এ ভূমিতে স্থায়ী হয়নি (রোমিলা ২০০২: ৩৯)। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে শক, পহ্লব, কুষাণ, তোচারী এবং পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে হুণরা ভারতে অব্যাহত আক্রমণে যেসব রাজ্য দখল করেছিল – সেখানেই স্থানীয় হয়েছিল। স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে বিবাহদির মাধ্যমে ক্রমে তারা নিজেরাও এ ভূখণ্ডের বহুরঙা জনসমুদ্রে মিশে গিয়েছিল। শক, হুণ ও অন্যান্যদের এ অভিযানগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭০) *কালের মন্দিরা*, 'ইন্দ্রতুলক', 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ', 'সেতু' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস ও গল্পে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতাঞ্জলি*র ১০৬ নম্বর কবিতায় বিভিন্ন জাতির আগমনের উল্লেখ আছে –

> হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন –
> শক-হুণ-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২/৬ : ৬৯-৭১)

১.৩

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী আর্যজাতির কাছে এদেশীয় পূর্বতন অধিবাসীদের পক্ষিজাতি বলে মনে হতো। *ঐতরেয় আরণ্যকে* (নীহাররঞ্জন ১৪২০ : ৩৫১) বঙ্গ ও মগধ জনের ভাষা পাখির ভাষার সঙ্গে তুলিত হয়েছে – এর অর্থ বোধ হয় এই যে, পাখির কিচির মিচির যেমন দুর্বোধ্য, বঙ্গ ও মগধজনদের ভাষাও তেমনই দুর্বোধ্য *আরণ্যক* গ্রন্থের আর্য ঋষিদের কাছে। বঙ্গ, মগধে তখন বসবাস করত অস্ট্রিক ভাষী অনার্য মানুষেরা, যারা বর্তমানে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, খেরোয়াল প্রভৃতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প* গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল জনপদের লোকদের ভাষাকে বলা হয়েছে অসুর ভাষা। পশুপালন নির্ভর যাযাবরবৃত্তির আর্যরা শারীরিক ও যুদ্ধজ্ঞানে এদেশীয় আদিবাসীদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত। সে-কারণে বিজেতা-জাতিসুলভ দর্পিত উন্নাসিকতায় এদেশীয় আদি অধিবাসীদের অভিহিত করত দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর ইত্যাদি বলে। এদের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, বসন-ব্যসন তাদের কাছে রুচিকর ছিল না। এদের প্রতি আর্য জাতির ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন পুরাণ-গ্রন্থে।

আর্যপূর্ব আদিম অধিবাসীরা ভারতবর্ষে কৃষিকাজ-পশুপালন-শিকার প্রভৃতি জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। লোহার অস্ত্র ও ঘোড়ার ব্যবহার এবং যুদ্ধজ্ঞানে দক্ষতায় শ্রেষ্ঠতর আর্যরা খুব সহজেই অনার্য জনগোষ্ঠীগুলোকে পরাজিত করে তাদের প্রণীত বর্ণব্যবস্থার নীচের স্তরে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করে এবং আর্যরা বর্ণব্যবস্থার উপরের স্তরে আসীন হয়।[৫] কিন্তু অপেক্ষাকৃত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন গোষ্ঠীগুলো নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে দুর্গম পাহাড়-পর্বত বা অরণ্যসংকুল স্থানে স্বাধীনভাবে নতুন আবাস গড়ে তোলে। কালক্রমে গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য বজায়কৃত এ অধিবাসীদেরই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, আদিবাসী, উপজাতি এসব নামে অভিহিত করা হয়।

সংস্কৃত থেকে আগত 'আদিবাসী' শব্দটির 'আদি' অর্থ মূল এবং 'বাসী' অর্থ বসবাসকারী। বি. কে. রায়বর্মণের মতে (রায়বর্মণ ২০০৯: ২৯৮-২৯৯), জৈব-ঐতিহাসিক অবস্থান এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের বাস্তবতার আলোকে চারটি মুখ্য অর্থে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয় –

* কালানুক্রমিক (Chronological)
* সম্পর্কগত (Relational)
* আইনগত (Juristic)
* স্বতঃসিদ্ধ (Axiological)

কালানুক্রমিক অর্থে Indigenous বা আদিবাসী বলতে বোঝায় আদি-অধিবাসী বা সর্বাগ্রে বসবাসকারীদের। ১৯৮৯ সালে আইএলও কনভেনশন ১৬৯-এ 'আদিবাসী' শব্দটির সম্পর্কগত অর্থে ব্যবহার পাওয়া যায়, যাতে শব্দটি ঐসব জনগণকে বোঝায় যারা একসময়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল এবং যারা সাম্প্রতিককালে, বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া দরিদ্র ও প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে। যেসব জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে অন্যের কর্তৃত্বাধীন এবং যারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সম্পদ থেকে প্রতিনিয়ত বিচ্যুত হচ্ছে এবং নিরন্তর প্রান্তিক অবস্থানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ; আইনগত ধারণায় (Juristic sense) এ শব্দটি দ্বারা তাদের বুঝানো হয়েছে। ১৯৯৩ সালে সিমলায় ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিতে একত্রিত হওয়া একদল সমাজবিজ্ঞানী জৈব-ঐতিহাসিক মূলগত স্বতঃসিদ্ধ অর্থে 'আদিবাসী' শব্দটির রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন। 'আদিবাসী' শব্দটি কালানুক্রমিক অর্থে ব্যবহার করা উচিত নয় বলে তারা মত প্রকাশ করেন এবং মাননির্ধারক অর্থে ব্যবহারের প্রতি জোর দেন ; এর দ্বারা এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা তাদের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত (Rooted) বলে মনে করে ; নিজেদের এলাকা এবং সম্পদ সম্পর্কে তাদের একটা নিরাপত্তা

বোধ কাজ করে ; প্রাথমিকভাবে তারা একটি নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ এবং তারা সমতাবাদী মূল্যবোধ দ্বারা সুসংহত একটি পারস্পরিক সম্পর্ক উপভোগ করে।

১৯৮৩ সালে, জাতিসংঘের Working Group on Indigenous Population আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি খসড়া সর্বজনীন ঘোষণা প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত 'ওয়ার্কিং ডেফিনেশন'কে গ্রহণ করে :

> Indigenous communities, peoples and nations are those, which having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sector of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as people, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems. (UN 1993 : Para-179)

১৯৮৯ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-র ১৬৯ নম্বর কনভেনশনের ১ নম্বর আর্টিকেলে আদিবাসীদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে –

> a) Tribal peoples in independent countries (are those) whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.
>
> b) Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions. (Rasmussen, H. & Roy, C. 2000)

১৯৮০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আই. বি. এস. কর্তৃক আয়োজিত উপজাতীয় সম্মেলনে ভারতের প্রখ্যাত ভাষাবিদ অনিমেষ কুমার পাল আদিবাসীদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "যে-সমস্ত সম্প্রদায় আদিকাল থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশে বসবাস করিয়া আসিতেছে এবং যাহাদের জীবনধারা এই বিংশ শতাব্দীর চরম শিখরেও আদিম পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে, তাহারাই আদিবাসী নামে পরিচিত" (উদ্ধৃত, স্টিফেন ১৯৯১ : ১১৯)। অন্যদিকে, নৃবিজ্ঞানী প্রশান্ত ত্রিপুরার মতে, "কোনো নির্দিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী বলার অর্থ হচ্ছে যে, তারাই সেই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের প্রাচীনতম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বংশধর। এটা স্পষ্ট যে, পুরোটিই একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। কীভাবে স্থানকালের সীমানা নির্ণয় করা হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করছে কোন প্রেক্ষিতে কাদের আমরা Indigenous বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বলবো" (প্রশান্ত ১৯৯৩ : ১৮)।

১.৪

আদিবাসীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় বিভিন্ন দেশে। যেমন – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদিবাসীদেরকে 'Red Indians', অস্ট্রেলিয়ায় 'Aborigines' বলে অভিহিত করা হয়। আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশে Tribal বা উপজাতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। Tribe অভিধাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল বৃটিশ ভারতের ১৮৮১ সালের আদমশুমারির সময়। এ পরিভাষা ব্যবহার করতো ঔপনিবেশিক শাসকেরা সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়কে দমন ও নির্যাতন করার জন্য এবং ঔপনিবেশিক শব্দভাণ্ডারে এটা ছিল হিংস্র (savage), আদিম জাতি (aboriginal), বর্বর (barbaria), জংলি (gunglee) ইত্যাদি শব্দের সমার্থক (জগন্নাথ ১৯৯২ : ৪৪)। বাংলাদেশের সংবিধানে এদের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (small Ethinic Group) অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ ধারায় ৬৯৭টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে Scheduled Tribes বলে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে সংখ্যালঘু এ সকল জাতিসত্তাকে বিভিন্ন অভিধায় পরিচিত করার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক 'অপরতা' বা otherness শব্দটি যুক্ত রয়েছে – এর সঙ্গে মূলস্রোতের আধিপত্যের ব্যাপারটি তো আছেই। তবুও এ সকল জনগোষ্ঠী নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আজও বাংলাদেশ, ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজেদের অবস্থানকে টিকিয়ে রেখেছে।

বিরজাশঙ্কর গুহ-এর বরাত দিয়ে সুবোধ ঘোষ (সুবোধ ২০০০: ৬৪-৬৫) ভারতের আদিবাসীদের তিনটি নৃতাত্ত্বিক বর্গে বিভাজিত করেছেন –

১. প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (proto-Australoid)

২. নিগ্রোবটু (Negrito)

৩. মঙ্গোলীয় (Mongoloid)

রোমিলা থাপারও একই ধরনের মত দিয়েছেন। ভারতীয় জনজাতির মধ্যে তিনি যে ছয়টি জাতির অনুসন্ধান করেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন তিন জাতি হল – নেগ্রিটো, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড ও মেডিটেরেনিয়ান। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন নেগ্রিটো। তারপর আসে প্রোটো-

অস্ট্রালয়েড। এরপর মঙ্গোলয়েড ও মেডিটেরেনিয়ান। আর্যদের আগমন ঘটে এদের পর। অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত প্রোটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণির লোকেরা বর্তমানে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভীল, কোল, খারোয়ার, ভূমিজ প্রভৃতি গোষ্ঠীভুক্ত জনজাতিতে বিন্যস্ত। নেগ্রিটো গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (সুবোধ ২০০০ : ৬৫-৬৭) হলো – দৈর্ঘ্যে বামনাকার, ছোট মাথা, ছোট চিবুক, ফোলা কপাল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন হালকা, শরীরের তুলনায় হাত লম্বা, গায়ের রং অত্যন্ত কালো। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বুসম্যান ও হটেনটট গোষ্ঠীর মধ্যে নেগ্রিটোর নিদর্শন পাওয়া গেলেও ভারতে বর্তমানে সম্পূর্ণ নেগ্রিটো গঠনের কোনো গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই ; তবে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অনেকের মধ্যে নেগ্রিটোর মুখ ও দৈহিক গঠনের কিছু ছাপ পড়েছে। দৈহিক উচ্চতা, মাথার গড়ন, চওড়া চ্যাপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট এবং কৃষ্ণবর্ণ – এ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নেগ্রিটো ও প্রোটো-অস্ট্রালয়েড উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে আছে। কিন্তু প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের কপাল এবং ভুরু আলাদা ধরনের, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও হালকা ধরনের নয়। উভয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য – চুলের বৈশিষ্ট্যে। নেগ্রিটোদের চুল আংটি-পাকানো কোঁকড়া, প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের তা নয় ; তাদের চুল ঢেউ-খেলানো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুঞ্চিত (Curly) কিন্তু স্প্রিংয়ের মতো আংটি পাকানো (Spirally coiled) নয়। মঙ্গোলীয়রা অরোমশ, বিরলশ্মশ্রু, চওড়া চোয়াল, চ্যাপ্টা নাক ও ভারি ভুরুর অধিকারী। মঙ্গোলীয়দের চোখ বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যাকে অনেকে 'বাদাম-আকৃতির চোখ' (almond-shaped eyes) বলে থাকে। আসামের আদিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য প্রবল। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা গোষ্ঠীও মঙ্গোলীয়দের বংশধর।

১.৫

আদিবাসী জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় দেশ। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে প্রায় ১০ কোটি ৪৩ লাখ আদিবাসী আছে, যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। এদের মধ্যে ৮৯.৯৭ শতাংশ গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং ১০.০৩% শহরে বাস করে। তাদের নারী ও পুরুষের অনুপাত ৯৯০ : ১০০০। আদিবাসী মোট জনসংখ্যার ১৪.৭% বাস করে মধ্যপ্রদেশে, ১০.১% মহারাষ্ট্রে, উড়িষ্যায় ৯.২%, রাজস্থানে ৮.৯%, গুজরাটে ৮.৬%, ঝাড়খণ্ডে ৮.৩%, ছত্তিশগড়ে ৭.৫%, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫.৭%, পশ্চিমবঙ্গে ৫.১%, কর্ণাটকে ৪.১%, আসামে ৩.৭%, মেঘালয়ে ২.৫% এবং অন্যান্য রাজ্যে ১১.৬%।[৬]

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসের শতকরা হার, ২০১৩ সালে ভারত সরকারের আদিবাসী পরিসংখ্যান বিষয়ক অধিদপ্তর প্রকাশিত *ভারতের সিডিউল্ড ট্রাইবদের পরিসংখ্যান* ২০১৩, থেকে নিম্নোক্ত তালিকাটি প্রণীত হলো–

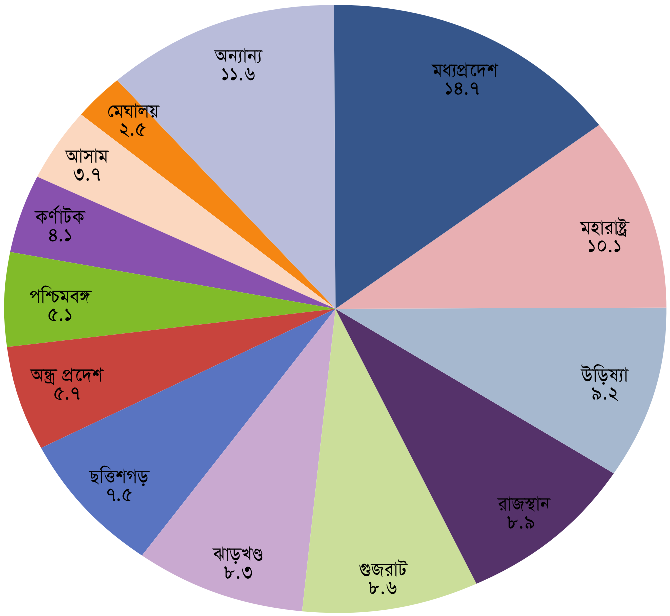

চিত্র : ২০১১ সালের গণনা অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা হার

ভারতের বর্তমান আদিবাসী জনসংখ্যার পাশাপাশি বিগত পাঁচ দশকের জনসংখ্যার তুলনামূলক একটি সারণীও দেওয়া হলো :

আদমশুমারি বছর	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	আদিবাসী জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা হিসাব
১৯৬১	৪৩৯.২	৩০.১	৬.৯
১৯৭১	৫৪৭.৯	৩৮.০	৬.৯
১৯৮১	৬৬৫.৩	৫১.৬	৭.৮
১৯৯১	৮৩৮.৬	৬৭.৮	৮.১
২০০১	১০২৮.৬	৮৪.৩	৮.২
২০১১	১২০১.৮	১০৪.৩	৮.৬

সূত্র : আদিবাসী পরিসংখ্যান বিষয়ক অধিদপ্তর, ভারত সরকার ২০১৩ : ৩

বিগত কয়েক দশকের আদিবাসী জনসংখ্যার তুলনামূলক হিসেবে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার হিসেবে আদিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১.৭ ভাগ। অর্ধশত বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ অপ্রতুল হার আমাদের জানিয়ে দেয় যে, ভারতভূমের আদিবাসীরা নিয়তই সংগ্রাম করে তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

১.৬

আর্যদের আগমনের পর ভারতের আদিবাসীরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পাহাড় বা অরণ্যের মতো দুর্গম স্থান নির্বাচন করেছিল নিজেদের বসতিরূপে। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে তারা নিজেদের সহজ-স্বাভাবিক জীবন-নীতি গড়ে তুলেছিল প্রকৃতির সাহচর্যে। সমতল কৃষিভূমিতে তাদের অধিকার না থাকলেও বনজ সম্পদ কিংবা জঙ্গল কেটে হাসিল করা জমি তারা ভোগ করেছে নিরঙ্কুশ আধিপত্যে। মধ্যযুগের শেষভাগে ইংরেজদের আগমনের পর নতুন ঔপনিবেশিক শাসন-যন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট আদিবাসীরা সরব হয়ে ওঠে নিজেদের হৃত অধিকার আদায় উপলক্ষ্যে। ইংরেজরা অধিকৃত নতুন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে সহজ-সরল আদিবাসীদের উপরও নয়া করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার অধিকারী আদিবাসীরা গভীর ঐক্যের বলে বলীয়ান হয়ে নব্য-ঔপনিবেশিক আগ্রাসনকে রুখতে চেয়েছে ; তির-ধনুক-কুড়াল-বর্শা দিয়ে প্রতিহত করতে চেয়েছে অর্ধবিশ্বের অধীশ্বর আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পরাক্রমশালী ইংরেজ বাহিনীকে। ১৭৭০ ও ১৭৭৯ সালের চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালের খাসি বিদ্রোহ, ১৭৮৯ সালের গঞ্জাস বিদ্রোহ, ১৭৮০-৮৫ সালের প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮০৮ সালের খান্দেশ আাদিবাসী বিদ্রোহ, ১৮১৮ সালের ভীল বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ সালের কোল বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬ সালের দ্বিতীয় সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৯৫-১৯০১ সালের মুণ্ডা বিদ্রোহ, ১৮৩৭ ও ১৮৮২ সালের ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে অসংখ্য আদিবাসী আত্মাহুতি দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা যেমন এই প্রতিরোধ সংগ্রামের কাহিনি মুছে দিতে চেয়েছে ইতিহাস থেকে, তেমনি স্বাধীন ভারতও তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগকে এড়িয়ে গেছে। স্বাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে আদিবাসীদের কোনো স্থান নেই। প্রান্তিক এ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষদের প্রতি রাষ্ট্রের হেজিমনিক অপরসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে পোস্ট-কলোনিয়াল ও সাবঅলটার্ন স্টাডিজ-এর তাত্ত্বিকগণ উচ্চকণ্ঠ ; আর মানবিকতাবোধে উচ্চকিত বাংলা সাহিত্যাঙ্গন, বিশেষত মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্য। রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় যাদের স্বীকৃতি মেলেনি, লিখিত ভাষার বা বর্ণের অভাবে যারা গান ও গল্পকথায় মৌখিকভাবে নিজেদের ইতিহাসকে সংরক্ষণ করে, তাদের কথাকার মহাশ্বেতা তাঁর সাহিত্যে আদিবাসী জনজীবনের নান্দনিক শিল্পভাষ্য নির্মাণ করেছেন। এ সূত্রে মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী জীবন ভিত্তিক গল্প-উপন্যাসের মূল্যায়ন খুবই প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যময়।

টীকা

১. হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে ১৯০০ কিংবা ১৮০০ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে স্থির করা হয়েছে (শিরিন ২০০৯ : ৮)। সে-হিসেবে আর্যদের আগমনের বহুপূর্বেই এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলা যায়।

২. "আর্য বা ইন্দো-এরিয়ানরা ইন্দো-ইয়োরোপীয়দের বংশধর। এরা কিছুকাল ব্যাকট্রিয়া ও উত্তর-ইরাণীয় মালভূমিতে বসবাস করছিল। কিন্তু ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তারা হিন্দুকুশ পর্বতমালার গিরিপথ দিয়ে উত্তর-ভারতে আসে" (রোমিলা ২০০২ : ১৪)।

৩. "জাতিবিদ্যাগত অনুসন্ধানে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান ছয়টি জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রাচীন হল নেগ্রিটো। তারপর এল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড। এরপর মঙ্গোলয়েড ও মেডিটেরেনিয়ান। এর পরবর্তীরা আর্য-সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হরপ্পা অঞ্চলে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, মেডিটেরেনিয়ান, আলপাইন ও মঙ্গোলয়েড মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয়, এই সময়ে উল্লিখিত প্রথম পাঁচটি জাতি ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বাস করত। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড শ্রেণীর লোকেদের। এদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত। এর উদাহরণ পাওয়া গেছে কয়েকটি আদিম উপজাতির মুণ্ডা ভাষার মধ্যে।" (রোমিলা ২০০২ : ৯)

৪. "প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৫৩০ সালের কাছাকাছি পারস্যের আকিমেনিড সম্রাট সাইরাস হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে কাম্বোজ, গান্ধার অঞ্চলের উপজাতিদের কাছ থেকে উপঢৌকন আদায় করে।

হেরোডোটাস লিখেছেন, গান্ধার ছিল পারস্যের বিংশতিতম প্রদেশ এবং এটি ছিল আকিমেনিড সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল ও সম্পদশালী প্রদেশগুলির অন্যতম।"(রোমিলা ২০০২ : ৩৮)

৫. The application of these ideas to Indian origins was strengthened by Max Mueller's work on Sanskrit and Vedic studies and in particular his editing of the Rigveda during the years from 1849 to 1874.

The Aryans, according to Max Mueller were fair-complexioned Indo-European speakers who conquered the dark-skinned dasas of India. The arya-vara and the dasa-varna of the Rigveda were understood as two conflicting groups differentiated particularly by skin colour, but also by language and religious practice, which doubtless underlined the racialinterpretation of the terms. The Aryas developed Vedic Sanskrit as their language. The Dasas were the indigenous people, of Scythian origin, whom he called Turanians. The Aryan and the non-Aryan were segregated through the instituting of caste. The upper castes and particularly the brahmanas of modern times were said to be of Aryan descent and the lower castes and untouchables and tribes were descended from the Dasas. (Romila, 1996 : 5-6)

Dhaka University Institutional Repository

ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর ঋগবেদের সূত্র ধরে একই কথা বলেছেন যে, বিজয়ী আর্যগোষ্ঠী অনার্য দাস বা দস্যুর মতো মানুষজনকে 'শূদ্র' বা সর্বনিম্ন বর্ণ হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। বৈদিককালে আর্যরা স্থানীয় মানুষদের দাস এবং দস্যু – এ অভিধায় চিহ্নিত করেছিল। (ইরফান ও বিজয় ২০১৩ : ২০-২২)

৬. ভারতের সিডিউল্ড ট্রাইবদের পরিসংখ্যান, ২০১৩, আদিবাসী পরিসংখ্যান বিষয়ক অধিদপ্তর, ভারত সরকার, পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাশ্বেতা দেবীর জীবন ও সাহিত্য

২.১

সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হলে স্রষ্টাকে নিবিড়ভাবে পাঠ করা আবশ্যক। যদিও রবীন্দ্রনাথের *উৎসর্গ* কাব্যগ্রন্থের একুশ নম্বর কবিতায় উৎকীর্ণ রয়েছে – 'কবিরে খুঁজো না তার জীবন চরিতে' – কিন্তু সাহিত্যিকের সমগ্র জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস তো পাওয়া যায় তার সাহিত্যকর্মে। পরিবার-পরিবেশ এবং বয়ে যাওয়া কালের অন্তর্লীন প্রবাহে ব্যক্তির যে হয়ে ওঠার ব্যাপার তা অগ্রাহ্য করা যায় না। সমাজ-সমকাল এবং লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্মিতিতে অর্জিত জীবনদর্শনের শব্দরূপ তাঁর সাহিত্য-কর্ম। মহাশ্বেতার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন প্রবলভাবেই সংশ্লেষিত তাঁর সাহিত্যকর্মে। ঔপনিবেশিক শাসনাকীর্ণ পরাধীনভূমে স্বাদেশিকতার সংগ্রাম, নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতভূমে দাঙ্গা-সহিংসতা, স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও গণমানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদার প্রাপ্তি না হওয়ায় একের পর এক গণ-আন্দোলন – তেভাগা, নকশাল বিদ্রোহ এসবই মহাশ্বেতা 'এক জীবনে' প্রত্যক্ষ করেছেন এবং মানুষের বিশেষত গণমানুষের কথাকার হিসেবে সাহিত্য ছাড়াও নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কর্মীর একনিষ্ঠতায়। তাঁর মনন, বিশ্বাস, কর্ম ও সাহিত্য একসূত্রে গাঁথা। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন –

> আমার লেখালেখিকে আমার কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে, নইলে এতটুকু পড়বে ধরা, অনেকটাই বাকি থাকবে। (মহাশ্বেতা ১৯৮৭ : ২৫)

তাই তাঁর সাহিত্য মূল্যায়নে ব্যক্তি মহাশ্বেতাকে জানা ও উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

২.২.১

১৯২৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) মকরসংক্রান্তির দিনে ঢাকার জিন্দাবাহার লেনের মামার বাড়িতে মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম। বাবা মণীশ ঘটকের তখন পঁচিশ বছর এবং মা ধরিত্রী দেবীর আঠারো।

বাবা ছিলেন একাধারে কবি এবং সাহিত্যিক ; 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে বাংলা ছোটগল্পে এক নতুন যুগের প্রণেতা। মাও কবি ছিলেন, যদিও লিখেছেন সামান্য কিন্তু তার পড়াশুনার ক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। মহাশ্বেতার স্মৃতিকথনে তার প্রমাণ মেলে –

> এমন এক পরিবেশে মা মানুষ হন, যেখানে গ্রামের বাড়ীতেও থাকে লাইব্রেরী ঘর। ... বিয়ে হয়ে মা যে পরিবারে এলেন সেখানেও বইয়ের সাম্রাজ্য। (নির্মল ১৯৯৮ : ১৩)

এমন বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান মহাশ্বেতা আশৈশব বই ও বই-প্রেমী মানুষবেষ্টিত হয়েই বড় হয়েছেন এবং সাহিত্যকে নিজ জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন।

কেবল বাবা-মা নন, তাদের পরিবারের প্রায় সবাই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। মহাশ্বেতার মানসে তাঁর পিতৃ ও মাতৃকুলের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য-চর্চা নিবিড়ভাবে কার্যকর ছিল। তাঁর পিতামহ সুরেশচন্দ্র ঘটক ইংরেজি ও ইতিহাস বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ডবল এম.এ. পাস করেন। পরে বেঙ্গল সিভিল-সার্ভিসে এস. ডি. ও. হন। তার আদিবাড়ি ছিল পাবনা জেলার পুরনো ভারেঙ্গায়। পিতামহী ইন্দুবালা দেবীও ছিলেন সে সময়ের শিক্ষিত এবং প্রবল সংস্কৃতি-মনা। এ দম্পতির পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা – মণীশ, সুধীশ, তপতী, সম্প্রীতি, ব্রততী, আশীষ, লোকেশ, ঋত্বিক ও প্রতীতি। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। মণীশ ঘটক কবি ও কথাসাহিত্যিক। সুধীশ ঘটক লন্ডনে সিনেমাটোগ্রাফি শিখে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করেন এবং ক্যামেরাম্যান হিসেবেও খ্যাতি পান। আশীষ ঘটকের পরিচিতি ঘটে সঙ্গীত-অনুরাগী রূপে। লোকেশ ঘটক নাবিক ও ভ্রমণপিপাসু – সে-সঙ্গে প্রবন্ধকার ও অনুবাদক হিসেবেও পরিচিত। ঋত্বিক ঘটক গল্পকার হলেও অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র-নির্মাতা হিসেবেই সমগ্র বাংলায় খ্যাত। মেয়েরা সকলেই সঙ্গীত-সাহিত্য অনুরাগী।

মহাশ্বেতার মাতৃকুলও শিক্ষিত ও সাহিত্যমনস্ক ছিলেন। মাতামহ নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত আইনজীবী ও সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক। যদিও তাদের পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার পুরনো ভারেঙ্গায়। ঘটক পরিবারের মতো চৌধুরী পরিবারও ছিল সংস্কৃতি-মনস্ক। মাতামহী কিরণময়ী দেবীর পিতা যাদবেন্দ্র চক্রবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরাগী এবং রাজনারায়ণের বন্ধু ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মহাশ্বেতা লিখেছেন – "রামমোহন রায়ের প্রথম জীবনীকার 'ঢাকা কলেজের ছাত্র' যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী সম্ভবত আমার মায়ের মাতামহ" (মহাশ্বেতা ১৯৮৭ : ২৭)। মাতামহী কিরণময়ী দেবী নিজেও সে-সময়ের শিক্ষিত নারী। বাড়িতে লাইব্রেরি নির্মাণ, পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার কথা বিভিন্ন স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়। মহাশ্বেতার পঠনপ্রীতির মূলে ছিল তাঁর দিদিমার প্রভাব। মহাশ্বেতার মনের দিক থেকে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কিরণময়ীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার এবং কিরণময়ীর নিজের ভূমিকা খুব

উল্লেখযোগ্য ছিল (কণিকা ২০১১ : ২২)। শৈশবে তিনি তাঁর কাছ থেকে দেশি রূপকথা ছাড়াও শুনেছিলেন ডেভিড কপারফিল্ড ও অলিভার টুইস্ট-এর গল্প। দিদিমা কিরণময়ী দেবীর ঔদার্যের একটি নিদর্শন মহাশ্বেতা দেবীর স্মৃতিচারণায় পাওয়া যায়। কবি গোবিন্দ দাসের (১৮৫৫-১৯১৮) মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাহায্যের জন্য এলে তিনি নিজ হাত থেকে একগাছি বালা খুলে দিয়েছিলেন ; কেননা, সে-সময়ে তাঁর হাতে টাকা ছিল না (মহাশ্বেতা ১৯৯৬ : ১৪)।

প্রবল রবীন্দ্র-অনুরাগী মাতামহের পরিবারে রবীন্দ্র-বিরোধিতা রীতিমতো অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত ছিল, যদিও তার বাবা মণীশ ঘটকের সাহিত্যচর্চা ছিল রবীন্দ্র-বলয়ের বাইরে। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণাতেও এই দুই পরিবারের সাহিত্যচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই পরিবারেই দেশ-বিদেশের বই পঠিত ও আলোচিত হতো (বুদ্ধদেব ১৯৭৬ : ৭)। অর্থ-বিত্ত নয়, মেধা-মননের মাপকাঠিতে এ দু'পরিবার ধনী ছিলেন নিঃসন্দেহে। মহাশ্বেতার সাহিত্যিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও এদের অবদান অসামান্য। তিনি নিজেই এই অবদান স্বীকার করেছেন –

> পরিবার তো রেখে যায় অবদান। আর আমরা মাতৃকুল পিতৃকুল মিলিয়ে শতখানেক মানুষের পারিবারিক বৃত্তে বড় হয়েছি। এর লাভের দিকটাও অসামান্য। কত রকম মানুষ দেখা, কত রকম জীবন জানা (মহাশ্বেতা ১৯৮৮ : ৩৫)।
>
> কি মাতৃকুল, কি পিতৃকুল, দুদিকেই আমরা অর্থ-ভূমি ইত্যাদি বলে বলী ছিলাম না। জোরের জায়গাটা ছিল, বড় বড় মাপের, খোলামেলা 'earthy' মানুষদের পেয়েছি। এঁরা মেজাজে বড়লোক (উদ্ধৃত, কণিকা ২০১১ : ২৬)।

২.২.২

মহাশ্বেতারা নয় ভাইবোন। তিনি সবার বড়ো। পরের আটজন হলেন – শাশ্বতী (১৯২৯-৯৫), অনীশ (১৯৩০-৭৮), অবলোকিতেশ (১৯৩৩-৭৩), অপালা (১৯৩৫–), শমীশ (১৯৩৮-৮১), মৈত্রেয় (১৯৪১–২০০৩), সোমা (১৯৪২–), শারী (১৯৪৫–)। সহজাত শিল্প-সাহিত্য প্রবণতার অধিকারী ছিলেন এরা সকলেই, একা কেবল মহাশ্বেতা পেয়েছেন সাহিত্যিকের খ্যাতি। এ সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে মহাশ্বেতা বলেছেন –

> বাবারা সব ভাই বোন যেমন আমার ভাইবোনরাও জন্মসূত্রে আঁকার হাত, গানের গলা, অভিনয় ক্ষমতা পেয়েছিল। উত্তরাধিকার লব্ধ সম্পত্তিতে কিছু হয় না। নিরন্তর চেষ্টায় তাকে বাড়াতে হয়। (মহাশ্বেতা ১৯৯৬ : ২৬)।

Dhaka University Institutional Repository

বাবা মণীশ ঘটক বি.এ. পাস করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। তিনি চাকরি করতেন আয়কর বিভাগে। বাবার বদলির চাকরি-সূত্রে তাঁরা সপরিবারে ঢাকা, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, ফরিদপুর, মেদেনীপুর, বহরমপুরসহ বিভিন্ন স্থানে থেকেছেন।

২.২.৩

খুব অল্প বয়সে মহাশ্বেতাকে ভর্তি করা হয় ইডেন মন্টেসরি স্কুলে। মাত্র চার বছর বয়সেই তিনি বাংলা লিখতে ও পড়তে শিখে ফেলেন। বাবার বদলির সূত্রে মাঝে মাঝে বিদ্যালয়-জীবনে ছেদ পড়লেও বাড়িতে পড়াশুনার কোন বিরাম ছিল না। ১৯৩৫ সালে বাবা মেদেনীপুরে বদলি হলে তিনি সেখানকার মিশন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরের বছর ১৯৩৬ সালে মেদেনীপুর ছেড়ে তাঁকে যেতে হয় শান্তিনিকেতনে। মাত্র দশ বছর বয়সে মা-বাবাকে ছেড়ে শান্তিনিকেতন যেতে মহাশ্বেতা কেঁদেছিলেন কিন্তু তিন বছর পর শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় আসতে কেঁদেছিলেন অনেক বেশি। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি – এ দুবছর শান্তিনিকেতনে পড়ার অভিজ্ঞতা তাকে ঋদ্ধ করেছিল অনেকখানি। প্রকৃতির সান্নিধ্যে উদার পঠন-পাঠন পরবর্তী সময়ে মহাশ্বেতাকে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সম্ভবত শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালেই তিনি প্রথম সাঁওতাল তথা আদিবাসীদের প্রত্যক্ষ করেন। সাঁওতাল পরগনার পার্শ্ববর্তী হওয়ায় সাঁওতালদের শান্তিনিকেতনে গমনাগমন ছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসাটাও রবীন্দ্র-প্রভাবিত মামাবাড়ির বলয়ে বেড়ে ওঠা মহাশ্বেতার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সপ্তম শ্রেণিতে রবীন্দ্রনাথকে তিনি পেয়েছিলেন বাংলার শিক্ষক হিসেবে। এ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথকে। শান্তিনিকেতনের এ দু'বছরের স্মৃতি রক্ষিত রয়েছে তাঁর দুটি বইয়ে – *আমাদের শান্তিনিকেতন* (২০০১) ও *ছিন্ন পাতার ভেলা* (২০০৬)।

অসুস্থ মা ও ছোট পাঁচ ভাইবোনের দেখাশোনা করার জন্য মহাশ্বেতাকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় ফিরতে হয়। মাত্র তেরো বছর বয়সে গৃহকর্ত্রীর কঠোর দায়িত্ব তিনি পালন করা শুরু করেন সুচারুভাবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও সাহিত্য পাঠ থাকে অব্যাহত। ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পর তিনি বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এসময় তাঁর জীবনে দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমত, সে-বছর তাঁর সমবয়সী কাকা (তিন মাসের বড়) ঋত্বিক ঘটক তাদের বাড়িতে এসে থাকেন প্রায় দু'বছর। তাঁর অলংকরণ ও সম্পাদনায় মহাশ্বেতা একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (মহাশ্বেতা ১৯৯৬ : ২৮)। বন্ধুসম এ কাকার সান্নিধ্যে তিনি ইংরেজি সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হন। ১৯৪০ সালে পলগ্রেভের দি

গোল্ডেন ট্রেজারি দিয়ে শুরু করেন, তারপর একাধারে তিনি পড়ে ফেলেন তুর্গেনিভ (১৮১৮-৮৩), হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮), এমিলি ব্রন্টি (১৮১৮-৪৮) প্রমুখ লেখকের রচনা। দেশ-কালের অস্থিরতা ও বিশ্বসাহিত্যের সংযোগে তাঁর লেখক-জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব ধরে নেয়া যায় সে-সময়কে। দ্বিতীয়, তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৪০-এ 'রংমশাল' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' সম্পর্কে লিখেছিলেন তিনি এবং এটি ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখা।

১৯৪২-এ ম্যাট্রিক পাশ করে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন মহাশ্বেতা। প্রথম বর্ষের ছাত্রী থাকাবস্থায় তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অলকা মজুমদার (চট্টোপাধ্যায়), গীতা রায়চৌধুরী (মুখার্জী) এবং সুজাতা বসু (প্রয়াত)-র প্রণোদনায় মহাশ্বেতা যোগ দেন কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্রী সংগঠন 'Girls` Student Association'-এ এবং পূর্ণোদ্যমে পঞ্চাশের মন্বন্তরে দুর্গতদের ত্রাণকাজে অংশ নেন। এ সময়ে 'কিশোর বাহিনী'র (CPI সংগঠন) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও তিনি পার্টির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন। পার্টির মিটিং-এ যেতেন তিনি, পার্টির মুখপত্র 'People's war' এবং 'জনযুদ্ধ' বিক্রি করতেন, পাঠও করতেন। কম্যুনিজমের প্রতি আস্থা গড়ে উঠেছিল সম্ভবত মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণেই। তবে প্রথাবদ্ধ রাজনৈতিক গণ্ডিতে আবদ্ধ তিনি হননি। দলীয় রাজনীতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। রাজনীতির ছকেবাঁধা জীবন তাঁর অভিপ্রেত নয়, মানবতাবাদে বিশ্বাসী হলেও তত্ত্ব-নির্ভর হয়ে ওঠেননি তিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য –

> কোনো থিওরি পড়িনি। আমাকে মার্কস এঙ্গেলস লেনিন মাও সে তুং পড়াবার বহু চেষ্টা করান হয়েছে, পড়িনি। আমি শুধু মানুষ থেকে পাঠ নিয়েছি। (মহাশ্বেতা ১৯৯৬ : ১৪)

ছাত্রজীবনে ভাইদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছে চড়া, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটার স্বতঃস্ফূর্ততায় মহাশ্বেতা ছিলেন প্রাণবন্ত। দৈহিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রত্যয়ে হাজরা পার্কে তিনি লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শিখতেন। অবশ্য মহাশ্বেতার মাতামহের গৃহে এর প্রচলন ছিল বহুপূর্ব থেকেই। তাঁর ছোটমামা শঙ্খ চৌধুরীর স্মৃতিচারণে জানা যায় যে, তাদের বাড়িতে মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য ছোরাখেলা, লাঠিখেলার ক্লাস হত (শঙ্খ ২০০২ : ৮-৯)। সুতরাং প্রথাবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য বাইরে সমালোচিত হলেও মহাশ্বেতা বরাবর মা-বাবার পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন জীবন গঠনে। আর্তের সেবা যেমন তিনি করেছেন, সাংসারিক দায়িত্বও পালন করেছেন। মায়ের পুরনো সেলাই মেশিন চালিয়ে তৈরি করেছেন জামাকাপড়, মশারি, বালিশের কভার। রান্নাবান্নাও করেছেন। ছাত্রী-জীবনেই অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার অভীপ্সায় ১৯৪২ সালে সহপাঠিনীদের সহযোগিতায় 'চিত্ররেখা' নামে কাপড় ছাপবার দোকান খুলেছিলেন। দোকানের মূলধন হিসেবে প্রদত্ত তিরিশ টাকাও তাঁর নিজের উপার্জনের। হ্যান্ডবিল

দেখে ভাই অবলোকিতেশের বুদ্ধি ও মায়ের সক্রিয় সমর্থনে ঢাকা থেকে কাপড় রঙ করার সাবান ভি পি করে আনিয়ে কলেজে বিক্রি করতেন। সেই ব্যবসা থেকে জমেছিল ওই তিরিশ টাকা। এ ব্যবসা অবশ্য তিনি স্বল্পসময়ই চালিয়েছেন এবং তারপর আবারও ব্যস্ত হয়েছেন পড়াশুনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে।

বাবার বদলিসূত্রে ১৯৪৪-এ মহাশ্বেতা কলকাতা থেকে চলে আসেন রংপুরে। সেখানে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী বিনয় রায় ও রেবা রায়চৌধুরীর সান্নিধ্যে এসে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁর এ অভিজ্ঞতা সম্ভবত পরবর্তী জীবনে তাঁকে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১৯৪৪-এর শেষের দিকে তিনি পুনর্বার শান্তিনিকেতনে বি.এ. পড়তে যান সাংসারিক দায়িত্ব থেকে কিছুটা অব্যাহতি পেয়ে, ছোট বোন মিতুল সে-দায়িত্ব নেয়ায়। সেখানে সম-মানসিকতার শিক্ষার্থীদের সাহচর্যে পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি সামাজিক-দায়বদ্ধতায় প্রতিবাদ-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, অস্তি চিমুর বন্দিদের ফাঁসির প্রতিবাদে পোস্টার লিখেছেন, গান্ধী দিবসে স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে পোস্টার এক্‌জিবিশন করেছেন। এসবই তাঁর সংগ্রামী চেতনাকে আরও উজ্জীবিত করেছে এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহের কাহিনি রচনার পূর্বসূত্র হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। শান্তিনিকেতনে থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কথায় তিনি ছোটগল্প লেখা শুরু করেন। সে-সময়ে তাঁর তিনটি ছোটগল্প ‘দেশ’ পত্রিকায় ছাপা হয়। প্রত্যেক গল্পের জন্য তিনি পারিশ্রমিক হিসেবে দশ টাকা করে পান। লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার প্রেরণা তৈরি হয় এ সময়টাতে।

১৯৪৬ সালে ইংরেজি অনার্সসহ বি.এ. পাশ করে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফিরে আসেন মহাশ্বেতা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. (ইংরেজি) ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণামে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া স্থগিত হয়ে যায়। অবশ্য তাই বলে তিনি থেমে থাকেননি, নানা কাজে যুক্ত থেকেও প্রায় সতেরো বছর পর ১৯৬৩-তে তিনি এম.এ. পাস করেন।

২.২.৪

প্রখ্যাত নাট্যকার ও সাহিত্যিক বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে পারিবারিকভাবে তাঁর বিয়ে হয় ১৯৪৭ সালে । বিয়ের পর কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তিনি। সাংসারিক জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিরত সংগ্রামে দিন-যাপন শুরু হয় তাদের। সে-সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে বিজন ভট্টাচার্য কোনো অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সংসার চালানোর পুরো দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মহাশ্বেতা ১৯৪৮

সালে পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউট-এ শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। জীবিকার তাগিদে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হন ; যথেষ্ট সংগ্রাম-সঙ্কুল ছিল তাঁর কর্মজীবন। ১৯৪৯ সালে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসে চাকুরি পেলেও তা করা হয়নি, কেননা বাবা মণীশ ঘটক সেখানে বড় অফিসার, সুতরাং তার কন্যার কেরানি পদে যোগ দেয়া সামাজিকভাবে নিন্দনীয়। এ বছরই কেন্দ্রীয় সরকারের পোস্টাল অডিটে আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে চাকরি পান। কিন্তু একবছরের মধ্যেই তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয় রাজনৈতিক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বা স্বামী কমিউনিস্ট হওয়ার অপরাধে। অবশ্য প্রখ্যাত আইনবিদ অতুল গুপ্তের চেষ্টায় পুনর্বহাল করা হয় তাকে অস্থায়ীভাবে। ১৯৫০-এ তাঁর ড্রয়ারে মার্ক্স ও লেনিনের বই পাওয়ার অপরাধে তাকে দ্বিতীয়বার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর আর সরকারি চাকরিতে ফেরার চেষ্টা করেননি তিনি।

চাকরি যাওয়ার পর তিনি সংসার চালাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাপড়কাচার সাবান বিক্রি এবং সকাল-বিকাল টিউশনি শুরু করেন। একমাত্র সন্তান নবারুণের (২৩.০৬.৪৮– ৩১.০৭.১৪) আগমন তার জীবন-যুদ্ধকে আরও কঠিন করে তোলে। ১৯৫৭ সালে রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ পাবার পর কিছুটা স্থিতি আসে জীবনে। ১৯৬৩-তে এম.এ. পাস করার পর ১৯৬৪-তে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজি বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন তিনি। লেখাকে পেশা হিসেবে নেবার পর ১৯৮৪-তে তিনি সেখান থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। জীবনের এই উত্থান-পতন, বিচিত্র পেশা ও মানুষের সঙ্গে সংযোগ এবং দারিদ্র্যের কন্টকময় দীর্ঘ দিনগুলো ব্যক্তি মহাশ্বেতাকে ঋদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তি –

> দুঃখ কষ্ট করে সামান্যে চালাবার অভ্যেস আমাকে শক্ত করে তৈরি করে দেয়। যে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।...(মহাশ্বেতা ১৯৮৮ : ৩৬)

নিদারুণ দারিদ্র্য নিবারণের উপায় হিসেবে নানা পেশার পাশাপাশি সাহিত্য রচনা চলতে থাকে এসময়ে পুরোদমে। আবারও ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম জীবনী-গ্রন্থ *ঝাঁসীর রানী* ৬ই অগাস্ট ১৯৫৫ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৫ খ্রি. পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালে পুস্তকাকারে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় নিউ এজ প্রকাশনা সংস্থা থেকে। ‘দেশ’ পত্রিকাতেই *যশবন্তী* নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এর আগে ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬-এর মধ্যে শ্রীসুমিত্রা দেবী / শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী ও সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে তিনি অনেকগুলো গল্প লেখেন ‘সচিত্র ভারত’ পত্রিকায়। (পম্পা ২০১৩ : ২০)

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৫

ঝাঁসীর রানী তাঁকে লেখক হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। ভূগোল, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি তাঁর লেখার উল্লেখযোগ্য উপাদান হয়ে ওঠে এ সময় থেকেই (কৃপাশংকর ১৯৯৯ : ৪৪)। ইতিহাস-আশ্রিত এ কাহিনি লেখার ইতিহাসও বেশ উপভোগ্য। হিন্দি ফিল্মের চিত্রনাট্য লেখার জন্য বিজন ভট্টাচার্য মুম্বাই যান ১৯৫২ সালে, মহাশ্বেতা তার সহযাত্রী হন। তাঁর বড়মামা, Economic and Political Weekly-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শচীন চৌধুরী তখন থাকতেন মুম্বাই। মামার কাছ থেকে তিনি ইতিহাসের বিশেষত সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনি পড়েন অখণ্ড অবসরে। এ বিষয়কে গ্রহণ করে তিনি *ঝাঁসির রানী*-র জীবনী-গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন এবং অল্প সময়ে চারশো পাতা লিখে ফেলেন। কিন্তু এক অতৃপ্তি তাড়া করে ফেরে তাকে। রচনার কাজ স্থগিত রেখে বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে ১৯৫৪ সালে বুন্দেলখণ্ডের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। কয়েক মাস একা একা বুন্দেলখণ্ডের আনাচে-কানাচে ঘুরে সংগ্রহ করেন রানী সম্পর্কিত আঞ্চলিক লোকগীতি এবং লোককাহিনি। রানীর জীবনীকার বৃন্দাবনলাল ভার্মা ও রানীর ভাইপো গোবিন্দ চিন্তামণির সঙ্গে যোগাযোগ করে ঝাঁসির সঙ্গে সম্পর্কিত আরও কিছু স্থান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে কলকাতায় ফিরে এসে নতুন করে লেখেন *ঝাঁসির রানী*। এ থেকেই তাঁর পেশাদারি লেখকের পথ সুগম হয়।

২.২.৬

ব্যক্তিগত জীবনে এ সময় ভাঙন ও বিচ্ছেদের সুর স্পষ্ট হয়। ১৯৬২ সালে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ১২-১৩ বছরের নবারুণকে ফেলে চলে আসতে হয় তাঁকে। এ যন্ত্রণা তাঁকে দীর্ণ করে তীব্রভাবে। অতিমাত্রায় ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালান তিনি, কিন্তু ডাক্তারদের চেষ্টায় বেঁচে যান। বিচ্ছেদ ঘটলেও মহাশ্বেতা তাঁর জীবনে বিজন ভট্টাচার্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন সবসময়। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য –

> Bijon has shaped my talent and given it a parmanent form. He has made me into what I am today. (নিতাই ১৯৯৯ : ২৭০)

বেদনা ভোলার জন্যই যেন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ১৯৬৫ সালে অসিত গুপ্তকে। কিন্তু এ বিয়েও সুখের হয়নি। ১৯৭৬ সালে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ। এরপর থেকে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন ; কাজকে সঙ্গী করে এগিয়ে যাওয়া জীবনের পথে এবং সে-পথে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া নিরন্ন, নিপীড়িত, অবহেলিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে।

২.২.৭

১৯৭৯ সালে পিতার মৃত্যুর পর মণীশ ঘটক সম্পাদিত ‘বর্তিকা’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহাশ্বেতা এবং এ পত্রিকাটিকে পরিণত করেন ক্ষুদ্র কৃষক, কৃষিমজুর, আদিবাসী, শিল্প-শ্রমিক তথা সমাজের ব্রাত্য শ্রেণির মুখপত্রে। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা তাঁর সাহিত্য-রচনার অন্তরায় হয়নি, বরং সহায়ক হয়েছে। ১৯৮২-৮৪ সালে তিনি ‘যুগান্তরে’ ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। আদিবাসী এবং ব্রাত্য শ্রেণির মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও ভালোবাসায় সাহিত্যের আসরে উপস্থাপিত করেন সে-জীবনকে। মেদেনীপুরের লোধা ও পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবর আদিবাসীরা তাদের জীবনসংগ্রামের কথা লিখতে পেরেছে ‘বর্তিকা’তে। এর আগে কোন পত্রিকা আদিবাসী জীবনকে এভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। লোধা মেয়েদের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট চুনি কোটালের জীবনসংগ্রামের কাহিনি লিখেছিলেন তিনি ‘বর্তিকা’তে ১৯৮২ সালে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করেছিল লোধা নারী চুনি। এভাবে বর্তিকার স্বতন্ত্র চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন বৈপ্লবিক দিগন্ত উন্মোচনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস মহাশ্বেতাকে বাংলা লিটল-ম্যাগাজিন আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। (কৃপাশংকর ১৯৯৯ : ৫২)।

২.২.৮

ইতিহাস-আশ্রিত জীবনী-গ্রন্থ *ঝাঁসির রানী* সাহিত্যিক হিসেবে মহাশ্বেতার অবস্থানকে একটি শক্ত ভিত্তি দেয়। সেই ভিত্তিতেই তাঁর পরবর্তী জীবনের সুউচ্চ সাহিত্য-পিরামিড স্থাপিত। এরপরই তিনি পেশাদার লেখক-জীবন গ্রহণ করেন এবং অর্ধশতক ধরে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য নানাবিধ ধারায় সক্রিয় থেকে বাংলা সাহিত্যকে দান করেন অফুরন্ত সম্পদ। কেবল বাংলা সাহিত্য নয়, তাঁর সাহিত্যকর্ম বিভিন্ন প্রাদেশিক ও বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে তাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দিয়েছে প্রভূত পরিচিতি। পেশাগত কারণে বেশ কিছু বাণিজ্যিক রচনা করতে হয়েছে কিন্তু তিনি কালজয়ী হয়েছেন ভারতবর্ষীয় ব্রাত্য মানুষ, বিশেষত আদিবাসী জীবনের কথাকার হিসেবে। সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন, ইতিহাসপ্রিয়তা ও প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদী চেতনা তাকে আদিবাসী জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত তাঁর আদিবাসী-সম্পর্কিত রচনাগুলো বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের আস্বাদ এনেছে।

মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধে সাহিত্য রচনার পাশাপাশি তিনি জড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কাজের সঙ্গে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের সাহচর্যে তাদের জীবনকেই তাঁর পরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের সাহিত্য-উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ব্রাত্যজন ও আদিবাসী জীবনকে কেবল কথার মালা গেঁথে মহিমান্বিত করেছেন মহাশ্বেতা, তা নয় ; বরং সক্রিয় থেকেছেন তাদের নানা অধিকার-দাবি আদায়ে। অসংখ্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তিনি।'কোরক' সাহিত্যপত্রে সেসব সংগঠনের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছিল। তালিকাটি (নির্মল ১৯৯৮ : ২৩) নিম্নে দেওয়া হল –

১. পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা, ২. সর্বভারতীয় বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা, ৩. পশ্চিমবঙ্গ লোধাশবর কল্যাণ সমিতি, ৪. পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি, ৫. পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি (মেদেনীপুর), ৬. পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া), ৭. পশ্চিমবঙ্গ সহিস জাতি কল্যাণ সমিতি, ৮. পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া জাতি কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া), ৯. মাঝিগেড়িয়া আদিবাসী গাঁওতা সুসার বাইসি (বাঁকুড়া), ১০. সান্তাল সমাজ লাহান্তি বাইসি (মুর্শিদাবাদ), ১১. ভারতের কের আদিম জাতি (মধ্যমগ্রাম), ১২. পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যাণ সমিতি (কাঁচড়াপাড়া), ১৩. দলিতজন মুক্তি সংগঠন (শিবপুর-হাওড়া), ১৪. কিরিবুরু আদিবাসী মহিলা সমাজ (সিংভূম), ১৫. মুণ্ডা সমাজ সাঁওয়ার জামদা (ওড়িশা), ১৬.কল্যাণী ও চাকদহ অঞ্চলের ইটভাটা মজদুর সমিতি, ১৭. আদিবাসী ও হরিজন কল্যাণ সমিতি, ১৮. বহরমপুর পৌর হরিজন কল্যাণ সমিতি (সোনারপুর), ১৯. পশ্চিমবঙ্গ ঢেকারো কল্যাণ সমিতি, ২০.সর্বভারতীয় ডিনোটিফায়েড এবং যাযাবর গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা সমিতি প্রভৃতি। এছাড়াও প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আদিম জাতি ঐক্য পরিষদ' – পশ্চিমবঙ্গের আটত্রিশ গোষ্ঠীসহ সকল আদিবাসীদের মিলনমঞ্চ।

২.২.৯

সাহিত্যে স্বীকৃতিস্বরূপ মহাশ্বেতা দেবী পেয়েছেন বহু পুরস্কার – চৈতন্য লাইব্রেরি পুরস্কার (১৯৫৮), শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার (১৯৬৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মৃতিপদক (১৯৭৮), সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৯), নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক শেফালিকা স্বর্ণপদক (১৯৮১), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ভুবনমোহিনী দেবী পদক (১৯৮৩), ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' (১৯৮৬), জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৮৯), বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার (১৯৯০), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৯৬), ম্যাগসাইসাই পুরস্কার (১৯৯৭), সাম্মানিক ডক্টরেট, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৮), ফেলোশিপ : বোম্বে এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯৯৮), ইয়াসমিন স্মৃতি পুরস্কার, দিল্লি (১৯৯৮), সাম্মানিক ডি.লিট. ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ ইউনিভার্সিটি, কানপুর (২০০০), সাম্মানিক ডি.লিট. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (২০০১), ভারতীয় ভাষা পরিষদ সম্মাননা

(২০০১), ইতালির 'প্রিমিও নোনিনো রিসিট ডি আউর' (২০০৫) এবং সমগ্র সাহিত্য রচনার জন্য ফরাসি সরকার কর্তৃক 'অফিসার অব দি অর্ডার অব আর্টস অ্যান্ড লেটারর্স'। এছাড়াও দেশ-বিদেশের বহু স্বীকৃতি, বহু পুরস্কার ও উপাধিতে সমৃদ্ধ হয়েছেন তিনি।

২.২.১০

ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামশীলতা প্রথমাবধি মহাশ্বেতার সাহিত্যিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে, সংগ্রাম হয়েছে তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপাদান ও উৎস। *ঝাঁসির রানী*-র সংগ্রামকে উপজীব্য করে ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতার যাত্রা শুরু – যদিও এটি ঠিক উপন্যাস নয় ; জীবনীগ্রন্থ বা উপন্যাসের আদলে রচিত ইতিহাস। তবে এ কাহিনির উপাদান নিয়ে রচিত *নটী* (১৯৫৭)-কে তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা নেই। এরপর একাধারে *মধুরে মধুর* (১৯৫৮), *যমুনা কি তীর* (১৯৫৮), *কি বসন্তে কি শরতে* (১৯৫৮), *এতটুকু আশা* (১৯৫৯), *তিমির লগন* (১৯৫৯), *সন্ধ্যার কুয়াশা* (১৯৫৯), *প্রেমতারা* (১৯৫৯), *তারার আঁধার* (১৯৬০), *লায়লী আশমানের আয়না* (১৯৬১), *তীর্থশেষের সন্ধ্যা* (১৯৬১) উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ লেখক হিসেবে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করে।

এ ধারার বাঁকপরিবর্তন ঘটে *অমৃত সঞ্চয়* (১৯৬২) ও *আঁধার মাণিকে* (১৯৬৬)। প্রিয় বিষয় ইতিহাস অবলম্বন করে এই প্রথম তাঁর লেখায় নিম্নবর্গ স্থান করে নেয়। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতার লেখক জীবনের শীর্ষ সোপানের প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিের জীবন ও মৃত্যু* (১৯৬৭) উপন্যাসটিকে। এরপর *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৩), *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭), *অপারেশন ? বসাই টুডু* (১৯৮২), *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* (১৯৮০), *শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা* (১৯৮০), *অক্লান্ত কৌরব* (১৯৮২) প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারার নির্মাতার গৌরব দান করেন মহাশ্বেতাকে। এ ধারাকে আরও বেগবান করে *টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা* (১৯৮৭), *ক্ষুধা* (১৯৯২) ইত্যাদি অনন্য-সাধারণ উপন্যাস।

একজন দায়িত্ববান সাহিত্যিক হিসেবে অন্যায়-অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে 'সূর্য-সম ক্রোধ' নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী সমগ্র জীবন 'মানুষের কথা' লিখেছেন। সাহিত্যসৃষ্টি ও গণমানুষের উত্তরণ – এ দ্বিবিধে দ্বিতীয়টিকে আজীবন অগ্রাধিকার দিয়েছেন তিনি। নির্দ্বিধায় বারংবার উচ্চারণ করেছেন যে, আদিবাসী-সমাজের সেবায় সমগ্র জীবন কাটাতে পারলে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষতিও তিনি মেনে নিতে পারেন (কণিকা

২০১১ : ১৩১)। তাঁর এ মনোভাবের কারণেই তাঁর সাহিত্য লোকবৃত্ত থেকে গণবৃত্তের আখ্যানে রূপ নিয়েছে।

২.৩

বার্ধক্য-জরার করাল গ্রাসে মহাশ্বেতা দেবীর জীবনাবসান ঘটে ২০১৬ সালের ২৮ জুলাই মধ্যাহ্নে। বাংলা সাহিত্যের এক নক্ষত্রের পতন ঘটে। তাঁর কর্ম ও সাহিত্য জগতের গতিশীলতা জীবনের শেষ কয়েক বছর রুদ্ধ ছিল বার্ধক্যজনিত স্মৃতিহীনতার কারণে। তিনি সংকল্প করেছিলেন, ২০২৫ সাল অবধি বাঁচবেন, পরের সময়টা দেখে যাবেন[১]; সংকল্প পূরণ হলো না, নয় বছর আগেই চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। মৃত্যু নিয়ে কোনো ভীতি ছিল না তাঁর, এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন –

> আমি কখনো মরবও না। আমি আদিবাসীদের মাঝে সবসময় বেঁচে থাকব। 'If they are alive I will be alive' আমি আদিবাসীদের থেকে আলাদা নই। যশ বা কীর্তির জন্য বেঁচেও থাকব না। বরং আমি মনে করি, আদিবাসীরা বেঁচে থাকলে আমিও বেঁচে থাকব (কৃপাশঙ্কর ১৯৯৯ : ৭৯)।

আদিবাসী জীবনের মহৎ কথাকার মহাশ্বেতা সমগ্র জীবন শোষিত শ্রেণির হয়ে লড়েছেন কলমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে বাংলা সাহিত্যকে অফুরন্ত দিয়েছেন তিনি। লেখক থেকে কর্মী-লেখক হয়ে ওঠা মহাশ্বেতার সাহিত্য মানবিক সমাজের সংকট ও সংকট মুক্তির আখ্যানরূপে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্রস্থান ধরে রাখবে বহুকাল।

টীকা

১. ঢাকায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে আলাপের এক পর্যায়ে মহাশ্বেতা দেবী এ সংকল্প প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "পরের সময়টা তো আমরা দেখে যাবোই। আমি আর আখতার ২০২৫ সাল অব্দি বাঁচবো।" সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ* (১৯৯৭)-এ। মহাশ্বেতার এ বক্তব্যটি খুঁজে পাওয়া যাবে উক্ত গ্রন্থের ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন

৩.১

সূচনালগ্ন থেকেই বাংলা সাহিত্য আদিবাসী জনজীবনকে সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদে যে ডোম, শবর বা টিলায় বসতকারী জনজীবনের বিবরণ আছে, নিঃসন্দেহে তা আদিবাসী প্রান্তিক জীবন। ভারতীয় পুরাণ, বেদ-রামায়ণ-মহাভারত এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও আদিবাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধুনা বাংলা কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবনের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-৮৯) *পালামৌ* (বঙ্গদর্শন ১২৮৭-৮৯) নামক ভ্রমণকাহিনিতে। গল্প-উপন্যাসের স্বাদবাহী এ কাহিনিতে 'কোল' এবং অসুরজাতির মানুষের পরিচয় ও প্রবণতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ কাহিনিতে লিপিবদ্ধ আদিবাসীদের জীবনাচরণ সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন –

> ছোটনাগপুরের আদিম গিরি-দরী-অরণ্যানী এবং আরণ্যক পশু-মানব লেখকের সমবেদনা রসধারার অভিষেকে *পালামৌ* প্রবন্ধগুলিতে অভিনব মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া জীবন লাভ করিয়াছে। (সুকুমার ১৪০৩ : ২০৩)

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) *রাজকাহিনী* (১৯০৯) গড়ে উঠেছে রাজপুতানার 'ভীল বিদ্রোহ'-এর প্রেক্ষাপটে। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের আদিম ঐতিহ্যবাহী শবর সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ 'ভীল' নামে পরিচিত। ভীল উপজাতীয় গোষ্ঠীর জীবন ও চেতনা এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঠাকুরবাড়ির শ্রেষ্ঠ সন্তান বাংলা সাহিত্য-সূর্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাসাহিত্যে মূল অবলম্বন হিসেবে আদিবাসী জীবন পাওয়া যায় না, তবে কাহিনিসূত্রে উল্লেখ আছে এমন গল্প-উপন্যাসের নাম করা যায়। যেমন – *রাজর্ষি* (১২৯৩) উপন্যাসে আদিবাসী সৈন্যদের উপস্থিতি পাওয়া যায়। পুরোহিত বিল্বন ঠাকুর জুমিয়া বা জুমচাষকারী আদিবাসী ও কুকি জাতির লোক নিয়ে সৈন্যদল গঠন করে নক্ষত্র রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে সাহায্য করেন। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের ধারায় কেবল 'দুরাশা' (১৩০৫) গল্পে আদিবাসী লেপচা গোত্রভুক্ত ভুটিয়া রমণীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দীর্ঘদিন বীরভূমের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বাসহেতু সত্যপূজারী রবীন্দ্র-মানসে আদিবাসীদের সরলতার প্রতি মুগ্ধতা থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু প্রবল

রোমান্টিকতার কারণে সাহিত্যে তাদের জীবন অবলম্বিত হয়নি – এ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বিশেষত ‘কল্লোল’ (১৯২৩), ‘কালিকলম’ (১৯২৬), ‘প্রগতি’ (১৯১৭)-র লেখকেরা প্রবল রবীন্দ্র-বিরোধিতায় অন্ত্যজ জীবনকে সাহিত্যের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) এবং রুশ বিপ্লব (১৯১৭) সমগ্র বিশ্বের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। অবধারিতভাবে সাহিত্যে তার প্রভাব স্পষ্ট হয়। বৈশ্বিক সাহিত্যে কেন্দ্র-প্রান্তের ধারণার পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং প্রান্তিক-নিম্নবর্গীয় মানুষ সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিস্থাপিত হয়। বিশ্ব সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন প্রবেশ করে সাড়ম্বরে, তবে আদিবাসী জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভাবে হয়তো বাংলা সাহিত্যে এ শ্রেণির মানুষের জীবন অবলম্বিত হতে দেরি হয়। কল্লোল যুগের একমাত্র লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৫) এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁর লেখনীতে প্রথম রানিগঞ্জ ও বিহারের ধানবাদ কয়লাখনি এলাকার বাস্তুচ্যুত সাঁওতাল কুলি-কামিনদের জীবননির্বেদ মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

৩.২

বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, সহমর্মিতা ও ভালবাসায় আদিবাসী জীবনের নানা অজানা তথ্য উপস্থাপন করেছেন। অসামান্য দক্ষতা ও গভীর মমতায় তিনি সাঁওতাল-কুর্মি-হো-মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী চরিত্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে জীবন্ত করেছেন। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস *আরণ্যক*-এ (১৯৩৯) অজানা এক জগতের ইতিবৃত্ত তিনি পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন। *আরণ্যক* উপন্যাসে বিধৃত আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, ঘর-গৃহস্থালি, বিশ্বাস-সংস্কার, ভাষা প্রভৃতির অনুপুঙ্ক্ষ বিবরণ পাঠককে এক অজানা জগতের সন্ধান দেয়। বিভূতিভূষণের ভ্রমণকাহিনিমূলক রচনায় পূর্বভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল ছাড়াও আসাম, মণিপুর, আরাকান ও হিমাচলের আদিবাসী অঞ্চলের গোঁড়, রাজগোঁড়, সাঁওতাল, মুণ্ডা, দুসাদ প্রভৃতি আদিবাসীর জীবনকথা পাঠকের সামনে এক ভিন্ন জগতের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

বিভূতিভূষণ আরণ্যক জীবনের যে ধারা নির্মাণ করেছেন তা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২) প্রমুখের কথাসাহিত্যে। বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* (১৯৩৯) প্রকাশের পরের বছরই প্রকাশিত হয়

তারাশঙ্করের *কালিন্দী* (১৯৪০)। এরপর সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনি উপন্যাসে রূপ পায় *অরণ্যবহ্নি* (১৯৬৬)-তে। এ সময়সীমায় আরও রচিত হয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস* (১ম খণ্ড ১৩৫৬, ২য় খণ্ড ১৩৫৮), পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর *ভাগনাদিহির মাঠে* (১৯৫৫), প্রফুল্ল রায়ের *পূর্বপার্বতী* (১৯৫৭), রমাপদ চৌধুরীর *অরণ্য আদিম* (১৯৫৭), নারায়ণ সান্যালের *দণ্ডক শবরী* (১৯৬২) প্রভৃতি উপন্যাস। এ উপন্যাসগুলো আদিবাসী জীবন রূপায়ণে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

৩.৩

সত্তরের দশকে যারা আদিবাসী জীবনকে কথাসাহিত্যে অঙ্গীভূত করেছেন তাঁদের মধ্যে সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), শক্তিপদ রাজগুরু (১৯২২-২০১৪), বুদ্ধদেব গুহ (১৯৩৬) প্রমুখ কথাসাহিত্যিক অগ্রগণ্য। সমরেশ বসুর *দুই অরণ্য* (১৯৬৩) ছাড়াও ভ্রমণমূলক তিনটি উপন্যাস *মন চল বনে* (১৯৭৩), *বনের সঙ্গে খেলা* (১৯৭৪), *প্রেম নামে বন* (১৯৭৫)-এ মুণ্ডা জীবনের সবিশেষ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও লেপচা ভুটিয়াদের নিয়ে রচিত *তুষার সিংহের পদতলে* (১৯৭৬) উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *অরণ্যের দিনরাত্রি* (১৯৬৮) উপন্যাসে আদিবাসী সাঁওতাল-ওঁরাওদের জীবন সামান্য পরিসরে এলেও তাদের চারিত্রিক মহিমায় ভাস্বর। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনেও তাদের আত্মসম্মানবোধ, তাদের সংস্কার ও একাত্মবোধের পরিচয় উপন্যাসটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

আবদুল জব্বারের *মাতালের হাট* (১৯৭২) উপন্যাসে টাটানগর, রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, রানিগঞ্জ, বাঁকুড়া, ওড়িশার শ্রমজীবী সাঁওতাল, মুণ্ডা ও কোড়া জাতিগোষ্ঠীর বঞ্চনার ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। তার পাশাপাশি তাদের জীবনাচরণ, তাদের সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে।

শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর ভ্রমণমূলক উপন্যাস *বনে বনান্তরে* (১৯৭২)-এ বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী দুর্গম 'সারান্দা' অরণ্যভূমির সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী সাঁওতাল-মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। তবে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত আনন্দময় জীবনে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বঞ্চনার ইতিহাস এ উপন্যাসে অনুপস্থিত। তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *কিছু পলাশের নেশা* (১৯৭৮)-এ অবশ্য এ ঘাটতি পূরণ হয়েছে। এ উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের অর্থনৈতিক সংকট এবং সংকট থেকে উত্তরণের সংগ্রাম উপজীব্য হয়েছে। লেখকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *রতনমণি*

রিয়াং (১৯৭৮)-এ ত্রিপুরার আদিবাসী রিয়াং সম্প্রদায়ের দুর্বিষহ জীবন এবং তাদের উপর শাসকবর্গের দুঃসহ পীড়নের ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে।

সমরেশ মজুমদার মদেশিয়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক ইতিহাস জানিয়েছেন *বাসভূমি* (১৯৮২) উপন্যাসে। ছিন্নমূল আদিবাসীরা জীবিকার টানে যাযাবরের মতো একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাড়ি জমায় কিন্তু অন্তরের গভীরে লালন করে আদিভূমির প্রতি আন্তরিক আবেগ ও মমতা – আদিবাসী জীবনের এ প্রান্তটি পাঠককে জানিয়ে দেন সমরেশ মজুমদার তাঁর উপন্যাসে।

দেবেশ রায় তাঁর *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (১৯৮৮) উপন্যাসে তিস্তাপারের মেচ, কোচ, রাভা, মদেশিয়া প্রভৃতি তিব্বতি-চিনা ভাষাগোষ্ঠীর আদিবাসীদের জীবনাচরণ নিখুঁত পর্যবেক্ষণে রূপায়িত করেছেন।

আরণ্যক পরিবেশের মোহময় রূপ-বর্ণনায় অসামান্য দক্ষতার অধিকারী বুদ্ধদেব গুহ অরণ্যচারী মানুষদেরও তাঁর লেখনীতে শিল্পিত করেছেন। সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস *পারিধি* (১৯৭১)-তে ওড়িশার কন্দ জাতিগোষ্ঠীর জীবনাচরণ শিল্পিত হয়েছে। লেখক নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও সহমর্মিতায় কন্দদের বিশ্বাস, সংস্কার বা প্রথাসমূহ স্পষ্ট করেছেন, পাঠককে এক অজানা জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর *কোয়েলের কাছে* (১৯৮০) উপন্যাসের উপজীব্য জীবন ওঁরাও, খারওয়ার, চেরোদের। অরণ্যের নিবিড় শীতলতায় গতানুগতিক, জটিলতাহীন নিঃস্ব জীবনের ইতিবৃত্ত রক্ষিত রয়েছে এ উপন্যাসে। তবে সেই সঙ্গে আদিবাসীদের বিশেষত ওঁরাওদের প্রব্রজনের কাহিনি পাওয়া যায় এ গ্রন্থে। বুদ্ধদেব গুহের বহু উপন্যাসের উপজীব্য আদিবাসী জীবন। তাঁর *শালডুংরি* (১৯৮৮) উপন্যাসে ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতাল-মুণ্ডাদের জীবনচিত্র পাওয়া যায়। মুণ্ডা জীবন নিয়ে লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস *সাসানডিরি* ও *গামহারডুংরি* (২০০৮)। আধুনিকতার সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত আদিম অরণ্যচারী মানুষের সমৃদ্ধ জীবনবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী এ উপন্যাসগুলো বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

৩.৪

১৯৪৭ পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় ও গ্রামীণ জীবন মূল অবলম্বিত বিষয় হলেও আদিবাসী জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়নি সহসা। বাংলাদেশের নদীতীরবর্তী সমতলভূমিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আবাস নগণ্য। এ ভূখণ্ডের পার্বত্যাঞ্চলে অধিকাংশ আদিবাসীর বাস – মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাজনিত কারণে সম্ভবত এ দেশীয় সাহিত্যে বহুদিন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া

যায়নি। বাংলাদেশের সাহিত্যে সাঁওতাল-জীবন নিয়ে রচিত দু'টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস তাসাদ্দুক হোসেনের *মহুয়ার দেশে* (১৯৫৯) ও রিজিয়া রহমানের *একাল চিরকাল* (১৯৬৪)। সাঁওতাল জীবন নিয়ে লেখা এ বাংলার প্রথম উপন্যাস তাসাদ্দুক হোসেনের *মহুয়ার দেশে ;* দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার উত্তরডাঙ্গা অঞ্চলের সাঁওতালদের জীবনকে এ উপন্যাসে উপজীব্য করা হয়েছে। দুই সাঁওতাল তরুণ-তরুণীর প্রণয়কেন্দ্রিক এ উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন খুব সামান্যই এসেছে। তবে উপন্যাসের চরিত্র ও তাদের অবলম্বিত ভাষা ব্যবহারে আদিবাসী জীবনের আস্বাদ পাওয়া যায়।

রিজিয়া রহমানের *একাল চিরকাল* উপন্যাসে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল-জনপদের জীবন, তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য শিল্পরূপ পেয়েছে। আধুনিক জীবনের প্রভাবে আদিবাসীদের আদিম জীবনে যে বিপর্যয় সূচিত হয় তার বিবরণও অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে এ উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে।

আলাউদ্দিন আল আজাদের *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০) ও *কর্ণফুলি* (১৯৬২) দু'টি উপন্যাসেই আদিবাসী জীবন শিল্পরূপ পেয়েছে ; যদিও প্রধান কাহিনিতে নয়, শাখা বা উপকাহিনিতে। *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* উপন্যাসে চন্দ্রঘোনার মগপল্লী এবং মগ ছাইলাউংফার কন্যা তিনার উপাখ্যানে স্বল্প হলেও আদিবাসী জীবন, তাদের মূল্যবোধ, প্রতিশোধ নেবার দুর্দম আগ্রহ কাহিনিবৃত্তে ঠাঁই পেয়েছে।

কর্ণফুলি উপন্যাস রাঙ্গামাটি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকেন্দ্রিক জীবনের শিল্পিত রূপ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইসমাইল এক চাকমা তরুণী রাঙামিল্যার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয় এবং সে-সূত্রে চাকমা সমাজের বিধি-বিধান এবং তাদের জনজীবনে প্রচলিত কাহিনি উপন্যাসে গ্রথিত হয়েছে। আদিবাসী সমাজে সচরাচর গোত্রবর্হির্ভূত বিবাহ সমর্থিত নয়। এ উপন্যাসে অ-আদিবাসী লালনের সঙ্গে ধলাবিবির বিয়ে সমাজ সমর্থন করে না। এমনকি তাদের কন্যা রাঙামিল্যার বিবাহের ক্ষেত্রেও এটি সমস্যা বলে প্রতীয়মান হয়। বিবাহ সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ ব্যতীত আদিবাসী জীবনের অন্য কোনো প্রান্ত এ উপন্যাসে আসেনি।

বদরুদ্দীন আহমদের *অরণ্য মিথুন* (১৯৬৩) উপন্যাসে পটুয়াখালি জেলার অন্তর্গত খেপুপাড়ায় বসবাসরত মগ জাতির জীবনকথা শব্দরূপ পেয়েছে। এটিও প্রণয় উপাখ্যান, তবে প্রায় সব চরিত্র আদিবাসী মগ জাতির। পটুয়াখালিতে মগদের আগমনের উপাখ্যান মেনিওর-অংজাফ্রুর প্রণয়-কাহিনির মাধ্যমে এসেছে – তবে এটি মূল কাহিনি নয়, অংজাফ্রুর বংশধরেরা যুগের পর যুগ এ অঞ্চলে নানা সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার মাধ্যমে বর্তমান সময়ে পৌঁছেছে এবং এ সময়েও হাতেম শিকদার নামের এক প্রভাবশালী বাঙালির সঙ্গে মগদের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম এ উপন্যাসে কাহিনিরূপ পেয়েছে। পটুয়াখালির বালিয়াতুলীতে মগদের

আগমন, বসতি নির্মাণের কাহিনি এবং জীবনযাপনের বিবরণের পর মনিআফ্রু ও মাচিং-এ প্রণয়-গাঁথা এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য হয়েছে।

অজয় ভট্টাচার্যের *কুলিমেম* (১৯৭০) উপন্যাসটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব পার্বত্যাঞ্চলের প্রেক্ষাপটে রচিত। একটি চা-বাগানে কর্মরত আদিবাসী কুলি-কামিনদের কর্মময় জীবন ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা টানাপড়েনের ব্যঞ্জনায় উপন্যাসের কাহিনিসূত্র গ্রথিত। তবে চা বাগানে কর্মরত কুলিরা স্থানীয় নয়, বহু স্থান থেকে আহরণ করে তাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করে তাদের চা বাগানের কুলিতে পরিণত করা হয়। সে-কারণে এ উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের সংস্কৃতি ও আচারসহ সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের *সমুদ্র বাসর* (১৯৮৬) উপন্যাসে আদিবাসী-জীবনের উল্লেখ খুব সামান্য, তবে এ ক্ষুদ্র অংশটি আদিবাসী জীবনের এক উৎসবের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাকে ধারণ করেছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ। মূল কাহিনিসূত্রে মগ-পল্লী ও এ পল্লীতে উদযাপিত ‘লাঙ্গবরণ’ উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এ উপন্যাসে আদিবাসী জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ এবং সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছে।

সেলিনা হোসেনের *কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯)* তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ইলা মিত্র, তবে তাঁর আন্দোলন সহযোগীরা উত্তরবঙ্গের নিপীড়িত আদিবাসী কৃষক। সে-হিসেবে আদিবাসী সংগ্রামী জীবন-প্রান্ত আভাসিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

উত্তরবঙ্গের ওঁরাওদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন আনিসুল হক। তাঁর *চিয়ারি বা বুদু ওঁরাও কেন দেশত্যাগ করেছিল (২০০০)* উপন্যাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা বুদু ওঁরাও-এর দেশত্যাগে বাধ্য হওয়ার করুণ বিবরণের পাশাপাশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রান্তিকতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩.৫

বাংলা ছোটগল্পের ধারাতেও আদিবাসী জীবন ঠাঁই পেয়েছে পরম মমতা ও সযত্ন পরিচর্যায়। আদিবাসী জীবনকে ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১–১৯৭৬)। তাঁর *কয়লাকুঠি* (১৩২৯) গল্প-সংকলনের ‘কয়লাকুঠি’, ‘নারীর মন’, ‘মা’, ‘ঝুমরু’ প্রভৃতি গল্পে সাঁওতাল জীবন বিশেষত তাদের প্রেম-ভালবাসা ও দাম্পত্য-জীবনের টানাপড়েন এবং সেই সঙ্গে সর্বহারা রিক্ত-

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত জীবনের কাহিনি শিল্পরূপ লাভ করেছে। তবে তাদের সামাজিক ও মানসিক জীবন-জটিলতা উপজীব্য হলেও তাদের প্রতিরোধ-সংগ্রামের কাহিনি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেনি।

শৈলজানন্দের পরবর্তীকালে বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), মণীশ ঘটক (১৯০২ -১৯৭৯), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬ -১৯৬৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮ –১৯৭০), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২), অসীম রায় (১৯২৭-১৯৮৬) প্রমুখের গল্পে আদিবাসী জীবন উপজীব্য হয়েছে। বনফুলের 'বুধনী' গল্পে আদিম জনজাতির তরুণ বিল্টুকে গল্পের কেন্দ্রে স্থিত করা হয়েছে। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পে কুর্মি, ভীল ও মাহাতো প্রভৃতি আদিম মানুষের সারল্য ও নিপীড়নের কাহিনি অবলম্বিত হয়েছে। 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে মুণ্ডা তরুণ স্টিফেন হোরো বা হোরা মুণ্ডার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ির 'আন্টাবাংলা' গল্পে ওঁরাও পরিবারের লাঞ্ছনা-নিপীড়নের মর্মান্তিক কাহিনি শব্দভাষ্যে বিবৃত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বীতংস', রমাপদ চৌধুরীর 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', অসীম রায়ের 'সুন্দর' প্রভৃতি গল্পে সাঁওতাল আদিবাসীদের অসহায় নিপীড়িত জীবনের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়।

আদিবাসীদের নিয়ে যারা লিখেছেন তাঁরা চরিত্র হিসেবে আদিবাসীদের গ্রহণ করেছেন, সে-চরিত্র অবলম্বনে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, শোষণ-নিপীড়নের কথাচিত্র নির্মাণ করেছেন কিন্তু তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ, বিদ্রোহ-সংগ্রামময় অবিনাশী জীবনের সন্ধান অল্পই পাওয়া যায় এসব গল্প-উপন্যাসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদিবাসী জীবনের বহির্বাস্তবতা প্রাধান্য পেয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাছে বা দূর থেকে অধীত জীবন রোমান্টিকতার প্রাবল্যে বাস্তবতা শক্ত ভিত খুঁজে পায়নি। বস্তুত এ জীবনের বহিরঙ্গই অবলম্বিত হয়েছে অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে।

৩.৬

আদিবাসী জীবনের অন্যতম কথাকার মহাশ্বেতা দেবীর দীপ্র আবির্ভাব ঘটে মূলত বীরসা মুণ্ডার জীবনী-নির্ভর ঐতিহাসিক উপন্যাস *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭) রচনার মাধ্যমে। সেই থেকে পরবর্তী অর্ধশতক তিনি নিবেদিত প্রাণে আদিবাসী জীবন, তাদের সংগ্রাম-সংকল্প, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-বঞ্চনার ইতিবৃত্ত শব্দের শরীরে স্থান দিয়েছেন পরম মমতায় এবং মানুষ হিসেবে মানবিকতার দায়ভারে আক্রান্ত হয়ে। রোমান্টিকতায় নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রখর রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে তিনি আদিবাসী জীবনকে চিত্রিত করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবনকে অবলম্বন করেছেন তাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে, আদিবাসী জীবনের সব খোঁজ-খাঁজকে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধে তাড়িত হয়ে। *কবি বন্দ্যঘটী গাঞিির জীবন ও মৃত্যু* (১৯৬৭) ও *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭) উপন্যাসদ্বয়ের রচনার পেছনে অবশ্য সাহিত্যসৃষ্টির অভীপ্সাই কার্যকর ছিল। বীরসার জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস যখন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেল, আদিবাসীরা আপ্লুত হল তাদের জীবন, তাদের সংগ্রাম, তাদের সংগ্রামী বীরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে সাহিত্যের আধারে ঠাঁই দেওয়াতে। *অরণ্যের অধিকার*-এর রচয়িতাকে তারা আপনজন বলে গ্রহণ করল পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়, তাকে অভিহিত করল 'মারাংদাই' বলে, বড়দিদি বলে। এরপর মহাশ্বেতা নিজেও জড়িয়ে পড়েন এদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা প্রতিরোধে, তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। শক্তিশালী লেখনীর সযত্ন পরিচর্যায় একের পর এক উপন্যাস ছোটগল্পের আখ্যানে তিনি আদিবাসী জীবন মূর্ত করেছেন মূল জনস্রোতের সঙ্গে তাদের সংবাহন তৈরির আশায় এবং আদিবাসীদের সংগ্রামী জীবনকে সহায়তা করার মানসে। *অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭), চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* (১৯৮০), *অপারেশন ? বসাই টুডু* (১৯৭৮), *অক্লান্ত কৌরব* (১৯৮২), *হুলমাহা* (১৯৮২), শালগিরার *ডাকে (১৯৮২), ক্ষুধা* (১৯৯২), *জঙ্গল (১৯৮৬*), *প্রথম পাঠ* (১৯৮৮), *সুরজ গাগরাই (১৯৮২), টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা (১৯৮৭)* ইত্যাদি উপন্যাস এবং 'দ্রৌপদী', 'দৌলতি', 'পালামৌ', 'গোহুমনি', 'রাজাবাসার রূপকথা', 'শিকার', 'ফারকাটি', 'ভাতুয়া', 'জগমোহনের মৃত্যু', 'নুন', 'শিশু' ইত্যাদি গল্পে মহাশ্বেতা আদিবাসী জীবনের বিভিন্ন প্রান্ত অবলম্বন করেছেন ; নিছক সাহিত্যসৃষ্টির লক্ষ্যে নয়, তাদের জীবনের নানা বাস্তব সমস্যার সমাধানকল্পে, আদিবাসী জীবনের নানা গৌরবময় প্রান্তকে উদ্ভাসিত করে তাদের জীবনকে মহিমান্বিত করার প্রয়াসে। মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে অবলম্বিত আদিবাসী জীবন তাই স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে আদিবাসী জীবন

বহুপ্রজ ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর প্রকাশিত উপন্যাস সংখ্যা শতাধিক[১]। অর্ধশতক ধরে রচিত মহাশ্বেতার উপন্যাসের বিশাল জায়গা জুড়ে আছে আদিবাসী জনজীবন কথা। কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আদিবাসী জীবন এসেছে কিছু উপন্যাসে (*অরণ্যের অধিকার, চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর প্রভৃতি*) আবার মূল কাহিনির সঙ্গে আদিবাসীদের কথা গ্রথিত হয়েছে বেশ কিছু উপন্যাসে (*শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা, মাস্টার সাব* প্রভৃতি), আবার কিছু উপন্যাসে কেবল প্রসঙ্গক্রমে আদিবাসীদের কথা এসেছে (*সরসতীয়া, সন্ধ্যার পাঠশালা* প্রভৃতি)। ইতিহাসের সংগ্রামমুখর অধ্যায়কে অবলম্বন করে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী সংগ্রামে আদিবাসীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে মহাশ্বেতা রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি উপন্যাস (*অরণ্যের অধিকার, শালগিরার ডাকে, হুলমাহা* প্রভৃতি)। আবার সমকালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংকট ও তা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন তিনি তাঁর একাধিক উপন্যাসে (*টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা, প্রথম পাঠ, সুরজ গাগরাই* প্রভৃতি)। মহাশ্বেতার প্রায় সব উপন্যাস পাঠ করে তাঁর আদিবাসীকেন্দ্রিক বারোটি উপন্যাস নির্বাচন করে আলোচ্য অধ্যায়টি রচিত হয়েছে। উপন্যাস নির্বাচনের ক্ষেত্রে আদিবাসী জীবন-বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* (১৯৬৭), *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭), *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* (১৯৮০), *অপারেশন ? বসাই টুডু* (১৯৭৮), *অক্লান্ত কৌরব* (১৯৮২), *শালগিরার ডাকে* (১৯৮২), *হুলমাহা* (১৯৮২), *সুরজ গাগরাই* (১৯৮৩), *জঙ্গল* (১৯৮৬), *টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা* (১৯৮৯), *প্রথম পাঠ* (১৯৮৯), *ক্ষুধা* (১৯৯২) – এই বারোটি উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ অভিজ্ঞানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, সমাজকাঠামো, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি অবিকল তুলে এনেছেন।

উপনিবেশিত সমাজকাঠামোয় 'অপর' বলে চিহ্নিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী স্বাধীন ভারতেও এ চিহ্নায়ন থেকে বিমুক্তি লাভ করেনি ; বরং তথাকথিত সভ্যতার ধারক-বাহক না হয়ে নিজ সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে ধারণ করায় তাদের অসভ্য অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী এ জনগোষ্ঠীর নিজস্বতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন তাঁর উপন্যাসে। আদিবাসী জীবনের বঞ্চনা-হতাশা-নিপীড়ন এবং তাদের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতায় ঋদ্ধ তাঁর উপন্যাস উত্তর-আধুনিক তত্ত্ব চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে কিন্তু লেখক ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বে বিশ্বাসী নন, তিনি আদিবাসী জীবনের চর্চা করেছেন আদিবাসীদের তাদের

প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা লাভ নিশ্চিত করতে এবং এ কারণেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসের যথার্থ প্রতিফলনে আদিবাসী জীবনচিত্রের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ অভিসন্দর্ভে। এ অধ্যায়ে বারোটি পরিচ্ছেদে মহাশ্বেতা দেবীর বারোটি উপন্যাস বিশ্লেষণ করে মূলত আদিবাসী জীবন-সম্পর্কিত মহাশ্বেতা-মানসেরই সন্ধান করা হয়েছে।

উপন্যাসে মহাশ্বেতা আদিবাসী জীবনের গৌরব ও দুর্দশা – দু'প্রান্তকেই উন্মোচন করেছেন। অতীতমুখিতায় আদিবাসী জীবনের সংগ্রামশীলতার গৌরব এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের নিপীড়িত-বঞ্চিত অবস্থার বিবরণ এবং তা থেকে উত্তরণের আশাবাদ ব্যক্ত করে লেখক সম্পূর্ণ ইতিবাচক দৃষ্টিকোণে আদিবাসী জীবনকে তাঁর উপন্যাসে উপজীব্য করেছেন। প্রবল দায়বোধে তিনি সমগ্র জীবন অনাদৃত, অবহেলিত এই মানুষগুলোর জন্য কাজ করেছেন এবং তাদেরকে সাহিত্যের বিষয় করেছেন।'একজন লেখক তাঁর লেখকজীবনের সীমিতকালের মধ্যেই যা সৃষ্টি করে যান তার অন্তর্বস্তুতে কালোত্তীর্ণ সম্পদ কতখানি আশ্লিষ্ট থাকে তার নিরিখেই বিচার হবে সাহিত্যশিল্পী হিসেবে সমাজমানসে তাঁর স্থায়ীত্বের কালসীমা' (পম্পা ২০১৩: ২২৫)। সমালোচকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতেই হয় সাহিত্যিক হিসেবে মহাশ্বেতা দেবীর স্থায়ীত্ব তাঁর আদিবাসী জীবন বিষয়ক কথাসাহিত্যের মধ্যেই নিহিত। লেখক মহাশ্বেতাকে অনুধাবন করতে হলে তাঁর আদিবাসী জীবনভিত্তিক কথাসাহিত্য বিশেষত তাঁর উপন্যাস পাঠের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। এ কারণেই মহাশ্বেতা দেবীর এ উপন্যাসগুলো বিস্তৃত বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু

৪.১.১

ইতিহাসের রোমান্সের পথ থেকে অনেক দূরে লোকবৃত্তের আখ্যান-রচনায় মহাশ্বেতা দেবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ৯ মে ১৯৬৭ খ্রি.। এর আগে উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয় অরুণ ঘোষ সম্পাদিত 'চতুষ্পর্ণা' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা ১৩৭২-এ। এ উপন্যাসটি মহাশ্বেতার লেখক-জীবনের দিক-বদলের সূচনা করে। ইতিহাসের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ইতিহাসের মুখ্য বিষয় অন্তর্মুখী পুরুষার্থকে অন্বেষণের প্রচেষ্টায়, সমাজনীতি ও অর্থনীতির অর্থে লোকাচার, লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক জীবনব্যবস্থাকে রাজনীতির অনিবার্য পটভূমিতে বিশ্লেষণ করে মহাশ্বেতা গণবৃত্তের কথাই বলতে চান। এ লক্ষ্যে তিনি ষোড়শ শতকের রাঢ়বাংলার মেদিনীপুরের পটভূমিতে এক আদিবাসী যুবকের কবি হয়ে ওঠার ইতিবৃত্তকে ধারণ করেছেন *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* উপন্যাসের আখ্যানে।

উপন্যাসের ভূমিকাতে 'লেখকের কথা'-য় মহাশ্বেতা জানিয়ে দেন রাঢ়বাংলার মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষের জীবনের বিপুল বর্ণাঢ্যতা তাঁকে ভীষণ আকৃষ্ট করেছিল। বাবার বদলির সূত্রে তাঁর কৈশোর জীবনের একাংশ কেটেছিল মেদিনীভূমে। খুব কাছ থেকে এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি এবং পরিণত লেখক-জীবনে ইতিহাসের নানা প্রেক্ষাপটে সে-জীবনকে রূপ ও রং-এ জারিত করে সৃষ্টিশীল রচনার বিষয় করেছেন। মধ্যযুগের রাঢ়ভূমে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত মানবতাবাদী ধর্মের জাগরণ ও বিস্তার ঘটে। লেখকের মতে (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ২১), এ স্থান উদারতা, মানবতাবোধ, সম্প্রীতি বা প্রেমধর্মের অন্যতম 'মাতৃউৎস'। মেদিনীপুর বহু বিচিত্র আদিবাসী জনজাতি, লোকাচার, লোকসংস্কৃতির জন্মস্থান বা ধাত্রীভূমি। বর্ণশাসিত সমাজের বাইরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব, তাদের দেবোপসনা, বিশ্বাস-প্রথা-ব্যবহার, চান্দ্রবৎসর গণনা, মাতৃকা আরাধনা, তাদের totem ও taboo লেখককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল এবং তারই প্রভাবে সৃষ্ট হয়েছে এ উপন্যাস।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.২

কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু উপন্যাসের নায়ক বন্দ্যঘটী ওরফে কলহণ এক চুয়াড় যুবক। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে 'চোয়াড়' নামটি পাওয়া যায় ; মুকুন্দরাম লিখেছেন –

> অক্ষটি বিংশক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
>
> কৃতাঞ্জলি বীর কহে হই গ চোয়াড় ৷৷' (নীহাররঞ্জন ১৪২০ : ১০৭)

আর এ নামটি পাওয়া যায় বাংলা কাঁপিয়ে দেয়া এক বিদ্রোহে, যা চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ শাসন কায়েম হওয়ার প্রথম যুগে ১৭৬৬-৭৬-তে, আবার ১৭৯৮-'৯৯-র বিদ্রোহে চুয়াড় আদিবাসীরা ইংরেজ উপনিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। রানি শিরোমণি, দুর্জয় সিংহ প্রমুখ ভূস্বামীর অধীনে তারা বৃটিশ সেনার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। হরিসাধন দাসের মতে –

> তৎকালে রাজাদের (জঙ্গল মহলের) অধীনে খয়রা, মাঝি, কোল, লোধা, মুণ্ডাজাতীয় উপদ্রবকারীরা বাস করত – এঁদের প্রধান উপজীবিকা ছিল লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি। এইসব জাতির লোকেরাই চুয়াড় নামে খ্যাত।...
>
> মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহই সমগ্র ভারতের মধ্যে ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ।(হরিসাধন ২০১১ : ১৮)

এ বিদ্রোহ সামান্য ছিল না। দীর্ঘ সময় ধরে মেদিনীপুর বিদ্রোহীদের দখলে ছিল :

> ১৭৯৯ সালের শেষের দিকে বিদ্রোহ এমন আকার ধারণ করেছিল যে, মেদিনীপুর শহরে কোন ব্রিটিশ কর্মচারী ও পুলিশ চলাফেরা করতে পারে নি। ২২/২৩ বছর ধরে এই যুদ্ধ চালিয়েছিল চুয়াড়রা, সাধারণ মানুষ, ভূমিজ, বাগদী, সাঁওতাল, লোধা, মুণ্ডা ও অন্যান্যরা – এদের হাতিয়ার ছিল তির ধনুক, টাঙ্গি, তলোয়ার এবং মশাল। অবশেষে ১৮১৬ খ্রি. মেদিনীপুর কালেক্টর 'ওকেলী' সাহেব এই বিদ্রোহ দমন করেন। (হরিসাধন ২০১১ : ২০)

উপর্যুক্ত তথ্যাদি দুটি বিষয় স্পষ্ট করে, প্রথমত, 'চুয়াড়' অরণ্যচারী যৌথ সম্প্রদায় ; দ্বিতীয়ত, অরণ্যচারী হলেও রাজার অধীনে রাজার সাহায্যার্থে তারা অসীম বীরত্বের সঙ্গে আপনভূমে পরাক্রমশালী বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছে প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে ; তাদের বীরত্বের পরিচয় উদ্ভাসিত করে এ তথ্যটি।

কৃষক বিদ্রোহের এক ঐতিহাসিক চুয়াড় বিদ্রোহের সূত্র ধরে চুয়াড়দের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন –

> চোয়াড় শব্দটির ব্যাখ্যা ও এই নামধারী মানুষগুলির পরিচয় দান প্রসঙ্গে এক ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন : "বাংলা ভাষায় 'চোয়াড়' শব্দটির অর্থ হইল 'নীচ ও দুর্বৃত্ত মানুষ' এবং এই শব্দটি দ্বারা বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের ভূমিজ আদিম অধিবাসীদিগকেই বুঝায়।" ইহারা যে ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির অন্যতম

তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি ভাবে বাংলা ভাষায় 'চোয়াড়' শব্দটির অর্থ 'নীচ ও দুর্বৃত্ত মানুষ' করা হইল তাহার কারণ বোধগম্য নহে। সম্ভবত অত্যাচারে ক্ষিপ্ত চোয়াড় বিদ্রোহীদের ভৈরব মূর্তি এবং উৎপীড়ক ও শোষকগণের উপর তাহাদের ক্ষমাহীন আচরণ হইতে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের তৎকালীন জমিদার গোষ্ঠী ও তাহাদের আজ্ঞাবহ লেখকগণ তাহাদিগকে এই আখ্যা দান করিয়াছেন।

আদিবাসী চোয়াড় সম্প্রদায় বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও মানভূম জেলার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। তৎকালে এই অঞ্চলগুলি ছিল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই জন্যই ইংরেজ শাসকগণ এই সকল অঞ্চলের নাম দিয়াছিলেন 'জঙ্গল মহল'। মালপাহাড়িয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের মতই চোয়াড় সম্প্রদায়টিও মোগল শাসনের পূর্ব হইতে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত। মোগল শাসকগণও কোনদিন ইহাদের স্বাধীন জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে শোষণের শিকারে পরিণত করেন নাই।

অরণ্যচারী চোয়াড়গণ অরণ্য-সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া এবং আদিম প্রথায় চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। (সুপ্রকাশ ২০১২ : ১৪০)

৪.১.৩

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতাবাদের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ষোড়শ শতকের রাঢ়বাংলার এক আদিবাসী চুয়াড় যুবক আত্মপরিচয় গোপন করে ভীমাদল রাজ্যের রাজা গর্গবল্লভের আশ্রয় ও আনুকূল্যে *অভয়ামঙ্গল* কাব্য রচনা করে তার কবিপরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা তাকে দেন নিষ্কর ভূমি, মাধবাচার্য তার কন্যা ফুল্লরাকে কবির হাতে সমর্পণ করতে চান। সাধারণ মানুষ একই সঙ্গে ঈর্ষায় জর্জরিত হয়ে কবির পতন কামনা করে ; আবার মুখে মুখে গেয়ে ফেরে কবির স্বপ্নের নায়িকা সুলভার রূপ ও প্রণয় বৃত্তান্ত। কবি নিজে ভীত এক ভয়ানক দুঃস্বপ্নে ; প্রতিনিয়ত যেন সে নিয়তি-তাড়িত হয়ে তার পরিণতির দিকে ধাবমান হয়। রাজকবি হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার মুহূর্তে তার সত্য পরিচয় প্রকাশিত হয় স্বজাতির সাক্ষ্যতে। অনিবার্য মৃত্যু এড়াতে সে প্রণয়কে অবলম্বন করে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে চায় কিন্তু প্রেমিকাও তার হীনজাতিত্বের প্রতি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে পালিয়ে যেতে চায় সভ্য সমাজ থেকে, দূরে আদিম অরণ্যে – তার বাসভূমিতে। কিন্তু বহুদিনের অনাভ্যাসে অরণ্য তার চেনা রূপে ধরা দেয় না, বাঁচার পথের সন্ধান দেয় না বরং এক গোলকধাঁধায় ভুলিয়ে অরণ্যই যেন তাকে তুলে দেয় রাজার প্রহরীদের হাতে। কবি প্রাণভয়ে সভ্যসমাজের সংকীর্ণতার বদলে আরণ্যক উদারতায় নিজের শেকড়ের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। অনুতপ্ত কবি তাঁর আদিপুরুষ পালকাপ্য মুনির ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাকে নিয়ে কাব্য রচনা করতে চায়। ইতঃপূর্বে তাঁর রচিত কাব্যে সব জাতির, সব পেশার লোকের উল্লেখ থাকলেও নিজ জাতির নাম-পরিচয় অনুল্লিখিত ছিল, এবার সে স্বজাতির আখ্যান কাব্যের মালায় গাঁথতে মনস্থ করে কিন্তু দেবীর মন্দিরে সে অভয়াশ্রয় পায় না

Dhaka University Institutional Repository

বরং পথ শেষে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে রাজার প্রহরী রূপ মৃত্যু। এভাবেই উচ্চাশাপ্রিয় যুবকের ট্রাজিক পরিণতি ঘটে। লেখকের মতে (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ২২), তিনি এমন এক যুবকের কথা লিখতে চেয়েছেন যে, তার জন্ম ও জীবনকে অতিক্রম করে সে নিজের জন্য একটি দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করতে চায়, সে- জগৎ তার নিজের সৃষ্ট, কিন্তু সমসাময়িক সমাজ তার প্রত্যেকটি চেষ্টাই পরাভূত করেছিল। প্রকৃতঅর্থে কবি বন্দ্যঘটীর ট্রাজিক পরিণতিতে যেমন বর্ণশাসিত উচ্চবর্গীয় সমাজের দায় আছে, তেমনি তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ট্রাজেডির বীজ সুপ্ত ছিল। এ উপন্যাসকে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারাবলং বলে অভিহিত করেছেন –

> মহাশ্বেতা যেন রচনা করেন একটা অ্যালিগরি, একটা রূপক, ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক মানসজগতের একটি প্যারাবেল যেন। আমাদের ইংরেজ হওয়া ইংরেজি ভাষার হাত ধরে দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টির ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার এলিট স্বপ্নের ট্রাজেডিই এই প্যারাবেলে দেখানো হয়। (উদ্ধৃত, মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৪৯৩)

রাহুল দাশগুপ্ত একই মত দিয়েছেন,

> কাফকার রচনার মতোই এটি যেন নিছক উপন্যাস নয়, একটি প্যারাবল ; আত্মবিস্মৃত উপনিবেশিত জাতির কাকের কোকিল হওয়ার এলিট স্বপ্নের ট্রাজেডি সেখানে প্রতিফলিত হয়। কবি বন্দ্যঘটী নিজের আত্মপরিচয়কে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, নিজের দেশ, জাতি, শ্রেণি, বর্ণ, ইতিহাস ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ক্ষমতাকে আশ্রয় করে,'অপরে'র পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিলেন। 'আত্ম'কে অস্বীকার করে 'অপরে'র প্রতি তার এই নির্ভরতাই শেষ পর্যন্ত তার পতন ডেকে আনে। (রাহুল ১৪১৮ : ২৪৩)

প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনার্য অরণ্যচারী যুবকের আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির সমলগ্ন হবার এ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উনিশ শতকের ইংরেজ উপনিবেশিত ভারতের মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মিল খুঁজে পাওয়া কষ্টকল্পিত নয় মোটেই। বরং বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগস্রষ্টা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনাখ্যানের সঙ্গে এর সাযুজ্য দেখানো যেতে পারে, যদিও মধুসূদন শেষাবধি মাতৃভাষার কাছে ফিরে গিয়ে কবি হিসেবে অমর হয়েছেন কিন্তু নিজ ধর্ম-গোষ্ঠীকে পরিত্যাগের বিড়ম্বনা ভোগ করেছেন আমৃত্যু। কবি বন্দ্যঘটীর মতোই তাঁর জীবন-সায়াহ্নও যথেষ্ট ট্রাজিক।

৪.১.৪

কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু উপন্যাসে উচ্চবর্ণশাসিত সমাজ, চৈতন্য ও ইসলামের প্রভাবে ক্রমপরিবর্তিত নতুন সামাজিক মূল্যবোধ অথবা আত্মপরিচয়কে বিলীন করে 'অপর' হওয়ার ট্রাজিক

পরিণতি কিংবা ষোড়শ শতকের উচ্চশ্রেণির মানুষের জীবন, খাদ্যাভ্যাস, রীতি-নীতি যতটা এসেছে ততটা স্ফুট হতে পারেনি আদিবাসী চুয়াড় সমাজের জীবন। এ উপন্যাসে আদিবাসী জীবন এসেছে পরোক্ষে totem, taboo, arcytype ও myth-এর হাত ধরে। গোটা উপন্যাসজুড়ে মিথ, ইতিহাস, স্বপ্ন-কল্পনা-বাস্তবের নিগড়ে আদিবাসী যুবকের চৈতন্য মিশে আছে।

মহাশ্বেতা দেবী ভূমিকাতে টোটেম ও টাবুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং সমগ্র উপন্যাসজুড়ে সে-প্রসঙ্গের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আদিম জনগোষ্ঠী প্রকৃতির সাহচার্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে দিনযাপন করতো। এই গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে তারা ব্যবহার করত টোটেম চিহ্ন। একটা সময় তাদের ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা টোটেম ব্যবস্থার অনুশাসনে চালিত হতে থাকে। টোটেম ও টাবু বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায় ফ্রয়েডের (ফ্রয়েড ১৯৯৩ : ২,৩) বিশ্লেষণে। টোটেম কোনো প্রাণি হতো সাধারণত। তবে কখনও কখনও গাছ বা প্রাকৃতিক শক্তিও (বৃষ্টি, জল) টোটেম হয়। এই টোটেমের সঙ্গে জনগোষ্ঠীর অদ্ভুত সম্পর্ক বিদ্যমান। কোনো গোষ্ঠীর প্রতীক বা টোটেম যে প্রাণী, তাকে ধরা হয় গোষ্ঠীর আদিপুরুষ হিসেবে। সে-ই দৈবশক্তির স্বরূপ ও গোষ্ঠীর রক্ষাকর্তা। পৃথিবীতে টোটেমই পাঠায় অবতার; অন্যান্য বিষয়ে ভয়ঙ্কর হলেও সে তার বংশধরদের চেনে এবং তাদের কোন ক্ষতি করে না। তেমনি টোটেমের বংশধররাও পবিত্র দায়ে বদ্ধ থাকে ; তারা তাদের টোটেমকে হত্যা বা ধ্বংস করবে না, তাদের মাংস খাবে না বা তাকে অন্য কোনো ভোগের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। এরূপ নিষেধের কোনো ব্যতিক্রম হলে শাস্তির ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে থাকে। টোটেমের স্বভাব কেবল একটি জন্তু বা জীবের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, পরন্তু বংশের সভ্যের মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। বহু গবেষক মনে করেন টোটেম ব্যবস্থা মানবীয় বিকাশের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় স্তর, যা প্রত্যেক জাতিই তার ক্রমবিকাশের পথে অতিক্রম করেছে। (ফ্রয়েড ১৯৯৩ : ২,৩)

পলিনেশীয় শব্দ 'টাবু' এর বিপরীতার্থবোধক শব্দ 'noa' অর্থ – যা কিছু সাধারণ এবং সহজলভ্য। অতএব, টাবু কথাটির মধ্যে সংরক্ষিত, নিষিদ্ধ এ ধরনের ইঙ্গিত আছে। বাস্তবে টাবু এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা – যার সঙ্গে ধর্ম বা গোষ্ঠীগত বিশ্বাস জড়িত। টাবুকে মানবতার সবচেয়ে পুরনো অলিখিত আইন বলে মনে করা হয় (ফ্রয়েড ১৯৯৩ : ১৭০)। টাবু ভাঙার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত করা – যা এক অর্থে মৃত্যুই। টাবুর উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সমস্ত বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। কেউ যখন টাবু ভাঙ্গে তখন সে কেবল নিজেদের নয়, সমগ্র গোষ্ঠীর কাঠামোকে বিপদগ্রস্ত করে। কিন্তু টাবু ভাঙ্গার বাসনাও মানুষের সহজাত। গবেষকের ভাষায়, টাবু একটি আদিম নিষেধ, বাইরে থেকে মানুষের প্রবলতম বাসনা বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছে। মানুষের নির্জ্ঞানে সর্বদাই এর বিরুদ্ধাচরণের

চেষ্টা চলছে। যে ব্যক্তি টাবু মেনে চলে তার মনে টাবুর আজ্ঞাভুক্ত সবকিছুতেই একটা দো-মনা ভাব থাকে। টাবুর ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে এ কথা বিশ্বাস করার কারণ, টাবু মানুষকে প্রলুব্ধ করে (ফ্রয়েড ১৯৯৩ : ২৮)। টোটেম ও টাবু অনেকটা একসূত্রে গাঁথা, কেননা টোটেমবাদের মূল দু'টি নীতি হচ্ছে টাবু-নিষেধের সবচেয়ে পুরনো এবং গুরুত্বপূর্ণ নিষেধ, যথা – টোটেম প্রাণীকে হত্যা না করা এবং প্রতিলিঙ্গ টোটেম সঙ্গির সঙ্গে মিলন এড়িয়ে চলা। এ বিষয়ে মহাশ্বেতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে এক আলাপে বলেন –

> সাঁওতালদের মধ্যে যারা হয় মুর্মু, মুর্মুদের গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক হচ্ছে পলাশ পাতা। কোনো মুর্মু পলাশ পাতায় খাবে না। (সমীরণ ১৯৯৭ : ১০৬)

অর্থাৎ এখানে টোটেম ও টাবু একই সূত্রে অবস্থান করছে। টোটেম ও টাবু বিষয়ক প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপন্যাসে বিধৃত চুয়াড় জীবনে টোটেম ও টাবু নির্ণয়ে সহায়ক হবে। চুয়াড়দের টোটেম হাতি – উপন্যাসে তেমনটা পাওয়া যায়। নিদয়া জঙ্গলে হস্তীযুথ আদিমতম সম্রাট ; অরণ্য রক্ষয়িত্রীর সন্তান তারা। আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস – ঐরাবতগণ এ ধরিত্রীকে তাদের দিব্যদন্তে ধারণ করে আছে। নির্ভয়ে, সগর্বে, ভয়ঙ্কর কোনো অমোঘ শক্তির মতো তারা বন থেকে বনে বিচরণ করে। একমাত্র চুয়াড় ছাড়া তাদের কাছে কেউ যেতে পারে না, তাদের অধিকৃত বনভূমিতে কেউ বাস করতে পারে না। চুয়াড় পুরাকল্প অনুসারে তাদের আদিপুরুষ পালকাপ্য সামগায়ন মুনি অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণ ঋষির ঔরসে এক হস্তিনীর গর্ভজাত পুত্র। আদিম সমাজব্যবস্থায় টোটেম প্রাণী সে-গোত্রের আদিমপুরুষ। টোটেম বংশানুক্রমিক এবং সম্ভবত মায়ের বংশের দিক থেকে প্রথম টোটেমের চলমানতা শুরু হয়। তাহলে চুয়াড় মিথকল্পের অর্থ দাঁড়ায় এমনটা যে, 'হাতি' গোত্রের কোন কন্যার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ঋষির মিলনে চুয়াড় জাতির উদ্ভব। এ ব্যাপারটি পৃথিবীর প্রায় সব আদিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন – অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদের মধ্যে ক্যাঙারু পুরুষের সঙ্গে এমু কন্যার বিয়ে মানে ক্যাঙারু টোটেমভুক্ত পুরুষের সঙ্গে এমু গোত্রের কন্যার বিয়ে বোঝায়। ভারতের উত্তরবঙ্গ ও আসামের হাতি অধ্যুষিত অঞ্চলেও এ ধরনের কথা প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় লোকগীতির উল্লেখ করেছেন সুদেষ্ণা চক্রবর্তী তাঁর নিম্নবর্গের 'উত্তরণের প্রচেষ্টা বাংলার মধ্যযুগ ও মহাশ্বেতা দেবী' শীর্ষক প্রবন্ধে: "হস্তীর কন্যা, হস্তীর বন্যা, বামুনেরই নারী। অর্থাৎ একটি কুমারি হস্তিনী নারী রূপ নিয়ে কোনো ব্রাহ্মণের ঘরণী হয়েছে" (উদ্ধৃত, মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৪৯৭) ।

চুয়াড়দের আদিপুরুষ পালকাপ্য মুনি এক চুয়াড় রমণীর স্তনদুগ্ধে প্রাণরক্ষা করেছিল। তার দুর্দিনে চুয়াড়রা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল বিনাশর্তে, বিনা যুক্তিতে ; তৃষ্ণার জল, গাছের ফল দিয়ে তাকে বাঁচিয়েছিল। এ

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধে বর্ণাশ্রিত হিন্দুসমাজ সেই মাতৃমূর্তি চুয়াড় রমণীকে হত্যা করেছিল পাথর মেরে মেরে, চুয়াড়দের ঘরবাড়ি থেকে করেছিল উচ্ছেদ। পালকাপ্য মুনি তার প্রতি দয়া দেখানোয় চুয়াড়দের লাঞ্ছনায় ব্যথিত হয়েছিল এবং তাদের বর দিয়েছিল হস্তীযুথ বেষ্টিত বনভূমিতে নির্ভয়ে বিচরণের –

> শুধু, নিদয়ার জঙ্গলে প্রমত্ত হস্তীযূথ, আদি জননীর ভয়ঙ্কর প্রহরীর মতো আজও ফেরে, আজও ফেরে। একমাত্র চুয়াড় জাত ছাড়া আর কারোকে তারা কাছে থাকতে দেয় না। চুয়াড়দের আদিপুরুষ হাতিদের রক্ষাকর্তা সেই মুনির সন্তান। তাই, এ রাজ্যে বল, মহিষাদল, নাড়িয়াজোল, বনবিষ্ণুপুর বল, চুয়াড়দল ভিন্ন কেউ হাতি ধরতে, হাতির রোগ সারাতে পারে না। হাতিদের সঙ্গে তাদের বহুদিনের মেলবন্ধন (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৩৮)।

টোটেম ও টাবুর মেলবন্ধনের সূত্রগুলোও গ্রথিত চুয়াড়দের জীবনে। চুয়াড়দের টাবুও হাতি-বিষয়ক। হাতি টোটেমের কেউ হাতিদের শরণ ত্যাগ করতে পারবে না, এ নিষেধ অমান্যকারীকে হাতির পদতলে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। চুয়াড়দের প্রতি পালকাপ্য মুনির নির্দেশেও টাবুর পরিচয় পাওয়া যায়। হাতিদের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে গেলেও তিন সময়ে চুয়াড়দের হাতির কাছে যাওয়া নিষেধ – হাতিদের মিলনকালে, প্রসবকালে এবং মৃত্যুকালে। কবি বন্দ্যঘটী মোহগ্রস্তের মতো অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে স্বপ্নে বা কল্পনায় মিলনবদ্ধ হস্তীযুগল দেখে ভীত হন। এ হয়তো তার অবচেতন মনের অপরাধবোধের ফল ; কেননা আজন্ম সে জেনে এসেছে যে জাত ছেড়ে যাবার শাস্তি মৃত্যু এবং সে মৃত্যু কোনো না কোনোভাবে হাতির দ্বারা সংঘটিত হবে। প্রকৃতঅর্থে কবির গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সকল টাবু তাকে তাড়িত করেছে। একটি নিষেধ অমান্যের ভয় তার ভেতরকার আরো নিষেধাজ্ঞার সীমানা পেরোনোর ভয়কে জাগরিত করে। এখানে কবির অন্তিম পরিণতিতে টোটেম, টাবু, আদিবাসীদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রতি আনুগত্য সবই ক্রিয়াশীল ছিল।

হাতি ছাড়াও চুয়াড়দের কোন কোন গোত্রের টোটেম নিশ্চয়ই ছিল সাপ – উপন্যাসে সে ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, যদিও হস্তী প্রতীকের মতো ঘটনার আড়ম্বরে তা সুশোভিত নয়, তবে বর্ণনা ও তুলনায় সাপের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে বারবার –

> ভীমাদল রাজ্যের চারপাশের জঙ্গল সর্পসঙ্কুল, মনসার সিংহাসন যেন, এমনই নির্ভয়ে সেখানে অহিকুল বিচরণ করে। মাঝে মাঝে, রাজবৈদ্যের ঔষধের প্রয়োজনে চুয়াড়দল সাপ ধরতে বেরোয়। চুয়াড়রা অরণ্যবাসী, নিঃশঙ্ক, তারা রাজগোখুরা ধরতেও ডরায় না এবং ঝাঁপিতে সাপ রেখে নিঃশঙ্কে নিদ্রা যায়। (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৩৬)

ভীমাদল রাজ্যে কবির আত্মপ্রকাশকে লেখক রাজসাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন, রাজসাপ যেমন মাটি ফুঁড়ে সহসা ফণা তোলে ও সকলকে সচকিত করে তেমনি কবির আকস্মিক উত্থানে সকলে বিমূঢ়, হতচকিত। আবার ফুল্লরার সঙ্গে কথোপকথনে ভীত কবির বর্ণনায় সাপের উপমার ব্যবহার গূঢ় তাৎপর্যবাহী হয়েছে –

Dhaka University Institutional Repository

> সেই চোখে ভয় চমকাতে লাগল, এক ভয়ঙ্কর, সর্বনাশা ভয় কবির দু'চোখের তারায়। কবি হাত মোচড়াতে থাকলেন, শরীর মোচড়াতে থাকলেন। ফুল্লরা এমন করে কোনো মানুষকে দেহ মোচড়াতে দেখে নি। বঙ্করাজ সাপকে বর্শা মেরে মাটিতে গেঁথে ফেললে সেই সাপ এমনি করে শরীর বাঁকায়, মোচড়ায় বটে। (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৫৭)

ঔপন্যাসিক চুয়াড় জীবনে সাপের সাহচর্যের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন আরও কিছু অনুষঙ্গে। কবির দৃষ্টিতে সালঙ্কারা ফুল্লরা মনসা দেবীর রূপকল্পে ধরা দিয়েছে –

> প্রবাল, মুক্তা ও মরকতমণির অতি বিচিত্র অলঙ্কার, তার উপর একছড়া জবাফুলের মালা। প্রতিটি অলঙ্কারের মধ্যমণিতে এক সকুণ্ডলী নাগ খচিত। ফুল্লরাকে দেখে কবির মনে হল মোহিনীবেশে স্বয়ং মনসা এ রাত্রে মাধবাচার্যের ঘরে উপস্থিত, যেন কোনো সাধকের ধ্যানে তুষ্ট হয়ে বরদানের ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে। (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৪৬)

হাতির মতো সাপের উল্লেখ এভাবে বহুবারই এসেছে এ উপন্যাসে। হাতি যেমন আদিপুরুষের রূপকল্প, সাপ বা মনসা তেমনি আদিমাতার এক রূপ। ভারতীয় উপমহাদেশে মানবের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক নিয়ে বহু কাহিনি প্রচলিত রয়েছে।

৪.১.৫

সৃষ্টির আদি থেকে প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ নানা প্রাণীর সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই নানা মিথ গড়ে উঠেছে। পুরাকথা বা মিথ সম্পর্কে বলা হয়, যে সত্য আদিকালে ঘটেছিল বা মানুষের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবতায় বিদ্যমান ছিল। স্মৃতি-শ্রুতিতে এটি মানব সভ্যতার আদিমতম ইতিহাসকে ধারণ করে। মির্চা এলিয়াদ মনে করেন (শুভা ২০০০: ২২১), মিথ এবং তার আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণের দ্বারা আদিকর্মের অনুকরণ আসলে সময়ের সরলরৈখিক গতিকে অস্বীকার করে আদিকালে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা। আলোচ্য উপন্যাসে এলিয়াদের মতের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

এ উপন্যাসে মিথ পাওয়া যায় পালকাপ্য মুনির আখ্যানে – আদিবাসী জীবনের আদিম পুরুষের সন্ধানে। মহাশ্বেতা তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন (মহাশ্বেতা ২০০২/৬: ৪৯০),'হস্তায়ুর্বেদ'[৩] বইয়ে পালকাপ্য ও রেণুকা হস্তিনীর কথা তিনি পড়েছিলেন – এ উপন্যাসে তার প্রয়োগ হয়েছে নবতর আঙ্গিকে। আদিবাসী চুয়াড়দের জীবনের পালকাপ্য মুনির আখ্যান সর্বজনশ্রুত। পালকাপ্য সেই মুনি যিনি হাতিদের সঙ্গে থাকতে থাকতে হাতিদের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে হাতিরা তাকে কাছে আসতে দিত না, তিনি

সর্বাঙ্গে হাতির মল মেখে শরীর থেকে মানুষের গন্ধ দূর করে হাতির গন্ধ গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে তার গন্ধ আর হাতির গন্ধ এক হয়ে গেলে, হাতিরা তাকে নিজেদের গোত্রভুক্ত করে নেয় এবং তাদের জন্ম-মৃত্যু-মিলন-যুদ্ধ সব দেখতে দেয়। বহু চান্দ্রবৎসর হাতিদের সঙ্গে থেকে তাদের কাছ থেকে তিনি হাতিদের শাস্ত্র শিখেছেন এবং হস্তীসমাজের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি হয়ে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। পালকাপ্য মুনির এ মিথের উপর ভিত্তি করে চুয়াড়দের বিশ্বাস-আচার-সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। চুয়াড় জীবনের আরেক মিথিক উপাদান একলব্য ও তার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন। মহাভারতের সেই ধনুর্বিদ আদিবাসী বালক একলব্য ; দ্রোণকে গুরু মেনে যে নিজ সাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠ ধানুকি হয়েও উচ্চবর্গীয় ঈর্ষার কাছে পরাভূত হয়ে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজ বৃদ্ধাঙ্গুল বিসর্জন দিয়েছিল। জগৎশ্রেষ্ঠ ধানুকি সে হতে পারেনি সত্য কিন্তু ত্যাগের মহিমায়, বীরত্বের ঔজ্জ্বল্যে সবশ্রেণির সব মানুষের অন্তরে স্থান পেয়েছে মমতা ও সহানুভূতিকে সম্বল করে। একলব্যের পুরাকথাকে চুয়াড়রা তাদের নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে জীবন্ত করে রেখেছে। চুয়াড়রা নিজেদেরকে একলব্যের স্বজাতি মনে করে চার আঙ্গুলে তীর ছোঁড়ে এবং তাদের মধ্যে যে রাজা হয় সে তার বুড়ো আঙুল কেটে ফেলে। একলব্যের ট্রাজেডির স্মৃতিতে জাগরুক রেখে তারা নিজ জাতধর্মের বাইরের কোন বৃত্তি গ্রহণ করে না। "জাতকর্মের বাইরে অন্য কাজ করতে চুয়াড়দল বড়ো ভয় পায়। তাদের এক স্বজাতি একলব্য জাতধর্মের বাইরের কাজ করতে গিয়ে হাতের আঙুল বিসর্জন দিয়েছিল" (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৬৭)। এমনকি লেখাপড়া করাও তাদের গোষ্ঠীতে নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত। অক্ষর চিনতে প্রয়াসী কলহণকে তাদের গোত্রের প্রাচীন সদস্য মাতং বুড়ো স্পষ্টভাবে এ নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে দিয়েছিল এবং এর কারণ দর্শিয়েছিল, "মোরা একলব্যের বংশ হই। চার আঙুলে ধনুক-তির বিন্ধি। ই কাজের জন্যে মোদের সৃষ্টি হঞেছে" (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৯৪)। উপন্যাস থেকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে চুয়াড়রা প্রকৃতই অসাধারণ ধনুর্বিদ ও যোদ্ধা – ইতিহাসও এ তথ্য সমর্থন করে। পুরুষানুক্রমে গর্গরাজাদের সঙ্গে চুয়াড়দের সম্পর্ক বিদ্যমান – তবে সে সম্পর্ক পারস্পরিক প্রয়োজনের সম্পর্ক। রাজবংশের বিপদে-আপদে, যুদ্ধে চুয়াড়দের স্মরণ করা হলে তারা অরণ্য ছেড়ে নগরে আসে। ভীমাদল রাজার যখনই দরকার তখনই গড়ের ওপর থেকে ঢোল বাজানো হয়, পেতলের ধ্বজা ওড়ানো হয় আর ধনুক কাঁধে চুয়াড়রা বেরিয়ে আসে। রাজার হয়ে যুদ্ধে জিতে তারা আবার অরণ্যে ফিরে যায়। তাদের কোনো প্রয়োজনে তারা যে কোনো মুহূর্তে বিনাএত্তেলায় রাজদরবারে আসতে পারে। যদিও সমগ্র গোষ্ঠী বিপন্ন, এমন না হলে তারা সাধারণত রাজার কাছে আসে না। রাজা তাদের সুবিচার করতে পুরুষানুক্রমে অঙ্গীকারবদ্ধ। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এক অদৃশ্য সুতো রাজ্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রান্তের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে যুগ যুগ ধরে।

৪.১.৬

অরণ্যচারী আদিবাসী জীবনে অভয়া দেবী মাতৃত্বের আর্কেটাইপে আবির্ভূত হয়েছেন *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* উপন্যাসে। সমগ্র উপন্যাসজুড়ে তার পরোক্ষ উপস্থিতি বিদ্যমান। কবি স্বপ্নাদেশে *অভয়ামঙ্গল* রচনা করেছিলেন বলে দাবি করেন। তার স্বপ্নের বর্ণনায় দেবী জাগ্রত, আদ্যাশক্তির ক্ষমতাধারী এবং একই সঙ্গে স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি। কবিকে তিনি বাছা বলে অভিহিত করেছেন এবং নিজ পরিচয় ব্যক্ত করে পূজা আহ্বান করেছেন । "যেখানেই বনজঙ্গল সেখানেই আমি অভয়চণ্ডী নামে পূজো পাই। ... একসময়ে মুনিঋষিরা আমায় অরণ্যানী নামে পূজত" (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৬০)। কবির কাব্যেও দেবীকে 'পর্ণশবরী, অরণ্যচণ্ডিকা, আদিমাতৃকা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। একসময় তিনি অনার্য দেবী হিসেবে কেবল শবর-চুয়াড়-পুলিন্দের দেবী ছিলেন। "একদা, অতি প্রাচীনকালে, চুয়াড় পুলিন্দ, শবর জাতির পূজায় শারদনিশীথে দেবী জাগ্রতা হতেন ও অরণ্য-যুবতীর সজ্জায় ভক্তদের সঙ্গে নাচতেন, মহুয়া খেতেন, কতই আমোদ করতেন" (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৪৩)। ক্রমে শিব ও অন্যান্য অনার্য দেবতারা যেমন ব্রাহ্মণ্য সমাজে পূজিত হতে শুরু করেন, একসময় শিবের ঘরণী হিসেবে তারও দেবসমাজে প্রতিষ্ঠা ঘটে। অনার্য দেবীর আর্যায়নে উত্তরণের এ কাহিনি যুগ যুগ ধরে অনার্য সমাজে প্রচারিত হয়েছে এবং তাদের অবচেতন মনে নিশ্চয়ই আর্যায়নের আকাঙ্ক্ষাকে স্ফূরিত করেছে ; যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কলহণের মধ্যে। উল্লেখ্য যে, কলহণ নামে প্রাচীন ভারতে একজন কবি সত্যিই ছিলেন ; *রাজতরঙ্গিনী* নামে এক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা তিনি (নীহাররঞ্জন ১৪২০: ৩৭৯)। মহাশ্বেতা নিশ্চয়ই সচেতন অভিপ্রায়ে প্রাচীন রাজকবির নামানুসারে চুয়াড় গোত্রের এ যুবকের নামকরণ করেছেন ; প্রকৃতার্থে এ নামটিও আর্য গোত্রভুক্ত, অনার্য নয়।

শ্রেণিগত উত্তরণের পর দেবী আর জাগ্রত মানুষ্যমূর্তিতে আদিবাসীদের দেখা দেন না কিন্তু আদিকাল থেকে আদিবাসীরা তাদের বিশ্বাস-আচার-পুরাকথা সবকিছুতে দেবীকে জড়িয়ে তাদের চৈতন্যে ধারণ করেছে। তাদের ভয়সঙ্কুল আরণ্যক জীবনে অভয়ার অর্চনা আবশ্যিক। অরণ্যের অতি গভীরে তার মন্দির, সে-মন্দিরে শরণ নেয়া কোনো মানুষ, কোনো অপরাধীকে বন্দি করার অধিকার নেই কোনো রাজার। কলহণ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ত্যাগ করে নতুন জীবন শুরু করেছেন নতুন বর্গে, নতুন সমাজে। চুয়াড় জীবন অতিক্রম করে কবি-জীবনে উত্তরণে সুখী হয়েছেন তিনি, কিন্তু স্বস্তি পাননি ; কৌমজীবনবিচ্ছিন্ন কবি নিরন্তর আচ্ছন্ন থেকেছেন নিদারুণ এক ভয়ে। পশু ভয় নয়, প্রেত ভয় নয় ; এ ভয়ের জন্ম অসীম একাকীত্ববোধে। হাতির বৃংহতিতে যখন এ ভয় তীব্রতা পায়, বোঝা যায় কৌমজীবন-বিচ্ছিন্নতাই এ ভীতির আদি অকৃত্রিম উৎস। আর এ ভীতি থেকে পরিত্রাণে যে দেবীর গুণকীর্তন করেন কবি, তিনি তো

অবধারিতভাবে হবেন অভয়দাত্রী – তার অনেকরূপ আছে – তবে কবির কাছে তার অভয়া জননী-রূপ কাম্য, সে রূপের বন্দনা করেছেন তিনি। দ্বিতীয় জীবন ত্যেজে যখন কবিকে আবার ফিরতে হয় বনের পলাতক জীবনে, স্বজাতি এবং রাজা ও তার পরিষদবর্গ দু'পক্ষই যখন বদ্ধপরিকর তাকে হাতির পদতলে পিষ্ট করতে ; তখন প্রাণরক্ষার্থে দেবী-মন্দিরের সীমানায় পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন তিনি। যদিও দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদে অরণ্য তাকে আপন করে নেয় না বরং বিভ্রান্ত করে ; বনমধ্যে পথহারা কবি আকুলভাবে কামনা করে দেবীর শরণ। কবির চেতনায় দেবীর রূপ প্রকাশিত হয় এভাবে –

> অভয়ার চেহারা আকাশের মতো বড়ো তাই তাঁর মুখ চোখ দেখা যায় না। তাঁর আঠারোটি হাত।
> কোনো হাতে ধনুকবাণ ধরে থাকেন, কোনো হাতে স্বর্ণ-গোধা ধরা থাকে।
> তাঁর পেট কাপড়ের পাকে পাকে এই জল-জঙ্গল-জীবজন্তু সব ধরা থাকে।
> এই তাঁর এক রূপ। কিন্তু এ-রূপ দেখলে মানুষ ভয় পায়, তাই, চুয়াড়দের পূর্বপুরুষ একলব্যের কাছে তিনি চুয়াড় যুবতী সেজে এসেছিলেন।" (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৯৩)

স্বজাতির মনুষ্যমূর্তিতে দেখা দিয়ে একলব্যের প্রাণ বাঁচানোর জন্য, কর্তিত বৃদ্ধাঙ্গুলির রক্তপাত বন্ধ করতে তিনি বনের ঔষধি উদ্ভিদের সন্ধান দেন এবং চুয়াড় ধানুকিদের তির-ধনুক ধরার নতুন বিধান দেন – দেবী বিষয়ক এ কাহিনি পুরুষানুক্রমে ধারণ করেছে অরণ্যচারী এ মানুষেরা। এ কারণেই চিরন্তন মাতৃত্বের প্রতিমূর্তিতে অভিষিক্ত হন তিনি আদিবাসীদের মননে। চুয়াড়দের বিশ্বাসে অরণ্যের প্রতিপালিকা, জম্বুদ্বীপের কৃষ্ণাঙ্গ প্রজাবর্গ পূজিতা, অস্ত্রদাত্রী, শস্যদাত্রী, পশুরক্ষয়িত্রী, জন্ম-প্রসব-মিথুন-মিলন দাত্রী দেবী অরণ্যচণ্ডিকা ; যাঁর নাম বিন্ধ্যবাসিনী, যাঁর নাম পর্ণশবরী, সেই আদিমতমা ক্ষেত্রপালিকা দেবীর বিশ্বস্ত প্রহরী ঐ হস্তীযূথ। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির রূপকল্পে এ দেবীমূর্তি কল্পিত ।

গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের যৌথচেতনা ও অবচেতনায় প্রকৃতি মাতৃত্বের আর্কেটাইপ বা আদি ছাঁদে পরিণত হয়। Carl Gustav Jung (১৮৭৫-১৯৬১)-এর মনস্তত্ত্ববিদ্যা মানব-প্রজাতির মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসের আদি ছাঁদের অবশিষ্টাংশ (archaic remnats) থেকে গড়ে উঠেছে বলে দাবি করেন। এই মানব অভিজ্ঞতার অবশিষ্টাংশ প্রাগৈতিহাসিক ছবি থেকে এসেছে যা মানুষের বৌদ্ধিক শর্তের চেয়েও বেশি। এটিই আদি ছাঁদ (archetype) অথবা যা একই ধরনের সমস্ত জিনিসের ধরন থেকে তৈরি। অর্থাৎ আর্কেটাইপ বিশ্বজনীন ধরন বা মোটিফ যা যৌথ নির্জ্ঞান (collective unconscious) এবং ফ্যান্টাসি থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে। আর্কেটাইপ নির্দিষ্ট শক্তি বহন করে এবং তা পৃথিবীর উপরে কাজ করতে সমর্থ হয়। Jung বলেন, "The archetype is a phenomena of 'numinos' or ' God-like' dimensions. The archetype is in a very real sense alive and functioning in the world. The archetypes thus have their own initiative and their own specific interpretation and to interfere in a given

situation. (Jon Platania 1997 : 58) Jung -এর এ সংজ্ঞার্থে আদিবাসী জীবনে প্রকৃতিকে দেবীর আর্কেটাইপে পাওয়া যায়।

উপন্যাসের বিভিন্নাংশে ঔপন্যাসিক নিজেই সৃষ্টি ও স্রষ্টার এ রহস্যের পট উন্মোচনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন তাঁর ভাষায় – "বিন্ধ্যের দক্ষিণ থেকে দণ্ডকারণ্য, এদিকে মেদিনীভূম, রাঢ়, গাঙ্গেয়বঙ্গ, রাজমহল, কত না জায়গায় এ জঙ্গল মানুষের সভ্যতা বিস্তৃতির সকল প্রয়াসকে উপেক্ষা করে উদ্যত গাম্ভীর্যে যুগ যুগান্ত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ও মৃত্যুর মতো নিরাসক্তভাবে এক একটি সভ্যতার উত্থান ও পতনের সকল চিহ্নকে নিজগর্ভে গ্রাস করে। পশ্চিম রাঢ়ের ঘন শালপিয়ালের জঙ্গলে মাঝে মাঝে ভাঙা মন্দির, পরিত্যক্ত দেবস্থান দেখে বোঝা যায়, অরণ্যের ভীষণ মরুসদৃশ নীরবতার মধ্যে এলে বোঝা যায়, মানুষ আসলে বড়োই তুচ্ছ, পতঙ্গ বা পাখির মতোই তুচ্ছ। প্রকৃতি ও সৃষ্টির, পৃথিবী ও বিশ্বের সৃষ্টির, অন্ধকার রহস্য সে কিছুই বোঝে না, তাই তার এত দেবদেবী, এত বিগ্রহ শিলার প্রয়োজন" (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ২৯)।

প্রকৃতির সন্তানেরা প্রকৃতির জীবন্ত সত্তাকে খুঁজে পেতে চায় বলেই তাকে নিজেদের প্রতিরূপ বা নিজেদের চাইতে শক্তিধর বা অলৌকিক শক্তির আধার বলে মান্য করে ; অর্থাৎ যে ক্ষমতা নিজের নেই অথচ যে ক্ষমতা থাকলে জীবন সহজ হতো অর্থাৎ যা তাদের আকাঙ্ক্ষিত তাই আরোপ করে দেব-দেবীকে রূপ দেয়া হয়। অথচ অলৌকিকতার পাশাপাশি মানবীয় রূপায়ণে ভরসা পেতে চায় তারা। ঔপন্যাসিক আদিবাসী চেতনার এ আকাঙ্ক্ষাকে শব্দরূপ দিয়েছেন গভীর অনুভবে –

> শবর ও অন্যান্য অন্ত্যজ জাত, যারা অরণ্যে থাকে, শিকার আদি আরণ্য বৃত্তি করে বাঁচে, তারা মাতৃকাপূজার রাতে দেবদেবী, নদনদী, পাহাড় পর্বতের বিয়ে, ভাব, ভালোবাসা, প্রণয়, প্রতিহিংসা নিয়ে গল্প করে, গান গায়। তাদের কাছে, একমাত্র তাদের কাছে, শিলাবতী নদী ও রূপনারায়ণ নদ প্রণয় ও প্রতিহিংসার ক্রীতদাস জীবন্ত পুরুষ রমণী। (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ২৫)

এ রোমান্টিকতা কার্যকর ছিল পুরো উপন্যাস জুড়ে। মহাশ্বেতা দেবী, তাঁর এই উপন্যাসটিকে রোমান্টিক বলে অভিহিত করেছেন (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৪৯১)। তবে এ রোমান্টিসিজমের মধ্যেও সামাজিক দায়বদ্ধতা বিদ্যমান, তাই একে সোস্যালিস্ট রোমান্টিসিজম বলা বোধহয় অন্যায় হবে না। পার্থপ্রতিমের ভাষায় –

> কথাটা বোধহয় জাঁ পল সার্ত্র্ বলেছিলেন, সোস্যালিস্ট রিয়্যালিজম নয়, দরকার সোস্যালিস্ট রোমান্টিসিজম। মহাশ্বেতার উপন্যাসে, সেটাই পাই – বাস্তব ও স্বপ্নের, ইতিহাসে, সমূহের সত্য ও ব্যক্তি, উপন্যাসের শৈল্পিক দ্বন্দ্বময় নির্মাণ ক্রিয়ায় তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসগুলি যেন এক রোমান্টিক জাগরণ। কবি বন্দ্যঘটী তারই এক প্রত্ন-প্রতিমা। (উদ্ধৃত, মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৪৯১)

রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই বোধহয় এ উপন্যাসে আদিবাসী জীবনাচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নেই। অবশ্য এ উপন্যাস রচনাকালে মহাশ্বেতার আদিবাসী জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাও উপরিতলের, তখনও আদিবাসী জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ করেননি, যা তিনি তাঁর পরবর্তী সময়ের উপন্যাসগুলোতে করেছেন। সে-কারণে চুয়াড় জীবনের আচার, জীবন-যাপন পদ্ধতির সামান্য বিবরণ পাওয়া যায় এ উপন্যাসে।

৪.১.৭

চুয়াড়রা নিদয়ার গহীন জঙ্গলে বাস করে। বনের ভেতরে শালগাছের খুঁটির ওপর উঁচু উঁচু টঙ্ বাঁধা থাকে। অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা সেইখানে থাকে। ছেলেদের আর মেয়েদের টঙ্ দূরে দূরে আলাদা। বিবাহিতরা ঘর বাঁধে ভূমিতে। পাতা দিয়ে তারা অস্থায়ী ঘর তুলে দিয়েছিল রোগগ্রস্ত সন্ন্যাসীকে। গানবাজনা এবং নানা আমোদ-প্রমোদ তাদের জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ। তাদের খাদ্যের যোগান পুরোটাই আসে বন থেকে। সুস্বাদু নানা ফলের গাছ, বিশেষত বৈঁচি, আতাগুঁী ফল ; নানা শিকারযোগ্য পশু তাদের খাদ্যের প্রধান উৎস। বড়ো জাতের হরিণ, যাকে তারা ঘোড়ারু বলে ডাকে – তার মাংস তাদের খুব প্রিয় খাবার। কবির স্বপ্নদ্রষ্ট খাবারের বিবরণে পাওয়া যায় তপ্ত ভাত, শোল মাছ পোড়া লেবুর রসে মাখা, হরিণের মাংসের ব্যঞ্জনের উল্লেখ। তাদের গোত্রের মাতংবুড়োর মুখে এ আপ্তবাক্য শোনা যায়, 'ভুঁড়ি আর মুড়ি শীতল র‍্যেখে দেখনা কেনী ? স্বপ্ন কুথা দিয়ে পলায় ?' (মহাশ্বেতা ২০০২/৬ : ৯৭)। ভুঁড়ি অর্থাৎ পেটে খাবার থাকলে পেট ঠাণ্ডা থাকে ; মুড়ি মানে মাথা তেলেজলে ঠাণ্ডা থাকে। জীবনের এই মৌলিক চাহিদাগুলো মিটে গেলে সত্যি তাদের জীবনে আর কোন স্বপ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

চুয়াড়দের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন নেই। লেখাপড়া কিংবা নিজ জাতধর্ম ছাড়া অন্য কাজকে তারা রীতিমতো অপরাধ বা অশুভ বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাসে পৃথিবীটা তিনকোনা এবং হাতি তার দাঁতে পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। তারা আরও বিশ্বাস করে বরাহের দাঁত বৃদ্ধের শুকনো দেহে যৌবনের জোয়ার আনে এবং এ বিশ্বাসে তারা বরাহের দাঁত তাদের সঙ্গে রাখে। নিজেদের রীতি-নীতির ব্যাপারে ভীষণ রকম কঠোর চুয়াড়রা শাস্তি প্রদানেও অগ্রণী। জাতি-ত্যাগী কলহণ তথা কবিকে তারা তাদের দলপতি হিসেবে পেতে চায় কেননা পূর্ববর্তী রাজা তাকে তার পরবর্তী রাজা হিসেবে নির্ধারণ করে ছিল। তাছাড়া যোগ্যতার বিচারেও সে তার গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এ বিবেচনাও এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে। তাই

দলত্যাগের অপরাধ ক্ষমা করার প্রস্তাব তাকে দেওয়া হয় এবং ফিরে এসে রাজা হতে বলা হয়। কলহণ তা প্রত্যাখ্যান করলে তাকে হাতির পদতলে পিষ্ট করে মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয়।

৪.১.৮

মহাশ্বেতা *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* উপন্যাসকে বর্ণবিভক্ত মধ্যযুগীয় সমাজ-বাস্তবতায় সাবঅলটার্ন চেতনায় উদ্ভাসিত করেছেন। ইতিহাস ও প্যারাবেলের মেলবন্ধনে সমাজ ও ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এবং আদিবাসী জীবন-বাস্তবতার শৈল্পিক প্রকাশে *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের সীমানাকে বিস্তৃত করেছে বহুদূর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অরণ্যের অধিকার

৪.২.১

মহাশ্বেতা দেবীর প্রিয় বিষয় ইতিহাস। সাহিত্য-রচনার সূচনালগ্ন থেকে তিনি তাই ইতিহাসকে উপজীব্য করেছেন তাঁর লেখনীতে। শাসক শক্তির তৈরি অসম্পূর্ণ ইতিহাস নিয়ে ঘরে বসে রোমান্টিক গল্প-উপন্যাস লেখা তাঁর বৈশিষ্ট্য নয় – ইতিহাসকে তিনি খুঁজে নিয়েছেন মাটি ও মানুষের কাছ থেকে। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের কাহিনির খোঁজে চষে বেড়িয়েছেন সমগ্র ঝাঁসি, অবলম্বন করেছেন সাধারণ মানুষের অন্তরে লালিত নানা উপকথা, নানা কাহিনি, কিংবদন্তি। সাধারণ মানুষই তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। পরবর্তী কালে ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রেমী মহাশ্বেতা বারংবার সাধারণ, শোষিত, নিমস্নবর্গীয় মানুষের প্রতিবাদ, বিদ্রোহকে তাঁর রচনায় স্থান দিয়েছেন। ইতিহাসকে মহাশ্বেতা খোঁজেন কোন আকর গ্রন্থে নয় ; খোঁজেন নিরন্ন, অবহেলিত চলমান জীবন-ধারায়, তাদের সংগ্রামে-প্রতিবাদে। ঔপনিবেশিক শক্তির রচিত মিথ্যে ইতিহাসের মুখোশ ছিঁড়ে টেনে বের করেন শাসকের কদর্য চেহারা। রাজ-রাজড়ার জীবনাতিহাসকে অগ্রাহ্য করে তিনি নিম্নবর্গকে ঠাঁই দিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। এ ধারায় কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে যেমন লিখেছেন *কৈবর্তখণ্ড*, সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে *শালগিরার ডাকে*, *হুলমাহা* ; তেমনি ১৮৯৯-১৯০০-এর ঐতিহাসিক মুণ্ডা-বিদ্রোহের আঁধারে রচেছেন অনবদ্য উপন্যাস *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭)।

কুমার সুরেশ সিং-এর *Dust Storm and Hanging Mist* (1966) বইটির কাছে সবিশেষ ঋণ স্বীকার করা ছাড়াও এ উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক একজন সামাজিক মানুষ, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায় স্বীকার করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন নতুন দৃষ্টিতে ইতিহাস ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ মানুষের জীবন রচনায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাৎপর্যময় বীরসা মুণ্ডার বিদ্রোহকে তিনি কেবল বিদেশি সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলেও চিহ্নিত করেছেন। সর্বোপরি উপন্যাসের আধারে বীরসার উৎস-অভিমুখে অর্থাৎ প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতি-নীতিতে প্রত্যাবর্তনের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক মননের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল করেছেন। তবে এ সব কিছুর ফাঁকে-ফোকরে তিনি খুঁজে নিয়েছেন মুণ্ডাদের জীবনকে। সে জীবন কেমন, কী তাদের দুঃখ, কী তাদের স্বপ্ন, কেমন করে বেঁচে থাকে তারা, কেমন করে বেঁচে থাকা তাদের প্রার্থিত – সে জীবনধারাকে

বিদ্রোহের ডামাডোলে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয় না এ উপন্যাসে। টুকরো টুকরো জীবন-কথার ফোঁড়ে তৈরি নকশায় আদিবাসী জীবন আভাসিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসে।

৪.২.২

ব্রিটিশ উপনিবেশিত যে ভূখণ্ডে মুণ্ডাদের জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে, সে-ভূখণ্ডে মুণ্ডারা উদ্বাস্তু, ভাসমান – এ পটভূমিতে *অরণ্যের অধিকার* নির্মিত। যে ভূমিতে তাদের বাস, সেই ছোটনাগপুরের নামকরণ হয়েছিল বীরসাদের পূর্বপুরুষ চুটু আর নাগুর নামে – তারাই প্রথম জঙ্গল কেটে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। তারাই আদি বাসিন্দা এ ভূমের, অথচ নিজ বাসভূমে তাদের ঘর মিলছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ সকল জমি জমিদারের দখলে এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে তারা সে জমি বণ্টন করেছিল বহিরাগত মহাজন শ্রেণির মধ্যে। বীরসার বাবা সুগানা মুণ্ডার যাযাবর জীবন-বৃত্তির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক সে-বাস্তবতাকে শুরুতেই উল্লেখ করেছেন –

> বীরসার বাপ সুগানা মুণ্ডার খুটকাট্টি গ্রাম উলিহাতু। কিন্তু উলিহাতুতে সেই খেরোয়ার লড়াইয়ের আগেই, আর থাকা যাচ্ছিল না। গয়া, ছাপরা, আরা, ভাগলপুর, তিরহুত, জায়গা-জায়গার মহাজনরা আইনের ভয় দেখিয়ে মুণ্ডাদের হাত থেকে খুটকাট্টি গ্রাম নিয়ে নিয়েছিল। যাদের গ্রাম, তাদের খেতমজুরের কাজেও রাখেনি। তাই অন্য অনেক মুণ্ডার মতো সুগানাও আজ খেত-মজুরির খোঁজে কুরুম্ব্দা, কাল গাইচরী, কাজের খোঁজে বাম্বা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯২)

আইন না জানা তাদের এ দুর্দশার অন্যতম কারণ বলে ঔপন্যাসিক অভিমত জানিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বেচান মুণ্ডার উল্লেখ করেছেন। বেচান মুণ্ডার ঘরদোর সব জগদীশ সাউ নিয়ে নিলে ছাগল-মোষ-লাঙলবেচা টাকা দিয়ে এক উকিলের সাহায্যে আদালতে গিয়েছিল সে। কিন্তু এ জমি যে তার, সে-কথা বোঝাতে পারেনি আদালতের হাকিমকে। ইংরেজ হাকিম দোভাষী ও উকিলের মাধ্যমে আদিবাসীদের আর্জি শোনেন। তারা যা বোঝায় তাকে, তাই বোঝেন। আদিবাসীদের টাকা নিলেও উকিল মহাজনদের পক্ষাবলম্বন করে, সুতরাং বেচান মুণ্ডা সব হারায়। উপরন্তু নিজ জমিতে গাই চরাবার দোষে তার জরিমানাও হয়। বেচান মুণ্ডা তাই নিপীড়িতের প্রতীক হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে এ উপন্যাসে। লেখকের ভাষায় – ‘আদালতে গেলেই সবাই বেচান মুণ্ডা হয়ে যায়’ (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯৩)। মুণ্ডারা শাসকযন্ত্রের বলির পাঁঠা হয়ে ভিখারির মতো দিন যাপন করে, আর এ কারণেই ঘটে বিদ্রোহ। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য বীরসার বাবা তার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছে, যাতে সে দলিল পড়তে পারে

বা হাকিমকে বোঝাতে পারে তাদের কথা। দলিল জমির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। সুগানা লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে আসলে জমির অধিকার ফিরে পেতে চায়।

ঔপন্যাসিক বিস্তৃত বিশ্লেষণে নয়, বরং যোগসূত্রগুলো উল্লেখ করে বীরসার বিদ্রোহ, যার নাম দেয়া হয়েছিল 'উলগুলান'; তার পটভূমি রচনা করেছেন –

> ১৮৭৮ সালে মুণ্ডারা সরকারকে আরজি লিখে জানিয়েছিল ছোটনাগপুর তাদের মালিকানা দেশ। সে দেশে তাদের অধিকার কায়েম করা হোক।
>
> মুণ্ডারা দেখতে পাচ্ছিল না। সব যেন ধুলোর আঁধিতে আচ্ছন্ন, সব যেন কুয়াশায় আবিল। তারা আছে, ছোটনাগপুরের মাটিতেই আছে, কিন্তু নেই, ছোটনাগপুরে নেই, কেননা সে জমিতে তাদের দখল নেই। তাদের সঙ্গে তাদের মাতৃভূমির মাঝখানে শত শত প্রাচীর। ...
>
> ১৮৭৯ সালের আরজিতে লাভ হয় নি কোনো। ১৮৮১-তে একদল সর্দার মুণ্ডা মিশন ভেঙে বেরিয়েছিল। তারা বলেছিল 'মোরা মেয়েলের চিল্‌রেন বটি। আমাদের নেতা এক মুণ্ডা, জন দি ব্যাপটিস্ট! ছোটনাগপুরের রাজাদের আদিম ঠাঁই দোয়েসা যেয়ে রাজ বসাব।'
>
> কিন্তু তাদের আস্ফালন টেকেনি। তারা ধরা পড়ে জেলে যায়। আবার তারা নট্রটের কাছে এসে জেদ ধরেছিল, ছোটনাগপুর ভূমিস্বত্ব আইন-মতে সব জমি ওদের ফিরে দিতে হবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩ / ৮ : ১১৪-১১৫)

এই জমি ফিরে পাওয়া মুণ্ডাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভীষণ প্রয়োজন। মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসের প্রথম দিকে ভূমির জন্য মুণ্ডাদের লড়াইকে গুরুত্ব দিয়েছেন, যদিও শেষাবধি তাঁর উপন্যাসে লড়াই হয়ে পড়ে অরণ্য-কেন্দ্রিক ; তবে অরণ্য এখানে ভূমির সমার্থকেই উপস্থাপিত হয়েছে। বীরসার অরণ্য-স্তুতি, বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে অরণ্যকে 'মা' বলে সম্বোধন, দিকু বা বহিরাগতদের কাছ থেকে অরণ্যের শুচিতা রক্ষার দায় গ্রহণ – এ সমস্ত ভাবনায় পরিবেশবাদী মনোভাব অবলম্বিত হয়েছে মনে করলে ভুল হবে। অরণ্য বা অরণ্য-সংলগ্ন গ্রামের ভূমি বীরসার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেননা তাদের identity নির্ভর করছে তাতে। ঐতিহাসিকেরা বীরসার 'উলগুলান'কে জমির লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মুণ্ডা-আন্দোলনের শতবর্ষে *Dust Storm and Hanging Mist* বইটির শতবার্ষিক সংস্করণের (সীগাল বুকস ২০০২) নতুন 'মুখবন্ধে' কুমার সুরেশ সিং লেখেন –

> Mashasweta Debi's celebrated, work *Aranyer Adhikar* drives its little from the concern for the forest. However, it was not forest but land that was the main issue in the Sardar movement and Birsa's uprising.

ভেরিয়ার এলুইন তাঁর *A Philosophy of NEFA* গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন যে, আদিবাসী জনগণের অবনতির প্রথম কারণ হচ্ছে তাদের বহু পুরনো জমি ও বন থেকে তাদেরকে উচ্ছেদকরণ।[৪] 'দ্যা ইন্টারন্যাশনাল

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস অ্যাফেয়ার্স'-এর সহ-সভাপতি বি. কে. রায়বর্মণ প্রসঙ্গটিকে বিস্তৃত করে বলেছেন –

> আদিবাসী জনগণের কাছে জীবন ও মাটি সমার্থক শব্দ। যদি কেউ আদিবাসীদের মাটির এই গুরুত্বকে মূল্যায়ন করেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন কেন আমরা মাটিকে পণ্য হিসেবে গণ্য করতে পারি না, যাকে মাপা যায় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মূল্যে।[৫]

কেবল আলোচ্য উপন্যাসে নয়, মহাশ্বেতা তাঁর আদিবাসীকেন্দ্রিক প্রায় সব উপন্যাসে আদিবাসীদের প্রান্তিকতা ও সংগ্রামের কেন্দ্রে ভূমিকে স্থান দিয়েছেন।

আদিবাসী কথাটি এসেছে আদি বাসিন্দা অর্থে। আদি মানে প্রাগার্য অর্থাৎ আর্যদের ভারত আগমন এবং আর্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আর্য সভ্যতা বিস্তারের আগেই যারা এ ভূখণ্ডে এসেছিল।[৬] বিহার-ঝাড়খণ্ড-মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়-উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ এসব আধুনিক প্রদেশের তদানীন্তন যে অরণ্য অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চলসহ ভূমি-ভাগ, সেখানে আর্যদের ভারতে আগমনের আগে থেকেই বসবাস করত উপজাতীয় বা আদিবাসী জনগণ। 'কোলহান' বা ছোটনাগপুর, রাঁচি, হাজারিবাগ অঞ্চলে কোলরাই প্রথম অরণ্য কেটে বসতি স্থাপন করে। তাদের চিরাচরিত 'খুঁটকাট্টি' কৃষিপ্রথা (যেখানে মুণ্ডা কৃষকেরাই জমির স্বত্ব বংশপরম্পরায় ভোগ করত) ভেঙ্গে যায় ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮২০-তে পোরাহাট রাজ্য ইংরেজ শাসকদের করদরাজ্যে পরিণত হবার পর। সৃষ্টি হয় জমিদারি-ব্যবস্থা, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং আদি বাসিন্দাদের উপর তৈরি হয় খাজনার চাপ। ক্ষমতার এ পালাবদল মুণ্ডাদের অজানা নয়। ধানী মুণ্ডার জবানিতে তাদের জমি জবর-দখল ও বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত জানা যায় –

> তখন আমি সা-জোয়ান। ... সে-বার ছোটনাগপুরের রাজার ভাইটা, সেই হরনাথ শাহী, আমাদের খুটকাট্টি গ্রামগুলা নিয়ে দিয়ে দিয়েছিল ভিনদেশি মহাজন-ঠিকাদারদের। আমার সেই কুচিলা তৈরিতে হাতেখড়ি পড়ল (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯১)।

এ অভিজ্ঞতা ধানীর জীবনে একবারই ঘটেছিল – এমনটা নয়, বরং আবহমান কাল ধরে বারবার একই বঞ্চনার পুনরাবৃত্তি ক্রমে অসহিষ্ণু করেছিল আদিবাসীদের এবং বারবার জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের দাবানল।

৪.২.৩

১৯৭৪ সালে শান্তি চৌধুরীর অনুরোধে চলচ্চিত্রের জন্য বীরসা মুণ্ডার ওপর লিখেছিলেন মহাশ্বেতা – পরবর্তীকালে অবশ্য চরিত্রটি তাঁকে আকর্ষণ করে এবং তিনি কুমার সুরেশ সিং-এর বই, আরও ইতিহাস-গ্রন্থ এবং আদিবাসী এলাকায় গিয়ে বহু অজানা তথ্য ও গান সংগ্রহ করে *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসটি লেখেন। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাক বা সাহিত্যের analepsis পদ্ধতিমতো, শেষের কথা সামনে নিয়ে। বীরসার মৃত্যুঘোষণার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা, তারপর সময়কে এগিয়ে পিছিয়ে নিয়ে এই মহানায়কের জীবন তথা বিদ্রোহের ইতিবৃত্তকে অক্ষরের মালায় সাজিয়েছেন ঔপন্যাসিক। অসাধারণ আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে রচিত উপন্যাসটির কাহিনি তিনটি স্তরে গ্রথিত (সোহিনী ২০১২: ১১৪)। এক. বীরসার পূর্বপুরুষের কাহিনি, যেখানে মুণ্ডাদের প্রাচীন সমাজব্যবস্থা, গ্রামব্যবস্থা এবং উৎখাত হবার ঘটনা ; দুই, বীরসার কাহিনি, যেখানে উলগুলানের উৎস ও প্রকাশের ঘটনা ; এবং তিন. অমূল্যের ডায়েরি, যেখানে মুণ্ডা সমাজের বাইরে থেকে দেখা, জানা ও বোঝা বীরসাকে ও উলগুলানকে। লক্ষণীয়, কাহিনির তিনটি স্তরেই আদিবাসী জীবন-ব্যবস্থা, লোকাচার, সংস্কৃতি, স্বপ্ন ও সাধ-সাধ্যের নানা তথ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

কুমার সুরেশ সিং-এর *Dust Storm and Hanging Mist* বইটির কাছে সবিশেষ ঋণ স্বীকার করে *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসটি রচিত। ঋণ স্বীকার করা ছাড়াও এ উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক নিজেকে একজন সামাজিক মানুষ, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায় স্বীকার করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন নতুন দৃষ্টিতে ইতিহাস ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ মানুষের জীবন রচনায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাৎপর্যময় বীরসা মুণ্ডার বিদ্রোহকে তিনি কেবল বিদেশি সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলেও চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আন্তোনিও গ্রামসির তত্ত্ব-নির্ভর একদল ঐতিহাসিক বিশ শতকের আশির দশকে সাবঅলটার্ন (Subaltern) বা নিম্নবর্গের যে ইতিহাসচর্চা শুরু করেন এ উপমহাদেশে, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে কৃষক বা নিম্নবর্গীয়দের সংগ্রামকে ইতিহাসে ঠাঁই দেয়া বা নতুন করে মূল্যায়ন করা। মহাশ্বেতাও গ্রামসি দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে ধারণা করা যেতে পারে, কেননা এ সময়ে তাঁর বহু রচনাতেই বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামকে। উপন্যাসের অভ্যন্তরে বীরসার উৎস-অভিমুখে অর্থাৎ প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতি-নীতিতে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ তাঁর উত্তর-ঔপনিবেশিক মননের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দাখিল করে। উপন্যাসের পরবর্তী বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণে এ বক্তব্যের পক্ষে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তবে তত্ত্ব-তথ্যকে ধারণ করেও এ উপন্যাসে মুখ্যত খুঁজে নেয়া হয়েছে মুণ্ডাদের জীবনকে। সে-জীবন কেমন, কী তাদের দুঃখ, কী তাদের স্বপ্ন, কেমন করে বেঁচে তারা থাকে, কেমন করে বেঁচে থাকা তাদের প্রত্যাশিত – সে-জীবনধারাকে বিদ্রোহের ডামাডোলেও খুঁজে পাওয়া যায় সহজ আয়াসে।

৪.২.৪

অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে মুণ্ডা-সংসারকে 'ছেঁড়া কানি' বা ছেঁড়া কাপড়ের উপমায় উপমিত করেছেন লেখক, ব্যবহার করেছেন বীরসার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার মায়ের জবানি –

> করমি, ওর মা বলত 'সংসারটা হয়ে গেল ছেঁড়া কানির মত। এদিকে সিঁয়াই, ওদিকে ছেঁড়ে। সব ছেঁড়া কোনদিন জুড়তে পারব না।' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯৪)

উদ্বাস্তু মুণ্ডাদের সাংসারিক অবলম্বন খুব সামান্য – 'একটা পোঁটলা, মাটির কড়াই, মাটির হাঁড়ি, ঘাসে-বোনা চাট্টি, এক খুঁচি চিনাঘাসের বীজ, এক ডেলা নুন' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯২)। এই সামান্য সম্বলে তারা নির্বাহ করে সাংসারিক জীবন, ভেসে বেড়ায় এক গ্রাম থেকে আন গ্রামে, গড়ে তোলে ক্ষণস্থায়ী বসতি। আবার জমিদার, মহাজনের চাপে সাময়িক বসতি গুটিয়ে পাড়ি জমায় নতুন বসতির খোঁজে। দিনান্তে একবার ঘাটো (চিনাঘাসের বীজসেদ্ধ) খেতে পারা তাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ঘাটোর সাথে নুন খেতে পাওয়া প্রার্থনীয় তাদের, আর ভাত খাওয়া তো পুরাকালের এক অধরা স্বপ্ন। গল্প-গাথায় কেবল নিত্যদিন ভাত খাওয়ার বিবরণ মেলে তাদের জীবনে –

> করমির মা বেশ গল্প বলত। গাছ-লতা-ঘর-দাওয়া-খুঁটি-ধান-ঢেঁকি-কুলো স-ব নিয়ে একেকটা গল্প বলতে পারত। পাথর-মা'র গল্প বলত, সেই কোন যুগে কোন মা-র কোন ছেলে বলেছিল 'মা, তুই ভাত রাঁধ, আমি ভাতের ফেন না জুড়াতে শিকার খেলে ফিরে আসব।' তখন পুরাকাল। সকল মুণ্ডা ভাত খেত।
>
> কিন্তু তখন দেশে আড়াকাঠি এসেছিল। আড়াকাঠি সে-ছেলেকে নিয়ে চলে যায়। ছেলে আর আসেনি। ছেলের জন্য বসে থেকে থেকে মা পাথর হয়ে গিয়েছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৭১)

এ গল্প-গাথায় আদিবাসী জীবনের বেশ কয়েকটি প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে। প্রথমত, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের দৈন্যের কথা। ভারতের কৃষিপ্রধান অঞ্চলের অধিবাসী হলেও ভাত খাওয়া তাদের পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার। এটি বর্তমান নয়, পুরাকালের রূপকথা যেন। যতদিন আদিবাসীরা জমির অধিকারী ছিল, ততদিন তারা ভাত খেয়েছে প্রত্যহ। আজ নিজভূমে পরবাসী তারা,

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য তালিকায় ভাতের অবস্থান আজ তাদের ঐতিহ্যে সীমাবদ্ধ। উৎসব বা পালা-পার্বণে কেবল তারা ভাত খাবার বিলাসিতা করতে পারে – দিনান্তে একবার নয়।

দ্বিতীয়ত, আড়াকাঠির প্রসঙ্গ এসেছে এ গল্পে । আড়াকাঠি হল একশ্রেণির দালাল – যারা লোভ দেখিয়ে আদিবাসীদের নিজভূম থেকে চ্যুত করে শ্রমিক হিসেবে পাঠাত দূর চা-বাগান বা রেল লাইন কিংবা খনিতে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অধিকারী এ আদিবাসীরা নিজভূম, গোষ্ঠী, ঐতিহ্য সব হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত একসময় সাধারণ কুলি বা মজুর হিসেবে কোন খনি-গর্ভে বা চা-বাগানে। কখনও ফিরতে পারতো না নিজস্ব গণ্ডির জীবনে বা পরিবারে।

তৃতীয়ত, আদিবাসী জীবনের অন্যতম অঙ্গ বা ঐতিহ্য শিকার-পরব বা শিকার-খেলা। আদিকাল থেকে অরণ্যচারী মানুষেরা বনের হিংস্র পশুদের তীর বা বর্শাবিদ্ধ করে নিরাপদ করেছে স্ব-গোষ্ঠীর জীবন ; অন্যদিকে হরিণ, বরা, খরগোশ ইত্যাদি শিকার করে ক্ষুন্নিবৃত্ত করেছে। সুতরাং শিকার তাদের জীবনে আবশ্যিক এবং অতি-প্রয়োজনীয় উপাদান। ছেলেবেলা থেকেই খেলাচ্ছলে শিকার খেলা খেলে তারা নিপুণ শিকারি হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত মহাভারতের একলব্যের উদাহরণ সুপ্রাচীন কাল থেকে আদিবাসীদের শিকারি হিসেবে দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে দাখিল করে। একলব্য অরণ্যচারী আদিবাসী ছিল নিঃসন্দেহে এবং তীর-খেলায় সে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিল অর্জুনকে পরাস্ত করে। শিকার-খেলার উল্লেখে এ উপাখ্যানটি আদিবাসী জীবনের অপরিহার্য এক অঙ্গকে চিহ্নিত করেছে। শিকারের মত আরেকটি উৎসব হোলি। ‘হোলিতে মুণ্ডারা আগুন জ্বালে, আগুন ঘিরে নাচে ও গান গায়’(মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৭৭)।

উলগুলানের শুরুতে বীরসা নতুন ধর্ম, নতুন রীতকরণ নিয়ে এল। পুরনো সব উৎসব – ‘জাপি’ নাচ-গান, পৌষ-পূর্ণিমার ‘মাগে’ উৎসব, ‘করম পূজোর নাচ’, ‘পাইকা’ নাচ, সব পরবে বোঙা-বুঙির পূজো, বলিদান, হাঁড়িয়া, বাড়ির বাস্তুদেবতা, পিতৃপুরুষ সকলকে অর্ঘ্য দেওয়া সব বন্ধ করে দিল ; মেয়েদের মাথায় ফুল পরা নিষিদ্ধ হল – তখনও হোলিতে আগুন জ্বালা, নাচ, গান বন্ধ করেনি বরং সিমবুয়া পাহাড়ে সারোয়াড়া মিশনের মুখোমুখি আগুন জ্বেলেছিল তীব্রভাবে, নাগারা বাজিয়ে নেচেছিল। ইংরেজ রানির প্রতিমা কলাগাছ এক কোপে কেটে অর্থাৎ বলি দিয়ে প্রতীকী বিদ্রোহের সূচনা করেছিল, গেয়েছিল মুণ্ডাজাতির বীরদের গান –

> ‘দুন্‌দিগারার দুখন কারেও ডরে না হে
> রামগারার রোতন সাই কারেও ডরে না হে ॥ (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৭৭)

নিজেদের উদ্দীপ্ত করতে আরও গেয়েছিল কোলবিদ্রোহের গান–

> ‘খুদা পিঁপড়া যেমন যায়, তেমন সার বেঁধে

Dhaka University Institutional Repository

কাঁধে হাতিয়ার নিয়ে ওরা কোথায় যায় ?
কোথা তির ছোঁড়ে
বড় পিঁপড়ার মত সার বেঁধে, হাতিয়ার কাঁধে ?
আগো ! এরা লড়ে বুন্দুতে
আগো ! ওরা তির ছোঁড়ে তামারে যেয়ে ৷৷ (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৭৭)

প্রকৃতপক্ষে কোল একটি সুনির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী নয়। কোলরা হো, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অর্থাৎ একজন মুণ্ডা একজন কোলও বটে। কোলবিদ্রোহের গান মানে মুণ্ডা-বিদ্রোহের গান, আর গান তো আদিবাসীদের প্রাণ। সুখ হোক, দুঃখ হোক, উদ্দীপনায় হোক কিংবা উৎসবে আদিবাসীদের সকল অনুভূতির আধার হলো গান। আদিবাসীদের কোন লিখিত লিপি নেই বলে মৌখিক সাহিত্য বা গীত তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়েছে। এ উপন্যাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মোট ১৪টি গানের উল্লেখ আছে – কিছু গান মুণ্ডারী ভাষায় অবিকল তুলে ধরা হয়েছে, সঙ্গে অবশ্য বাংলার ভাষান্তর উল্লেখিত হয়েছে, কিছু গান সরাসরি বাংলায়। গানের কথায় মুণ্ডা-জীবনের নানা বিষয় স্থান পেয়েছে।

বহুবিচিত্র বিষয় সম্বলিত গান আদিবাসী জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। জীবনের প্রতিটি স্তর বা ধাপে আবেগ অনুভূতির প্রকাশে, কোনো ঘটনা স্মরণীয় করে রাখতে, কোনো দুঃখ বা উল্লাসের বহিঃপ্রকাশে আদিবাসী সরলতা প্রকাশিত হয় তাদের গানে। স্রষ্টাকে স্মরণ করে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশে কিংবা প্রার্থনা ধ্বনিত হয় মুণ্ডা কণ্ঠে মুণ্ডারী ভাষার গানের সুরে –

‘হে ওতে দিসুম সিরজাও
নি’ আলিয়া আনাসি
আলম আনদুলিয়া
আমা’ রেগে ভরোসা
বিশ্বাস মেনা !!’

হে পৃথিবীর স্রষ্টা,
আমাদের প্রার্থনা ব্যর্থ ক’রো না
তোমাতে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস !! (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৭৯)

ধরতি-আবা হিসেবে বীরসার আবির্ভাবকে গানের ছন্দে মহিমান্বিত করেছে মুণ্ডারা। বীরসাকে ভগবান বলে মেনে নিয়ে তাদের মুক্তির দূত হিসেবে গ্রহণ করেছে তাকে। বীরসার বাসস্থান তাই তাদের তীর্থ। সদলবলে তারা বীরসা-দর্শনে যেতে চায় এবং তাদের এ আকাঙ্ক্ষাকে গানের বাণীতে ভাষাবদ্ধ করে।

চালকাড়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত বেশ কয়েকটি গান এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, তাদের দুটি উল্লেখ করা হল –

পায়ে পড়ি বলো কতদূর চালকাড় ?
আমি ধীরে যাব,
কে বলে পুবে, কে বলে দক্ষিণে,
আমি ধীরে যাব,
জঙ্গলে গির্জায় চিতাবাঘ, ডাকে ভালুক
ওগো, ধীরে যাব ? যাব দল বেঁধে ?
বীরসার কথায় নাকি আলো ঝরে ?
আমি ধীরে যাব, শুনবো তার বাণী। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১২৭)

রালডুর গোমী মুণ্ডার বাঁধা গানটিও একই ভাবার্থের –

চলহে মিতা চালকাড়ে যাই, বনের বুকে চালকাড়ে যাই
তারে দেখতে চল যাই
সবাই যায় মোরাও চল তারে দেখতে যাই
আকাশ হতে সুতার ভরে নেমে এসেছে সে
নূতন কথা গলায় নিয়ে নেমে এসেছে সে
লাউয়ের খোলে জল বহে মোরা যাব গো
মনের আশা পুরাব গো
ও যে সুরজ পারা উদেছে, পূর্ণ চাঁদের মত –
নিতি নিতি আসবে না সে
হঠাৎ কবে মিলাবে যে
চল মোরা যাই তারে দেখি
চলে গেলে আর ত পাব না দেখা
নিতি নিতি আসবে না সে
কবে দেশ ত্যজে চলে যাবে, মিলাবে আঁধারে গো ॥ (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১২৭-১২৮)

বীরসার জন্ম নিয়েও নতুন গান তৈরি হয়েছে –

‘নে মুলুক দিসুম্‌রে ধরতি’ আবায় হাইজি লেখায়ে ভাদ্রমাসে,
মানোয়া হোন্‌কো রসিকতানারে ভাদ্রমাসে...’
‘এই দেশেতে ধরতি আবা জন্মাল গো ভাদ্রমাসে
মানুষ আনন্দ করে ভাদ্রমাসে

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা জানায় মানুষ সার বেঁধে এসে

চলে যায় দল বেঁধে

... ...

চল যাই, আনন্দ করি, ধরতি আবাকে প্রণাম করি

সে আমাদের দুশমনদের বন্দি করবে ভাদ্রমাসে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১২৬)

যীশু খ্রিস্টের জন্মের পর যেমন পণ্ডিতদল নানা উপহার নিয়ে যীশুর জন্মস্থানের দিকে যাত্রা করেছিল অসীম আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে ; তার সঙ্গে যেন সাদৃশ্য রয়েছে মুণ্ডাদের চালকাড় অভিমুখের যাত্রায়। আদিবাসী জীবনে, তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে মিশনারিজদের প্রভাব অনস্বীকার্য। আকালের সময় বহু মুণ্ডা বাঁচার তাগিদে স্ব-ধর্ম সাময়িক ত্যাগ করে মিশনের খাতায় নাম লিখিয়েছে অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং গ্রহণ করেছে খ্রিস্টিয় নাম ; আবার ফসল হলে পরে স্বধর্মে ফিরে এসেছে। যীশুকে ত্রাতা বলে মিশনারিজদের প্রচার তারা শুনেছে, তাই তাদের জীবনে তাদের ত্রাতা হয়ে বীরসার আবির্ভাব ঘটলে যীশুর ভাবমূর্তির সঙ্গে বীরসাকে মিলিয়ে গ্রহণ করা বা সম্মান জানানো যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে তাদের কাছে। মুণ্ডা লোককথায় তাদের ত্রাতার আবির্ভাব-বিষয়ক বিবরণেও এ তথ্যের প্রমাণ মেলে। 'তখন ধানীরা বুড়োদের কাছে শুনত একদিন কালো কালো মানুষদের ঘরেই জন্মাবে ওদের ত্রাতা' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯০)।

আদিবাসী জীবনের এক দুরন্ত অভিশাপ 'বেঠবেগারি প্রথা'। কৌশলে ঋণগ্রস্ত করে বংশপরম্পরায় আদিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার নাম বেঠবেগারী অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য হওয়া। ঐতিহাসিকেরা বেগার প্রথার অস্তিত্ব উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে। ইরফান হাবিব তাঁর *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৯৯৯)* গ্রন্থে কৃষিকাজে বেগার খাটা শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পাদটীকায় 'বেগার' প্রথা সম্পর্কে তাঁর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে এ প্রথার ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন।

এ প্রথার বিস্তৃত বিবরণ এ উপন্যাসে না থাকলেও এ প্রথায় অভিশপ্ত জীবনের গান স্থান পেয়েছে উপন্যাসে –

বেঠবেগারী দিতে মোর কাঁধে ঝরে লৌ গো।

জমিদারের পেয়াদা ওই রাতে দিনে।

তাড়ায় মোরে, কাঁদি আমি রাতে দিনে।

বেঠবেগারী দিয়ে মোর এই হাল গো –

ঘর নাই সুখ মোরে কি দিবে গো।

Dhaka University Institutional Repository

কাঁদি আমি রাতে দিনে।

চোখের জলের মতই লুনপারা মোর লৌ গো ! (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯০)

গান মুণ্ডা জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ। 'ধানী জানে, জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণার্ত মুহূর্তগুলো মুণ্ডারা গানে-গানে ধরে রাখে। সে-গান কে বাঁধে, কে সুর দেয়, কেউ জানে না।' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯০) রচয়িতা মুখ্য নয়, কেননা গান বেঁধে নাম করার কথা তারা ভাবে না ; বরং জীবনের রঙগুলো গানের মাধুর্যে ডুবিয়ে তাকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার আকুলতা হয়তো রচয়িতার ভেতর কাজ করে। এ সমাজে ব্যক্তি-পরিচয় যে মুখ্য নয়, সামষ্টিক জীবনই প্রধান, সে-তথ্যটি পাওয়া যায় এ বক্তব্য থেকে।

কেবল অভাব-অভিযোগ নয়, নির্যাতনে-নিপীড়নে কোণঠাসা আদিবাসীরা বীরসার নেতৃত্বে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল এবং প্রবল উদ্দীপনায় গান ধরেছিল –

জমিদারের অত্যাচারের যন্ত্রণার
মানুষের দুঃখে দেশ আজ উত্তাল
চল, তুলে নাও ধনুক, তির ও বলোয়া
আজ বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল
বীরসা ভগবান আমাদের নেতা
আমাদের জন্যেই সে এসেছে এখানে
আজ বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল
চল তৈরি হই তুণ তির তরোয়াল নিয়ে
ডোম্বারি পাহাড়ে জড়ো হব সবাই
ধরতি-আবা কথা কইবে সেখানে
বাঁদরের কিচকিচিকে ভয় পাই না আমরা।
কিছুতে ছেড়ে দেব না জমিদার, মহাজন, বেনে–বিদেশিদের
তারাই ত ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের দেশ
খুটকাট্টি অধিকার ছেড়ে দেব না
চিতাবাঘের দাঁত, সাপের ছোবল থেকে হাসিল করেছিলাম দেশটা
এই সুন্দর দেশ কেড়ে নিয়েছে ওরা ॥ (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৮৬-১৮৭)

এ উপন্যাসে যে গানটি বারবার ধ্বনিত হয়েছে বীরসাইতদের কণ্ঠে ; সুনারার কণ্ঠে যে গান শুনতে বীরসা সবচেয়ে ভালোবাসতেন ; যে গান সকল মুণ্ডার গলা থেকে, রক্ত থেকে, মন্ত্রের মতো, যন্ত্রণার মতো, গম্ভীর আর্তধ্বনিতে উচ্চারিত হয়েছে ; যে গানে নিজ দেশ হারাবার ব্যথা এবং একই সঙ্গে সকলকে জেগে ওঠার আহ্বান জানানো হয়েছে সে গানটি হল –

Dhaka University Institutional Repository

বোলোপে বোলোপে হেগা মিসি হোন্ কো।

হোইও ডুডুগার হিজু তানা।

বোলোপে।

ওতে রে ডুডুগার সিরমা রে কোআন্সি।

দিসুম তাবু বুয়াল তানা

বোলোপে...

তাইওম্ তে দো হোরা কাপে নামিয়া।

দিসুম তাবু নুবা জানা।

বোলোপে......'

'ও ভাই, ও বোন, ও ছেলেরা, ছুটে যা, প্রাণ বাঁচা

আঁধি উঠেছে।

ও ভাই....

ঝড় মাটির বুকে, আকাশ ঢাকা কুয়াশায়।

আমাদের দেশ দেখ্ ওই ছিনে নিয়ে গেল।

ও ভাই....

পরে আর পথ পাবি নে রে।

সব যে আঁধারে আঁধারে!

ও ভাই.....।' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৮৮)

টুইলা বাজিয়ে গান গাওয়া মুণ্ডা সংস্কৃতির এক আবশ্যিক অঙ্গ। মুণ্ডা ছেলেরা বাল্যকাল থেকে টুইলা অথবা বাঁশি বাজাতে শেখে, আখড়ায় নাচের আসর বসায়। যে মানুষগুলো সারা জীবন দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, মাথা গোঁজার স্থায়ী ঠিকানা পায় না, সে মানুষগুলো সুর ও ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে – নিজ সংস্কৃতির শ্বসনমূলে গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে তেজি ও দৃঢ় হয়। অভাবের তাড়নায় ধর্ম ছাড়ে সাময়িকভাবে কিন্তু নিজ আত্মার গভীরে প্রোথিত বিশ্বাস হারায় না, নিজ সংস্কৃতিকে কখনও ছাড়ে না। মিশনারিরা তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে, শিক্ষার ব্যবস্থা করে, আদিম দেবতা ও তাদের সকল সংস্কার বা পৌরাণিক কাহিনি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়। ঔপনিবেশিক শক্তি মুণ্ডাদের সকল পরিচয় মুছে নিজেদের তৈরি ছাঁচে ঢালাই করে নতুন আকার দিতে চায়। কিন্তু মুণ্ডারা ভোলে না তাদের শেকড় ; তাদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের মূল এত গভীরে প্রোথিত যে, হ্যাচকা টানে তা বিচ্যুত হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৫

মুণ্ডা-বিশ্বাসে নানা দুষ্ট আত্মা ও ডাইন্-এর অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের গল্পকথায়, তাদের পুরাণে পাওয়া যায় দুষ্ট আত্মার কথা। পুরাণ-কথায় জানা যায়, সিংবোঙা পৃথিবীর অসুরদের পুড়িয়ে মেরে ছিল এবং তা নিয়ে অসুরদের বউরা সিংবোঙার কাছে গিয়ে দরবার করেছিল। সিংবোঙা বা মুণ্ডাদের প্রধান দেবতা অসুরদের বউদের চুলের মুঠি ধরে শূন্য থেকে নীচে ফেলে দেন ; তখন থেকে তারা পাহাড়-জঙ্গলে দুষ্ট আত্মা হয়ে আছে। সিংবোঙার সৃষ্ট মানুষের উপর তাদের বড় রাগ। কখনো অপরূপা মুণ্ডারী যুবতী, কখনো চকিতনয়না হরিণী, কখনো মুখে আগুন বের করা শেয়াল সেজে ওরা মুণ্ডা পুরুষদের ভুলিয়ে জঙ্গলের গহিনে নিয়ে মেরে ফেলে। তারা বিশ্বাস করে ডাইন্‌রা কখনো কালো বেড়াল বা বুড়ো-আঙুলে মানুষ হয়ে মুণ্ডাদের ঘরে ঢুকে যদি কোন ঘুমন্ত মানুষের থুতু চেটে দেয় তবে সে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। তারা আরও জানে যে বেরেল-সুদ, বোর-সুদ, পুঁড়ি-সুদ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের কুষ্ঠ হয় বোঙা নাগ-ইরার কারণে ; যে জলাশয়ে নাগ-ইরা থাকে তার জলে স্নান করলে এ রোগ হয়। একমাত্র ওঝা পারে তাদের এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে। মুণ্ডা সমাজে ওঝার স্থান বেশ উচ্চ। ভীতিকে পুঁজি করে ওঝারা সমীহ আদায় করে নেয় মুণ্ডাদের কাছে। উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায় –

> চিরকাল মুণ্ডাদের ভূতে ধরেছে, ডাইনি নজর দিয়েছে, শত্রু বাণ মেরেছে। চিরকাল ওরা হরমু ওঝার কাছে এসেছে। হরমু ওঝা চাল, মুরগি, খাসি নিয়েছে। তুকতাক – যাগযজ্ঞ করেছে। সবাই ওর কথা মেনে নিয়েছে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৩০)

কিন্তু মিশনারিজরা তাদের এ ভীতি ভাঙাতে চেয়েছে। মিশন জানায়, তাদের নাসান্‌বোঙা, নাগ্-ইরা সব মিথ্যে ; সিংবোঙা-হরম্ আসুল সব দেবতা মিথ্যে ; কুষ্ঠ হয় ছোঁয়া থেকে, রক্ত-মিশাল থেকে ; কলেরা হয় পচা-গলা খাবার জল থেকে, বসন্তের বীজ বাতাসে ছড়ায়। অসুখের বিজ্ঞানসম্মত এসব ব্যাখ্যা অন্তর থেকে গ্রহণ করেনি মুণ্ডারা। কেননা এর প্রচারক বা মিশন তাদের পূর্বতন দেবতাদের মিথ্যে বলে মুণ্ডা অস্তিত্বকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছে। ঔপনিবেশিক শক্তির প্রচারিত তথ্য সত্যি হলেও তা চাপিয়ে দেয়া ; ক্ষমতা ও অর্থশক্তির জোরে আরোপিত সে-সত্য মুণ্ডারা অবগত হয়, কিন্তু তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না। বীরসার দৃষ্টিকোণে লেখক জানান –

> মুণ্ডারী জীবন মানে হাজার হাজার অনুশাসন আর রক্তে রক্তে বিশ্বাস। আজ তুমি মুণ্ডারী, কাল তুমি ক্রিশ্চান, আবার তুমি মুণ্ডারী আবার তুমি ক্রিশ্চান। কিন্তু তোমার নাম আজ সুগানা-কোমতা-ডোন্‌কা-ভরমি-ধানী – কাল পলুস-দাউদ-মথি য়োহান-আব্রাহাম – যাই হোক না কেন, রক্তে থাকে সিংবোঙার শাসন, হরমি আসুলের ভ্রূকুটি। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১০২)

Dhaka University Institutional Repository

বীরসাও আনে নতুন ধর্ম – পুরনো রীতি-অনুশাসন সব ত্যাগ করে সকলকে আহ্বান করে নতুনকে গ্রহণ করতে। সকল ভীতি দূর করার অভয় বাণী শোনায় – 'মন্ত্রতন্ত্র বিশ্বাস ক'রো না, মনের আঁধার কাটাও, সামনে বড় দুর্দিন।'(মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৩০) মুণ্ডা জীবনের নানা বন্ধন সে মুক্ত করতে চায়। অসুর পুজো, দেঁওরা ও পগানের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস, সহস্র সংস্কার ও বন্ধনের নাগপাশ খুলে মুণ্ডাদের জীবন আলোকিত করতে চায়। নানা রোগে বিজ্ঞানসম্মত, তবে প্রকৃতিদত্ত চিকিৎসা করিয়ে মহামারীর প্রকোপ থেকে বাঁচায় সে। যেমন – গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে সকলকে নিমপাতা জলে ভিজিয়ে সে-জল খাওয়ার ও গা মোছার নির্দেশ দেয়। যাদের গুটি বেরিয়েছে তাদের সাদা তুলসী পাতা রস ও আদার রস মিশিয়ে খেতে বলে। তারপর সকল রোগীকে করলা পাতা আর হলুদের রস খাওয়ানোর নির্দেশ দেয়। রোগীর সংস্পর্শে যেতে সাবধানতা অবলম্বন ও মৃত রোগীর কাপড় পুড়িয়ে ফেলে রোগের বিস্তার রোধ করে। গ্রামে কলেরা শুরু হলে বদ্ধ জলাশয় মুক্ত করে বহতা করে এবং লবণ পানির মিশ্রণ খাইয়ে, পানির ব্যবহারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে, বাসি খাবার ফেলে দিয়ে এ রোগ প্রতিহত করে। বলা বাহুল্য, এ সমস্তের পেছনে তার মিশনের শিক্ষা কাজ করেছে। মুণ্ডাদের সমস্ত পরব, সমস্ত সংস্কার ভেঙ্গে লক্ষ বছরের অন্ধকার পেরিয়ে তাদের আধুনিক সময়ে আনতে চায় বীরসা। প্রাচীন জড়তা, অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুণ্ডাদের মুক্ত করে আধুনিক সময়ে এনে দাঁড় করাতে চায়। সে উদ্দেশ্যে পুরনো ধর্মের সব রীত-করণ ত্যাগ করে বীরসাইত বা বীরসার অনুসারী হতে বলে। লক্ষণীয় যে, মিশন প্রায় একই কথা বলেছে বা মিশনের শিক্ষা বীরসাকে প্রভাবিত করেছে এ সিদ্ধান্তগুলো জানাতে। একই কথা মিশন যখন বলেছে মুণ্ডারা তা নাকচ করে দিয়েছে আর বীরসা যখন বলেছে তখন নতুন ধর্মের রীতকরণ বলে সানন্দে গ্রহণ করেছে। একই যাত্রায় ভিন্ন ফল কেন ? উত্তর কঠিন নয়। মিশন যখন মুণ্ডাদের দেবতা ও বিশ্বাসকে মিথ্যে বলেছে তখন একধরনের তাচ্ছিল্যবোধ তাতে ছিল ; আত্মাভিমানী মুণ্ডারা তা সহজভাবে নিতে পারেনি। উপরন্তু ধর্ম বদল করেছে তারা পেটের তাগিদে, মনের তাড়নায় নয় এবং মিশন তাদের সাময়িক ক্ষুণ্নিবৃত্ত করেছে মাত্র, বৃহৎ কোনো পরিবর্তন কিংবা মহৎ জীবনের পথ নির্দেশ করতে পারেনি। তাছাড়া বিদেশি এবং ভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রতি ততটা বিশ্বাস তাদের নেই – যতটা আছে নিজেদের মানুষ বীরসার উপর। সর্দারদের মুলুক-ই লড়াইয়ে মিশনারিজরা সমর্থন দেয়নি – এটিও মিশনের প্রতি অনাস্থার একটি বড় কারণ। মিশনের এ মনোভাব তাদের জানিয়ে দিয়েছে – মিশনারিজরা চায় না মুণ্ডারা ভূমির অধিকারে বলীয়ান হোক, স্বনির্ভর হয়ে বাঁচতে শিখুক। অন্যদিকে বীরসা শুধু পরিবর্তনের কথা বলেনি ; বদলে কী পাবে তার স্বপ্ন দেখিয়েছে। মুণ্ডাদেশের অধিকার ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে মুণ্ডাসমাজ উদ্বেলিত হয়েছে। নতুন করে নিজভূমিতে নিজ ফসলি জমির স্বত্ব ফিরে পাওয়া তথা সম্মানজনক, স্বচ্ছল জীবনের স্বপ্নকে উজ্জীবিত করতে পেরেছে বলে বীরসা সকলকে পেয়েছে অনুসারী হিসেবে। নচেৎ সে জানত যে, কেবল

Dhaka University Institutional Repository

মড়ক রোখবার উপায় বা নতুন ধর্ম প্রচার করে সে ধরতি-আবা হতে পারবে না। ঔপনিবেশিক শিক্ষা গ্রহণ করে সে তা ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে সফলভাবে। ব্রিটিশ, রাজা, জমিদার সকলকে তাড়িয়ে আদিপিতৃভূমিতে মুণ্ডারাজ কায়েম করতে চেয়েছে। সর্বপ্রথমে সে মুণ্ডাদের নিজ গৌরবের ঐতিহ্য ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। 'উলগুলান' বা বীরসার বিদ্রোহের প্রথম ধাপ ছিল চুটিয়ার মন্দির অভিমুখে যাত্রা। সেখানে মুণ্ডাদের পূর্বপুরুষ চুটিয়া মুণ্ডা সিংবোঙার পূজার জন্য বেদি তৈরি করেছিল কিন্তু পরবর্তী কালে রাজা রঘুনাথ তিনশো বছর আগে তা দখল করে মন্দির বানিয়েছে। সে-মন্দিরে রক্ষিত তামার পাটায় ছোটনাগপুরে মুণ্ডাদের অধিকারের কথা লিখিত আছে। বীরসা মন্দির ও তামার পাটার দখল নিয়ে মুণ্ডাভূমিতে মুণ্ডা অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিল বলে বীরসার অনুগামী হয়েছিল সকলে। উলগুলানকে ধর্মীয় বিদ্রোহ এবং বীরসাকে ধর্মীয় নেতা বলে অনেকক্ষেত্রে ঐতিহাসিকেরা মত দিয়েছেন কিন্তু ধর্মীয় আবরণের আড়ালে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল লড়াই, ভূমির জন্য লড়াই। মহাশ্বেতা সযত্ন সতর্কতায় বীরসার উত্থানের আখ্যানে এ তথ্যটি পরিবেশন করেছেন –

> বড়ো প্রাচীন মুণ্ডারক্ত। যেদিন ভারতে শ্বেতজাতি ঢোকে নি, সেই কৃষ্ণ ভারতের সন্তান মুণ্ডারা। বীরসা এক দুঃসাধ্য ব্রত নিয়েছে। যেন নদীর উৎসে ফিরে যেতে চাইছে ও। বহিরাগতদের কাছ থেকে নেওয়া 'করম পূজা' ও অন্যান্য রীতিনীতি, প্রাচীন অসুর ধর্মের জাদু-প্রক্রিয়া ও রক্তোৎসব, সব বাদ দিতে চাইছে। ধর্মের অসার জাদু-রীতিনীতির বোঝা বুকে চেপে থাকলে মুণ্ডারা মাথা তুলতে পারবে না। তাই এক সহজ, সুন্দর, নির্ভার ধর্ম চাই। তাই বীরসা ভগবান হয়ে ধর্মে বিপ্লব এনেছে।" (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৮৩)

নদীর উৎসে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটি উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বকে নির্দেশ করে। বীরসা অবশ্যই এ ধরনের কোনো তত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয়, তবে ঔপনিবেশিক শক্তিকে উপেক্ষা করে নিজ সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করা কিংবা নিজ ঐহিত্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়া রাখার যে প্রচেষ্টা বীরসার মধ্যে দেখা যায় – তা অবশ্য এ তত্ত্বকে ধারণ করে। অন্য একটি প্রসঙ্গেও এ তত্ত্বটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। বিদ্রোহের শুরুতে বীরসা ঘোষণা করে যে সাদা হল সাহেবদের রং। সাদা মুরগি সাদা শুয়োর সব অশুচি। তাই মুণ্ডারা সব সাদা মুরগি, সাদা শুয়োর কেটে কেটে খেয়ে নেয়। উত্তর-উপনিবেশ তত্ত্বের একজন প্রধান তাত্ত্বিক Frantz Fanon তাঁর *Black Skin, White Musk (1952)* গ্রন্থে সাদা রঙের প্রতি ঔপনিবেশিতদের যে আগ্রহ কিংবা কালো রং নিয়ে যে হীনমন্যতাবোধের কথা বলেছেন, বীরসা ও মুণ্ডাদের অবস্থান ঠিক তার বিপরীতে। সাদাকে বীরসা সাহেবদের রঙ বলে অশুচি গণ্য করে এবং নিজেকে কৃষ্ণ ভারতের সন্তান বলে গৌরব বোধ করে। মুণ্ডারী পুরাণে কালো মানুষের ঘরে তাদের ত্রাতার আগমনের উল্লেখ রয়েছে। এ ভাবনা কতখানি বীরসা অনুভূত, কতখানি ঔপন্যাসিকের নিজের তা নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নের অবতারণা করা বাহুল্য। কেননা পাঠকেরা নিশ্চয়ই জেনে যান যে, এ কেবল ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে বীরসার আধারে।

বীরসার ভগবান হওয়ার বিষয়টি অবশ্য কোন তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তবে সহজ যুক্তি দিয়ে যায়। সরল মুণ্ডাদের ধর্মবিশ্বাস অতি প্রবল। ধর্ম কেবল পারে সমগ্র গোষ্ঠীকে একত্র করতে – তাই স্ব-গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে নিজ লড়াইয়ে সামিল করতে বীরসা ধর্মকে একটি প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছে ; অন্তত ঔপন্যাসিক এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন উপন্যাসের আধারে। এক ঝড়ের রাতে বীরসার জঙ্গলে গমন, অরণ্যের কান্না শুনে অরণ্যকে মা বলে গ্রহণ করে তার শুচিতা রক্ষার অঙ্গীকার এবং লোকালয়ে ফিরে নিজেকে ভগবান বলে অভিহিত করে সকল বহিরাগতদের তাড়িয়ে মুণ্ডাভূমি মুণ্ডাদের ফিরিয়ে দেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মাধ্যমে ধর্মীয় নেতা হিসেবে বীরসার উত্থান। ক্রমে সে যেন সত্যিই পরিণত হয় ভগবানে। যুগের প্রয়োজন, আদিবাসীদের টিকে থাকার প্রয়োজন বীরসাকে ভগবানে পরিণত করেছিল। ভগবান তাদের কাছে বেঁচে থাকার প্রেরণার উৎস। মুণ্ডা দৃষ্টিতে ভগবানের সংজ্ঞায়ন এবং সে সংজ্ঞায় বীরসার অবস্থানকে ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে –

> বীরসা এখন ধরতি-আবা। কতদিন ধরে আদিবাসীরা বীরসার মতো কারোকে চাইছিল কে জানে ! সিংবোঙার সঙ্গে, মিশনের ধর্মের সঙ্গে একই সাথে যে নামাতে পারে যুদ্ধে – সেই ধরতি-আবাকে চাইছিল। ওঁরাও, কোল, খারিয়াদের আর রক্ষা করতে পারছিল না সিংবোঙা। তারা ভরসা পাচ্ছিল না যিশুর শরণে। নতুন ভগবান চাইছিল ওরা। সে ভগবান শুধু জাদু আর অপদেবতা আর অভিশাপ দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখে না। যে দেবতা কিংডাম অফ হেভ্‌নের কথা বলে না উপোসি মানুষদের।
>
> যে দেবতা বলে, অপদেবতা নয়, দিকু আর সরকারকে খতম কর।
> নিজেদের হক্ নিজেরা কেড়ে নাও।
> যে দেবতা বলে, দরকার হলে মারো, মরার জন্য তৈরি থাক। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১২৬-১২৭)

বীরসা সেই দেবতা হয়ে মুণ্ডাদের বাঁচার অর্থাৎ লড়াইয়ের পথ দেখিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৮৫৫-৫৬ সালে সংঘটিত সাঁওতাল-বিদ্রোহের কাহিনিতেও সিধু-কানুকে ভগবান প্রেরিত পুরুষ বা সুবা ঠাকুর বলে অভিহিত করা হয়। ধর্মনেতার পক্ষে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করা সহজ বলেই হয়তো বিদ্রোহের আবরণ হিসেবে ধর্মকে আশ্রয় করা হয়েছে যুগে যুগে। সাধারণ মানুষ নিপীড়নের শেষপ্রান্তে পৌঁছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা খোঁজে ভগবানের কাছে, কেননা তাদের বেঁচে থাকা যেখানে অলৌকিকতার জোরে সম্ভব সেখানে তাদের ত্রাতা কেবল ভগবানই তো হবে অথবা ভগবানে পরিণত হবে। বিদ্রোহী ধানী হাটে বাজারে খুঁজে ফেরে ভগবান। তার ভগবান স্বর্গীয় নয়, এ ধরার ধুলার সন্তান। ধানী যে ভগবানকে খোঁজে, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন লেখক তাঁর উপন্যাসে –

Dhaka University Institutional Repository

> সে ভগবান নাকি মুণ্ডা হয়ে জন্ম নিবে। সে সকল মুণ্ডার তরে খুটকাট্টি গ্রাম দিবে। সে এলে দিকু থাকবে না। সে এলে সকল মুণ্ডার গায়ে কাপড়, হাঁড়িতে ঘাটো, খুচিতে লবণ থাকবে। ভাঁড়ে থাকবে মৌয়ার কড়ুয়া তেল। তখন মুণ্ডারা রাজা হবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯৫)

কত সাধারণ চাওয়া মুণ্ডাদের জীবনের কাছে ! কত সামান্য পেলে তারা নিজেদের রাজা ভাবতে পারে ! কত সামান্য চাওয়া পূরণের জন্য দিনের পর দিন তাদের অপেক্ষা করতে হয় ভগবানের আবির্ভাবের, তার অলৌকিক ক্ষমতার ! উদ্ধৃতাংশের এই সামান্য বর্ণনাতে মুণ্ডাদের মানবেতর জীবন আভাসিত হয় এবং পাঠককে মুণ্ডা বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে।

সময়ের প্রয়োজনে বীরসার বিদ্রোহ এবং উত্থান। শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্কের মাঝে যখন দুর্ভেদ্য পর্বত অবস্থান করে, যখন কোনো সংবাহন বিন্দুতে এসে মেলে না ; তখন শাসন পরিণত হয় নিপীড়নে, বিদ্রোহ তখন অবশ্যাম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়। মুণ্ডা বিদ্রোহেও তেমনটা ঘটেছিল। এ বিদ্রোহের পটভূমি এবং আদিবাসীদের বঞ্চনার ইতিহাসকে ঔপন্যাসিক ভাষারূপ দিয়েছেন এভাবে –

> বড়ো দূর সিমলা আর দিল্লি, বড়ো দূর খুন্‌টি তামার রাঁচি থেকে। সিমলা ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। সেখানে লাটপ্রাসাদের বিশাল, ইন্দ্রপুরী সদৃশ বাড়িতে যত আলো জ্বলে, টেবিলে যত খাবার ও মদ সাজানো হয়, বাগানে ফুল ফোটাতে যত আয়োজন হয় তার খরচে সব মুণ্ডাদের সব খুটকাট্টি গ্রাম ফিরে দেওয়া যায়। সেখানে বসে থাকলে অবান্তর মনে হয় জঙ্গল – কালো, উলঙ্গপ্রায় মানুষ – তাদের খিদে – তাদের ঘাটোর থালা – তাদের লবণের স্বপ্ন – তাদের নিষ্প্রদীপ পাতার কুটির। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৪২)

মুণ্ডাদের দারিদ্র্য কিংবা বঞ্চনার সঙ্গে আমাদের ধারণা বা অনুভবের মেলবন্ধন ঘটানো প্রায় অসম্ভব। একজন অ-আদিবাসীর পক্ষে আদিবাসীদের দুঃখ-সুখের প্রান্ত উন্মোচন একান্তই কঠিন – কেননা তাদের জীবন আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। মহাশ্বেতা দেবী এই দুঃসাধ্য কাজটি করেছেন অনায়াস ঋজুতায়। আদিবাসী জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাদের জীবনের নানা প্রান্ত বীরসার বিদ্রোহের আখ্যানে গেঁথে দিয়েছেন, পাঠককে সচেতন করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন অজানা এক জীবনের সমলগ্ন করে। মুণ্ডা জীবনে সবচেয়ে প্রার্থিত হল লবণ, যা ছাড়া ঘাটো বা ঘাসের বীজসেদ্ধ বিস্বাদ। এ সামান্য দ্রব্যটিও তাদের নাগালের বাইরে ; লবণ তারা নিজেরা উৎপাদিত করতে পারে না – বাজার থেকে কিনতে হয়। আর হাট-বাজারে গিয়ে লবণের মতো সস্তা দ্রব্য কেনার মতো অর্থও তাদের থাকেনা। দিনের পর দিন স্বাদহীন ঘাসবীজ সেদ্ধ খেতে খেতে তারা স্বপ্ন দেখে লবণের। বীরসার দাদা বড় হয়ে হাট থেকে একবস্তা নুন কিনে আনতে চায় ; যার যত ইচ্ছে, হাত ডুবিয়ে তুলে নিয়ে ঘাটোয় মিশিয়ে খাবে বলে ভাবে। চাহিদার ক্ষুদ্রতা এ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান অর্থাৎ প্রান্তিকতাকে নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

মুণ্ডাদের আরান্দি বা বিয়েতে রঙ গুলে যে পৃথিবীর আলপনা আঁকা হয় তার আকৃতি তেকোনা[৭]। এই তিন কোনায় সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে মুণ্ডাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া আরও বেশি সীমিত। বীরসার বাবা সুগানার পৃথিবী চালকাড় থেকে বাম্‌বা, বাম্‌বা থেকে কুরুমদা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর বিশালত্বের কোনো ধারণা নেই তার – খুব সামান্য চাওয়া তার এই পার্থিব জীবনের কাছে। ঔপন্যাসিক সুগানা মুণ্ডার মতো সাধারণ মুণ্ডা জীবনের স্বপ্নের ভাষিকরূপ দিয়েছেন এভাবে –

> ওর পৃথিবী সীমায়-সীমায় বাঁধা। সে পৃথিবীতে দু'বেলা দু'থালা ঘাটো, বছরে চারখানা গড়া-কাপড়, শীতে তুষের বস্তার ওম, মহাজনের হাতে রেহাই, আলো জ্বালাতে মহুয়া তেল, ঘাটো খেতে কালো নুন, বনের শেকড় ও মধু, বনের হরিণ-খরগোশ-পাখির মাংস, এই সব পেলেই রাজা হওয়া যায়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১০৮)

জীবনের কাছে, পৃথিবীর কাছে চাহিদার এ সামান্যতা আমাদের বিস্মিত করে, অপরাধী করে নিজেদের বিবেকের কাছে। একই পৃথিবীতে একই ভূখণ্ডে বাস করেও সুদূরের বাসিন্দা হয়ে থাকার দায়ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণিচেতনা দীর্ণ হয় ; গভীর সহানুভূতি ও মমতার উন্মেষে আপ্লুত হয় পাঠক-হৃদয়। তবে তাতে সুগানাদের কিছু আসে যায় না। কেননা তাদের জীবনে দারিদ্র্য এত স্বাভাবিক যে দারিদ্র্যের কারণে কোনো দুঃখবোধ তাদের নেই। সমগ্র জীবনে তারা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। প্রাপ্তির আনন্দরহিত জীবনে তাই অপ্রাপ্তির বেদনাবোধের স্বীকৃতি বা অনুভূতি নেই।

মুণ্ডাদের বিশ্বাসে আদিকালে সেংগেল-দা নামক ভয়াবহ আগুনে ধ্বংস করা হয়েছিল সমগ্র পৃথিবী ; কেবল বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল একটি মুণ্ডারী ছেলে ও মুণ্ডারী মেয়েকে। তাদের থেকে নতুন জগতের সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ মুণ্ডাদের থেকেই সকল মানুষ সৃষ্ট – তাদের পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে। তবে এই আদি মুণ্ডা পিতামাতার সন্তান হলেও মুণ্ডাদের কপালে বা ভাগ্যে নিরন্তর জ্বলে সেংগেল-দার আগুন –

> কিন্তু সুগানার কপালে তো সেংগেল-দার আগুন। কপালে আগুন, পেটে আগুন, মনে আগুন।
>
> সকল আগুন সে মেনে নিয়েছে। তার মধ্যে কোনো প্রতিবাদ নেই। এত আগুন কী একেবারে নেভে ? মুণ্ডা জাতির জীবনে আগুন জ্বলে আর জ্বলে।
>
> তাতেও সুগানার মনে কোনো দুঃখ নেই। ভরপেট খেলে, আস্ত কাপড় পরলে, অটুট ঘরে ঘুমোলে কেমন লাগে তা ও জানে না। তাই কম খেয়ে – না-খেয়ে, ছেঁড়া-কাপড় পরে ভাঙা-ঘরে ঘুমিয়ে ওর দুঃখ নেই। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯৭-৯৮)

মুণ্ডাদের মধ্যেও অর্থনৈতিক প্রতিসাম্য আছে তবে তা অবশ্যই শ্রেণিগত অবস্থানে তারতম্য ঘটায় না। বীরসার বাবা ও মেসোর অর্থনৈতিক অবস্থান একই সমতলে নয়। বীরসার বাবা অধিকাংশ মুণ্ডার মতো

ভূমিহীন, উদ্বাস্তু – অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের সামর্থ্যও তার নেই। অন্যদিকে বীরসার মেসো গুটিকয়েক মুণ্ডার মতো জমি ও পশুসম্পদের অধিকারী ; উপরন্তু মুণ্ডা জীবনের ভীতিকে পুঁজি করে ঝাঁড়ফুক ও তন্ত্র-মন্ত্রের ধারক হিসেবে সমাজের ক্ষমতাবানদের কাতারে অবস্থান করে, তবে আলাদা শ্রেণিতে নয়। প্রকৃতিগত দিক থেকে তারা উভয়ে ভীতু। একজন না খেতে পেয়ে কমজোরি ও ভীতু হয় ; অন্যজন খেয়ে-পরে-মাখতে পেয়ে কমজোরি ও ভীতু হয় – এ সুখটুকু হারাবার ভয়ে তটস্থ থাকে।

৪.২.৬

মুণ্ডাদের জীবনের আগাগোড়াই ভীতি ও নিষেধের ঘেরাটোপে বন্দি। প্রকৃতির কোলে লালিত মুণ্ডারা আজ প্রকৃতিকে ভয় পায়। মাতৃসম জঙ্গল-পাহাড়-ঝর্ণায় তারা অশুভ বা দুষ্ট আত্মার অস্তিত্বের কল্পনায় ভীত হয়। তাদের বিশ্বাস, এই আত্মারা সুন্দরী নারী রূপে মুণ্ডাদের ভুলিয়ে জঙ্গলের গহিনে নিয়ে মেরে ফেলে। জিউরার জঙ্গলে তারা দিনমানেও ঢোকে না ; কেননা তাদের বিশ্বাসে অরণ্যরক্ষয়িত্রী পরিদের লীলাভূমি এ জঙ্গল। জীবিত মানুষ দেখলেই তারা চুলের ফাঁস দিয়ে তাদের মেরে ফেলে। বীরসা এ সকল অলীক ভয় দূর করে মুণ্ডাদের ভেতরকার সাহসকে উজ্জীবিত করে। অবশ্য তাদের সাহসী হয়ে ওঠার অন্যতম উপাদান হলো তাদের ঐক্য। মুণ্ডারী জীবনে অনেক কিছুর অভাব আছে, প্রভূত আছে কেবল তাদের আত্মসম্মানবোধ এবং অসামান্য একতা। মিশনের ফাদাররা মুণ্ডা সর্দারদের ঠক, জোচ্চোর বলে গালি দিলে বীরসা তা মেনে নিতে পারেনি – কেননা মুণ্ডারা কখনও ঠক বা জোচ্চোর হয় না, প্রতারণাকে তারা ঘৃণা করে সব চেয়ে বেশি। আর এক মুণ্ডাকে গালি দেয়া বা আঘাত করলে তা লাগে সব মুণ্ডার গায়ে। একতাবোধের ধারণা কেবল তাদের জীবনাচরণে নয়, অস্তিত্বে-ঐতিহ্যের মর্মমূলে প্রোথিত। মুণ্ডারা তাদের ঐতিহ্যের স্মরণে সগর্বে সে-ধারণার প্রকাশ ঘটায় –

> মোদের সবার পিতা-পুরুষ যখন মুণ্ডা সমাজে মুণ্ডারাজ ছিল, তারা লবণ পেলেও ভাগ করত সমানে সমান, সোনা পেলেও ভাগ করত সমানে সমান। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৮৫)

মুণ্ডাদের এই ঐক্যকে ভয় পেয়েছে ঔপনিবেশিকেরা সবচেয়ে বেশি। বীরসার মতো তারাও জানে, "অস্ত্রশস্ত্রের সকল অভাব ঘুচিয়ে দিতে পারে মুণ্ডারী ঐক্য " (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৮৪)। এই ঐক্যের বলেই তীর-ধনুক হাতে আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়ে সৈলরাকাবে যুদ্ধ করতে ভীত হয়নি তারা, অসীম শক্তিধর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হয়নি। ইংরেজরাও এ বিদ্রোহ দমনে তাদের ঐক্য, তাদের মনের জোরকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে সর্বাগ্রে। নানা আইন-কানুনের

Dhaka University Institutional Repository

জালে জড়িয়ে, বিনা বিচারে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ করে, প্রকৃতির-সন্তান এ মানুষগুলোকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে তাদের মনোবল ভেঙে দিতে চেয়েছে শাসকেরা। সাময়িকভাবে তাতে সফলতা পেলেও আদিবাসীরা বারবারই বিদ্রোহী হয়েছে – ইতিহাসে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

৪.২.৭

মুণ্ডা সমাজে নারীর অবস্থান অতি উচ্চে। ঔপন্যাসিক এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন –

> ওদের সমাজ পুরুষশাসিত নয়। ওরা স্ত্রী-পুরুষ সমান খাটে, সমান আয় করে, সমান সম্মান পায়। মায়ের সম্মান মুণ্ডা সমাজে খুব উঁচুতে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৭৩)

সম-অধিকার-ভিত্তিক যে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সভ্য সমাজে নানা আন্দোলন, সভা-সমিতি কিংবা দিবস পালন করা হয় ; আধুনিকতার স্পর্শ-বঞ্চিত, অনগ্রসর সমাজে যদি সে বৈশিষ্ট্যটি থাকে সমুজ্জ্বল, তাহলে তা বিস্মিত করে পাঠককে এবং নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে যে, যাদের আমরা অসভ্য, অনগ্রসর বলছি তাদের ক্ষেত্রে সে অভিধা সত্যি প্রযোজ্য কি না।

অন্য সব সমাজের মতো মুণ্ডা সমাজেও বিয়ে একটি বিশেষ অঙ্গ। উৎসব-প্রিয় মুণ্ডারা বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচ-গান এবং ভোজের পাশাপাশি পালন করে নানা আচার, নানা রীতি। সাধারণত বর-কনের বাবারা বিয়ে স্থির করেন। বর বা বরের বাবা বালা-খাড়ু-শাড়ি কনের বাবাকে দিয়ে বিয়ের কথা নিশ্চিত করেন। মুণ্ডা বিয়েতে যেসব আচার পালন করা হয় বীরসার মনোগত ভাবনায় তা উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে এভাবে–

> ভগবান হতে হলে অনেক বড়ো দাম দিতে হয়। সে জীবনে কোনো বরযাত্রা নেই, বাজনা বাজিয়ে মেয়েরা আমপাতায় জল ছিটিয়ে বরকে নামিয়ে নিয়ে 'চুমান্' স্ত্রী-আচার করে না। বীরসাকে তেল-হলুদে স্নান করিয়ে কোনো কনের বাপ কোলে বসায় না। পাঁচ 'পঞ্চেশ' এসে বিয়ে দেয় না। কোনো বধূর সঙ্গে তিলক ও 'জনাও' বিনিময় করে না বীরসা – জল, আগুন, ধান, দুধ, তলোয়ার, তির ও ধনুক, সাতটি জিনিসের সামনে দাঁড়িয়ে একে একে অঙ্গীকার করে না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৮৪)

মুণ্ডা বিয়ের অনেক রীতি কেবল একটি অনুচ্ছেদে ধারণ করা হয়েছে। মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহ নয়, কবর দেয়ার রীতি তাদের সমাজে প্রচলিত। তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবার জন্য ইংরেজরা বীরসার মৃতদেহ কবর না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে চাল্‌কি মুণ্ডানীকে কবর দেবার কালে তার ও গর্ভস্থ সন্তানের আত্মা বা 'রোয়া'র জন্য রূপার গহনা ও আটআনা পয়সা কবরে দেওয়ার ইতিবৃত্ত উপন্যাসে

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষিত আছে। মুণ্ডারা বিশ্বাস করে যে, রোগ হলে দেহ অশুচি হয়ে যায়। মহুয়া বিচি কুটে, পিষে তা থেকে তেল তৈরি করে আলো জ্বালে তারা। পাহাড়-জঙ্গলে লালিত মুণ্ডারা পাহাড়ে চড়তে অত্যন্ত দক্ষ। ঔপন্যাসিকের বিবরণে –

> সৈলরাকাব পাহাড় তোমরা দেখেছ, সে পাহাড় যেমন চড়াই, যেমন খাড়াই, বাঘ তাড়লে হরিণের পা পিছলায় কিন্তু মুণ্ডারা সে পাহাড়ে উঠে পা পিছলায় না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৮৫)

৪.২.৮

আদিবাসী জীবনে টোটেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একটি গোষ্ঠীর পরিচয় নির্ভর করে একটি প্রাণী-চিহ্নে। মুণ্ডা গোষ্ঠীর টোটেম হল হাতি। বীরসার অন্তর্দৃষ্টিতে তাদের গোষ্ঠীর আদিপুরুষ নাগু, চুটু দুই ভাইয়ের সঙ্গে কুমারী অরণ্যকার প্রহরীরূপে এক সুবিশাল হাতিকে দেখতে পায়, যে শুঁড় তুলে চেঁচিয়ে তাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

টোটেমের উল্লেখ যেমন আছে, তেমনি আদিবাসী জীবনের সামগ্রিক আখ্যানে আদিবাসী মিথ এবং তার সঙ্গে ভারতীয় মিথের সাযুজ্য নির্দেশ করা হয়েছে। সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে মুণ্ডা মিথের আড়ালে নিজ জাতির প্রাচীনতার ও গৌরবের ইতিহাস রক্ষিত আছে।

> আদিযুগে সেংগেলদার আগুনে পৃথিবী জ্বলে ছাই হয়েছিল। সিংবোঙা আকাশ থেকে আগুন ফেলেছিল। তাতে সকল মানুষ জ্বলে মরে যায়। এক কাঁকড়ার গর্তে ছিল ঠাণ্ডা জল। মাটির বুকে ঠাণ্ডা জল। একটি ছেলে একটি মেয়ে – মুণ্ডারী তারা, শালবনের ছায়ায় ছেলেটি টুইলা বাজাচ্ছিল, মেয়েটি নাচছিল, তারা আগুন দেখে থমকে দাঁড়াল।
>
> সিংবোঙা আকাশ থেকে মুখ নামিয়ে বললেন 'আরে তোরা পালা। তোদের হাতে জনম মরণের ভার। তোরা হতে আবার জগৎ সির্জাব যে।'
>
> তারা বলল 'কোথা পালাব?'
>
> 'ও–ই দেখ্ !'
>
> আগুনরঙা সাপ, তিনি নাগদেবতা নাগীরা, তিনি ফণায় ঢেকে ছেলেটিকে আর মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন সেই কাঁকড়ার গর্তে। শীতল জলে তারা ডুবে থাকল। কতদিন নিদ্রায় গেল তারা জানে না। তারপর তারা সিংবোঙার ডাকে উঠে পড়ল।

> বাইরে এসে দেখে কবে থেকে বৃষ্টি নেমেছে কে জানে। সিংবোঙা যেমন আগুন ঢেলেছিলেন, তেমনি বৃষ্টি নামিয়ে বিশ্বভুবন ঠাণ্ডা করেছেন। কতদিন ধরে কে জানে, অরণ্য, নদী, পাহাড়, পশু, পাখি, ফুল, ফল, কীটপতঙ্গ সব – সৃষ্টি করেছেন।
>
> সিংবোঙা মেঘ থেকে মাথা নামিয়ে হেঁকে বললেন 'যা! জগতে সব আছে, মানুষ নাই। তোরা সির্জা। শুন্, মানুষে মানুষে – মুণ্ডারী মানুষে ভুবন ভরে দে।'
>
> সেই ছেলে, সেই মেয়ে থেকে সকল মুণ্ডারীর, মুণ্ডারী জগতের শুরু। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯৭)

এই মিথের অন্য একটি রূপও আছে যেখানে সিংবোঙা নয়, স্রষ্টার নাম হরম্ আসুল। তিনি আগে জলের জীব সৃজন করেছেন, তারপর সাগরের মাটি দিয়ে ডাঙার জীব গড়েছেন। সাগরের মাটি এনে দিয়েছিল তাকে কেঁচো। সাগর থেকে উঠে আসা কেঁচো পেটের মাটি মলের সঙ্গে বের করে হরম্ আসুলকে দিয়েছিল বলে তিনি সব গড়তে পারলেন। ধর্ম-বিশ্বাসের আবরণে আচ্ছাদিত নিতান্ত গল্পকথা বলে মনে হয় তাদের বিশ্বাসজাত কাহিনিগুলো ; কিন্তু এ কাহিনির সঙ্গে সৃষ্টি-রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আশ্চর্য সাযুজ্য বিস্মিত করে আমাদের। জীববিজ্ঞানীরা যেমন বলেন, সমুদ্র থেকে জীবনের সৃষ্টি অথবা পৃথিবীর উত্তপ্ত অবস্থা এবং ধীরে ধীরে শীতল হয়ে জীবন-বিকাশের উপযোগী হওয়া – এ তথ্যাদি বহু বছরের গবেষণায় প্রাপ্ত এবং আধুনিক মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে যোগ হওয়া খুব বেশি আগের নয় ; অথচ মুণ্ডারা তাদের মিথের মাধ্যমে এ কাহিনিকে ধারণ করে আছে বহুশতাব্দী ধরে। কোনোভাবে আধুনিক শিক্ষা বা আধুনিক জীবনের সঙ্গে যাদের কোন যোগ নেই ; তাদের কাছ থেকে এ ধরনের তথ্য জানতে পারার মতো বিস্ময়ের আর কী হতে পারে !

মুণ্ডারী পুরাণের সঙ্গে হিন্দু মিথের সাযুজ্য লেখক স্পষ্ট করেছেন এ উপন্যাসে । মুণ্ডা-জীবনের আকাঙ্ক্ষার বিবরণে মুণ্ডাদের ত্রাতার আগমনকে তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে – 'কালো মানুষের কোলে আসবে অনার্য কৃষ্ণ। তাই মুণ্ডাদের জীবনটা কংসের কারাগার হয়ে গেছে'(মহাশ্বেতা ২০০৩/৮: ৯০)। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে একই ভূখণ্ডে বাস করলে নিজেদের মধ্যে কিছু বিনিময় ঘটবে, সেটা স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে কে কার থেকে গ্রহণ করেছে তা নির্ণয় করা দুরূহ, তবে বিনিময়টা পারস্পরিক বলে ধারণা করা যেতে পারে। যেমন – পূর্বোল্লিখিত একটি উদ্ধৃতি থেকে বলা যায় যে 'করম পূজা' ও অন্যান্য রীতনীতি মুণ্ডারা গ্রহণ করেছিল বহিরাগতদের কাছ থেকে। আবার বলিদান প্রথা আদিম অসুর বা অনার্যদের রীতি, আর্যরা একসময় তা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে অঙ্গীভূত করেছিল।

৪.২.৯

মিথ-বিশ্বাস, সামগ্রিক জীবনাচরণ, খাদ্যাভ্যাস, দারিদ্র্য, স্বপ্ন-বাসনা – সমস্তই মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে ঠাঁই পেয়েছে। এ উপন্যাসে যেমন রোমান্টিকতা আছে, পাশাপাশি আছে রিপোর্তাজধর্মিতা। সমালোচকরা তো একে ডকুমেন্টশন (সোহিনী ২০১২ : ১৫৫) বলেও অভিহিত করেছেন। বিদ্রোহের কাহিনিতে ঔপন্যাসিক স্থান-কাল তো বটেই প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নাম-পরিচয়, বিদ্রোহ দমনে সরকারি সিদ্ধান্ত (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৯৪), বিদ্রোহ দমনের নিষ্ঠুর বিবরণ (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ১৯৯), বিদ্রোহীদের ধরিয়ে দেবার সরকারি বিজ্ঞাপন (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৯৭), বিদ্রোহীদের পক্ষে ব্যারিস্টার জেকবের লড়াই এবং তার বিষয়ে কলকাতার 'দি বেঙ্গল' ও 'দি স্টেট্সম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয়, জবাবে সরকারের কাজের সমর্থনে ডি. সি. স্ট্রিটফিল্ডের 'দি স্টেট্সম্যান' পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ২২৫) – এ সমস্ত সরাসরি তুলে দিয়েছেন উপন্যাসে। কোথাও কোথাও ফুটনোট ব্যবহার করে লেখক সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করেছেন। লেখকের এ আচরণে তাঁর প্রচ্ছন্ন সাংবাদিক পরিচয় মূর্ত হয়েছে। তবে সব ছাপিয়ে ঔপন্যাসিকের রোমান্টিক মনোভঙ্গী প্রধান হয়ে উঠেছে। *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাস পাঠ করে বিদগ্ধ সমালোচক রণেশ দাশগুপ্তের মতো কারো মনে হতেই পারে যে, বস্তুভিত্তিক উপন্যাস যেন এখানে অনুভূতি প্রধান কাব্যের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে (উদ্ধৃত, সুব্রত ২০১২ : ১৫৩)। অরণ্য ও আদিবাসী মায়ের সমীকরণ করে বীরসার অরণ্যের মুক্তির সংগ্রাম, সে-সংগ্রামের রীতকরণে অনেকাংশে লেখক হয়েছেন রোমান্টিক।

ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা সর্বাংশে লেখক অনুভব করেননি। বীরসাকে তিনি নিজ নির্মাণে নবরূপ দিয়েছেন। উপন্যাসে কেবল বীরসা জিতেন্দ্রিয় – নারী-সংসর্গ বিবর্জিত নয়, তার ধর্মীয় অনুশাসনে বীরসাইত বা তার অনুসারীরাও স্বাভাবিক বৈবাহিক জীবন-যাপন করতে পারবে না। ইতিহাস বলে বীরসা স্বাভাবিক আদিবাসী জীবনের অধিকারী – একাধিক স্ত্রী ও সঙ্গিনী তার ছিল। উপন্যাসেও দেখা যায়, ধরা পড়ার সময় তার সঙ্গে দুজন নারী ছিল, যদিও লেখক তাদের স্ত্রী বা সঙ্গিনী নয়, সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস থেকে কিছুটা সরে এসেছেন বলে সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী। সুরেশ সিং কে উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে বীরসার একাধিক সঙ্গিনী ও স্ত্রী ছিল – "Birsa has been condemned for his many marriages which went against the christian and his own prescription of monogamy. The Birsaites have either maintained a discreet silence about these affairs or tried to nationalize them. (সুমিতা ১৯৯৮ : ১২৪) এ

সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন – 'বীরসার প্রণয়-সম্পর্কজনিত দিকটিকেও ইতিহাস সমর্থিতরূপে দেখালে কী বীরসা চরিত্রের মহত্ত্ব কিছু কমে যেত ?' (সুমিতা ১৯৯৮ : ১২৫) অধ্যাপক চক্রবর্তী মনে করেন, কমত না ; বরং আরও মানবীয় হতো চরিত্রটি। মহাশ্বেতা বীরসা চরিত্রকে আদর্শায়িত করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠককে মাথায় রেখে সম্ভবত এমনটি করেছেন ; একারণেই তাঁর অন্যান্য আদিবাসী চরিত্রকেও আমরা সকল নেতিবাচকতার ঊর্ধ্বে দেখতে পাই।

৪.২.১০

অরণ্যের অধিকার-এ বীরসার লড়াই মূলত মানবাধিকারের শাশ্বত লড়াই। এ লড়াইকে মহিমান্বিত করতে, আদিবাসী জীবনের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা লাভের অভীপ্সায় মহাশ্বেতা বীরসাকে দেবতার আদলে গড়েছেন ; তাতে বিঘ্নিত হয়নি ইতিহাস ও শিল্পের মিলিত রসায়ন বরং যুক্ত হয়েছে রোমান্টিকতা, বাংলা সাহিত্য লাভ করেছে অসাধারণ এক কাব্যিক-ঐতিহাসিক উপন্যাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর

৪.৩.১

মহাশ্বেতা দেবীর সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাস *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর*[৮] (১৯৮০) – গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে[৯] তিনি এ কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন। আদিবাসীদের বঞ্চনার সবগুলো প্রান্ত প্রায় পৌনে শতাব্দীর কালপরিসরে এ উপন্যাসের বৃহদায়তন কলেবরে স্থান পেয়েছে। মুণ্ডা বিদ্রোহের নায়ক বিরসার মৃত্যুসাল ও এ উপন্যাসের নায়ক চোট্টির জন্মসাল একই বছর – ১৯০০ সাল। লেখক সচেতনভাবে বিরসার উত্তরসূরি হিসেবে চোট্টিকে গ্রহণ করেছেন। বিরসা মুণ্ডার সহযোদ্ধা ধানী মুণ্ডার সঙ্গে চোট্টির সংযোগ, ধানীর তির চোট্টির কাছে হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে মুণ্ডা বিদ্রোহের ধারাবাহিকতাকে চোট্টির কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। দীর্ঘজীবনে চোট্টি প্রত্যক্ষভাবে নয় বরং পরোক্ষে দিকু ও মহাজন শ্রেণির সঙ্গে লড়াই করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে। জীবন্ত এক কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে সে এবং তার মাধ্যমে আদিবাসী জীবনকে মহিমান্বিত করা হয়েছে।

চোট্টি একটি নদীর নাম, নদী তীরবর্তী গ্রামের নাম, সে গ্রামে অনুষ্ঠিত মেলার নাম এবং সে গ্রামের এক আদিবাসী মানুষের নাম। নামের এ পুনরাবৃত্তের প্রভাব উপন্যাসের সংগঠনেও দেখা যায়। উপন্যাসটির শুরু চোট্টি মেলায় চোট্টির তির খেলার মাধ্যমে এবং সমাপ্তও হয়েছে একই মেলায় চোট্টির তির ছোঁড়ার অনুষঙ্গে, তবে ঘটনাকালে ভিন্নতা রয়েছে ; শুরু এবং শেষের পার্থক্য আঠারো বছর। আঠারো পরিচ্ছেদের এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে চোট্টি মেলায় ষাট বছরের চোট্টি তিরন্দাজ হিসেবে অবসর নিয়ে বিচারক হবার ঘোষণা দেয়। সর্বশেষ আঠারো পরিচ্ছেদে ১৯৭৮-র বিজয়াদশমীর চোট্টি মেলায় আটাত্তর বছর বয়সী চোট্টির তির ছোঁড়ার প্রতীকী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। মধ্যবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে চোট্টির জন্ম থেকে তার আটাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত ঘটনাকাল নিরবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতীতচারিতার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাঠামো বিন্যাস পেয়েছে। আবার অতীত থেকে বর্তমানের ধারাও প্রবাহিত হয়েছে চোট্টিকে কেন্দ্র করে। চোট্টিই এ কাহিনির মূল উপজীব্য তবে একক ব্যক্তিত্ব নয়, সে মুণ্ডা সমাজের প্রতিনিধি। লেখকের ভাষায় – "চোট্টি একটি প্রতীক, উপজাতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক" (মহাশ্বেতা ১৪১৮ : ৩৭৯)। চোট্টির জীবনকথার মধ্য দিয়ে তাই মুণ্ডাদের জীবনকথা উদ্ভাসিত হয়েছে। মুণ্ডা ও দুসাদ-ধোবিদের মতো অন্ত্যজদের বঞ্চনা-নিপীড়নের অনুপুঙ্খ বিবরণে কাহিনি গতি পেয়েছে এবং প্রান্তিক মানুষের সংগ্রামশীল জীবন-চেতনায় কথকতার ভঙ্গিতে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে।

আদিবাসীদের মধ্যে নদীর নামে নামকরণ বেশ দুর্লভ ; তারা সচরাচর বারের নামে তাদের সন্তানদের নামকরণ করে থাকে – চোট্টি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং এ ব্যতিক্রমতা দিয়েই উপন্যাসের সূচনা এবং অবয়ব গড়ে উঠেছে। নামের ব্যতিক্রমতার বিষয়টির সূত্রপাত হয়েছে চোট্টির পূর্বপুরুষ পূর্তি মুণ্ডার কাহিনিসূত্রে। ভূমিপুত্র পূর্তি মুণ্ডা ভূমি খনন করে আহরণ করতে চেয়েছে শস্য কিন্তু তার পরিশ্রমের বরদানে প্রতিবারই মিলেছে খনিজ সম্পদ – কখনও কয়লা, কখনও অভ্র, কখনওবা প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার। সৌভাগ্যের বরপুত্র পূর্তির এই আবিষ্কার ডেকে আনে সম্পদলোলুপ সভ্য মানুষদের, ফলে বিতাড়িত হতে হয় আদিবাসী সরল কৃষিজীবীদের। ক্রমাগত এই যাযাবরবৃত্তি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ করেছিল পূর্তিকে। চোট্টি নদীর তীরবর্তী নতুন বাসস্থান গড়ে নদীর বালিতে সে যখন সোনার সন্ধান পায়, তখন নিজ পরিবার পরিজন এবং পাহাড়-বন-নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষিত করতে নিজেকে সরিয়ে নেয় দৃশ্যপট থেকে ; নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্ম দিয়ে অন্তর্হিত হয় চিরতরে। পূর্তি মুণ্ডার এই কাহিনি একদিকে যেমন আদিবাসী জীবনের সুদীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসকে প্রতীকায়িত করে, তেমনি জানিয়ে দেয় আদিবাসী জীবনে সৌভাগ্যের কোনো অস্তিত্ব নেই ; লৌকিক জীবনে যা সৌভাগ্য, আদিবাসী জীবনে তা-ই চরম দুর্ভাগ্য বলে প্রতিভাসিত হয়।

৪.৩.২

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন দীর্ঘদিন তিনি পালামৌ-ডালটনগঞ্জে বাসে বাসে ঘুরেছেন।[১০] একদিন বাসে যেতে যেতে তিনি হেসালং বাজারে একটা আদিবাসী মেলায় গিয়ে পড়েন, তিরন্দাজির প্রতিযোগিতা সে-মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল। সে-প্রতিযোগিতায় এক বৃদ্ধ মুণ্ডা বিচারক হিসেবে ছিলেন, যিনি প্রতিযোগিতা শেষে শ্রেষ্ঠ তিরন্দাজ হিসেবে শেষ তিরটি ছুঁড়বেন। এই বৃদ্ধ তিরন্দাজের শুভ্র কেশ, দৃঢ় মুখশ্রী মহাশ্বেতাকে আকর্ষণ করেছিল, স্মৃতিতে সযত্নে সংরক্ষিত ছিল ; পরবর্তী সময়ে চোট্টি চরিত্রে রূপ পেয়েছে তা এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর আদিবাসী জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা। বাস্তব ও স্মৃতি, কথা ও উপকথা, অলিখিত ইতিহাস ও প্রচলিত লোককাহিনির সমন্বয়ে আদিবাসী জীবনের অপরূপ আলেখ্য নির্মাণ করেছেন তিনি অনায়াস দক্ষতা ও গভীর মমতায়।

আদিবাসী জীবনে তির ও তিরন্দাজের গুরুত্ব ব্যাপক। একসময় তির ছোঁড়ার দক্ষতার উপর নির্ভর করত তাদের জীবিকা – কেননা শিকার ছিল অরণ্যচারী আদিম মানুষের খাদ্যসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস, হাতিয়ার ছিল আত্মরক্ষার শক্তি। আজ অরণ্য অন্তর্হিত, জীবনধারণের হাতিয়ার আজ শৌখিন খেলনায়

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরিত। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী আদিবাসী জীবনে তির ও তির চালনায় দক্ষতা আজও শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়ে থাকে। তির মুণ্ডাদের পৌরুষ, ক্ষমতা, প্রতিবাদের প্রতীক। উপন্যাসে চোট্টি-কণ্ঠে উচ্চারিত সংলাপে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "চোট্টি বলেছিল, তির ছোঁড়ে হাঁ-মরদ, গুলি ছোঁড়ে না-মরদ" (মহাশ্বেতা ২০০৩/ ৯ : ২৩)। উচ্চারিত এ বাক্য বন্দুক তথা আধুনিক মারণাস্ত্র শোভিত সভ্যতার প্রতি তির্যকতা এবং সেই সঙ্গে হাজার বছরের সংগ্রাম বিশেষত আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বীরসার সংগ্রামের ইতিবৃত্তের দিকে ইঙ্গিত করে। আধুনিক মারণাস্ত্রের সঙ্গে তিরের প্রতিতুলনা কেবল চোট্টি-কণ্ঠে নয়, লেখকের নিজস্ব কথনেও ব্যক্ত হয় –

> অবশ্য ওরা তীর বা অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখতো, কিন্তু কাউকে মারতে শেখেনি। ওরা প্রকৃতিকে টিকে থাকতে সাহায্য করতো। অস্ত্র ব্যবহার করতে জানলেও, ওরা রক্তপিপাসু নয়। মূলত ওরা শান্ত, মার্জিত, উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন, আর ওদের এই সহজাত সভ্যতা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। একজন উপজাতি প্রকৃতি, মানুষ, এমনকি অনধিকার প্রবেশকারী সকলের সঙ্গেই মিলমিশ করে বেঁচে থাকে। তাই যখন সে মারে, বুঝতে হবে মারাটা দরকার ছিলো। (*মহাশ্বেতা* ১৪১৮ : ৩৮৮)

এ উপন্যাসে বীরসার সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে বহমান রাখে চোট্টি। বীরসা থেকে ধানী এবং ধানী থেকে চোট্টি – সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় তাদের অবস্থান। চোট্টিকে ধানীর তির চালনা শেখানো, মানুষবেশী শত্রু হননের চরম শিক্ষা অনুশীলন এবং সবশেষে তার নিজের তিরটি চোট্টিকে দেয়া প্রকৃত অর্থে বীরসার উত্তরসূরি হিসেবে তাকে মনোনীত করা। এ উপন্যাসে এই তিরটিকে বারবার জাদু-তির বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাশ্বেতা ইতিহাস ও কিংবদন্তিকে, একের পর এক আন্দোলনকে এই তিরের প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। বীরসার উত্থান যে বীরসার মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়নি এবং তা যে সংক্রামিত হয় পরবর্তী প্রজন্মে তার প্রমাণ এই তির। চোট্টি মুণ্ডার তিরের জাদুকে পুলিশ, প্রশাসন ও আদিবাসী-অআদিবাসী সকলেই অতিলৌকিক মনে করে আর সে জাদু-ক্ষমতার বলে চোট্টির জীবনের সব কথা হয়ে যায় গল্পকথা। সারাজীবন যে চোট্টি তার তিরকে জ্যা-বদ্ধ করেনি নরমেধে, উপন্যাসের অন্তিমে অহেতুক খুনোখুনি এড়াতে এবং নিজ জনপদের নিজ গোষ্ঠীর মানুষকে রক্ষার্থে নরহত্যার দায়ভার গ্রহণ করে সে। এস ডি ও-র সংশয়ের জবাবে সে তখন ধানী মুণ্ডার তিরটি ব্যবহার করে বৃদ্ধ বয়সেও নিশানাবিদ্ধ করে নিজ ব্যক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। বাস্তবিকই অন্তিমে তিরটি পায় এক অতিলৌকিক মাত্রা। এ উপন্যাসের ভূমিকায় শঙ্করলাল ভট্টাচার্য বলেছেন,

> মহাশ্বেতা তাঁর তীরের উপাখ্যান শেষ করেছেন দুটি বাক্যের এক অপরূপ freeze shot-এ : 'একদিকে চোট্টি, অন্যদিকে এস. ডি. ও. মাঝে শূন্যে উত্তোলিত হাজার ধনুক। আর অনেক উত্তোলিত হাতে সাবধান ঘোষণা।' বলা বাহুল্য, এই স্থিরদৃশ্যটি আদিবাসীদের স্বপ্নের উলগুলান বা উত্থানের বয়ে চলার ইঙ্গিত ধারণ করে। এই

স্থিরদৃশ্যটি চোট্টি-মুণ্ডার জাদু-তীরের ইতিহাস হয়ে ওঠার সাক্ষ্য। বর্হেসের গল্পের মায়া ছোরার মতো এই তীরও তার ধারককে একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত, মুক্ত, অলৌকিক করে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/ ৯ : ১০)

উপন্যাসটির শুরু ও শেষের দৃশ্যপট একই – চোট্টি মেলা। আদিবাসীরা যে কৌম-জীবনের অধিকারী, তাদের সমাজে ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠী বড় এবং তারা সত্যিকার অর্থেই যে একতাবদ্ধ তার প্রমাণ এই চোট্টি মেলা। মূল জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন আদিবাসীদের গ্রাম। অন্ত্যজ গোষ্ঠীরা বাস করে তাদের সঙ্গে। সে-হিসেবে আদিবাসী গ্রাম নয় সেগুলো বরং পাঁচমেশালি গ্রাম বলা যেতে পারে। মূল জনগোষ্ঠী যাদের প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে তারা একটি দিনের জন্য মূলভূমির অধিকার পায় মেলা উপলক্ষে। কেন্দ্র ও প্রান্তের পারস্পারিক এ বিন্যাসকে সচেতনভাবেই এ উপন্যাসে ঠাঁই দেয়া হয়েছে। এদিন তারাই রাজা – সকল অ-আদিবাসীকে সেদিন দূরে থাকতে সরকারি নির্দেশ দেয়া হয় অর্থাৎ প্রান্তে সরিয়ে দেয়া হয়। মেলার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক বিশ্বস্ত ও বাস্তবানুগ –

বছরে একবার চোট্টি জায়গাটি আদিবাসীতে ভরে যায়। বিজয়া দশমীর দিন চোট্টি মেলাতে। সেদিন পঁচিশ-তিরিশটি গ্রামের আদিবাসীরা সে মেলায় আসে। বাঁশের মাচায় কাগজ জুড়ে ওরা অতিকায় বাঘ, হাতি, ঘোড়া বানায়। সেগুলি বয়ে নিয়ে নাচে। মেয়েরাও নাচে। মৌয়া খায়। সে মেলায় নাচের কাছাকাছি অ-আদিবাসী পুরুষদের যাওয়া নিষেধ। গেলে তারা আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করতে পারে এবং শুকনো ঘাসে আগুন লাগা সরকারের অপছন্দ। সে রকম কোনো ঘটনা না-ঘটে যায়, সেজন্যে তোহরি থানা থেকে পুলিশ আসে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ২২)

উদ্ধৃতাংশে আদিবাসী জীবনের আরেকটি প্রধান রীতি প্রকটিত হয়েছে – তা হল তাদের সমাজে নারীর অবস্থান। সূচনাতে লেখক জানিয়ে দেন আদিবাসীরা নারীদের অসম্মান সহ্য করে না মোটেও। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহসূত্রে এ মন্তব্যের যথার্থতা প্রতীয়মান হয়। যুবলীগের পহলোয়ান, রোমিও এবং দিলদার আদিবাসী কন্যা বাসন্তীকে তুলে নিতে এলে চোট্টিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাদের প্রতিহত করা হয়। বন্দিদের যুবলীগ সেক্রেটারির হাতে সোপর্দ করার সময় চোট্টি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করে – ''বিটিদের বেইজ্জত করলে মারি ফেলি মোরা"(মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ২০২)।

মুণ্ডা সমাজকাঠামোয় নারী তথা মায়ের সম্মান বিষয়ে ঔপন্যাসিক অন্যত্র স্পষ্টভাবে জানান, "চোট্টিদের সমাজে মায়ের সম্মান বাপের সমান" (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ২০২)। সাংসারিক সব কাজে নারীদের মতামত চাওয়া হয়, অর্থনৈতিকভাবেও তারা সাবলম্বী। বিয়ের পর চোট্টির বউ আনে একটি শুয়োর, একটি ছাগলি। চোট্টির মায়ের ছিল দুটি গাই ; বহিরাগতদের কাছে দুধ বিক্রি করে সে। চোট্টির ভ্রাতৃবধূ মুংরি মুরগি পালন করে যে অর্থ সঞ্চয় করে তা তার নিজস্ব – সংসারের পুরুষদের তাতে কোনো অধিকার

নেই। নাচ-গান, উৎসব-পরব সবটাতে নারীরা সমভাবে অংশ নেয়। সংসার চালানো এবং দিনমজুর, বেঠবেগার হিসেবে আদিবাসী নারীরা পুরুষদের সাথে সমানতালে ঘরের বাইরে কাজ করে থাকে।

৪.৩.৩

আদিবাসী এবং অন্ত্যজ সমাজের বড় অভিশাপ বেঠবেগারি প্রথা। সরল অক্ষরজ্ঞানহীন আদিবাসীরা পুরুষানুক্রমে বাঙালি, বিহারি এবং অন্যজাতির মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকে। ভয়াবহ সেই ঋণের জাল – একবার তাতে আটকালে সাতপুরুষেরও সাধ্য নেই তা থেকে বেরোনোর। ক্রীতদাস প্রথার আরেক নাম যেন বেঠবেগারি। আকালের সময় কেউ হয়তো টিপসই দিয়ে মহাজনের কাছ থেকে খাদ্যশস্য নেয় এক খুঁচি – সে-ঋণ তার পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের কাঁধে বর্তায়। ঋণগ্রস্ত পরিবারের সকল সদস্যের বিনাপারিশ্রমিকে মহাজনের ক্ষেতের কাজ, পালকি টানা, পাখা টানা – সকল কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে হয় সারা বছর। চোট্টির বোন পরমির শ্বশুর বাড়িতে শাশুড়িসহ সকলকে ফসল কাটার মৌসুমে মহাজনের জমিতে বেঠবেগারি দিতে হয়। চোট্টিদের গ্রামের অর্ধেকের বেশি আদিবাসী ও অন্যান্য তফশিলি জাতি লালা তীরথনাথের বেঠবেগার। চোট্টি পরিবার বেঠবেগার না হলেও মহাজনের ইচ্ছাধীন ; কেননা গোটা অঞ্চলের মালিক বনে গিয়েছে যে, তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ভূমির অধিকার নেই যাদের, মহাজনের জমি বর্গায় চাষ করে কিংবা স্রেফ দিনমজুরি করে যাদের জীবন কাটে ; প্রতাপশালী মহাজনকে অগ্রাহ্য করার শক্তি তাদের কোথায় ? সামন্তবাদী এ প্রভুরা অনেক খরচ করে মাস্তান লেলিয়ে দিতে পারে কিন্তু ঋণগ্রস্ত মজুরদের ন্যায্য মজুরি দিতে চায় না। ২৪ অক্টোবর ১৯৭৫ সালে অর্ডিন্যান্স জারি করে ভারতে বেঠ-বেগারী প্রথা বে-আইনি বলে ঘোষিত হয় কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। নিরক্ষর নিঃস্ব আদিবাসীদের পক্ষে আদালতে যাওয়া সম্ভব নয়, আবার বল প্রয়োগে মালিককে চাপ দিয়ে তা বাস্তবায়নও তাদের পক্ষে অসম্ভব। বেঠ-বেগারী কিংবা 'মিনিমাম ওয়েজ' আইন হিসেবে সরকারের ইমেজ বৃদ্ধি করে, বাস্তবে তা কার্যকর করা এই সমাজব্যবস্থায় সম্ভব নয়। প্রকৃত সত্যটি প্রশাসনের কোনো এক মুখপাত্র, তথাকথিত ভারতবিশেষজ্ঞ সমাজ-অর্থনীতিবিদ অমলেশ খুরানার সঙ্গে কথোপকথনের এক পর্যায়ে জানিয়ে দেন –

> যারা গরিবের ভালাইয়ের অ্যাক্ট ইমপ্লিমেন্ট করার ওপর জোর দেয় না, তারা কাংগ্রেসি হোক, চাই কমুনিস তারা গরিব অছুত ঔর আদিবাসীকে আপনার মতো পণ্ডিতের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তারা জানে, অ্যাক্ট ইম্প্লিমেন্ট করলে মালিক মহাজনের হাতে ওই বেচারি গরিবলোক মারা পড়বে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ২১২)

তথ্য-উপাত্ত এবং বাস্তবতার নিরিখে আদিবাসী এবং খেতমজুরদের জন্য তৈরি আইনের উপযোগিতা এবং সেই সঙ্গে বঞ্চিত মানুষের স্বর চিহ্নিত করেছেন মহাশ্বেতা তাঁর এ উপন্যাসে। মূল জনগোষ্ঠী যাদের প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে, সেই জমিদার-মহাজনেরা তাদের 'মানুষ' পরিচয়ও কেড়ে নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য করে। এ উপন্যাসে এমন নিপীড়নমূলক বিধি-নিষেধের সন্ধান দিয়েছেন ঔপন্যাসিক চরিত্রের কথনের মধ্য দিয়ে –

> বুধা বলল, জমিদার বা কি ! এখুনো কুনো মুণ্ডা গায়ে পিরাণ দিবে না, পায়ে জুতা পরবে না, মাথে ছাতি লিবে না, কাঁসা পিতলে ভাত খাবে না। একোজনের ছল ধরলে গোটা গ্রাম জরিমানা দিবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৮৬)

অন্যত্র চোট্টি তার ক্ষোভ প্রকাশে স্পষ্ট উচ্চারণ করেছে – মুণ্ডা ভাত খেলে, গোটা কাপড় পরলে দোষ হয়। তা জানত বলে জলে সোনা দেখে আমার পিত্তিপুরুষ পলায়েছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৪৫)

প্রান্তে ঠেলে দেয়া এ মানুষগুলোর বঞ্চনা-বেদনার ইতিহাস রচনা করে মহাশ্বেতা পাঠক সমাজের সহানুভূতি কুড়াতে চাননি, বরং আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এবং চরিত্রগত সমৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগিয়ে কাহিনির কেন্দ্রে তাদের ঠাঁই দিয়েছেন ; স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের প্রাচীনত্ব, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। মহাভারতের প্রসঙ্গ টেনে ধোনি যখন চোট্টিকে সগর্বে জানায় যে, হিন্দু দেবতারা তির ছুঁড়তে শিখেছিল আদিবাসীদের কাছ থেকে তখন তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না বিন্দুমাত্র ; কেননা তিরন্দাজিতে আদিবাসীদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মহাভারতসহ বিভিন্ন পুরাণে রক্ষিত রয়েছে বহুকাল ধরে।[১১]

৪.৩.৪

যৌথজীবনের অধিকারী আদিবাসী সমাজব্যবস্থায় পহান বা পুরোহিত হল গ্রামসমাজের প্রধান। গ্রামবাসীরা যে কোনো সমস্যা পহানের সঙ্গে আলোচনা করে মিটিয়ে নেয়। আবার কোথাও কোথাও পহান ও গ্রামপ্রধান আলাদা মানুষ হতে পারে। পহানের বংশধর বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী উত্তরাধিকারসূত্রে পহানের অধিকার লাভ করে। পূর্ববর্তী পহান সাধারণত পরবর্তী পহান নির্বাচিত করে। এ তথ্য আমাদের জানিয়ে দেয়, আদিবাসীদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র যথেষ্ট নিয়মতান্ত্রিক এবং কঠোরও বটে। আধুনিক যুগের আইন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন আদিবাসীরা নিজেদের বৃত্তে আবদ্ধ থাকে ; এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিকতা নয়। ঔপন্যাসিক এর মূলে সরকারের অনাগ্রহতা কিংবা আদিবাসীদের যথাযথ মূল্যায়নের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন। আমলাতন্ত্রের বিমুখিতায় আদিবাসীরা তাদের নাগরিক অধিকার

সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও জানতে পারে না। উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনাসূত্রে একাধিকবার এ প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। লেখক নিজস্ব বয়ানে গভীর তির্যকতায় বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন –

> অফিসার ও প্রজাবর্গের মধ্যে বাস্তব সম্পর্ক গড়ে ওঠা সরকারের, বিদেশি বা স্বদেশি সরকারের ইচ্ছে নয়। সম্পর্কটি সম্পূর্ণ অবাস্তবতার স্তরে থাকাই সরকারের পক্ষে শুভ। তাহলে অফিসারের চোখে মানুষগুলি থেকে যায় সাপ্লাই করা পরিসংখ্যান রূপ অঙ্কের হিসাব। মানুষের চোখে প্রশাসন থেকে যায় রাজার হাতি হিসেবে। যে হাতি তাদের কাজে লাগে না, অথচ যাকে তাদের পুষতে হয়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৪১)

স্থানীয় জোতদার, মহাজন কিংবা ধনী কৃষকদের জন্য প্রশাসন নিবেদিত প্রাণ ; তাদের চোখে ভূমিহীন সরল আদিবাসী-অন্ত্যজ শ্রেণির অস্তিত্ব নেই। বৃটিশদের প্রতি অসঙ্গত রকমের আনুগত্য প্রদর্শনকারী এবং 'রাজা' খেতাবধারী নরসিংগড়ের ভূস্বামী স্বাধীন ভারতবর্ষেও রাজাই থেকে যান ; পঞ্চাশের দশকে এসেও কোনো আইনের আওতায় পড়েন না তিনি। তাই তার তসিলদার প্রজা-শাসনের জন্য যখন তখন হাতি চাপিয়ে প্রজাদের ঘর ভাঙতে পারে। প্রজা মানে তার খাস জমিতে অবস্থানকারী মুণ্ডা-ওঁরাও-কুর্মি-দোসাদ প্রভৃতি আদিবাসী-অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা। তাদের দমনে রাখার হাতিয়ারও সেই একই – করজ-চক্রবৃদ্ধিসুদ-বেঠবেগার। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে, মানচিত্র পাল্টে যায় কিন্তু নিপীড়িত মানুষের শ্রেণিগত অবস্থান পাল্টায় না, শোষকদের চেহারাও অপরিবর্তিত থাকে। নতুন রাষ্ট্রের অপরিবর্তিত আইনের প্রশ্রয়ে শোষণের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। নরসিংগড়ের রাজা তার রাজত্বের সীমানা বাড়িয়ে নেয় জঙ্গল পর্যন্ত ; হয়ে ওঠে 'জঙ্গলের রাজা' ; চিতাবাঘ, বাঘ ইত্যাদি বন্যপশুর চামড়া বিদেশে রপ্তানির ব্যবসায় যুক্ত হয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে এবং বনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে, বিপন্ন করে তোলে অরণ্য-নির্ভর আদিবাসীদের জীবন। আদিবাসীদের খাদ্যের প্রধান উৎস বন। শিকারপ্রিয় গোষ্ঠী চিরকালই বন্য পশু – 'খরা-বরা-হরিণ-শজারু-তিত্তির-ঘুঘু' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ২৭) শিকার করে নিজেদের খাদ্যতালিকায় আমিষের যোগান দিয়েছে। বন-জঙ্গল ও বনের প্রাণীর প্রতি অসীম মমতায় তারা শিকারের কিছু নিয়ম স্থির করেছে ; অপ্রয়োজনে একটি প্রাণীও তারা শিকার করে না ; মাদী ও শিশু পশু হত্যা থেকে নিজেদের যথাসম্ভব বিরত রাখে। এ উপন্যাসে দেখা যায় চোট্টিকে তির ছোঁড়া শেখানোর সময় ধানী একটি মদ্দা হরিণ শিকার করে কেননা সেটি তাদের ধান খেয়ে যাচ্ছিল। কালের প্রবাহে চোট্টি তার নিজ জমির ধান পাহারা দেবার সময় সঙ্গী জিতাকে একটি মাদী হরিণ মারা থেকে বিরত রাখে। তার যুক্তি মাদী হরিণ বংশবৃদ্ধি করবে। সভ্য মানুষেরা বাণিজ্যের লালসে বিলাসিতার উপকরণের যোগান দিতে যখন পশু নিধন শুরু করে বন উজার হয় তখন। অথচ প্রশাসন এদের ক্ষেত্রে নির্বিকার। ঔপন্যাসিক বন্যপশুর চামড়া ব্যবসায়ী নরসিংগড়ের রাজা প্রসঙ্গে কঠোর ভাষা ব্যবহার করে বলেন –

জঙ্গল বিষয়ক আইন তাঁর বিষয়ে প্রযোজ্য নয়। কোনো আইনের আওতাতেই তিনি পড়েন না। কোম্পানির রাজপুত হাবিলদারের পত্তনি এই রাজবংশ। 'রাজা' খেতাবের উৎস অসঙ্গত রকম ব্রিটিশ আনুগত্য। কয়েক পুরুষ আগে তৎকালীন রাজা গুলি চালিয়ে জনাতিরিশ প্রজা মারেন এবং ঘোষণা করেন, আমি হচ্ছি সূর্যবংশীয়। কোনো আইনের এক্তিয়ারে পড়ি না।...

দারোগা বা থানা সূর্যবংশীয়র অত্যন্ত অনুগত। এমন কি, ট্রেন পর্যন্ত শের কা চাম্ ওঠাবার দিনে 'নো হল্‌টেজ' স্টেশনে দাঁড়ায়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১০৭)

সূর্যবংশীয়র প্রতি থানা বা দারোগার এ আনুগত্য অহেতুক বা অকারণ নয়, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কও বিদ্যমান। সাতটি বাঘের চামড়ার দাম একুশ হাজার টাকা এবং দারোগা তা থেকে অন্তত এক হাজার টাকা ভাগে পাবেন – এ তথ্যও উপন্যাসে পাওয়া যায়।

উপন্যাসের এক স্থানে চোট্টি তার স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে হতাশ প্রকাশ করে বলে যে, তাদের পরবর্তী বংশধরেরা তাদের পরিচিত পরিবেশ, নদী, পাহাড়, জঙ্গল কিছুই দেখবে না। কেননা সভ্যজগতের প্রয়োজন মেটাতে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে – সরকারি নিয়মের অধীন ঠিকাদারেরা আদিবাসীদের দিয়েই বনের মানচিত্র পাল্টাচ্ছে। আদিবাসীরা বেঁচে থাকার তাগিদে দিনমজুর হিসেবে নিজেদের আবাসভূমি, রক্ষয়িত্রী বনভূমি ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জঙ্গল হাসিল করেই একসময় চোট্টির পূর্বপুরুষেরা বসতি গড়েছিল, আবাদভূমি তৈরি করেছিল কিন্তু তা ব্যাপক ছিল না। গ্রাম গড়েছে জঙ্গলকে পাশে রেখে, চাষের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ততটুকুই হাসিল করেছে – একটুও বেশি নয় ; তাতে বনভূমি সমৃদ্ধ হয়েছে, ধ্বংস হয়নি।

৪.৩.৫

চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর উপন্যাসের স্থানিক পটভূমির আদি বাসিন্দা এবং বন কেটে চাষযোগ্য জমি গড়ার কারিগর আদিবাসীরা আজ নিজভূমে বাস্তুচ্যুত। দিকুদের কূটকৌশলে এবং নিজেদের সারল্যে তারা হারিয়েছে তাদের খুটকাট্টি গ্রাম এবং চাষযোগ্য জমির মালিকানা। অতীত তারা বিস্মৃত নয়, এ নিয়ে হাহাকার শোনা যায় চোট্টির বউয়ের কণ্ঠের অতীতচারিতায় –

দাদী পরদাদীর কাছে কাহিনি শুনছি, মুণ্ডাদের এত ছিল, তত ছিল। কিন্তুক ছিল ঘর – আবাদ-শিকারের লেগে বন। কুন্-অ দিন তারা গল্পকথায় বলে নাই মুণ্ডার কোঠাবাড়ি ছিল। আমরা তো সে সব দেখি নাই। দেখে হেলাম, মহাজনের থাকে কোঠা, মুণ্ডা থাকে পাতার ঘরে, মহাজনের ক্ষেত চষে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৮৫)

বস্তুত মহাশ্বেতা তাঁর সমগ্র আদিবাসী-বিষয়ক রচনায় যে দিকটির প্রতি কেন্দ্রীয় আলোকসম্পাত করেছেন তা হল আদিবাসীদের ভূমিহীনতা বা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে তাদের অবস্থান। এ বিষয়ে তিনি তাঁর একটি গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টত বলেছেন –

> To fully understand these stories, one must have a knowledge of agricultural economy and land-relations. (Mahasweta 2009 : vii)

অন্যত্র এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন –

> ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, স্বাধীনতার পর আমূল ভূমি সংস্কার হয় নি। মূলত একটি সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থাই রেখে দেওয়া হয়েছে। একটি সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের রীতিকেই লালন করে ও মদত দেয়। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ নারী বিরোধী, গরীব মানুষের বিরোধী, শ্রমজীবী মানুষের বিরোধী (গায়ত্রী ১৪১৮ : ৩৮২)।

এ বক্তব্য আদিবাসী বিষয়ক তাঁর সব রচনা সম্পর্কে প্রযোজ্য ; আলোচ্য উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। মহাজন তারকনাথ চোট্টিকে চাষের জন্য ফাল্‌না জমি লীজ দেয়। পাথরাকীর্ণ সে-বন্ধ্যা জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব নয় বলেই মহাজন এ উদারতাটুকু দেখাতে পেরেছে। আরও যে ক'জনকে সে জমি দিয়েছে সেগুলোর অবস্থাও অনুরূপ – পাথুরে জমি, বাঁজা জমি, শুকনো জমি, বহুদূরে পড়ে থাকা ডাঙা জমি, জঙ্গলের কিনারে জমি, এগুলোই সে আধাআধি ভাগে দেয়। আদিবাসীদের ফল্‌না অর্থাৎ উর্বর জমি সে দেবে না, কেননা তাতে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা আসবে। সেক্ষেত্রে তারা আর মহাজনের মুখাপেক্ষী থাকবে না এবং সেও ক্রীতদাসের মতো তাদের নিজ অধিকারে রাখতে পারবে না। ক্রীতদাস প্রথাকে সচল রাখতে মহাজন-মালিক শ্রেণির কূটকৌশলে পর্যুদস্ত মানুষেরা অবশ্য হাল ছাড়ে না। চোট্টি ও তার পরিবারের সকলের অমানুষিক পরিশ্রমে পতিত ফাল্‌না জমি আবাদী ফল্‌না জমিতে পরিণত হয় এবং মহাজন সকল মৌখিক চুক্তি অস্বীকার করে চোট্টিদের ফসলী জমি নিয়ে নেয় এবং পরিবর্তে অন্য কোথাও পতিত জমি দেয়ার প্রস্তাব করে। চোট্টিরা সঙ্গতকারণেই এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং মহাজনের লাঠিয়াল বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট্টির বড় ছেলে হরমু জেলে যায়। যথারীতি প্রশাসন আদিবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু পক্ষাবলম্বন করে মহাজনদের। স্বাধীন ভারতে আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়নে দপ্তর ও অফিসার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তা সত্যিকার অর্থে তাদের কোনো কাজে আসেনি। কেননা "আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন আধিকারিক উচ্ছিন্ন মুণ্ডাকে কুটিরশিল্পে মদত দিতে পারেন, হৃত জমি পুনরুদ্ধারে নয়"(মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১০৯)। এ এক আজব প্রহসন – যাদের উন্নয়নের জন্য সরকার দপ্তর তৈরি করেছে তাদের

সমস্যার মূলে দৃষ্টিপাত করতে তারা নারাজ। আদিবাসীদের ভালো করতে তারা আইন তৈরি করে কিন্তু সে-আইনের বাস্তবায়নে তাদের অনীহা।

আদিবাসীদের সব বিদ্রোহের মূলে ছিল তাদের হৃত জমির অধিকার ফিরে পাওয়া। সাঁওতাল বিদ্রোহ, বীরসার মুণ্ডা বিদ্রোহ প্রভৃতি যদিও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মূলে ছিল বহিরাগতদের হটিয়ে পূর্বপুরুষের হাসিল করা জমিতে নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। বীরসার উত্তরসূরি তিরের জাদুকর চোট্টি মন্ত্রপড়া তির দিয়ে কোনো প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নামে না, তবে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির সমন্বয়ে মুণ্ডাদের সামগ্রিক অস্তিত্বকে জমির বাঁধনে টিকিয়ে রাখতে চায়। তাই শ্রীপুরণচাঁদ বানিয়ার কাছ থেকে অত্যন্ত রুখা শুকা জমির বন্দোবস্ত নিয়ে মুণ্ডা জীবনে স্থিতির স্বপ্ন দেখে। ইটভাটার মালিক হরবংশের দৃষ্টিতে 'চোট্টিরা জমির লালসে মরে'(মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১৩৫)। সকলের দৃষ্টিতে এরকম অনুর্বর জমির বন্দোবস্ত নেয়া পাগলামি কিন্তু মুণ্ডারা কেবল জানে জমির অধিকার পাওয়া বা অর্থনৈতিক সুস্থিরতার মূল্য। চোট্টির ভাবনায় বিষয়টি এভাবে আসে –

> ফাল্না হোক, পাথুরে হোক, এক টুকরো জমি মানে নিজের স্রোতেভাসা অস্তিত্বকে নোঙর বাঁধা। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১৩৫)

চোট্টির এ স্বপ্নে স্বপ্ন মেলাতে মুণ্ডাদের মধ্যে সঞ্চয়ের ধুম পড়ে যায়। নিজেদের সামান্য উপার্জন থেকে খেয়ে না-খেয়ে তারা পয়সা জমাতে থাকে। তাদের এ আচরণ জমির প্রতি তথা নিজ অস্তিত্ব সমুন্নত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ। মালিকপক্ষ ব্যাপারটিকে সুনজরে দেখে না। মহাজন নিতে থাকে সকল ফাল্না জমি – চাষের জন্য নয়, মুণ্ডাদের জমির মালিক হতে বিরত রাখার জন্য। জোতদার তীরকনাথ এবং ঠিকাদার হরবংশ কেউ চায় না মুণ্ডারা জমির মালিক হোক। লক্ষণীয় যে তীরকনাথ সামন্তবাদের ও হরবংশ পুঁজিবাদের প্রতিভূ ; সামন্তবাদ বা পুঁজিবাদ কোনো সমাজই আদিবাসীদের ভূমির অধিকারকে সমর্থন করে না। তাদের মানসিকতাকে উন্মুক্ত করেছেন লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে –

> তীরকনাথ ও হরবংশ দুজনেই চোট্টির জমি নেওয়ার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকে। চোট্টিরা পাথুরে জমির মালিক হওয়াও ঠিক নয়। তাতে তাদের মানসিক গঠনসাম্য বদলে যেতে পারে। জমিতে স্বত্ববোধ জন্মাতে পারে। সেটি কাম্য নয়। ওদের চিরতরে নির্ভরসা, নিরালম্ব প্রেতের মতো শরণার্থী রাখা উচিত। ভূমি-জল-বায়ু সব কিছুই যাদের বাইরে রাখে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১৩৬)

তীরথনাথের তো মনে হয় চোট্টির জমি নেয়াটা রীতিমতো অধর্ম। তার মনের কথাটা সে চেপেও রাখে না, সরাসরি চোট্টিকে জানিয়ে দেয় – "জমি থাকে মালিক-মহাজনদের। মুণ্ডা-দুসাদ জমির মালিক হবে, ই পরমাত্মার ইচ্ছা নয়। ইচ্ছা থাকলে তারা জমি পেত।" (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১৪৩)

ধর্মকে হাতিয়ার করে নিপীড়নের চাকা সচল রাখার এ এক পুরনো প্রথা। সময় এগিয়ে যায় কিন্তু মালিকের সুবিধাজনক প্রথাগুলো ধর্মের মোড়কে অক্ষত থাকে।

৪.৩.৬

মুণ্ডাদের ধর্মমত অবশ্য স্বতন্ত্র। হরমদেও হল তাদের পূজ্য দেবতা। দেবতাদের নিয়ে নানা কাহিনি-উপকাহিনি প্রচলিত আছে তাদের সমাজে। লক্ষণীয় যে, তাদের পুরাণে প্রকৃতির ভূমিকা বেশি। যেমন, মাঝে আধ মাইল ফাঁক, দু'পাশে দু'পাহাড় – এটিকে চোট্টিরা দু'সতীন বলে অভিহিত করে। বাপ-দাদাদের কাছে শুনেছে তারা, ধরণী সৃজনের পরে অসুরদের বউয়েরা হরমদেওয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়েছিল। হরমদেও তাদের নীচে আছাড় মারে, তাতেই তারা সব ধরণী পাহাড়ে পরিণত হয়েছে।

জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ধর্ম ও সংস্কারকে মান্য করে চলে। জমিতে চাষ শুরুর পূর্বে জমিতে পূজো করে মুরগি বলি দিয়ে রক্ত ছিটিয়ে জমির মঙ্গল প্রার্থনা করে মুণ্ডারা। তবে জাতিভেদ নেই তাদের সমাজে – সকলে সমান মর্যাদার অধিকারী। এটি তাদের মধ্যে অদ্ভুত দৃঢ় একাত্মবোধ সৃষ্টি করেছে। চোট্টির বাবা বিসরাকে মহাজন বলায় ভীষণ অপমানিতবোধ করে সমগ্র গ্রামের মুণ্ডারা। 'মহাজন', 'সুদ' ইত্যাদি খুব ঘৃণ্য অনুষঙ্গ তাদের কাছে। এর প্রতিকার চেয়ে সমবেতভাবে তারা লালার কাজ বন্ধ করে দেয় এবং পহান সগর্বে উচ্চারণ করে তাদের একাত্মবোধের দৃঢ়তাকে –

> আমারদের মাঝে আমরা ছাড়া আমারদের আপন কেউ নাই। একজনের গায়ে লাগলে সবে ব্যথা পাই। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৪৩)

মুণ্ডাদের কেউ নিজেকে বিপদগ্রস্ত কিংবা একা ভাবলে অন্য মুণ্ডারা অপমানিত বোধ করে – কেননা আদিবাসীরা নিজেদের যৌথ জীবনের অধিকারী বলে মনে করে। এ বোধ কেবল নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য আদিম গোষ্ঠীকেও তারা আপন ভাবে। দুখিয়া মুণ্ডা নয়, ওঁরাও। সে যখন তার হতাশা প্রকাশ করে এই ভেবে যে, তার বাপ-ভাই কেউ নেই তার পেছনে দাঁড়াবার মতো, তার সঙ্গী সুখা ও বিখনার মনে হয় দুখিয়া তাদের গাল দিল। আজন্ম তারা জেনে এসেছে মুণ্ডা-ওঁরাওদের ঘরে একজনের পিছনে সকলে থাকে। তাই অতি বিপদেও তারা কেবল নিজের চিন্তা করে না – সকলের জন্য ভাবে। আকালের সময় মহাজন কেবল চোট্টি পরিবারকে ঋণ দিতে চাইলে তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রশ্ন তোলে পেট কেবল তাদের একার ? অন্য মুণ্ডাদের পেট নেই ? বন্য বরার কবল থেকে দারোগাকে বাঁচালে তার স্ত্রী পূজার অনেক মিষ্টি পাঠায় চোট্টি ও তার ছেলেমেয়ের জন্য। চোট্টি সে মিষ্টি

সকলকে দিয়ে তবে খায়। চোট্টির হাতে হত বরার মাংস কেবল মুণ্ডা পাড়ায় নয়, গঞ্জু, দুসাদ, ধোবি টোলিতে, কুলি লাইনে বিলি হয়। এমন অনেক অনেক ঘটনার উল্লেখে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আদিবাসীদের গভীর একাত্মবোধের নজির ছড়িয়ে রয়েছে।

আদিবাসী যৌথ-জীবন আবর্তিত হয় তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে। নিপীড়ন-শোষণে জর্জরিত বিষাদের জীবন তারা রাঙিয়ে তোলে বিভিন্ন পরব, মেলা বা উৎসবের রঙে। অবশ্য তাদের সব উৎসবের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে। 'করম' উৎসবে মেলা হয়, 'সোহরাই' পরবে ছাতু-গুড়-দই মেখে খাওয়া হয়, দিওয়ালির দিনে সকলে কুরমি পাহাড়ের মাথায় নানা আচার পালন করে, সেখানে ভূত তাড়ায় দেওরা-পহান, তারপর সূর্যদেবতাকে ডেকে শুয়োর বেঁধে ফেলে দেয় পাহাড়ের শীর্ষ থেকে। দিওয়ালির পরদিন প্রথম ফলনের ফল ও শস্য সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। বিজয়া দশমীর দিন হয় চোট্টি মেলা। সাত দিন ধরে চলে সে-মেলা। নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা গৃহস্থালি উপকরণ বিক্রি হয় এ মেলায়। সব গ্রামের মুণ্ডারা একত্রিত হয়ে নাচ-গান উৎসবে মেতে উঠে। তারপর হয় তির খেলা। সে-খেলায় অংশগ্রহণের অধিকার কেবল আদিবাসীদের। প্রতিযোগিতা আছে এ খেলায়, তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুশ্রিতা নেই। যারা জেতে এবং যারা হারে, তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় না দেখে দারোগা প্রতিবারই বিস্মিত হন। যেই জিতুক পুরস্কারের শুয়োর মেরে সবাই একসঙ্গে ভাত খায়। হিন্দুদের দোলের দিন হয় আদিবাসীদের শিকার উৎসব। শিকারের পর মদ খেয়ে গান ও নাচ হয়। উৎসবে সময় মুণ্ডা ও মুণ্ডানী – উভয়ে বিশেষভাবে সাজ-সজ্জা করে। মুণ্ডানীরা কানে দেয় সাদা সোলা, মাথায় পরে ফুল, চুলে দেয় তেল, আর পরে সাদা কাপড়। পুঁতির মালা আর পিতলের বালা তাদের সজ্জার বিশেষ উপকরণ, কাঠের বালাও তারা ব্যবহার করে। পুরুষেরা পরে হলুদ ধুতি। কুসুম ফুলের হলুদ রঙে রাঙিয়ে ধুতি পরে তারা, চুলে দেয় কাঠের কাঁকই। বৃদ্ধদের সাজপোশাকে অবশ্য ভিন্নতা দেখা যায়। উপন্যাসের শেষপর্বে বৃদ্ধ চোট্টির সজ্জার বর্ণনা দেয়া হয় এভাবে – "সাদা চুল পেছনে উলটে ঘাড়ের কাছে পেতলের আংটায় ঢোকানো। কানে শোলা গোঁজা, পরনে ধবধবে সাদা ছোটো ধুতি।" (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ২৪৩)

লক্ষণীয় যে আদিবাসীদের উৎসবে হিন্দু ধর্মের প্রভাব রয়েছে। তাদের চোট্টি মেলা বসে বিজয়া দশমীর দিনে, শিকার-উৎসব হোলির দিনে, অন্যান্য উৎসব যেমন – 'করম', 'সোহরাই' বা 'হোলি' আধা হিন্দু-উৎসব। বিষয়টি খুব স্বাভাবিক ও সহজাত, কেননা আদিবাসীরা পৃথক কোনো আদিবাসী গ্রামে বাস করে না। তাদের গ্রাম পাঁচমিশালি গ্রাম – সেখানে মুণ্ডা, ওঁরাও, গঞ্জু, দুসাদ, ধোবি অর্থাৎ আদিবাসী ও অন্ত্যজ হিন্দুরা একসঙ্গে বাস করে। তাই হিন্দুদের পরবগুলোতে তারাও নিজেদের মতো উৎসব করে। আবার তাদের নিজস্ব উৎসব 'শিকার পরব'-এ তাদের সঙ্গে অন্যান্য জাতিও অংশ নেয়। এ সম্পর্কে লেখক

বলেছেন, "উৎসবগুলিও এইভাবে যৌথ উৎসব হয়ে উঠেছে। রেলের কুলিরাও সোহরাই, করম, হোলি উৎসবে আনন্দের সঙ্গে যোগ দেয়।" (গায়ত্রী ১৪১৮ : ৩৮১)

সূর্য উপাসনার বিষয়টিও লক্ষণীয় – প্রকৃতির কোলে লালিত সন্তানেরা প্রকৃতির পূজা করবে সেটি খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং দেখা যায় আদিবাসীরা এক মিশ্র ধর্ম-সংস্কৃতির অধিকারী। কালের প্রবাহে তারা নিজস্বতা বজায় রেখেছে এবং সেই সঙ্গে অন্য ধর্ম-জাতির সংস্কৃতিকে আত্মস্থ ও নিজস্বতার প্রলেপ দিয়ে গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে সহাবস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।

৪.৩.৭

উৎসবের একটি আবশ্যিক অঙ্গ গান। বিলীয়মান স্মৃতি ও ইতিহাসকে ধারণ করার আবশ্যিক আধারও গান। চোট্টির ভাষায় – "বড় দরকারে গান বাঁধে ইয়ারা। সকলই তো জলের মত হাতের ফাঁক দিয়া পালায়। গানটো বাঁধি ইয়ারা ভরসা খুঁজে।" (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১৩৪)

মুণ্ডাদের ভাষায় লিপি নেই। তাই স্মরণীয় ঘটনাগুলোকে তারা গল্প করে, কিংবদন্তি করে, গান করে ধরে রাখে তাদের স্মৃতিতে। গানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে। যে কোনো ঘটনাকেই তারা গানের সুর ও ছন্দে আবদ্ধ করে নিজেদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। আনন্দ-বিষাদ-উৎসব সবক্ষেত্রে তারা নিজেদের আবেগ-উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করতে গানের শরণ নেয়। ধানী মুণ্ডার মৃত্যুতে লিপিহীন ভাষার অধিকারী মুণ্ডারা বীরসার কাহিনির সঙ্গে মিশিয়ে গান বেঁধে ধানীকে চিরকালীন করে দেয়। দীর্ঘ এই গানটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল –

> ধানী, তোমাকে ধরতি-আবা ডাকল
> তার দেহের মরণের দিনে সৈল্‌রাকাবে
> সে তার শিষ্যদের খুঁজতে আসে।
> সে পাহাড় কাঁপিয়ে হেঁকে বলে,
> কে মোরে মনে রেখেছে হে, কে গিয়েছে ভুলে
> কে আছে উলগুলান্‌ পাগলা মানুষ !
> তোমাকে ধরতি-আবা ডাকল।।...

এইভাবে, গল্প ও গান হয়ে ধানী চোট্টি মুণ্ডার কাছে ফিরে আসে। যতদিন আসে নি, চোট্টি নদীর দিকে চেয়ে পাথর হয়ে বসে থাকত। যখন ধানীকে গানে ও গল্পে ফিরে পেল, তখন সে পাথর থেকে মানুষ হল আবার। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৩৫)

একটা মানুষ, তার কর্ম, তার স্মৃতি সব জীবন্ত হয়েছে এ গানের মধ্য দিয়ে। সেই সঙ্গে বীরসার সংগ্রামের দীপ্তিকে ধারণ করে মুণ্ডারা হয়ে উঠেছে ঐতিহ্য-গর্বে গরবী। আলোচ্য উপন্যাসে বেশ কিছু গান তুলে দেয়া হয়েছে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে। মহাশ্বেতা দেবী দীর্ঘদিন আদিবাসী অঞ্চলে ঘুরেছেন, তাদের সঙ্গে দিনযাপন করেছেন, পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাদের সুখদুঃখের ভাগীদার হয়েছেন, আগ্রহ নিয়ে সংগ্রহ করেছেন তাদের মৌখিক ইতিহাসকে – যা লিপিবদ্ধ আছে গল্প বা গান হিসেবে। গানগুলো আদিবাসী ভাষায় নয়, বোধগম্য বাংলাতে রূপান্তরিত ; সে-কারণে কিছুটা ছন্দহীনতা লক্ষিত হয়। এ গানগুলো অসাধারণ সাহিত্যমূল্যের অধিকারী তা হয়তো বলা যাবে না কিন্তু নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক থেকে এগুলো অমূল্য।

আদিবাসী সমাজে গানের রচয়িতাদের এক বড় অংশ নারী এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তারা তাৎক্ষণিক গান রচনা করে। চোট্টি যখন এক সাহেবকে নিয়ে গ্রামে এল, মেয়েরা মুখে মুখে গান বানিয়ে গাইল –

ঘরে গোরমেন এসেছে
গোরমেন ছবি বানিয়েছে
গোরমেন বন্দুক লয়ে আসেনি
মোরাদেরকে মারেনি
গোরমেন পরসাদ খেয়েছে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৪৮)

আদিবাসীদের কাছে সাহেব মানে গোরমেন্ অর্থাৎ সরকার। এ গানের মধ্যে বর্তমান ঘটনার বর্ণনা আছে, কাহিনিবদ্ধ করে ঘটনাটিকে সংরক্ষণ করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে সরকারের নিপীড়নের কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রবহমান কথকতায়যুক্ত এই জাতীয় গানগুলো কাহিনিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে।

কিছু গান আছে যার প্রচলন ও আবেদন চিরকালীন। যেমন – শিকার-উৎসবের গান। কুরমি গ্রামের গোমস্তা শাস্তি-স্বরূপ তাদের শিকার-উৎসবের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে সমগ্র গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে তোমারু মিশনে চলে যায়। পেছনে থেকে যায় একমাত্র বৃদ্ধ গ্রাম-পহান ; একা সে উদযাপন করতে চায় আদিবাসী জীবনের নিজস্ব উৎসব শিকার-পরব। উৎসবের দিন ঘরের সামনে শাল গাছের নীচে বসে সে ধরে শিকার পরবের গান –

পুব দিকে ছিল বাঘ, আহা মরদ বাঘ –
বল্লমে বিঁধলাম তারে –
শিকার পরবের দিনে গিয়াছিলাম বনে
তুমি ছিলে ঘরে গো
দরজা ধরে চেয়েছিলে পশ্চিমের পানে
আমি তো তখন পুব দিকে
শিকার পরবের দিনে গিয়াছিলাম বনে ॥ (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৭৮)

শীর্ণবৃদ্ধের কণ্ঠের এই ঐতিহ্যবাহী গান ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল কোড়া মেরে নিকেশ করার মতলবে আগত গোমস্তা ও পেয়াদাদের। এ গান তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আদিবাসীদের শিকারে দক্ষতার কথা। আপাত নিরীহ আদিবাসীরা অসীম সাহসে মোকাবিলা করে বনের বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর, বল্লম হাতে তারা যে বনের রাজা সে-তথ্যটি মনে করিয়ে দেয় এবং দারুণ ভয়ে গোমস্তা-নায়েবেরা পালাতে থাকে। এখানে গান তাদের শৌর্য-বীর্য এবং গৌরবের ধ্বজা বহন করে। এ সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন তাৎপর্যপূর্ণ –

> আমি যা করতে পারি সেটি অবশ্যই গানের মধ্যে দিয়ে গাঁথা হতে থাকে, এই গান চলতেই থাকে, তারপর আরেকটি পর্ব আসে, আরেকটি গান, এই গানগুলি সর্বত্র গাওয়া হয় – এইভাবে গানগুলি বেঁচে থাকে, এটি একটি প্রতিরোধও। এইভাবে ওরা সবকিছু জীবন্ত করে তোলে (গায়ত্রী ১৪১৮ : ৩৭৯)।

উপন্যাসের অন্য গান সব চোট্টিকে ঘিরে। চোট্টির বিজয়-গাঁথা, দিকু-মহাজনের তাকে সমীহ করে চলা, বিভিন্ন প্রতিকূলতায় চোট্টির জীবনের সমস্ত কিছু ‘গল্পকথা’ হয়ে গেছে। লেখক সচেতনভাবে মহাকাব্যিক বিশাল ক্যানভাসে স্থাপন করে চোট্টিকে নায়ক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে –

> ধানীর সঙ্গে ওর যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার ফলে চোট্টিও মহাকাব্যের অংশ হয়, এবং ফলে তার অন্তিম পরিণাম হয় মহাকাব্যের নায়কদের মতো বিশাল ও সম্ভাবনাময়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ২৫)

৪.৩.৮

মহাকাব্য বীরযুগের কাব্য এবং সে-বীরত্ব ব্যক্তি-আশ্রয়ী। মহাশ্বেতা-মানসে বীরসন্ধানের প্রচেষ্টা দীর্ঘকালের। তিনি নিজেই বলেছেন, “আমি সর্বদা বীর খুঁজি। বীর পূজার রোমান্টিকতা আমার মধ্যে দীর্ঘকাল ছিল। আর এই ‘বীর’ খুঁজি সাধারণ মানুষের মধ্যে।”(উদ্ধৃত, রাহুল ১৪১৮ : ২৩৩) লেখকের এ উক্তির মধ্যে চোট্টি চরিত্র গঠনের সূত্র নিহিত রয়েছে। চোট্টিকে ঘিরে নানা গল্প-গান, কিংবদন্তি গড়ে ওঠে;

অথচ চোট্টি একজন সাধারণ মানুষ, বীরসার মতো কোনও বিপ্লবী নায়ক নয়। নিজের কাছে সে কেবল সৎ থাকতে চেয়েছে। অন্য মুণ্ডাদের মতো কখনও মরিয়া হয়ে কোন কাজ করেনি, কাউকে হত্যা করেনি, ধর্মান্তরিত হয়নি, কোনও বৃহত্তর স্বার্থে প্রাণ বিসর্জন দেয়নি। অথচ মুণ্ডা জীবনের সব ভালো, সব কৃতিত্ব তার উপর বর্তায়। মুণ্ডারা তাকে দেবতা, ত্রাণকর্তা জ্ঞান করে আর দিকুদের কাছে সে ত্রাস বলে বিবেচিত হয়। এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য-মান্য হয়ে উঠে সে অল্প বয়সেই। চোট্টি নিজে ভালো করে জানে যে তির চালনায় তার দক্ষতা নিরন্তর অভ্যাসের ফল – জাদু তিরের অলৌকিকতায় ঋদ্ধ সে নয় কিন্তু তা প্রতিষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য। বীরপূজা-প্রিয় এ জনজাতি চোট্টির বীরত্বের ছায়ায় আশ্বাস-ভরসা পেতে চায় – তাদের এ স্বস্তিটুকু কেড়ে নিতে চায় না বলে চোট্টি নিজেও একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করে ধানী প্রদত্ত তিরটি জাদুর। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের মতো চোট্টির তির হয়ে ওঠে কিংবদন্তি, যে সবসময় লক্ষ্যভেদে সক্ষম এবং মুণ্ডাদের কাছে ন্যায়ের প্রতীক, আত্মরক্ষার অমোঘ ও চূড়ান্ত অস্ত্র। উপন্যাসের শেষাংশে এ জাদুতিরটি চোট্টি ব্যবহার করে ‘নিজের কাছ নিজে সাচাই থাকিবার লাগি।’ হত্যা না করেও হত্যার দায়ভার গ্রহণ করে সে সমগ্র গোষ্ঠীকে বাঁচায়। অবশেষে নিরস্ত্র হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে এবং “দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে চিরকালের সঙ্গে মিলেমিশে হয়ে যায় নদী, কিংবদন্তি, অবিনশ্বর। একমাত্র মানুষই যা হতে পারে। সকল আদিবাসী আন্দোলনকে নিয়ে আসে বর্তমানে, এখন আদিবাসী ও তফশিলিযুক্ত আন্দোলনে” (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ২৪৪)। আর তাকে বাঁচাতে উঠে আসে হাজার হাজার মুণ্ডার হাত, স্বাধীন ভূখণ্ডের উপনিবেশকারী দিকুদের প্রতিস্পর্ধী বয়ান হয়ে থাকে কিংবদন্তি ঘেরা তার জীবন, আর সেই কিংবদন্তি ধারণ করে থাকে তাদের গান আর গল্পকথা।

৪.৩.৯

জীবনের মতো মৃত্যুকেও মুণ্ডারা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে। সকল ধর্মে, সকল সমাজে যা পাপ, মুণ্ডা সমাজেও আত্মহনন মহাপাপ বলে অভিহিত। তারা বিশ্বাস করে আত্মহননকারীর আত্মা বা রোঁয়া কখনও শান্তি পায় না। স্বাভাবিক মৃত্যুতে মৃতদেহ স্নান করিয়ে ও নববস্ত্র পরিয়ে নতুন খাটুলিতে করে মুণ্ডারা শ্মশানে যায়। আত্মা বা রোঁয়ার সদগতির জন্য চাল-পয়সা নতুন গামছা সঙ্গে দিয়ে পহানের সাহায্যে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। সমাধিটা বসে গেলে বা নিচু হলে কিছুদিন পর তারা সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শোঁসান-বুরু স্থাপন করে। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপিত হয় শোঁসান-বুরু। আদিবাসীদের সমাধিক্ষেত্র সাধারণত খুব সুন্দর হয় ; ছায়া-ঘেরা, শান্ত, সুনিবিড় ; মৃত স্বজনের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পরিচয় প্রকাশ পায় তাতে।

ধানীর মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে মুণ্ডা জীবনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হয় –"স্বগৃহে মরতে ভালোবাসে মুণ্ডারা" (মহাশ্বেতা ২০০৩ / ৯: ৩৩)। ধানী নিজ মৃত্যুর আসন্নতায় তার সংগ্রামভূমি সৈলরাকাবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। অভীষ্ট মৃত্যুস্থান অভিমুখে এ যাত্রা হাতিদের শ্মশান-যাত্রাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, হাতি মুণ্ডাদের টোটেম ; যদিও এ উপন্যাসে তা উল্লেখ করা হয়নি। টোটেম প্রাণীর বৈশিষ্ট্যাবলি সাধারণত আদিবাসীরা নিজেদের চরিত্র বা জীবনে ধারণ করে থাকে। যেহেতু টোটেম জাতির লোকদের প্রায়ই বিশ্বাস করতে দেখা যায় যে তারা এবং টোটেম পশু একই বংশোদ্ভূত। (ফ্রয়েড ১৯৯৩ : ৮৫)

মুণ্ডারা স্বভাবত ঐতিহ্যপ্রিয়। তাদের এ অতীতমুখিতা বা ঐতিহ্যপ্রিয়তা কেবল নস্টালজিক নয়, বাস্তবক্ষেত্রে তা তাদের বিপদ থেকে উত্তরণের পাথেয় হয়েও থাকে। ভীষণ খরায় চোট্টিরা মহাজন বা অন্যদের মুখাপেক্ষী না থেকে পূর্বপুরুষদের দেখানো পথ অনুসরণ করে। সকল মুণ্ডা ও তফশিলি গোষ্ঠীভুক্তরা একত্রে শুষ্ক নদীর বুকে গভীর গর্ত খুঁড়ে সঞ্চিত জল তুলে ব্যবহার করে। এভাবে ঐতিহ্য-অনুসারী আদিবাসীরা একাত্মতার জোরে খরার মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করে। মালিকপক্ষ বরাবর তাদের একতাকে ভয় পায় ; বিভিন্ন সুযোগে তাদের মধ্যে বিভেদ আনতে চায় – যদিও প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়।

অতীতমুখিতা আদিবাসী জীবনকে কিছু সংস্কারের গণ্ডিতেও আবদ্ধ করে। সৎ আদিবাসীদের আসামীতে পরিণত হওয়া, জেলে যাওয়া রীতিমতো অকল্পনীয় ব্যাপার। তেমনটা ঘটলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাদের।

মুণ্ডারা মিছে কথা বলে না, পারতপক্ষে অসদাচরণ করে না এবং গভীর এক আত্মসম্মানবোধ ধারণ করে। অতীতে জমিদার-নায়েবের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক ছিল। হাটে দ্রব্যাদি বিক্রয় করতে এলে তারা যথাসাধ্য হাটতোলা দিত। বিপরীতে আদিবাসীদের উৎসবের দিনে জমিদার কাছারি থেকে পহানের কাছে সিধা যেত, একটি খাসি ও চাল। এমন পারস্পরিক সম্পর্ক পাল্টে যখন কেবল নিপীড়নের সূচনা হয়, আদিবাসীরা তার প্রতিবাদ করেছে এবং তাতে কাজ না হলে সবাই মিলে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। মহাজনের ক্রীতদাস হয়ে থাকলেও তাদের চরিত্র নিয়ে কটূক্তি করলে রীতিমতো বিদ্রোহ করে তারা। প্রবল বিরোধিতার মুখে মহাজনকে বাধ্য করে তার কথা ফিরিয়ে নিতে। আবার চোট্টির বাবাকে থানায় ধরে নিয়ে দারোগা তাকে ছেড়ে দেবার বদলে পাঁচ টাকা গ্রাম-জরিমানা করলে চোট্টির মন্ত্রপূত তিরের ভয়ে ভীত লালা ও থানার সেপাই উভয়ে জরিমানার পাঁচ টাকা দিয়ে যায়। সে-সময়ে টাকায় একমণ চাল পাওয়া যেত, সুতরাং দশ টাকা তখন অনেক টাকা। কিন্তু চোট্টিরা সে-টাকা রাখেনি – পরদিনই যার টাকা তাকে ফেরত দিয়েছিল। নিরন্ন আদিবাসীদের জন্য এ লোভ অতিক্রম করা সহজ কথা নয়। তবে সে দুরূহ কাজটি সম্ভব হয়েছে তাদের অনন্যসাধারণ আত্মসম্মানবোধের কারণে।

৪.৩.১০

চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর উপন্যাসটি মূলত রাজনৈতিক। ১৯০০ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক তাপ-উত্তাপের পটভূমিতে চোট্টি তথা আদিবাসী জীবনের রূপ-রূপান্তরের রেখাচিত্র এঁকেছেন মহাশ্বেতা। সময়ের প্রবাহে আদিবাসীরা ধীরে ধীরে নিজভূমে হয়ে পড়ে পরবাসী। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তাদের মিল খুঁজে পেয়েছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। ফ্রানজ্ ফেনো তাঁর *The Wretched of the Earth* গ্রন্থে একই পরিস্থিতির শিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জীবন তুলে ধরেছেন কঠোরভাবে। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি আদিবাসী জীবনে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত করেনি। বরং স্বাধীন ভারতে মুণ্ডা জীবনে ঢুকে পড়ে দালাল, কন্ট্রাক্টর, রাজনীতিক, লুম্পেন, খুনি প্রভৃতি সমাজের দুষ্ট ক্ষতসমূহ এবং আদিবাসীদের সরলতার সুযোগ নেয় পুরোমাত্রায়। এমার্জেন্সি ও উত্তর এমার্জেন্সিকালীন উত্তুঙ্গ পরিস্থিতিতে সমগ্র ভারতের মতো আদিবাসীরাও রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়। 'রক্তে চাষিবাসি' মুণ্ডারা এ সময়ে এসে ক্ষেতমজুর থেকে দিনমজুরে পরিণত হয়। লেখকের ভাষায় –

> এমনি করেই চোট্টি গ্রামের মুণ্ডারা ও নিম্ন তফশিলি জাতের লোকরা স্বাধীন ভারতের জাতীয় আর্থনীতিক প্যাটার্নে প্রবেশ করে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১৩০)

কাঠকাটা, ইটের ভাটায় ইট তৈরি, কয়লার খনিতে কয়লাকাটা – নতুন পেশা তাদের চাষী পরিচয় পাল্টে দেয় কিন্তু জীবনযাত্রার মানে কোনো পরিবর্তন আনে না। তবে নতুন যুগ নতুন ভাব-ভাবনায় আপ্লুত করে তাদের। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে তারা লেখাপড়া শিখতে চায়। সরকারি স্কুলে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের ছেলেমেয়েদের পড়তে বাধা দেয়া হয় ; আদিবাসীরা সেখানে আরও বেশি অনাহূত। তাই তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করতে চায়। অসুখ-বিসুখে পহানের ঝাড়-ফুঁকের চেয়ে হাসপাতালের উপর নির্ভর করা শুরু করে। এমনকি ভ্রাম্যমাণ সিনেমার কল্যাণে চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করে। পরিবর্তনের জোয়ারে আদিবাসী জীবনের স্বাতন্ত্র্য পুরোপুরি অক্ষত থাকে না, তবে লোপও যে পায় না, তার মূলে কাজ করে তাদের সচেতনতা। চোট্টির ভাবনায় বিষয়টি এভাবে ধরা পড়ে –

> সেদিন আসছে। নিজস্বতা নিয়ে আর বাঁচতে পারবে না মুণ্ডারা। ছগনদের মতো যারা ব্রাত্য দেশের সকল উন্নতিতে, তাদের সঙ্গে এক হয়ে করতে হবে খেতমজুরি ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীর কুলি কাজ। তখন গায়ে থাকবে জামা, হয়তো বা পায়ে জুতো। তখন 'মুণ্ডা' পরিচয় থাকবে শুধু উৎসবে – সামাজিক ব্যবহারে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১০৬)

আগত দিনকে প্রতিহত করার ক্ষমতা চোট্টির নেই। তবে নিজস্বতা বিসর্জন দিতে রাজি নয় সে। আর তাই নিজ সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সে তির ছোঁড়া শেখাতে চায় তরুণদের। সে ভাল করেই জানে তির আজ আর হাতিয়ার নয়, খেলনায় পরিণত হয়েছে। তবু তিরের রয়েছে বিদ্রোহের, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ক্ষমতা এবং প্রয়োজনে যাতে তা ব্যবহার করা যায়, সে-কারণেই তিরন্দাজির অভ্যাস গড়ে তোলায় গুরুত্ব দেয় সে। এভাবে বীরসার সংগ্রামের নির্যাসটুকু চোট্টি ও তার তিরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মূল্যায়ন তাৎপর্যপূর্ণ –

> বিরসার মৃত্যুতে বিরসার বিদ্রোহ শেষ হয় না। তাই ধানী চরিত্রটির মাধ্যমে আমি বলতে চেয়েছি যে একটি যাদু-তীর আছে, সংকীর্ণ অর্থে যাদু নয়, যে তীরটি ধানী মুণ্ডা কাউকে দিয়ে যেতে চায়। এই তীরটি সেই লোকটির কাছে একটি প্রতীক, যে ধারাবাহিককে বহন করে নিয়ে যাবে। চোট্টি তারই প্রতীক। (গায়ত্রী ১৪১৮ : ৩৭৯)

প্রকৃতঅর্থে চোট্টির মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা আদিবাসী জীবনকে প্রতীকায়িত করেছেন। চোট্টি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র বা বিদ্রোহের নায়ক নয়। *অরণ্যের অধিকার* প্রকাশের পর আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁর যে ব্যাপক যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং সাংবাদিকতার সূত্রে আদিবাসীদের অভাব-অভিযোগ বিষয়ে প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে চোট্টির মধ্য দিয়ে একটি জনজীবনের আখ্যান রচনা করেছেন তিনি। ঔপনিবেশিক মানসিকতার আবহ বিচ্যুত হয়ে কেন্দ্র-প্রান্তের ছক উল্টে দিয়ে তিনি এমন এক শ্রেণির জীবনকে কেন্দ্র করেছেন – সমগ্র অর্থে যারা উপনিবেশ পরবর্তী রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামোর প্রান্তে অবস্থান করে। দীর্ঘদিনের লিখিত ইতিহাসে যাদের স্থান নেই, নিজেদের ইতিহাস লেখার জন্য যাদের লিপি নেই – তাদের জীবনাতিহাসকে পরম মমতায় মহাশ্বেতা সাহিত্যের আকরে অমরতা দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এদের ‘সভ্যতার পিলসুজ’[১২] বলে অভিহিত করেছেন ; মহাশ্বেতা তাদের সূর্যপ্রতিম করে তুলেছেন।

চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর উপন্যাসের ভূমিকায় শঙ্করলাল ভট্টাচার্য আলোচ্য উপন্যাসকে গাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেজের বিখ্যাত উপন্যাস *One Hundred Years of Solitude* -এর সধর্মী, সন্নিভ বলে মনে করেছেন। উভয় উপন্যাসই প্রতিকূল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক মানুষের জীবনকে উপজীব্য করেছে। বিলীয়মান স্মৃতি ও ইতিহাসের সমস্যার পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষের সংগ্রামী অবস্থান রয়েছে উভয় উপন্যাসে ; আরও রয়েছে জাদুবাস্তবতা, লোকাচার, হিংস্রতা, করাল রাজনীতি, রক্তপাত ও মৃত্যুর উৎসব। মার্কেজ তাঁর এ উপন্যাস রচনার পটভূমি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেছেন – “We also suffer from the plague of loss of memory." (উদ্ধৃত, মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ১২)

মহাশ্বেতাও তাঁর এ উপন্যাস রচনার পটভূমি সম্পর্কে একই কথা বলেছেন–

> আমাকে লিখতে হবে, কারণ এই সব জিনিস হারিয়ে যাবে। ... যেমন করেই হোক যে সময়টাকে আমি দেখেছি তাকে লিপিবদ্ধ করে যেতে হবে, কেননা সেই সময়টা চলে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে। (গায়ত্রী ১৪১৮ : ৩৮০)

বিলীয়মান সময়কে ধারণ করা হয়েছে আদিবাসী জীবনের অনুষঙ্গে। আদিবাসী জীবনের শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন তাদের সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তি, গল্পকথা ও গানের শৈল্পিক ব্যবহারে। উপন্যাসের নির্মাণে মুক্ত সমাপ্তি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ । এ সম্পর্কে গায়ত্রীর মত –

> ... the novel has an open end, a thousand hands raised but the conclusion forever suspended.(Mahasweta 2003 : x)

মহাশ্বেতা অবশ্য এ উপন্যাসের সূচনা ও কেন্দ্রেও মুক্তি আছে বলে মন্তব্য করেছেন[১৩]। তাই উপন্যাসটি চোট্টি নদীর মতোই স্রোতোময় প্রবহমান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অপারেশন ? বসাই টুডু

৪.৪.১

অগ্নিগর্ভ(১৯৭৮) গ্রন্থে চারটি রচনা সন্নিবেশিত : *অপারেশন ? বসাই টুডু*,[১৪] 'দ্রৌপদী', 'জল' এবং 'এম. ডব্লু. বনাম লখিন্দ'। চারটি রচনাই লেখকের রাজনৈতিক চিন্তা-প্রসূত। এ গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় লেখক পটভূমি হিসেবে ভারতের কৃষক-আন্দোলন এবং নকশালবাড়ি অঞ্চলে সংঘটিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেছেন এবং সেই সঙ্গে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে লেখকদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও তাঁর মূল্যায়ন তীর্যকতায় ব্যক্ত করেছেন –

> বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকার বিবেকহীন বাস্তব-বিমুখিতার সাধনা চলেছে। লেখকরা দেওয়ালের লেখা দেখেও দেখেছেন না। ফলে, সৎ পাঠকের মনে তাঁদেরও বিসর্জন ঘটেছে। বহু সমস্যা, বহু অবিচার, বহু জাতি, বহু লোকাচার সংবলিত দেশের লেখকরা লেখার উপাদান দেশ ও মানুষ থেকে পান না, এর চেয়ে বিস্ময়কর কী হতে পারে ? মানুষের প্রতি এ ধরনের চূড়ান্ত উন্নাসিকতা সম্ভবত ভারতবর্ষের মতো আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, বৈদেশিক শোষণে অভ্যস্ত দেশের পক্ষেই সম্ভব।...ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষিতের সপক্ষে, অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩২৫)

মহাশ্বেতা বলেছেন যে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁর নেই। তাঁর ভাষায় –

> আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক। শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকায়। জীবন অঙ্ক নয় এবং রাজনীতির জন্য মানুষ নয়, মানুষের স্বাধিকারে বাঁচার দাবিকে সার্থক করাই সকল রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমার বিশ্বাস। আমি বর্তমান সমাজব্যবস্থার বদলে আকাঙ্ক্ষিত, নিছক দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা। দক্ষিণে-বামে সকল দলই সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমার জীবনকালে এ বিশ্বাস বদলাবার কারণ ঘটবে বলে আশা নেই, তাই সাধ্যমতো মানুষের কথাই লিখে গেলাম, নিজের মুখোমুখি হতে যেন লজ্জা না পাই সে জন্য। কেননা লেখক জীবনকালেই শেষ বিচারে উপনীত হন এবং উত্তর দেবার দায় থেকে যায়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩২৫)

*অগ্নিগর্ভে*র একটি উপন্যাস ও তিনটি গল্প লেখকের এই দায়বোধের স্ফুলিঙ্গকে ধারণ করেছে। এ গ্রন্থে ইতিহাস ও শিল্পকে একাকার করে মহাশ্বেতা সৃষ্টি করেছেন বসাই টুডু, দ্রৌপদী, মঘাই ডোম প্রভৃতি আদিবাসী চরিত্র।

৪.৪.২

অপারেশন ? বসাই টুডু উপন্যাস মূলত খেতমজুর আন্দোলনের সমস্যা ও সংগ্রামের তথ্যচিত্র। বসাই টুডু, এক আজন্ম সংগ্রামী সাঁওতাল ; দীর্ঘদিন কম্যুনিস্ট কিষাণসভার হয়ে কাজ করে সে পার্টি থেকে সরে আসে, পার্টির দুর্বলতা ও ভোট সর্বস্বতাকে ছেড়ে গড়ে তোলে নিজস্ব সংগ্রাম – খেতমজুরদের সংগ্রাম। তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা দিয়ে এ উপন্যাসের সূচনা এবং তার এককালের সহকর্মী কালী সাঁতরার স্মৃতিচারণায় এ উপন্যাসের শরীর গড়ে ওঠেছে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ এর মধ্যে বসাই টুডু চারবার মারা গেছে এবং চারবারই তাকে শনাক্ত করতে ডাকা হয়েছে কালী সাঁতরাকে। পঞ্চমবার মৃত্যুর খবর শোনার পরই পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে কালী সাঁতরা জীবন্ত বসাইয়ের খোঁজে ছুটে চরসার জঙ্গলে। এই যাত্রায় তার স্মৃতি চলচ্চিত্রের মত ; এগিয়ে-পিছিয়ে বসাইকে, তার জীবন, তার মত-পথকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে। বসাই এ আখ্যানের প্রধান চরিত্র কিন্তু এ আখ্যানের সব খাঁজখোঁজ যার চোখ দিয়ে দেখা, সে কালী সাঁতরা। মধ্যবিত্ত থেকে শ্রেণিবিভাজনহীন সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের স্বপ্নে স্বাপ্নিক কালী তেতাল্লিশে পার্টিতে যোগ দেবার সময়ে পিতৃদত্ত তিরিশ বিঘা জমি মাহিন্দারদের দিয়ে দেয়। কারণ দ্বিবিধ, এক হল, ব্যক্তিগত মালিকানায় কম্যুনিস্ট বিশ্বাস করে না – এ আদর্শটি জনসমক্ষে তোলা দরকার ছিল। দুই হল, "সে বিশ্বাস করেছিল বিপ্লব এসে যাচ্ছে। অচিরে দেশ জুড়ে কম্যুন স্থাপিত হবে এবং সকলের থাকা খাওয়ার সমস্যা ঘুচে যাবে" (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৩৪)। সি. পি. এমের সক্রিয়কর্মী কালী সাঁতরা 'সরলরৈখিক নিষ্ঠার জন্য পার্টিতে সে ব্যবহৃত, ঘরে অবহেলিত'। ঔপন্যাসিক তার রাজনৈতিক সততার মূল্যায়নকে তির্যকতায় উপস্থাপন করেছেন –

> কিন্তু মহল্লায় তার একটি ইমেজ আছে। পুরনো দিন থেকে পার্টির লোক, অথচ নিখরচায় চক্ষু অপারেশন ক্যাম্প না পড়লে ছানি কাটাতে পারে না। এমন লোককে ভোটের সময়ে কিংবা পার্টি ইমেজ নষ্ট হবার সময়ে গল্পের কুমিরের ছানার মত তুলে দেখাতে কাজে লাগে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩২৮)

কালী সাঁতরার ব্যক্তিগত জীবনবলয়ের উত্তাপে মহাশ্বেতা নির্মাণ করেছে বসাইয়ের প্রতিরোধের উপকথা। ফিনিক্স পাখির মতোই বসাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। তার বারবার মরে যাওয়া, বেঁচে

ওঠে অ্যাকশনে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জনমানসে এ প্রতীতী জন্মায় যে, সংগ্রামের মৃত্যু নেই – শোষকের নিস্তার নেই।

৪.৪.৩

আপাদমস্তক রাজনৈতিক উপন্যাস *অপারেশন ? বসাই টুডু*-তে শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাসের যে প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে তাতে অনিবার্যভাবেই সে-অঞ্চলের তথা আদিবাসীদের টুকরো টুকরো জীবন-চিত্র শব্দরূপ পেয়েছে। কালী সাঁতরার সঙ্গে বসাইয়ের কথোপকথনে সাঁওতাল সমাজের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উন্নাসিকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। পার্টির মেম্বার হলেও নিচুজাত বা আদিবাসীদের পেয়ালায় নয়, মাটির ভাণ্ডে চা পরিবেশনের ব্যাপারটি বসাই কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছে এবং সগর্বে উচ্চারণ করেছে যে, তাদের সমাজে এ ভেদাভেদ নেই –

> আমার কপাল অ্যানেক ভাল, যি লেংটা ভুখা শালো সকল খেতমজুর, আর লাথ খেয়্যে মাগ্যের বেথায় জাতে পাঁতে ভাগ হয় নাই। এক ধর্ম হাঁড়ি হথে সভে ভাত খায়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৩৯)

এ কেবল বসাইয়ের মুখের কথা নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণও কালীবাবু পেয়েছে আদিবাসী গ্রাম পলতাকুড়িতে গিয়ে –

> বসাইয়ের ধরা মাছ, দ্রৌপদীদের কুমড়ো ও চাল, মুসাইয়ের বোন ও বোনের ননদের আনা কচু ও কুমড়া, প্রতিঘর থেকে আনা চাল, খেসারি ডাল, কুমড়ো, কচু, পেঁয়াজ, একটি লাউ – অনেক অনেক খাওয়া। পলতাকুড়ি একেবারেই সাঁওতাল গ্রাম। মেঝেন্‌রা রাঁধতে রাঁধতে গান গাইছিল। এ-ওর উকুন বাছছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৫৫)

যৌথ জীবনের যে ছবি সাঁওতাল গ্রামে দেখেছিল কালী সাঁতরা – সে-জীবনই তো তার স্বপ্নের জীবন – একজন কম্যুনিস্টের আকাঙ্ক্ষিত জীবন। বাস্তবে প্রশাসন যখন সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে চালিত হয়, তখনও আমাদের সমাজে শ্রেণিবিভেদহীন যৌথজীবনের স্বপ্ন কেবল পরাবাস্তবের রূপকল্পে সীমিত থাকে। মাটির পৃথিবীতে স্পর্শের নাগালে তা বাস্তবরূপ পায় না অথচ আদিবাসী জীবনের আবহমানকাল থেকে সেই আকাঙ্ক্ষিত শ্রেণি ও জাতের বিভেদহীন কৌম জীবন বিদ্যমান থেকেছে নির্বিঘ্নে। কালী সাঁতরার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন পাঠকের মনেও এটি বিস্ময় জাগিয়ে তোলে এবং আদিবাসী জীবনের খোঁজখাঁজ জানিয়ে মহাশ্বেতা দেবী এ বিস্ময়বোধকে বাঁচিয়ে রাখেন।

অপারেশন ? বসাই টুডু পুরোপুরি রাজনৈতিক উপন্যাস। *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৩) উপন্যাসের পর নকশাল আন্দোলনের উৎসভূমির সন্ধানে গ্রামীণ পটভূমিতে নকশালীদের আন্দোলনকে বিশ্লেষণের অভীপ্সায় এ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল কৃষিজীবীদের সক্ষোভ বিস্ফোরণে ; এ উপন্যাসে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও তাদের ন্যায্য মজুরি আদায়ের লড়াইকে সামনে রেখে বসাইয়ের মাধ্যমে নকশাল আন্দোলনের পরিবর্ধিত ধারাকে শব্দরূপ দেয়া হয়েছে। বসাই চরিত্রটি একটি মিথে পরিণত হয়েছে। শোষিত, সংগ্রামী আদিবাসীদের শক্তি ও প্রেরণার উৎস বসাই বারবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে সংগ্রামের অমরত্বকে ঘোষণা করে। বসাইয়ের দু'হাতে বাতাসের গলা মোচড়ানোর মুদ্রাদোষটিও প্রতীকায়িত ; তাঁর সংগ্রাম যেন অদৃশ্য বাতাসের সঙ্গে। প্রকৃতার্থে অসীম ক্ষমতাধর রাষ্ট্রযন্ত্র কিংবা প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিরন্ন আদিবাসীদের সংগ্রাম বাতাসের সঙ্গে সংগ্রামের মতোই নিস্ফল। কিন্তু তাতে বসাইয়ের মতো যোদ্ধারা থেমে থাকে না, অনবরত বাতাসের গলা মুচড়ে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। এ বিশ্লেষণের পক্ষে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয় ; এ উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় তিনি বলেছেন –

> Out of several tribal heroes of the actual Naxalite movement, Mahasweta Devi contructs her tribal hero, Bashai Tudu, who stands outside the Naxalite movement as well as the constitutional political parties, to fight exclusively and doggedly for the cause of the agricultural labourers. Once she conceives Bashai Tudu, she lets him grow into a myth, who dies at every encounter and is reborn to lead the next one. (mahasweta 2002 : xi)

৪.৪.৪

অপারেশন ? বসাই টুডু উপন্যাসে রাজনৈতিক পটভূমি মুখ্য, সাঁওতাল জীবন গৌণ। কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামের ফাঁকে-ফোকরে সাঁওতাল জীবনের কিছু খণ্ড ছবি পাওয়া যায় অথবা সংগ্রামী সাঁওতালদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তাদের জীবনাচরণের নানা বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়। আদিবাসী জীবনের প্রখর মূল্যবোধকে ঔপন্যাসিক খুব সহজে নির্দেশ করেছেন এ উপন্যাসে।

সাঁওতাল বা আদিবাসীদের বীরুৎ সদৃশ জীবনকে মহীয়ান বা বৃক্ষসম করে তোলে তাদের একতাবোধ। বস্তুত একতার জোরেই বসাইয়ের মতো লোক সি. পি. এমের মতো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে নিজস্ব মত ও পথে চলার প্রত্যয় ঘোষণা করে – যে পথ না নকশালী, না অন্য কোন পুঁথিগত তত্ত্বনির্দেশিত – সে-পথ এককভাবে বসাইয়ের পথ। তাদের জীবন সংগ্রামে আহরিত, তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধানে প্রকল্পিত। বসাইয়ের ভাষায় –

> লকসাল আমু হই নাই। ফরন্ট যে চোট দিছু তাথে আর শিক্ষিৎ বাবুর শিখানো পথে কানার মত যাব নাই। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৫২)

অন্যত্র পাওয়া যায় –

> ই পথ বসাই টুডুর পথ (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৫১)

যে পথে একা বলে বসাইয়ের ভয় নেই। কেননা সে জানে যে, সে একা নয়, যে কৌমজীবনের সে অংশীদার – সে-জীবনের প্রতিটি অংশ তার সহযোদ্ধা – তার ডাক শোনার অপেক্ষায় আছে মাত্র। তাই বসাইয়ের লড়াই খেত-মজুরের লড়াই। কেননা যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে এ উপন্যাসের উপজীব্য সাঁওতালদের বাস, সে-অঞ্চলে তাদের পেশা খেতমজুরি। ঔপন্যাসিকের ভাষায় –

> 'বানারি' গ্রামটি জিলা ম্যাপ থেকে মুছে গেলে বহু লোক স্বস্তি পেত। এ গ্রামে বসবাস করে কিছু সাঁওতাল, ক্যাওট ও চামার। পেশা খেতমজুরি। সাঁওতালরা অবশ্য স্ব-অঞ্চলের স্বার্থে সংঘাত না বাধলে, যেখানে পায় সেখানে দাওয়ালী বা নামালী কাজ করে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৬০)

পেশায় খেতমজুর এই সাঁওতালরা একতা ও নৈতিকতার জোরে সামন্তপ্রভুদের একই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত ও বিরাগভাজন। আকাঙ্ক্ষিত এ জন্য যে, সাঁওতালরা খেতমজুর হিসেবে অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সৎ। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মজুরি এম. ডব্লু তারা চায় না বা চাওয়ার সাহস নেই তাদের। ১৯৬৮ সালে ঘোষিকৃত মিনিমাম ওয়েজ ছিল – পুরুষেরা পাবে তিন টাকা সাতাশ পয়সা, শিশু শ্রমিক দুই টাকা দুই পয়সা। অথচ ঔপন্যাসিক কাহিনির সূক্ষ্ম বয়নে একজন সৎ প্রশাসনিক অফিসারের সরেজমিনে তদন্তকৃত এ তথ্য জানিয়ে দেন যে, বানারিতে সাঁওতাল ও সমগোত্রীয় খেতমজুররা মিনিমাম ওয়েজের ধারে-কাছেও নেই। এ এলাকায় বড়োরা পায় সাঁইত্রিশ পয়সা। কিন্তু জলখাবার – মুড়ি ও পিঁয়াজ পেলে জলখাই-খরচ কেটে হাতে পায় পঁচিশ পয়সা। ছোটোরা পায় ত্রিশ পয়সা। জলখাবার-খরচ বাদে আঠারো পয়সা। অর্থাৎ বেঁচে থাকার বা নূন্যতম চাহিদা পূরণের মতো অর্থও জোটে না তাদের দিনশেষে প্রাণান্ত পরিশ্রমের সমাপ্তিতে। অথচ প্রতিবাদ করার বা উপযুক্ত পারিশ্রমিক চাইবার সাহস তাদের নেই। কেননা তাদের ভয় এম. ডব্লু চাইলে মহাজন বা জমিদার অন্যখান থেকে যদি খেতমজুর আনে, তাহলে তারা কর্মচ্যুত হবে। দ্বিতীয়ত, পার্শ্ববর্তী গ্রামের কোন জমিদার যদি তার এলাকার খেতমজুরদের ওয়েজ দেবে না বলে সাঁওতালদের ডাকে, সেখানেও বানারি গ্রামের সাঁওতালরা যায় না। এ কারণে মালিকেরা এদের 'যুধিষ্ঠিরের জাত' বলে গালি দেয়। এ গালিটিতে ব্যাজস্তুতির আভাস পাওয়া যায়। পুরাণের যুধিষ্ঠির ধর্মদেবতার পুত্র – অন্যায় বা মিথ্যা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তার চরিত্রে নেই (যদিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌশলে তাকে দিয়ে মিথ্যা বলানো হয়েছিল – সে প্রসঙ্গ এখানে নির্দেশিত হয় নি)। সাঁওতালরাও মিথ্যা

বা অন্যায়কে তাদের জীবনাচরণে স্থান দেয় না এবং তারা একতাবদ্ধ – এ সত্যটি সামন্তদের ভীত করে এবং সাঁওতালরা 'পোলিটিকালি পোটেন্ট' বলে প্রশাসনের খাতায় চিহ্নিত হয়। এ উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে সাঁওতাল-জীবনের বিস্তৃত কথা নেই তবে বসাইয়ের উত্থান কিংবা বসাইয়ের সংগ্রামের পটভূমি হিসেবে তার স্বজাতির দুর্দশা কিংবা নিপীড়িত হবার কাহিনি পটভূমি হিসেবে অপরিহার্য হয়েছে।

খেতমজুররা যথার্থ মজুরি না পেয়ে যে মানবেতর জীবন-যাপন করে তারও সামান্য ছায়াচিত্র আছে উপন্যাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গে। বসাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে কালী সাঁতরা যখন সাঁওতাল গ্রামে গিয়েছিল, সকলে মিলে একসঙ্গে খাবার যোগাড়, রান্না ও খাওয়ার বিবরণ আছে সেখানে, সেই সঙ্গে মুসায়ের বউয়ের একটি উক্তি আছে, যাতে সে বলেছে –

> কমরেট আল্যে মোরা ভরা ভাত খাই। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৫৬)

অর্থাৎ অন্যসময় তারা পেটভরে ভাত খেতে পায় না। বস্তুত পেটভরে খাওয়া তাদের জীবনে বিশাল ব্যাপার। ভাত খাওয়া তো এক বিলাসিতা ; ভাত খায় তারা ক'দিন। বন-জঙ্গল থেকে আহরিত কন্দ-মূল, চিনাঘাসের বীজ, খরগোশ কিংবা শিকারকৃত অন্য পশু তাদের খাদ্যের উৎস। তাদের জীবনে বনের উপযোগিতা সম্পর্কে বসাই কালীকে জানাচ্ছে যে, বন সংরক্ষিত না হয়ে উন্মুক্ত থাকলে তাদের সুবিধা, বসাইয়ের জবানিতে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা পায় –

> খরা-গোসাপ মিল্যে। মোরা খেয়্যে বাঁচি। পোটিন কিছু খেত্যে মিলে না মোদের। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৫৪)

বসাইয়ের এ উক্তিতে একদিকে যেমন তাদের দুঃসহ দারিদ্র্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনি আধুনিক শিক্ষা বা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত নব্যজ্ঞানের ইঙ্গিত মেলে। বসাই সাঁওতাল-সমাজের নেতৃত্বদানকারী চরিত্র। সুতরাং তার জ্ঞানের বিস্তৃতিতে সাঁওতাল-সমাজের বা জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। যদিও জ্ঞান নয়, খাদ্যের প্রকৃত অভাবেই তারা পীড়িত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পর ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিটগুলোর একটির রিপোর্ট কালী সাঁতরার স্মৃতিতে স্ফুটিত করে উপন্যাসে রক্ষিত হয়েছে এভাবে –

> বাঁচবার ইচ্ছাই সেই খাদ্য "যাহা ভারতবাসীকে বাঁচাইয়া রাখে। ইহা এ-জেড সকল ভিটামিনযুক্ত খাদ্য হইতেও শক্তিশালী। অনশন-অর্ধাশন-অখাদ্য-কুখাদ্য যাহাদের নিত্য অভিজ্ঞতা, তাহারা বাঁচিয়া থাকে বাঁচিবার ইচ্ছায় –" (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ :৩৫৬)

উদ্ধরণ-চিহ্নের মধ্যে মেডিক্যাল রিপোর্ট, বসাই ও মুসায়ের বউয়ের টুকরো সংলাপে সাঁওতালদের বেঁচে থাকার আপাত বিবরণ কালী সাঁতরার দৃষ্টিকোণে উপস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক।

অবশ্য ঔপন্যাসিক নিজে হাজির থেকেও সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে নিরন্ন এ আদিবাসীদের দুর্দশায় প্রশাসনের ব্যর্থতার কথা গভীর তির্যকতায় উল্লেখ করেছেন একাধিক জায়গায় –

> নিরন্ন নেংটেরা প্রশাসনের প্রথম পক্ষ। মত জিজ্ঞেস না করে ঘাড়ে চাপানো বউ। প্রতাপ প্রশাসনের ইচ্ছেয় ডেকে এনে পাটে বসানো দ্বিতীয় পক্ষ। প্রশাসনের গ্রাম ভিজিট-রিলিফ দান- ভোট ব্যবস্থা চলে না। আদর পেয়ে প্রতাপ তাই 'দাও দাও' বলে সম্বচ্ছর আখখুটে বায়না ধরে থাকে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৬০)

প্রতাপ বা জমিদারের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ প্রশাসনে যে দু'একজন মানবতাবাদী বা সৎ মানুষ নেই – তা অস্বীকার করেননি মহাশ্বেতা। প্রশাসনের সদিচ্ছার দু'টি দৃষ্টান্ত ঔপন্যাসিক উপন্যাসের অবয়বে স্থান দিয়েছেন। প্রথম দৃষ্টান্ত – জনৈক আদিবাসী-সহানুভূতিসম্পন্ন সতীশের কথা বলা হয়েছে, যে কিনা তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পরে আদিবাসীদের মেডিকেল-রিপোর্ট দিয়েছিল, তার পরিণতি নির্বিকারভাবে জানানো হয়েছে যে, সে মরে গেছে সাপের কামড়ে ; অন্ধ্র প্রদেশের এক হিরে খনির শ্রমিকদের সাপের কামড় থেকে বাঁচাতে লেক্সিন-চিকিৎসা করতে গিয়ে সতীশ নিজেই সর্পদষ্ট হয়ে মারা যায়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, সৎ প্রশাসনিক অফিসার, যে সামন্তপ্রভুদের তাবেদার না হয়ে খেতমজুরদের ন্যায্য মজুরির আইন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারাবাহিক চক্রে ছেদ তৈরি করে, পরিণামে সে দিল্লিতে বদলি হয়ে বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ঔপন্যাসিক তির্যকভাবে দৃষ্টান্তটি সম্পর্কে বলেছেন –

> এই অফিসারের নজির দেখিয়ে প্রশাসন সকল উৎসাহী অফিসারকে বোঝাতে পেরেছেন, শুদ্ধ ইংরেজি জানা, পেট্রিয়ট বাপ-মার সন্তান হওয়া, ঘুসের নামে নাক সিঁটকানো, মিলখা সিং হয়ে সত্তরের দশকে ছোটাছুটি করা – কোনোটাই উন্নতির পথ নয়। পরিণামে ডান ঠ্যাঙে আথ্রাস হতে পারে। যাঁরা বুঝেছেন, তাঁরা বেঁচে গেছেন। যারা বোঝেন নি তাঁরা প্রশাসনের হাতে নানাবিধ হজিমত ভোগ করে থাকেন। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৬১)

খেতমজুর বা আদিবাসী-দরদী এ দুজনের দুর্দশার বয়ানে ঔপন্যাসিক দ্বিবিধ মেসেজ দিয়েছেন। প্রথমত, প্রশাসন-যন্ত্র এতই বিগড়ে গিয়েছে যে, দু'একজনের সততা কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে বাধাগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনের পক্ষে আরোপিত পদ্ধতিতে সাঁওতালদের উদ্ধার সম্ভব নয়। তাদের জন্য প্রয়োজন তাদের জীবন থেকে উদ্ভূত বসাই টুডু-র মত মানুষ – যে তাদের রিলিফ দিয়ে সাহায্য নয়, তাদের ভেতরকার শক্তিকে উজ্জীবিত করবে, লড়াই করে নিজ অধিকার আদায় করবে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হিসেবে তারা বসাই টুডুকে গ্রহণ করেছে বলেই বারবার মৃত্যুর পরও সে আবার বেঁচে উঠে, প্রশাসন শুনতে পায় – 'বসাই ইজ ইন অ্যাকশান এগেইন' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৭২)।

৪.৪.৫

ঔপন্যাসিক অলৌকিকতাকে পরিহার করে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে বসাইয়ের সঞ্জীবিত হয়ে ওঠার ব্যাখ্যাদানে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথমবার মৃত্যুর পর বসাইয়ের যে আইডেনটিটি রেকর্ড করা হয় তাতে মৃতদেহের উচ্চতা ছিল পাঁচ-সাত এবং কালী-সাঁতরা তাকে বসাই বলে শনাক্ত করে। পরবর্তী সময়ে টেরামাইসিন ক্যাপসুল, ব্যান্ডেজ, তুলো, ডেটল ইত্যাদি নিয়ে কালী সাঁতরা প্রকৃত বসাইয়ের সেপটিসিমিয়ার নিরাময় করতে দিশাই গ্রামে গেলে, সহাস্যে প্রকৃত বসাই ওর শনাক্তীকরণ ও লাশ মাপামাপি শুনে বলে,

> আঁ ? পাঁচ-সাত কর্যে দিছু ? আর এক ইঞ্চি পাব কুথাক্। আমু ত ছয় ইঞ্চি হে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৭১)

দ্বিতীয়বার দুইশত একান্ন জন লোক বসাই টুডুর শবদেহ শনাক্ত করে। তৃতীয়বার বসাইয়ের মৃত্যুর পর কালী সাঁতরার মনোকথনে জানা যায়, মৃতব্যক্তি বসাই নয়, তার অনুগত মুসাই। চতুর্থবারও ঔপন্যাসিক ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন, বসাই সেজে মৃত্যুকে বরণ করেছে আরেক সংগ্রামী সাঁওতাল তরুণ দুলনা মাঝি। সাঁওতালদের দৈহিক গড়ন, উচ্চতা, গায়ের রং প্রায় একই রকম হওয়াতে, সর্বোপরি অসামান্য একতার জোরে প্রশাসনকে বারবার ঘোল খাওয়ানো সম্ভব হয়। প্রকৃত বসাই আসলেও বেঁচে আছে কি-না তা কিছুটা রহস্যাবৃত রেখে ঔপন্যাসিক জানিয়ে দেন যে, দৈহিকভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই বসাই টুডুর। 'বসাই' নামটি উজ্জীবনের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে সাঁওতালরা – দৈহিকভাবে তার বেঁচে থাকা বা না থাকা মুখ্য নয়। তাদের চেতনায় বসাই আছে, তাই তারা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বসাইয়ের নেতৃত্বে এগিয়ে যায় বারবার, সেক্ষেত্রে একজন হয়তো বসাইয়ের অভিষিক্ত হয় কেবল।

৪.৪.৬

বিচ্ছিন্নভাবে যে সাঁওতাল জীবন এ উপন্যাসে এসেছে সে-জীবনে সাঁওতালরা অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্বর নয় – বরং প্রাকৃতিকভাবে তারা শিক্ষিত কিংবা বিজ্ঞ বলে দাবী করেন মহাশ্বেতা। শিখেছে তারা জীবনের কাছে, সবাই হয়তো বসাইয়ের মতো মিশনারী থেকে শিক্ষিত হয়ে আবদুল্লাহ রসুলের বই পড়ে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক সংগঠনের অংশ হতে পারে না ; প্রোটিন বা ভিটামিন সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই বসাইয়ের মতো কিন্তু জীবনধারণের পাঠে অভিজ্ঞ তারা। ঔপন্যাসিকের ভাষায় –

> তারা ঋষিদের মতো সর্বজ্ঞ। তারা জানে, আইন করা হয়, বলবৎ করা হয় না, এবং যাদের জন্য আইন, তারা জীবনেও তার বেনিফিট পায় না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৬০)

এদের অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে মহাশ্বেতা –

> সকল নিরন্ন নেংটের মতো এরাও, সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত নয়, ক্ষুধা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৬০)

প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সাঁওতালদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ হয়ে ওঠে আবহাওয়া বিশারদ। মুসাই টুডুকে যেমন এ কাহিনিতে জলহাওয়ার পণ্ডিত বলে দাবি করে বসাই এবং বৃষ্টি-হাওয়া সম্পর্কিত প্রমাণও দাখিল করে কাহিনি-সূত্রে। বস্তুত গ্রামীণ মানুষ আবহমান কাল থেকে প্রকৃতি-বিষয়ে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে – সুতরাং তারা নিরক্ষর হতে পারে, অশিক্ষিত নয় ; সে সত্যটি যেন ঔপন্যাসিক সংগোপনে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন।

সাঁওতাল জীবনের আরও দু'একটি বৈশিষ্ট্য কালী সাঁতরার বয়ানে প্রকাশিত হয়েছে এ উপন্যাসে। কালী যখন সাঁওতাল গ্রামে যায় আদিবাসী মানুষগুলোর পরিচ্ছন্নতাবোধ তাকে কেবল মুগ্ধ করে না, বিস্মিত করে। কালীর স্বগতোক্তিতে সে বিস্ময়বোধের সন্ধান মেলে –

> টাল খুব পরিষ্কার । এত দারিদ্র্যে সাঁওতালরা এত পরিষ্কার থাকে কী করে ? যারা সাঁওতাল নয়, তারা কেন পারেন না ? (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৪৩)

অন্যত্র সাঁওতাল-জীবনের কঠোর নৈতিকতার কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর কালীকে বসাই গান গাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলে –

> খাবু দাবু, দিবু না কিছু ? (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৩৫৫)

সত্যিকার অর্থে অত্যন্ত উচ্চ নৈতিকতার অধিকারী তাদের সমাজ। বিনিময়ে বিশ্বাসী এ আদিবাসীরা কোনো শ্রম, অবদান বা উপহার ব্যতীত অন্যের বাড়িতে খাদ্যগ্রহণকে রীতিমতো অন্যায় বলে মনে করে।

পরোপকার বৃত্তির পরিচয়ও পাওয়া যায় বসাই তথা সাঁওতালদের আচরণে। পার্টি প্রধান সামন্তকে বসাই একবার বাঁচায় হাসপাতালে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে, আরেকবার তার বম্বে যাবার টাকা যোগায় তার সাইকেল বিক্রি করে – যে সাইকেল তাকে উপহার দিয়েছিল দশখানা গ্রামের খেতমজুরেরা মিলে। অথচ সামন্ত তাকে গাদ্দার, নকশাল বলে ছুঁড়ে ফেলতে দ্বিধা করেনি।

৪.৪.৭

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বহু দুর্লভ বৈশিষ্ট্য, যা সভ্য মানুষেরা কৃত্রিমতার আবর্তে হারিয়ে ফেলেছে। জাত-পাতের বিভেদ না মেনে সকলে এক জাতের মানুষ হিসেবে কৌমজীবনের

অধিকারী এ আদিবাসীদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিফলন বাঙালি মধ্যবিত্তদের মধ্যে দেখতে চান মহাশ্বেতা দেবী ; *অপারেশন ? বসাই টুডু* উপন্যাসে বসাই টুডুকে কালী সাঁতরার চোখে দেখার মাধ্যমে সে-ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। কালী সাঁতরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ, বসাই আদিবাসী সংগ্রামী চরিত্র। প্রথা না ভাঙা, সব মেনে নেওয়া মধ্যবিত্ত কালী সাঁতরার পক্ষে পরিবর্তিত হওয়া বা পরিবর্তন আনা অসম্ভব, অথচ বসাইয়ের মতো অনাথ, নিরন্ন কেবল বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত একজন আদিবাসীর পক্ষে সম্ভব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অক্লান্ত কৌরব

৪.৫.১

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত হননি মহাশ্বেতা – এমনটা তাঁর বিভিন্ন সময়ের ব্যক্তিগত কথনসূত্রে জানা যায়। কিন্তু একজন সচেতন বিবেকবান মানুষ হিসেবে সামাজিক দায়বোধে তিনি রচনা করেছেন বেশকিছু কালজয়ী রাজনৈতিক উপন্যাস – *অপারেশন ? বসাই টুডু* তার মধ্যে অন্যতম। এ উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় কিছুটা বিস্তৃত পরিসরে তিনি রচনা করেন *অক্লান্ত কৌরব* (১৯৮২)। যে সূর্যসম ক্রোধে সমকালীন রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা ও নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি প্রশাসনিক বঞ্চনার ইতিহাসকে ধারণ করেছেন পূর্ববর্তী উপন্যাস *অপারেশন ? বসাই টুডু*-তে, সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত থেকেছে আলোচ্য উপন্যাসেও। বসাইয়ের মৃত্যুর পরও বারবার ফিরে আসার কিংবদন্তি এ উপন্যাসে ভেঙে দিয়ে নতুন করে গড়া হয়েছে। উপন্যাসের অন্তিমে দিলীপ সোরেন তার নিজের মধ্যে বসাইয়ের উপস্থিতি অনুভব করে বসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ব্যক্তি বসাইয়ের মৃত্যু ঘটলেও তার আদর্শ ও ইমেজের মৃত্যু ঘটেনি বরং আদিবাসী সমাজে সে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে – এ প্রেক্ষাপটে *অক্লান্ত কৌরব* উপন্যাসটি রচিত। এ উপন্যাসে ভূমিবঞ্চিত আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণির নিপীড়িত জীবনে 'অপারেশন বর্গা' নামক সরকারি পদক্ষেপের ব্যর্থতার দিক তুলে ধরা হয়েছে। সে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষেতমজুরদের এম. ডব্লু অর্থাৎ মিনিমাম ওয়েজ না পাওয়ার ইতিবৃত্ত।

৪.৫.২

আশির দশকের নকশাল-পরবর্তী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ঘটনার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের শুরুতে বসাইয়ের মৃত্যুরহস্য, কালী সাঁতরা ও উদ্ধবের হত্যার ঘটনা এবং তা ধামাচাপা দেবার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনঅসন্তোষের বিশেষত আদিবাসী ও অন্ত্যজ জীবনের ক্ষোভকে ভাষা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এ উপন্যাসে *অপারেশন ? বসাই টুডু-র* কালী সাঁতরার শূন্যস্থান পূরণ করেছে পার্টির সৎ কর্মী ইন্দ্র। নৈরাজ্যের সময়ে লড়াই করে সংগঠনকে টিকিয়ে রাখা ইন্দ্র জেল থেকে বেরিয়ে পরিবর্তিত সময় ও সংগঠনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। শাহরিক ট্রেড ইউনিয়নের আদর্শহীনতার সঙ্গে আপোষ না করে সে চলে আসে গ্রামে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে সে আরও শক্ত বাধার

সম্মুখীন হয়। সে দেখতে পায় গ্রামীণ সাধারণ মানুষ জীবনযাপনের ন্যূনতম সুবিধাটুকু থেকে বঞ্চিত। সমাজতান্ত্রিক সরকার আসার পরও তাদের অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না বরং এ সরকারও মদদ দিয়ে চলেছে জোতদার-মহাজনদের। 'অপারেশন বর্গা'র মতো কিছু আইন তৈরি হচ্ছে বঞ্চিতদের জন্য কিন্তু তা কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ, বাস্তবে তা অধরা থেকে গেছে অন্ত্যজদের কাছে। প্রতিবাদ করলে নকশাল অভিধায় তাদের নির্মূল করা হচ্ছে। উপন্যাসের শুরুতে ঔপন্যাসিক জানিয়ে দেন – "লুটেরাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সহিংস ও সশস্ত্র প্রতিবাদ শোষিত শিবিরে যেন আবার না দেখা দেয়। সহিংস ও সশস্ত্র হবার অধিকার যেন একমাত্র শাসকের থাকে।" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ২৪১)

পার্টির সাচ্চা ও সংগ্রামী কর্মী ইন্দ্র অবস্থার পরিবর্তন চান এবং এ লক্ষ্যে কাজ করার সংকল্প করে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে 'জঞ্জাল'-এ পরিণত হন তিনি। এ কাহিনিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক দ্বৈপায়ন বিদেশি টাকায় আদিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে গ্রামে আসে। সাঁওতাল বিদ্রোহের সার্ধশত বছরে সাঁওতালদের ভীরু বলে প্রমাণ করে সে দেখাতে চায় যে, অন্য আদিবাসীদের তুলনায় সাঁওতালরা অধিক সুবিধাভোগী। ইন্দ্রকে আদিবাসী ও অন্ত্যজদের শত্রুতে পরিণত করতে তাকে গবেষক দ্বৈপায়নের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। নেতাদের এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্য উন্মোচিত হলে ইন্দ্র আদিবাসীদের হাতে তুলে দেয় দ্বৈপায়নকে এবং আদিবাসী নেতা দিলীপ সোরেন তাকে হত্যা করে এবং অপ্রতিরোধ্য আদিবাসী চেতনার স্ফূরণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। সমগ্র উপন্যাসের পটভূমি জাগুলা নামক অঞ্চল। জাগুলাকে প্রতীক ধরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আধিপত্য ও শোষণের চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের ভাষায় – পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যেমন চলছে, জাগুলিয়াতেও তাই। জাগুলাতে যা যা ঘটেছে, সেই মানচিত্রটি ভালো করে বুঝলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে মোটামুটি বোঝা যাবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ২৪২)

৪.৫.৩

রাজনৈতিক তাপ-উত্তাপের ফাঁকে এ কাহিনিতে আদিবাসী জীবনের রেখাচিত্র নির্মিত হয়েছে সন্তর্পণে। আদিবাসী ও অ-আদিবাসী যৌথ সংগ্রামের ডামাডোলে আদিবাসী বিশেষত সাঁওতালদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আদিবাসী জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী দিকগুলো হল গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রতি আনুগত্য তথা একাত্মবোধ এবং নিজ ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অহংকার – এ দু'টোর উপস্থিতি কাহিনি বুনোটে প্রবলভাবে বিদ্যমান ; ডোম সমাজের মদন ও পারীর বিয়ে উপলক্ষ্যে সোরেনের জবানিতে তার প্রমাণ মেলে। সাঁওতাল, ডোম, কাওরা তিন সমাজের লোককে একত্রে মিলিয়েছে সোরেন অর্থাৎ নেতৃত্বটা মূলত আদিবাসীদের হাতে, কেননা কৌম জীবনযাপনের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তারা। সংখ্যার

অত্যল্পতা এবং অন্ত্যজ গোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতায় তারা এখন যৌথসমাজ গড়েছে এবং তাদের সমাজও অভিন্ন। সে-কারণেই তাদের সমাজে ডোম পাড়ার বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং কন্যাপণও করে দেয়া হয় নির্দিষ্ট। সাঁওতাল সমাজে কন্যাপণের প্রথা চালু আছে বহুকাল ধরে। তবে এ প্রথা যেন সামাজিক জীবনে দুর্ভোগের কারণ না হয় সে-ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে তারা সমাজ ডেকে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে যে, কনেপণ হবে সর্বোচ্চ বিশ টাকা ; লাল সুতি কাপড় দিতে হবে কন্যাকে এবং দস্তার গয়না। নাইলন শাড়ি, রোলেকস জরি, রুপোর গয়না এবং বেশি পণ ঋণের পথ প্রশস্ত করে কেবল ; ক্ষণিক বিলাসিতার দায় টানতে হয় সমগ্র জীবন, এমনকি কখনও কখনও কয়েক প্রজন্ম ধরে। বিয়েতে সামাজিক ভোজ একটি আবশ্যিক অঙ্গ কিন্তু সে দায়ভারও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লাঘবের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সমাজ-ভোজে খরচের বাহুল্য নয় – ডাল, টক, মাছ যথেষ্ট বলে বিবেচিত তাদের কাছে। মাছ বলতে রুই-কাতলা নয়, লাঠা-বেলে-সিং-টেংরা-পুটি-চিংড়ি অর্থাৎ খালে-বিলে থেকে যা জোগাড় করা যায় তাই যথেষ্ট। চাল, ডাল ও অন্যান্য খরচও তারা চাঁদা তুলে জোগাড় করে। এমনকি নবদম্পতির ঘরও তারা সকলে মিলে তুলে দেয়। এ উদ্যোগ অবশ্যই আবহমান কালের নয় ; দীর্ঘদিন ধরে বিয়ের পণ ও ভোজের টাকা যোগাড় করতে নিঃস্ব থেকে আদিবাসীরা নিঃস্বতর হয়েছে। ঋণ ও মহাজন থেকে মুক্ত রাখতে তরুণদের উদ্যোগে এবং একাত্মবোধের জোরে তারা প্রকৃতঅর্থে কৌম-সমাজের অন্তর্গত করে নিয়েছে অ-আদিবাসীদেরও। ঔপন্যাসিক বিয়ে সম্পর্কিত যৌথ ব্যবস্থায় তাদের মনোভাবের ভাষারূপ দিয়েছেন এভাবে –

> গাঁ-গেরাম ছোট, কামে-কাজে এক, বানে-আকালে এক দুখ, সকল অবস্থায় এক হই আছি। তাতেই ই বেবস্থাটো। এখুন আমাদের পরবে ভি উরা আসবে। উরাদের পরবে ভি মোরা যাব। আমি আদিবাসী, উ ডম, সি হিসাবে চলে ? (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ২৯০)

ডোমদের বিয়েতে তাদের মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় সাঁওতালরাও যোগ দেয়। গ্রাম-সংলগ্ন বনে প্রাচীন বটগাছের গোড়া ঘিরে পূজার যে ব্যবস্থা তাতে গান একটি প্রধান উপকরণ। গান আদিবাসীদের জীবনেরও একটি আবশ্যিক উপকরণ। ডোমদের বিয়েতে যেমন সাঁওতালদের উপস্থিতি অনিবার্য, তেমনি সিদু-কানুর বিদ্রোহের স্মরণে ভরা বর্ষায় চরসা গ্রামে যে উৎসব হয়, জলে ভিজে তাতে যোগ দেয় সাঁওতাল নারী-পুরুষেরা এবং গ্রামবাসী অন্যান্য জাতের লোকেরাও।

আদিবাসীদের মধ্যকার ঐক্য, ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রখর আত্মসম্মানবোধ তাদের স্বাতন্ত্র্যকে দীর্ঘকাল সমুন্নত রেখেছে। সভ্য সমাজ বা পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের তাবেদার দেশীয় নয়া ঔপনিবেশবাদের ধারক ও বাহকেরা ভেঙে গুড়িয়ে দিতে চায় তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে ; ভয় পায় তাদের ঐক্য ও আত্মমর্যাদাবোধ এবং সংগ্রামী মনোভাবকে। বিদেশি শক্তি ও নয়া উপনিবেশ এবং

জ্ঞানকে অস্ত্র করে মিথ্যের প্রচারে সমগ্র পৃথিবীর সামনে তাদের ছোট করতে চায়, হীন করতে চায়। ঔপন্যাসিক নয়া-উপনিবেশবাদের এ প্রয়াসকে চিহ্নিত করেন তীব্র-কঠোর ভাষায় –

> যে বিদেশি শক্তি দীর্ঘকাল ধরে ভারত সরকারের সাগ্রহ সহযোগিতায় এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সে শক্তি শুধু ভারতীয় শ্রমে ও কাঁচামালে তৈরি জিনিস বাণিজ্যিক চুক্তির নলচের আড়ালে কম দামে কেনে না। ভারতীয় মগজেও স্থাপন করে উপনিবেশ। তাদের মদতপ্রাপ্ত গবেষণা-সংস্থায় শামিল হয় দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীর দল। অগাধ টাকা। অপার সময়। রিসার্চের বিষয়বস্তু ভালো ভালো। যেমন আদিবাসী, গরিব কৃষক, ক্ষেতমজুর, শিল্পপ্রেমিক, গ্রামীণ কারিগর, লোকশিল্পী, এদের জীবন ও কাজকেন্দ্রিক" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ২৪৫)।

বিদেশি অর্থ-সহায়তায় আদিবাসী-বিষয়ক গবেষণা প্রকৃতার্থে আদিবাসীদের প্রতি মমত্ব-সহানুভূতির প্রকাশক নয়, বরং মানুষ হিসেবে তাদের পরিচয়কে মুছে দিয়ে, তাদের স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করার হীন প্রচেষ্টারই নামান্তর বলে মনে করেন লেখক।

আলোচ্য উপন্যাসে এমন একজন গবেষক দ্বৈপায়ন, গবেষণার ছদ্মাবরণে যে বিদেশি ঔপনিবেশক ও দেশীয় নয়া উপনিবেশপ্রেমিদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের গবেষকদের মধ্যেও তার অবস্থান উচ্চে। মাঝে মাঝেই সে আদিবাসীদের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে। তার প্রবন্ধ লেখার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তাকে টাকা দেয়। এ ব্যাপারটি বিস্ময়কর। কেননা ভারতের ওঁরাও, মিকির, হো, নাগেসিয়া, কোলতা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখাতে কেন ইতালি বা বেলজিয়াম বা হল্যান্ড বা পশ্চিম জার্মানি বা নরওয়ে বা সুইডেন টাকা দিচ্ছে – এ বিষয়ক জিজ্ঞাস্য উত্থাপন করে লেখক সচেতন পাঠকের মনে আলোড়ন তুলেছেন। ইতঃপূর্বে দ্বৈপায়ন ১৯৬৮-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল সাঁওতাল গ্রামীণ সমাজে বিবাহ ও বিবাহিত জীবন বিষয়ে ব্যক্তি ও সমাজের মনোভঙ্গি নিয়ে এক সমীক্ষা চালাতে। গবেষণা শুরুর আগেই সে ঠিক করে নিয়েছিল যে, সাঁওতাল সমাজে বিবাহের পবিত্রতা আর নেই – এটি তার গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হবে। তখন সময়টা ছিল উত্তাল – নকশাল আন্দোলনে জোতদার-মহাজনের পাশাপাশি এ ধরনের সুবিধাবাদী লোকেরাও ছিল ভীত। তাই সাঁওতালদের বিয়ে উৎসবে গিয়ে যখন সে তাদের লড়াকু মেজাজে আবিষ্কার করে এবং জানতে পারে যে, সদ্য তারা জনৈক জোতদারের মাথা কেটে এসে আনন্দ করছে – প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে সে। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে, সাঁওতালদের বিপর্যস্ত বিবাহিত জীবন এখন মূল্যবোধহীন – এ থিসিস অসমাপ্ত রেখে রাতারাতি পাড়ি জমায় দিল্লি। বহুদিন পর সুবিধাজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নয়া ঔপনিবেশবাদের স্বার্থে নতুন করে গবেষণা করতে সে জাগুলায় আসে ক্ষমতাসীন পার্টির প্রত্যক্ষ মদদে। এবার সে প্রমাণ করতে চায় যে, আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরা সবচেয়ে ভীরু, কম লড়াকু, এস্টাবলিশমেন্ট অনেক সহজে ও সস্তায় এদের কিনে নিতে পারে এবং এদের তুলনায় মুণ্ডা বা নাগা বা অন্য জনগোষ্ঠী অনেক বেশি লড়াকু।

সিদু-কানুর সাঁওতাল-বিদ্রোহের একশো পঁচিশ বছর যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্‌যাপন করছে মহাসমারোহে, সে-সময়ে এ ধরনের সমীক্ষা আদিবাসীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করবে – এটিই তার গবেষণার লক্ষ্য। সাঁওতালদেরকে সরকার অহেতুক গুরুত্ব দিচ্ছেন, নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন এবং অন্য আদিবাসীরা তাতে বঞ্চিত হচ্ছে – এ বিষয়টি সামনে এনে আদিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা পুঁজিবাদী সমাজের এক বিশেষ কৌশল। আদিবাসীদের আদিম ঐক্যবন্ধনকে তারা ভীতিকর ব্যাপার বলে মনে করে। দ্বৈপায়নের ভাষায় – 'দে ডিভাইডেড, উই স্ট্যানড। দে ইউনাইটেড, উই ফল।' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩০৭)

দ্বৈপায়ন কোনো একক ব্যক্তি নয়, পুঁজিবাদী সমাজের ক্রীড়াণক মাত্র। দামি এক সংস্থার পরিচালক সানি বজ্রপানির মতো লোকেরা দ্বৈপায়নের মতো লোকেদের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে। বহিরাবরণে তারা আদিবাসী বিশেষজ্ঞ, আদিবাসী-দরদী ; বাস্তবে আদিবাসীদের, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করা তাদের লক্ষ্য। আদিবাসী সংস্কৃতিকে তারা বিনোদনের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে। ঔপন্যাসিক এ বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে –

> সানির বাড়িতে আদিবাসী ডিনারের সময়ে কাচের দেয়ালের ওপারে হাজার লক্ষ আলো জ্বেলে সকৌতুকে নয়াদিল্লি হাসে। ঘরে দ্বৈপায়নরা বাইসনের সিঙের খোলে ভরে ছাঙ খায়। রাক্ষুসে বাঁশের চোঙে বুনো শুয়োরের মাংস ভরে চোঙটি মাটি মাখিয়ে কাঠ কয়লার চুল্লিতে ঢুকিয়ে রান্না করা হয়। একেবারে কাঁচা শালগাছের ছালে জড়িয়ে মাংস রোস্ট করা হয়েছিল। সানির বাড়ির 'আদিবাসী সন্ধ্যায় আসুন' এক অসামান্য ব্যাপার। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩০৭)

শহুরে এ মানুষগুলো উদ্ভট সব ধারণা তৈরি করে আদিবাসীদের সম্পর্কে নিজেদের মনে এবং সেগুলো সত্য বলে প্রচার করে । যদিও সত্যের সঙ্গে সে ধারণার সম্পর্ক নেই কিন্তু 'প্রচারে প্রসার'– এ মতবাদটি এখানে কার্যকর হয়। তথাকথিত আদিবাসী বিশেষজ্ঞ দ্বৈপায়নের মতে, সাঁওতাল এবং অন্য আদিবাসীরা নাচে জীবনের আনন্দে। জীবনের আনন্দ এমন এক জিনিস, যার সঙ্গে পেটের খিদের কোনো যোগ নেই। বাস্তবে নিরন্ন আদিবাসীদের কাছে পেটের খিদেই সবচেয়ে বড়। জীবনের সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে তারা যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত – এমনকি ক্রীতদাস হতেও। এ উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের সে-প্রান্তটি গভীর মমতা ও সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। পেটের দায়ে আদিবাসী ও অন্ত্যজ মানুষেরা ধনীদের গৃহে বারমাসিয়া হয়ে থাকে। 'বারমাসিয়া' ক্রীতদাস প্রথার আধুনিক রূপ – কেবল খাবারের বিনিময়ে আজীবন এরা প্রভু-গৃহে দিবারাত্রি কায়িক পরিশ্রম করে, মৃত্যুর পর তার সন্তানেরাও দাসে পরিণত হয়। পেটের দায়ে তারা নিজেদের তো বটেই, পরবর্তী প্রজন্মের স্বাধীনতা পর্যন্ত বিকিয়ে দেয়। বারমাসিয়া, মাহিন্দার, ভাতুয়া – বিভিন্ন দেশে তারা বিভিন্ন নামে সম্বোধিত

হয় – নানা নামের অন্তরালে তারা দাসত্বের জীবন ধারণ করে ; মনের দুঃখকে সঙ্গীতের সুরে বেঁধে প্রকাশ করে –

> বারমাসিয়া রে ! তুর দুখে পাষাণ কান্দ্যে (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ২৪৯)

লক্ষণীয় যে, জনম-দুঃখী স্বেচ্ছা ক্রীতদাস সরল মানুষগুলোর দুঃখে সমগ্র প্রকৃতি কাঁদে কিন্তু মনিব হাসে। আবার, মনিব ও মনিবানী কেবল একা নয় তাদের সকল অনুষঙ্গ – কুকুর, বিড়াল, ঢেঁকি, পায়ের নূপুর – সকলই হাসে। অরণ্য-প্রকৃতি ও ধনী-গৃহের এই বিভেদ – যা তাদের গানে উঠে এসেছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপাদানের তারতম্য এই প্রকৃতি-লালিত মানুষগুলো যেমন অনুভব করে, তেমনটা প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন নাগরিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অনুভবের এই স্বাতন্ত্র্য – আদিবাসী জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪.৫.৪

আদিবাসী জীবনের স্বপ্ন-সাধের সন্ধান করেছেন মহাশ্বেতা চরম অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে, পরম আন্তরিকতায়। অনুসন্ধানের শেষে তিনি দেখিয়েছেন, তাদের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শিক্ষিত নাগরিক মানুষের চাহিদার মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। মানুষ মাত্রই নিজেদের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করতে চায় ; পরিপূর্ণ, সম্মানিত জীবনই সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত মানব-জীবনে। আদিবাসীরাও বৃহৎ মানব-সমাজের অংশ, হোক না বিচ্ছিন্ন কিংবা প্রান্তিক। তবে তাদের স্বপ্ন-সাধের সামান্যতার বিবরণে মহাশ্বেতা বরাবরই অ-আদিবাসী সমাজকে বিস্মিত করেন, শিহরিত করেন – এ উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মর্মস্পর্শী ভাষায় পাঠককে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন আদিবাসী জীবনের স্বপ্ন, পরম আকাঙ্ক্ষাকে –

> মোরা ভাতের দুখে দুখী বাবু, মোরা বেবাগি হই না, আপ্তঘাতী হই না, ভাতের সপন দেখি ছিঁড়া খোসলা গায়ে দিয়া, সপনে পাকা ধানের সুবাতাস বহি যায়, মনটো জুড়ায়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ২৫৯)

আর এক স্বপ্ন তাদের মনজুড়ে থাকে, সে স্বপ্ন জমির – কৃষিজমির। কৃষি ভারতের কৃষিজাতি জমির আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র জীবন কাটিয়ে দেয়, যদিও তাদের সে চাওয়া কখনও পাওয়ায় পরিণত হয় না, তবুও হৃদয় পিপাসার্ত থাকে জমির তরে। ঔপন্যাসিকের ছন্দোময় ভাষায় তাদের সে আকাঙ্ক্ষার গদ্যরূপ দিয়েছেন এভাবে –

> জমির তরে হাহাকার থেকে যায় তার করোটিকায়, হৃদপিঞ্জরে, সন্ধ্যার নেশার কালে, রাতে স্ত্রীর সঙ্গে মিলে যাবার মোহনায়। এ রূপান্তরভবনের একটি পর্যায়। এ পর্যায়ে যে কিষান, সে মজুর। মজদুর-কিষান এক হো – হ্যাঁ, এ পর্যায়ে মজদুর-কিষান এক মানব দেহেই এক থাকে। মিলেমিশে। কত র‍্যাঁদা-পালিশের পর অন্তরতম স্বপ্নেও সে মজদুর হবে, তা তুমি জান না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ২৬০)

কৃষি তাদের রক্তে থাকলেও আজ ভূমিহীন তারা, মজুর হিসেবে গণ্য। তবুও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কৃষিঐতিহ্যের ধারাকে তাদের মধ্যে সজীব রাখে – কেবল স্বপ্নবিলাসে নয়, প্রয়োজনে। ভাতের দুঃখে ম্রিয়মাণ আদিবাসীদের এ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবতাকে আদিবাসী-দরদী মহাশ্বেতা উপেক্ষা করতে পারেননি। ঘুরে ফিরে তাদের এ স্বপ্ন এবং তা বাস্তবায়নের সংগ্রামই তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে – এ উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আদিবাসীদের ভাতের দুঃখকে তিনি রূপকথা বলে অভিহিত করে পাঠকসমাজকে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন –

> রূপকথা তো কোনদিন পুরনো হয় না। কনকসালি, রামশাল, রূপনারায়ণ ধানের পাহাড় কেটে যারা পরের খামারে তোলে সেই রতনদের ভাতের দুঃখও তো রূপকথার মতোই। বহু প্রাচীন সে কথা, আজও তা বেঁচে আছে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ২৬০)

লেখক একটি শব্দ 'রূপকথা'র মধ্য দিয়ে বহুদিনের আদিবাসী-বঞ্চনাকে নিবিড়ভাবে প্রকাশ করেছেন।

৪.৫.৫

প্রশাসনের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক সবসময়ই বন্ধুর। ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে তো বটেই, বর্তমান স্বাধীন ভারতের প্রশাসনের বৈরিতায় বিপর্যস্ত হয়েছে তাদের জীবন বরাবরই। প্রশাসনের প্রতি তাই তারা নেতিবাচক মনোভাব লালন করে তাদের অন্তরে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সোরেনের বক্তব্যে। সোরেনের দাদি, আদিবাসী ভাষায় তার 'গড়ম আয়ু' সোরেন পুলিশ হয়েছে মনে করে কেঁদে ওঠে। কেননা যে পুলিশ আদিবাসীদের উপর বিনা কারণে গুলি চালায়, তাদের গোত্রভুক্ত হওয়া বা তাদের জীবন বেছে নেয়া অত্যন্ত ঘৃণ্য বোধ হয় তার কাছে। সোরেন পুলিশের চাকুরির মোহত্যাগ করে গ্রামে ফিরে আসে এবং স্বজাতির উন্নয়নে তার শিক্ষা-জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর সংকল্প করে। আদিবাসী ও প্রশাসনের তিক্ততার গাঢ়তা এ উপাখ্যান অনেকটাই স্পষ্ট করেছে।

৪.৫.৬

প্রকৃতি-নির্ভর আদিবাসী জীবনে দৈব-মন্ত্রে বিশ্বাস একটি সহজাত ব্যাপার। পার্টি কর্মী ইন্দ্র আদিবাসী জীবনের এ প্রান্তটি দেখেছেন বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গিতে। তেলপড়া, জলপড়া, মন্ত্র, তাবিজ – এগুলো অবলম্বন করেই আদিবাসী-অন্ত্যজেরা তাদের রোগ-ব্যাধির প্রকোপ কাটায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দ্র জানে এগুলো বুজরুকি, নিজেকে কেবল ভোলানো। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-ব্যবস্থা যাদের নাগালের মধ্যে নেই, গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেখানে ওষুধ নেই, যন্ত্রপাতি নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই – সেখানকার মানুষ যদি মন্ত্রে বা বিশ্বাসে সাময়িক উপশম পায়, তাহলে ক্ষতি কী ?

আদিবাসী মানুষেরা কেবল বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়েই জীবন ধারণ করে। তাদের সরলতা এবং বিশ্বাসের জোরের ভয়ংকর নমুনার উল্লেখও আছে এ উপন্যাসে। সাঁওতাল গোত্রভুক্ত লবণ মাঝি তার পায়ের পোড়া ঘায়ে লাগাবার জন্য হাসপাতাল থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে – ওষুধের লাল রঙে প্রলুব্ধ হয়ে তার ঘরের ছেলেপিলেরা সে ওষুধ খেয়ে নেয় এবং তাদের পেটের ব্যথা সেরে যায়। রম্য এ উপাখ্যানটি আদিবাসী জীবনের বেশ কয়েকটি প্রান্তকে উন্মোচিত করে। প্রথমত, তাদের সরলতা এবং অবশ্যই অজ্ঞতা ; দ্বিতীয়ত, তাদের বিশ্বাসের গভীরতা এবং তৃতীয়ত, খাবারের প্রতি তাদের অসীম প্রাণোদনা। আধুনিক জীবনবিচ্ছিন্ন আদিবাসী জীবনে অজ্ঞতা স্বাভাবিক ও সহজাত। তবুও পোড়া ঘায়ে লাগাবার ওষুধ খেয়ে ছেলেপিলের পেটের ব্যথা সেরে যাওয়ার ঘটনাটি দৈব নয় – বরং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী সন্তানেরা খাবারের সামান্যতাতে অভ্যস্ত, খাবারের বৈচিত্র্য তাদের কাছে কল্পনাতীত। ওষুধের লাল রং তাদের যে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করবে তা চেখে দেখার, তা যেন স্বাভাবিক। কিন্তু ওষুধ মানেই রোগের উপশম – এ গভীর বিশ্বাস ব্যতীত ঘায়ে লাগানো ওষুধে পেটের ব্যথা কমার কথা নয়, বরং উল্টোটাই সত্যি হবার কথা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সব হিসাব-নিকাশের বাইরে যাদের জীবন, বিজ্ঞানের সাধারণ প্রতিক্রিয়াটুকুও স্বভাবতই তাদের জীবনে ঘটে না।

আদিবাসী জীবন প্রধানত প্রকৃতি-নির্ভর। মূল জনপদের বাইরে বা প্রান্তে বিশেষত বন-জঙ্গলের কাছাকাছি তাদের বাস। অরণ্যচারী মানুষেরা অরণ্য থেকে সংগ্রহ করে তাদের দৈনন্দিন আহার্য। মহুয়া ফুলের পাপড়ি ওরা চাপটি ভেজে খায়। জঙ্গলের মূল-কন্দও তাদের আহার্য। জঙ্গলে মেলা শিকার – খরা, শজারু, গোসাপ তাদের প্রোটিনের চাহিদা মেটায়। জঙ্গলে মেলে না এমন বস্তু তাদের কাছে দুর্লভ। তাই ডিংলা বা কুমড়া রান্না করে খাওয়ার জন্য যে লবণ লাগে – তার যোগানে তারা ভাবিত হয়। প্রকৃতির উপর তারা নির্ভর করে বটে তবে প্রকৃতি যে তাদের উজাড় করে দেয় সমস্তকিছু – তা কিন্তু নয়। খাদ্যকষ্ট তাদের আজন্ম সঙ্গী – সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু পানীয় জলের অভাব তাদের বিপর্যস্ত করে সবচেয়ে

বেশি। মূল জনপদের প্রান্তে বা বাইরে তাদের বাস বলে কুয়োর সুবিধা তারা পায় না – নির্ভর করে নদী বা প্রাকৃতিক জলাশয়ের উপর। জাগুলায় চরসা নদীর কোলে সাঁওতালদের বাস। চরসার নিয়মিত বানে তারা ভাসে আবার চৈত্র না পড়তে নদীর বুকের জল শুকিয়ে জলকষ্ট শুরু হয় তাদের। কুয়ো নেই, কুয়ো কাটাবার সামর্থ্য নেই – তাই শুকনো মওসুমে খাবার জলও নেই। প্রকৃতির খেয়ালখুশির বলি প্রকৃতির এ সন্তানেরা রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের গ্রামে কুয়ো তৈরি হয় না, প্রাচীন দিঘিগুলির সংস্কার করা হয় না। প্রকৃতি-নির্ভর অলৌকিকতায় বিশ্বাস জন্মে পুরোপুরি ; জল নেই, তাই আকাশের জল চেয়ে পূজাপাট, জল ডাকা ইত্যাদির নির্ভরে জীবনধারণ করতে চায় তারা।

৪.৫.৭

কালের গতিতে আদিবাসী সমাজেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। কিছু আদিবাসী লেখাপড়া শিখছে – তাদের চাকরিবাকরি দেয়া হচ্ছে। কিছু আদিবাসী অফিসার হচ্ছে, মন্ত্রী হচ্ছে কিন্তু তাতে আদিবাসী সমাজের কোনো উন্নতি হচ্ছে না। ধীরে ধীরে একটি নতুন শ্রেণি জন্মাচ্ছে সাঁওতাল কিংবা অন্য আদিবাসী সমাজে। কিন্তু নিরানব্বই ভাগ আদিবাসী আছে এখনও ধানক্ষেতের নানাকাজে, কয়লা খাদানে কিংবা অন্যত্র কুলি কাজে। গ্রামীণ ধনী সাঁওতাল বা আদিবাসীদের কিন্তু শ্রেণি-বদল ঘটেনি। এ উপন্যাসে পবন কিসকুর কথা আছে – যে পনেরো বিঘা জমির মালিক – স্বজাতির অনুপাতে ধনী লোক। ওর ঝকঝকে আঙিনায় শুয়োর খোঁয়াড়, গোরুর গোয়াল, দাওয়ায় ব্ল্যাকবোর্ড, তাকে চটি চটি বই – কেননা সে তার স্বজাতির সন্তানদের সাক্ষর করাতে চায়। তবুও সে ভিন্ন শ্রেণির মানুষ নয়। সন্ধ্যার মুখে এখনও তার বউ-মা-মেয়ে খাল থেকে মাছ ধরে ফেরে। বোঝা যায়, সে শিক্ষিত এবং শিক্ষাগুণে, বুদ্ধির জোরে এবং পরিশ্রমের গুণে সে জমির মালিক হয়েছে – তবে তার স্বজাতীয়দের অধিকাংশের অবস্থানই প্রান্তিক।

৪.৫.৮

কুরুবংশীয়দের কৌরব বলে অভিহিত করা হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজিত, রাজ্য তথা জমির অধিকারহৃত কৌরবেরা সবংশে নির্মূল হয়েছে। পুরাণে স্থান পেয়েছে বিজয়ী গোষ্ঠীর মাহাত্ম্য। আদিবাসীরাও কৌরবদের মতো – তারা হারিয়েছে তাদের অধিকৃত ভূমির অধিকার, তবুও তারা হেরে যায়নি, জীবন-যুদ্ধে অক্লান্ত শ্রমে টিকিয়ে রেখেছে নিজেদের অস্তিত্ব। তাই তাদেরকে মহাশ্বেতা অক্লান্ত

কৌরবের অভিধায় অভিষিক্ত করেছেন, তাদের অবিনাশী জীবনের জয়গান গেয়েছেন পরম মমতা ও গভীর অনুরাগে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শালগিরার ডাকে

৪.৬.১

সাঁওতাল কিংবা পাহাড়িয়া শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিপটে ভেসে ওঠে অর্ধনগ্ন, অভুক্ত, অসভ্য, ভূমিহীন দরিদ্র এক গোষ্ঠীর চিত্র – যারা গোষ্ঠীর বাইরের কোনো খোঁজ রাখে না ; আবহমান কাল থেকে একই গোষ্ঠীর একই রীত-করণে বদ্ধ জলাশয়ের মতো যাদের জীবন এবং অন্তঃকরণ পঁচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে অথবা ভাবনায় রূপ পায় বিচিত্র সাজপোশাক পরিহিত যথেচ্ছা মদ ও অবাধ যৌন স্বাধীনতার অধিকারী, নাচ-গান-হল্লা প্রিয় শিকারী এক জাতি – যারা অরণ্যচারী ; সমতলের মানুষ তারা নয়। সমতলের মানুষের সঙ্গে তাদের ভিন্নতা প্রায় সব ক্ষেত্রে। আদিবাসী সম্পর্কিত এই রোমান্টিক কিংবা হীন-ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় মহাশ্বেতা দেবী *শালগিরার ডাকে (১৯৮২)* উপন্যাসে ঔপনিবেশিক পূর্ববর্তী স্বাধীন সাঁওতাল জীবন, তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গৌরবালেখ্য রচনা করেছেন। ইংরেজ ঔপনিবেশের বিরুদ্ধাচরণ কিংবা ঔপনিবেশিক শক্তিকে অস্বীকার করে খাজনা না দিয়ে নিজেদের স্বাধীন-সত্তা অক্ষুণ্ন রাখতে বাবা তিলকা মাঝির যে লড়াই বা সংগ্রাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, তা এ উপন্যাসের অবয়ব গড়ে তুলেছে এবং সেই সঙ্গে বর্তমান সময়ের পাঠককে আদি জনগোষ্ঠীর প্রতি কৌতূহলী করে তাদের জীবনাচারণের এক অজানা মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দ দিয়েছে।

‘ভারতের আদিবাসী সমাজকে’ উৎসর্গীকৃত *শালগিরার ডাকে* উপন্যাসটি মহাশ্বেতা দেবী রচনা করেন আদিবাসীদের তথা ইতিহাসের প্রতি দায়িত্ব ও ঔচিত্যবোধ থেকে। সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনি ভারতবর্ষীয় মানুষদের যথেষ্ট জানা নেই বলে ভাগলপুরে তিলকা মাঝির নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সেখানকার মানুষের মধ্যে বিতর্ক হয়। স্মরণীয় শহীদ হিসেবে বাবা তিলকা মাঝির কথা জানা নেই অথবা ভাগলপুরে তার ফাঁসি হয়নি, এ দাবিতে তিলকা মাঝির মূর্তি স্থাপনে অনেকে বিরোধিতা করেন। মহাশ্বেতা দেবী এ বিতর্কে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে জড়াননি, কিন্তু *শালগিরার ডাকে* রচনা করে এর যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন –

> বাবা তিরকা (ইংরেজি থেকে অনুদিত এ সাক্ষাৎকারে অনুবাদক ‘তিরকা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।) মাঝির বিদ্রোহই (১৭৮০-৮৫) হল প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই বিষয়ে আমি অনেক চিঠি পাই, কারণ আমি বাবা তিরকা মাঝিকে নিয়ে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছিলাম, লেখাটা যদিও খুব ভাল হয় নি। শেষ অব্দি তাকে

> ফাঁসিতে ঝোলানো হয় আর ভাগলপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে তার একটি মূর্তি বসানো হয়। এখন জায়গাটা তিরকা মাঝি চক নামে পরিচিত। উপজাতি ভোটারদের তুষ্ট করার জন্য সরকার সাঁওতাল বিদ্রোহী বীর সিধু-কানুর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। ভাগলপুরে বাবা তিরকা মাঝি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। সেখানেও ওরা একটি মূর্তি বসাতে চেয়েছিল। ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু লোক দাবী করেছিলো যে তিরকা মাঝি একটি অলীক কাহিনি, এরকম কিছু কখনো ঘটে নি। আমি সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে ওদের লিখেছিলাম। তিরকা মাঝির নাম সরকারী ইতিহাসে উল্লেখিত হয় নি। (গায়ত্রী ১৪১৮ : ৩৭৮)

উপন্যাসের শেষাংশে তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, ভাগলপুর বাজারে তিলকাকে কোড়া মারা হচ্ছে এবং তাকে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে –

> ভাগলপুরে বটগাছে বাবা তিলকা মাঝির রক্তাক্ত শরীর ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে জল্লাদ মেলে না কিছুতেই। শেষে এক ইংরেজ সৈন্য উঠে এল।
>
> ভাগলপুর। ১৭৮৫ সাল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৪৬২)

তথাকথিত উন্নত সভ্যতার অধিকারী উন্নাসিক মানুষদের মানসিকতাকে কুঠারের আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে ‘প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের’ নায়ক বাবা তিলকা মাঝির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাস রচনা করেছেন।

উপন্যাসের কালসীমা পলাশীর যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের প্রাথমিক কাল। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আদিলগ্ন এবং পূর্ববর্তী মারাঠা দস্যু – বর্গি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত বাংলায় শান্ত নিরুপদ্রব সাঁওতাল-পাহাড়িয়া জীবন-চেতনা, সংস্কার, ধর্ম-দেব-দেবী, উৎসব, আচার-রীতকরণ ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট বিষয়। পাহাড়িয়াদের জুম চাষ, ‘জঙ্গল হাসিলি’ সমতল জমিতে সাঁওতালদের ধান-ডাল-সর্ষের চাষ, কার্পাস থেকে সুতো কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনা, আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ‘বিনিময় প্রথা’, কাঁড় ধনুক দিয়ে শিকার, বিভিন্ন উৎসব-পরবের সমৃদ্ধ অথচ খাজনাহীন স্বাধীন জীবনে ঔপনিবেশিক শাসনের বিষময় প্রভাবের ইতিহাস এ কাহিনিতে বিস্তৃত। তার সঙ্গে বাংলার মানুষকে পঙ্গু-ভিখারি করার লক্ষ্যে সুকৌশলে জমিদার-গোলদার-তহসিলদার প্রভৃতি দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সহায়তায় ১১৭৬ বা ১৭৭০ সালের ভয়াবহ ‘মন্বন্তর’ সৃষ্টি, পাইক-বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনার সমন্বয়ে উপন্যাসের কাহিনি, পটভূমি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ‘বস্তুত, কথাসাহিত্যের বিস্তীর্ণ পরিসরে *শালগিরার ডাকে* মহাশ্বেতার ব্যতিক্রমী সৃষ্টি – এটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের স্বাদবাহী, বিচিত্র ও অজ্ঞাত জীবনকাহিনি নিয়ে পাঠকের দরবারে উপস্থিত (সুবোধ ২০১০ : ৩৩৯)।

৪.৬.২

আর্যদের আগমনের পূর্বে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদি জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে ভারতবর্ষে – ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি সবাই এ বিষয়ে একমত। কোথা থেকে তারা এসেছিল তার সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়নি আজও। তবে তাদের পুরাণে তাদের আদি বসতির উল্লেখ আছে। এ উপন্যাসেও তেমন একটি পুরাণ-কথা তিলকাকে শোনায় তার গড়ম্ আয়ু বা ঠাকুমা। সাঁওতাল জীবন জানার লক্ষ্যে দীর্ঘ পুরাণটি উদ্ধৃত হল ঠাকুমার জবানিতে –

> গোণা যায় না রে, আকাশে যত তারা দেখিস, তা কি গুণতে পারিস ? তেমন অগণন, অগণন চাঁদ আগেকার কথা। তখন এ ভুবনে কোথাও কিছু ছিল না। কেউ নেই, কিছু নেই, কোথা থেকে উড়ে এল এক ধবধবে সাদা বুনো হাঁসিল। এত বড় হাঁস, দুধের ফেনার মত সাদা, আকাশের ইন্দা চাঁদের মত সাদা। সেই হাঁসিল পাড়ল দুটি সাদা, গোল বেলে।
>
> সেই বেলে ফুটে বেরিয়ে এল একটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারাই আমাদের প্রথম মা, প্রথম বাবা। পিলচু বুড়ি, পিলচু হাড়াম। এদের সন্তাদের থেকে এল প্রথম সাতটি গোত। কে বলে তারা আহিড়িপিড়িতে ছিল। তখনকার কথা তিলকা, সব যেন অনেক জানি, অনেক জানি না। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে তারা এল খোজকামান। এখন বল দেখি আমাদের কি কি পরব দেখিস ?
>
> আখন, মাঘ-সীম, সার্জোম বাহ, আরে-সীম, মাহ্মারে, রোহিন, আষাঢ়িয়া, মোর আতি, নাওয়াই, জন্তাল, বোঙ্গা-রাকাব, শাক-রাত কত কব ? এই এ-ত পরব।
>
> হ্যাঁ হ্যাঁ । তা পরব তো করি, করতে হয়। কিন্তু খোজকামানে ওদের কিসে বা দোষ হয়ে গেল, ব্যস।
>
> কী হল ?
>
> আকাশ থেকে যেমন জল নামে শ্রাবণে, তেমন নামল আগুন। আগুনের বৃষ্টি পড়ল খোজকামানে। এক মেয়ে, এক মরদ উঠল হারৎ পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে আগুন নামল না। আর সব পুড়ে মরে গেল।
>
> তারপর মেয়েমরদ গেল সমান জমিনের দেশ শাশাংবেডা। তারপর গেল জারপিতে। জারপিতে ছিল মারাংবুরু। পাহাড় পেরিয়ে যে আন-দেশে যাবে তার পথ কোথায় ? মারাংবুরুর বোঙ্গাকে পূজা করলে তারা। পাহাড়ের দেবতা খুশি হয়ে তাদের পথ দেখিয়ে দিল। সেই পথ ধরে এল আহিরি। আহিরিতে চাষবাষ শিকার করে ঘর বেঁধে বসল তারা। মানুষ তো অনেকটি হল ছেলেপিলে হয়ে। তখন তারা এল কেন্ডি, তারপর এল ছায় দেশে। তারপরে এল চাম্পা। চাম্পা দেশে অনেক অনেক কাল ছিল সাঁওতালরা। কিন্তু ফলে ফুলে ধানে বনে চাম্পাকে সাজিয়ে নিল যারা, তাদের দেশ দখল করল অন্য সব মানুষ। তখন তারা এল সাওন্ত দেশে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪২৩)

সম্ভবত 'সাওন্ত' স্থানের নামেই এ জাতির 'সাঁওতাল' নামকরণ করা হয়েছিল (প্রভাস ২০০৫ : ৩২৯)। এ কাহিনিতে আহিড়িপিড়ি, খোজকামান, হারৎ পাহাড়, শাশাংবেডা, জারপি, আহিরি, কেন্ডি, চাম্পা প্রভৃতি স্থানের নাম পাওয়া গেলেও ভৌগোলিকভাবে তাদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়নি। তবে বর্তমানে সাঁওতালরা

পরেশনাথ পাহাড়কে মারাংবুরু দেবতা বলে কল্পনা করে থাকে (আবদুস সাত্তার ১৯৭৫ : ৩৬০)। কোন কোন গবেষক অনুমান করেন, 'সাঁওতালদের আদিতম বসতি চায়চাম্পা ছিল হাজারিবাগ মালভূমির উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত।' (আবদুস সাত্তার ১৯৭৫ : ৬) সাঁওতাল পুরাণ অনুসারে রাজহাঁস থেকে সৃষ্টির সূচনার যে কাহিনি পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রাচীন গ্রিক পুরাণের সাদৃশ্য আছে। গ্রিক পুরাণে এক রাজহাঁসের উল্লেখ আছে, যে সোনার ডিম পেড়েছিল, এ রাজহাঁসকে সৃষ্টিশীলতার উৎস ধরে পরবর্তীকালে ইউরোপে "Mother Goose" নামে কাহিনি ও লোকছড়ার pantomime প্রচলিত হয়েছে। Mother Goose নামটি সাঁওতালদের পুরাণের আদিমাতা রাজহাঁসের সঙ্গে আশ্চর্য সাযুজ্য স্থাপন করে এবং সাঁওতাল সভ্যতার সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার ঐক্য নির্দেশ করে।

উপন্যাসের ক্ষুদ্র পরিসরে বিশাল আদিবাসী জীবনকে রূপ দিতে অনিবার্যভাবেই মহাশ্বেতা দেবী আশ্রয় নিয়েছেন নানা পুরাণ, লোককথা ও গানের। আদিবাসীদের লিখিত সাহিত্য বা ইতিহাস নেই বলেই তাদের সকল কথা অন্ধকারগর্ভে তলিয়ে গেছে। যেটুকু বেঁচে আছে তা মূলত গানে গানে মুখে মুখে। এ উপন্যাসে মহাশ্বেতা 'রাজবৃত্ত' নয়, 'লোকবৃত্ত'-র ইতিহাস লিখেছেন। সমগ্র আদিবাসী সমাজ যে বৃহত্তর এক বন্ধনে আবদ্ধ তা প্রতিনিয়ত তারা স্মরণ করে তাদের লোকগীতির মধ্য দিয়ে। তাদের গোত্র আলাদা, গ্রাম আলাদা কিন্তু গিরার বাঁধনে বাঁধা তারা অর্থাৎ বৃহত্তর এক সমাজ। তাই সাঁওতালরা পাহাড়িয়াদের বিপদে তাদের চাল কর্জ দিয়ে সাহায্য করে ; বিপরীতে হুলের সময় সাঁওতালরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে, পাহাড়িয়ারা তখন সাঁওতালদের কৃষিজমিতে চাষবাষে সাঁওতাল রমণীদের প্রধান সহায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্বে গোলদারদের চাল কেনার তাগিদে বিচলিত হয়ে, কোশানি নদীর ধারে মস্ত প্রান্তরে বিশাল সাঁওতাল জমায়েতে গ্রাম-মাঝির চাল বিক্রি করে শৌখিন জিনিস না কেনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয় সকলকে – ফলে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে বেঁচে যায় সাঁওতাল সমাজ। এ অদ্ভুত একাত্মবোধের বিবরণ গীতময় ভাষায় ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন –

> তিলকা বুঝল, কত বড় সমাজের মানুষ সে। ছড়ানো ছিটানো গ্রামে গ্রামে কে কোথায় আছে, সবাই গিরার বাঁধনে বাঁধা। সব হেমব্রম-মুর্মু-টুডু-কিসকু-সরেন-হাঁসদা-বাস্কে গিরার বাঁধনে বাঁধা। সকলে এক পরব করে, একভাবে গান বাঁধে ও নাচে, এক সার বেঁধে চলে, এ-ওর চাষবাসে সাহায্য করে, একভাবে সমাজের শাসন মানে। এই ভরসা আছে বলেই সাঁওতাল এমন আত্মস্থ, আত্মসম্মানী। সাঁওতাল সমাজে তাই জীবন আনন্দ করে বাঁচার উৎসব। আর মরণ ?
>
> সওয়া ধারতিরে হাসা হড়মরে
> লান্দায় লেকাকে জিউয়ি মেনাঃ।
> নওয়া জিউয়ি দ শিশির দাঃ লেকা

অক দিশম চং অটাং চালাঃ।

এ পৃথিবীতে এই মাটির শরীরে

প্রাণের বাসা, প্রাণের হাসি

এ জীবন ভোরের শিশির

কেউ জানে না কখন তা মিলাবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪২৫)

জীবন ও মরণের কঠিন দার্শনিকতাকে সহজ কথায় সহজ সুরে প্রকাশ কেবল গানেই সম্ভব। তাই জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা মনের উল্লাস বা বেদনাকে বা জীবন-সত্যকে গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। গান আদিবাসী-জীবনের এক অপরিহার্য উপাদান।

৪.৬.৩

শিকার আদিবাসী জীবনের এক প্রধান অবলম্বন। জঙ্গল থেকে শিকার করে আনা বরা, খরগোশ প্রভৃতিতে ক্ষুণ্নিবৃত্তি হয় তাদের। জীবন-ধারণের এই প্রাত্যহিক অঙ্গ কেবল প্রাত্যহিকতার সাধারণত্বে হারিয়ে যায় না ; রীতিমত পরব করে তারা শিকার এবং শিকারী জীবনকে ভিন্ন মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। শীতের শেষে তিনদিন ধরে তারা শিকার উৎসব করে। তাদের সর্বাধিক প্রিয় উৎসব এটি। এ তিনদিন কেবল উৎসব আর উৎসব – ঘরে ফেরা নেই। এ উৎসবে একাত্ম হয় সকল গ্রাম। 'দশটি, বিশটি, পঞ্চাশটি গ্রামে এক পরগণা। তার মাথা পরগনায়েত। পরগনায়েতরাও এক হয়। সকলে এক হয়ে শিকারের দিন ঠিক করে। পুরুষরা এ উৎসবে দিনমান শিকার খেলে বিকেলে এক জায়গায় সমবেত হয়। সেখানে আগুন পোহাও, শিকারের মাংস খাও, পালা করে কেউ জাগো, কেউ ঘুমোও। তিনদিন বাদে সকল গ্রাম প্রধান এক হয়ে জঙ্গল জ্বালানো জমিতে বসে লো-বির সেন্দ্রা বা সেন্দ্রা-দুরুপ-এ। এ হল চূড়ান্ত বিচার সভা। এখানে বসে সবাই যে যার গ্রামের অভিযোগ শোনে, বিচার করে মাঝিরা, পরগনায়েতরা। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪২৪)

শিকার পরবের প্রথম রাতে আগুন জ্বেলে বসে তারা গান করে, গান শোনে। পঞ্চাশ গ্রামের শত শত আদিবাসী মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় –

বাহারেদ সহরায় বেদ

ইঞ হঁ দাদা লাই আঞপে,

ইঞ হঁ দাদা আপে জাতি গে।

আপে রেয়াঃ দেওয়া সেবা

ইঞ হঁ দাদা বাতায় গেয়া

ইঞ হঁ দাদা আপে জাতি গে।

সেন্দ্রারে দ কারকারে দ

বলনরে সে নেওতাঞ পে,

ইঞ হঁ দাদা আপে জাতি গে।

আমাকে ডাকো তোমাদের বাহা আর সোহরাই পরবে

সত্যি বলতে কি দাদা

আমি তোমাদের একজন হয়ে গেছি।

তোমাদের পরবপূজায় স-ব আমার জানা

সত্যি বলতে কি দাদা

আমি তোমাদের একজনই হয়ে গেছি।

যখন শিকারে যাও তখনো ডেকে নিও আমাকে

সত্যি বলতে কি দাদা

আমি তোমাদেরই একজন হয়ে গেছি ॥ (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪২৫-৪২৬)

এ সময় গানে গানে তারা তাদের অতীতকে স্মরণ করে – দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে হাজির করে তাদের অতীতের গৌরবের অংশীদার করে তোলে –

চাম্পা থেকে সাওন্ত

কত পথ, কত কত পথ

নাগারা মাদল বাঁশির সুরের পথ

ছেলে পিঠে, মাথায় বোঝা, হাঁটার পথ

কত পথ, কত কত পথ

তারপর শাল বন আর ধূ ধূ মাঠ

আর নেচে চলা নদী

সব আমাদের ডেকে নিল

ঝকমকে পিতলের থালার মতো সূর্য না ডুবতে

ঝকমকে পিতলের থালার মতো চাঁদ উঠেছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪২৬)

শিকার তাদের অন্যতম জীবিকা হলেও একমাত্র নয়। সমতলের সাঁওতালরা প্রধানত কৃষিজীবী। দারুণ পরিশ্রমী সাঁওতালরা জঙ্গল জ্বালিয়ে, বন কেটে, অফলা জমিনে ফলায় অফুরান শস্য। তাই বর্ষাকাল তাদের প্রার্থিত। বর্ষাকালে ধান রোয়ার সময় মেয়েরা গান গায় আর ধান রোয় –

নদীর ধারে বনের ধারে
ফুল ফুটেছে ফুল ফুটেছে
ভাদ্র মাসের ফুল।

বাঘ ডাকে না পাহাড়তলায়
বাঘ ডাকছে পাহাড়চূড়ায়
ভাদ্র মাসের দিন।

ফুল তুলেছি চুলে পরেছি
ফুল তুলেছি কানে পরেছি
ভাদ্র মাসের ফুল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪২৮)

অফুরান শস্য এবং সুফলা জমির লোভে কোম্পানি সরকার আদিবাসী জমিতে খাজনা ধার্য করে। আমন ধানের জমিতে বিঘা প্রতি ছ'আনা খাজনা, রবিশস্যের জমিতে তিন আনা এবং আমন ও রবি খন্দের একই জমিতে আমনের জন্য ছ'আনা ও রবির জন্য তিন আনা মোট নয় আনা খাজনা ধার্য করা হয়। কোম্পানি নিযুক্ত তহসিলদার পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে ধান কাটার পর আদিবাসীদের গ্রামে আসে খাজনা আদায় করতে। আদিবাসীরা তহসিলদারের জুলুম নিয়ে গান রচে –

মাথায় পাগ ফরফর
পায়ে জুতা মচমচ
কানে কলম কানের শোভা
চোখ ঘুরে বন বন
ধান-চাল-গরু- মোষ দেখে নেয়
আর খাজনা ধরে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪৪৮)

কোম্পানি শাসনের আগে সাঁওতালদের কেউ খাজনার আওতায় ফেলেনি। কোনো সুবাদার তাদের কখনও ঘাটায়নি। রাজা, জমিদার বরং তাদের দুর্গাপূজায় পাহাড়িয়াদের, সাঁওতালদের ফল, মিষ্টান্ন, কাপড়, পাগড়ি পাঠিয়ে মান দিয়েছে, সম্পর্ক ভাল রেখেছে। নির্বিবাদে কোম্পানির শাসনাধীন হওয়া তাই সম্ভব ছিল না পাহাড়িয়া-সাঁওতালদের। ফলে তারা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমনে কোম্পানি পাঠায় সৈন্য। সমতলের সাঁওতালরা সৈন্য আগমনের খবর পেয়ে জানায় পাহাড়িয়াদের। পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বেলে

পাহাড়িয়ারা তাদের গোত্রের সকলকে সে-লড়াইয়ে সামিল হতে আহ্বান জানায়। লড়াই নিয়ে বাঁধা হয় গান –

আগুন জ্বলে আগুন জ্বলে
সাহেব আসে ঘোড়ার পিঠে
খেরকাট খেরকাট খেরকাট।
আগুন জ্বলে আগুন জ্বলে
সাহেব আসে ঘোড়ার পিঠে
খেরকাট খেরকাট খেরকাট।
সিপাইদের পায়ে পট্টি কোমরে পেটি
ঘেরকাট ঘেরকাট ঘেরকাট।
হো, তিলকা মুর্মু হো !
আমরা তিরের ফলা শানাই
হো, মনসা হো !
আমরা তোমাদের মেয়ে-শিশু আগলাই।
চেরকাট চেরকাট চেরকাট ॥
আমরা তিরের ফলা শানাই
হো, মনসা হো !
আমরা তোমাদের মেয়ে-শিশু আগলাই।
চেরকাট চেরকাট চেরকাট ॥ (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪৩৮)

তিতাপানি নালার ধারে পাহাড়িয়ারা কোম্পানি সৈন্যদের কচুকাটা করলে আবার গান ধরে –

তিতাপানির জল লালে লা-ল
তিতাপানির পাথর লালে লা-ল
তিতাপানির বালি লালে লা-ল।। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪৩৮)

আদিবাসী সাঁওতালদের বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চায় ব্রিটিশ ফৌজ। তারা সাঁওতাল গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। সে-আগুনের তাপে পালান্ রবিদাস দু'চোখ হারিয়ে অন্ধ। তবুও সে বিদ্রোহী দলে সামিল হয়, তিলকা মাঝির অনুচর হিসেবে গান গেয়ে সে উদ্দীপ্ত করে সকলকে ; কাঠের ঠকঠকি বাজিয়ে সে গায় বিষাদের গান –

ঘর পুড়েছে ছাই উড়েছে
ভিটায় গজায় বন
গোহাল ঘরে বনটিয়া

রুককন কোথা, ঝুককন কোথা

সুখন লছমন শাবন কোথা

আমি নুক্কন, আমি গোহালে

আমি ঝুক্কন, আমি ঘরে।

সুখন লছমন শাবন ঘুমায়

বাজরা ক্ষেতে নদীর চরে।। (মহাশ্বেতা ২০০৩ / ১০: ৪৫৬)

বিষাদের গান শেষে দুঃখ-বিষাদের ভার ফেলে সে ধরে যুদ্ধজয়ের প্রেরণার গান, নতুন দিনের আশাবাদের গান –

নুসাসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে হঁ বাকো তেঙ্গোন,

খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো,

খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো,

দিশম দিশন দেশমাঞ্জহি পরগানা

নাতো নাতো মাপাঞ্জিকো

দঃ কেন দাবাং বোন বাং গেকো তেঙ্গোন

তবে গেবোন হুলগেয়া হো। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪৫৬)

এসব গানের মধ্য দিয়ে আদিবাসী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে ধারণ করা হয়েছে। বস্তুত গানের মধ্য দিয়ে আদিবাসী-জীবনের সবচেয়ে কাছাকাছি যাওয়া যায়। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন –

> এই মানুষগুলোর কথা কেউ লেখেনি, ওদের লিপিও নেই। ওরা ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী নিয়ে গান বাঁধে। সেগুলি গান হয়ে, কথা হয়ে, কিছু একটি হয়ে যায় ...একটি ধারা। (গায়ত্রী ১৪১৮ : ৩৭৮)

বস্তুত গানের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে আদিবাসী জীবন ও জীবনাতিহাস। গানগুলো বেঁচে থাকে এবং সেই সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখে আদিবাসী জীবনের সামগ্রিক সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে।

৪.৬.৪

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-লৌকিকতার সামগ্রিক বিবরণে *শালগিরার ডাকে* উপন্যাসটি আদিবাসী জীবনের এক বিশ্বস্ত দলিলে রূপ নিয়েছে। আদিবাসীদের সমাজবন্ধনই সব। শিশু জন্মালে জনমচাতিয়ার আর কোকো-চাতিয়ার অনুষ্ঠান করলে শিশুর নামকরণ হয়, সে সমাজের একজন হয়। একের ঘরে শিশু জন্মালে সকল

গ্রামের অশৌচ চলে। সমাজবন্ধন এর নাম জাতকর্ম, নামকরণ হল, গ্রামসমাজকে খাওয়ালে ভাত, হাঁড়িয়া। অশৌচ কাটল।(মহাশ্বেতা ২০০৩/১০: ৪২৫)

অন্যত্র দেখা যায় আদিবাসীদের পুরোহিত নায়কে স্নান করলে সবাই শুদ্ধ হয়। চৌদ্দ বছর বয়স হলে ছেলেরা শিকার পরবে যাবার ছাড়পত্র পায় অর্থাৎ গ্রামসমাজ ওদের সাবালক বলে স্বীকার করে নেয়। এর আগে দশ বছর থেকে তেরো বছর অবধি ছেলেরা দল বেঁধে গ্রামের কাছাকাছি শিকার করে। ছেলেদের মতো মেয়েদেরও পরিণত বয়সে বিয়ে হয়। জন্মের মতো মৃত্যুতেও এদের অশৌচ চলে। অপঘাতে মৃত্যু হলে মৃতদেহের সৎকার করা হয় না, গভীর কোনো খাদে ফেলে দেয়া হয়। কেননা তাদের রীতিতে 'অপঘাতে মৃত্যু, অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনো প্রথা-অনুমোদিত শবাচার নেই।' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪১৯) অপঘাতে কেউ মারা গেলে মনে করা হয় যে, গ্রামে কাই অর্থাৎ পাপ ঢুকে যায়।

কেবল জন্ম ও বিয়ে নয়, আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের খুঁটি-নাটি উপাদান, এমনকি খাদ্যাভ্যাস পর্যন্ত মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন – পূর্ণ করেছেন আদিবাসী জীবন-বৃত্তকে। সাঁওতালরা মহুয়ার তেল দিয়ে বাতি জ্বালায়, রিঠা দিয়ে কাপড় সাফ করে, কাপাস তুলোয় সুতো কাটে। সেই সুতোয় তাঁতে বোনা কাপড় তারা পরিধান করে – এ তথ্যগুলো সবই পাওয়া যায় এ উপন্যাসে।

এ উপন্যাসে উপনিবেশ-পূর্ব সমৃদ্ধ আদিবাসী জীবনকে অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে তাদের খাদ্যাভ্যাসে দেখানো হয়েছে প্রাচুর্য। সাঁওতালরা বাথুয়া শাক, খাম আলু, ভাত, বেগুন পোড়া, খরগোশের মাংস, করমচার আচার, চিড়ে-মুড়ি ইত্যাদি খেতে ভালোবাসে। মালপাহাড়িয়ারা উৎসবের দিনে পাঁঠার মাথা দিয়ে খিচুড়ি বানিয়ে খায়, বন্যপ্রাণীর মাংস খায়। দুর্দিনে খায় তারা বনের মূল-কন্দ, কলাই সেদ্ধ, চিনা ঘাসের দানা ইত্যাদি।

আদিবাসীরা অত্যন্ত ধর্মভীরু। সাঁওতালদের তিন প্রধান দেবতা 'মঁড়েঁকো', 'মারাংবুরু' ও এঁদের বোন 'জাহের এরা'। মঁড়েঁকো হল প্রধান দেবতা – তার পূজা করা হয় মনের সাধসাধনা মেটাতে, ভাল শস্য পেতে, রোগব্যাধি দূর করতে। মঁড়োঁকোর পূজা বড় পূণ্য পূজা। এ পূজায় দেওয়া হয় লাল মোরগ, লাল পাঁঠা। মঁড়োঁকোর বড় ভাই মারাংবুড়ো অত্যন্ত অল্পে তুষ্ট দেবতা। তাঁর পূজায় বলি দেওয়া হয় সাদা মোরগ, সাদা পাঁঠা। আর বোন জাহের এরার পূজায় বলি দিতে হয় লাল মুরগি, লাল ছাগী। পাহাড়িয়ারা ঘরে ঘরে গাঁওদেবতা পূজা, সূর্য পূজা করে। এ পূজা হয় রবিবারে। অন্য জাতির লোক এ পরবের দিন এলে পূজায় দোষ লেগে যায় বলে ধরে নেয়া হয়। মালপাহাড়িয়ারা গাঁওদেওতার পূজায় প্রথমে পায়রা, তারপর পাঁঠা ও শেষে মোরগ বলি দেয়। ওদের পুরোহিতকে বলে দেহ্রি। বলির রক্তমাখা চাল তারা ঘরে

নিয়ে রাখে – কেননা তাদের বিশ্বাস এই যে, এ চাল ঘরে থাকলে বিপদ বা অমঙ্গল দূরে থাকবে। এরা সিঁদুর লেপা ডিম ভাঙে দেবতার থানে তারপর চলে নাচ-গানের উৎসব।

আদিবাসী সমাজে যেমন জাতিভেদ নেই, তেমনি নেই লিঙ্গ-বৈষম্য। তাদের সমাজে নারী-পুরুষ একত্রে কাজ করার সূত্রে এ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় –

> তিলকা আর রূপা এখন দশ হাতে খাটে। মাঠে যায় দু'জনে ; শিকারে যায় তিলকা। তিতাপানিতে মাছ ধরে রূপা, ধান কাটে দু'জনে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪৪১)

কাজের এমন সুষম বণ্টন সম্ভবত আদিবাসী সমাজেই সম্ভব।

অসামান্য একতা ও সমাজবন্ধনে ঋদ্ধ সাঁওতাল সমাজ। তাদের কাছে সবচেয়ে ভয়ানক শাস্তি 'বিটলাহা' অর্থাৎ সমাজের বার হওয়া। এ শাস্তির ভয়ে ভীত আদিবাসীরা গ্রামে গ্রামে সমাজপতিদের শাসন মেনে চলে। তাদের সমাজে বেঈমানি নেই, বিবাদ নেই, মিথ্যা নেই। সকলে সকলের তরে জীবন দিতে প্রস্তুত। তিলকার ঠাকুরদাদা অর্থাৎ সুন্দ্রার বাবা পাহাড়িয়াদের গ্রামে হাতি তাড়াতে গিয়ে নিহত হন। কেননা তাদের ভাষ্যে –

> আগুন নিভাতে, হাতি তাড়াতে তোমরা আমাদের আমরা তোমাদের। চিরকাল।...জঙ্গল সমাজের প্রাচীন নিয়ম। যে বিপদ সর্বজনীন, তার মোকাবিলায় সকলকে যেতে হবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪১৯)

একতাবদ্ধ সাঁওতাল সমাজে জরুরি প্রয়োজনে অন্যগ্রামের লোকদের আহ্বান করার জন্য শালগাছের ছালে গিরা (শালের ডাল) বেঁধে প্রচার করে। পাহাড়িয়ারা পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বেলে সবাইকে ডাকে।

ধার দেয়া বা সুদ নেয়ার প্রচলন আদিবাসী সমাজে একেবারে নেই। সরল আদিবাসীরা মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী – তাদের কাছে লোভ অর্থাৎ সুদ অধর্ম –

> তোমাকে দরকার এখন এক ধামা চাল দিলাম। ফেরত নেব কি দুই ধামা ? সেটা অধর্ম হয়ে গেল না ? (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৪৩১)

এ প্রশ্নের সহজতা কিংবা সরলতা লজ্জিত করে সভ্য-সমাজকে সেই সঙ্গে আদিবাসী সমাজের মানবতা কিংবা সরলতাকে প্রকটিত করে।

নিয়ম-কানুনের কঠোর শাসনে একতাবদ্ধ আদিবাসী জীবন কিন্তু বাস্তবিক বদ্ধপানা-পুকুর নয় – পরিবর্তনের ইতিবাচকতায় তারা তাদের গ্রামে ছুতার-কামার-কুমারের বসতি করে দেয় এবং সে-সূত্রে পরিচিত হয় অন্যজাতির মানুষের রীতি-নীতির সঙ্গে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ভালোত্বটুকুকে আহরণ

করে নির্দ্বিধায় এবং হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ। উপন্যাসের একাধিক স্থানে ঔপন্যাসিক সে-সূত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন – রূপার সন্তান হবার পর কামার রতনমণির স্ত্রীর নির্দেশে তিলকার মা সনা মরিচ ও কালোজিরা বাটে নতুন মায়ের জন্য। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তারা অ-আদিবাসীদের কিছু আচার গ্রহণ করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ন না করে।

৪.৬.৫

শালগিরার ডাকে উপন্যাসের অবয়বে ঔপন্যাসিক একদিকে যেমন উপনিবেশ-বিরোধী প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের বিস্মৃত ইতিহাসকে পাঠকের স্মরণে উজ্জীবিত করেছেন, তেমনি সমকালীন অন্যান্য সংগ্রামের পটভূমিতে এ বিদ্রোহের রাজনৈতিক গুরুত্বকেও অবহিত করেছেন। ১৭৮০ সাল থেকে মহীশূরের হায়দার আলি ফরাসিদের সহায়তায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ছেন। হায়দারের বিরুদ্ধে সেনা পাঠাতে ইংরেজদের ওড়িশার দখল প্রয়োজন। ওড়িশার দখল মানে মেদেনীপুর ও বীরভূমের জঙ্গলমহালের জমিদার ও আদিবাসীদের অনুগত রাখতে হবে। এ সময়ে মেদেনীপুর উত্তাল ছিল ঘড়ুই-বিদ্রোহ ও প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহে, চলছিল সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। এ কালপটে রাজমহল ও ভাগলপুরের মাঝামাঝি জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় তিলকা মুর্মুর নেতৃত্বে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের সম্মিলিত বিদ্রোহ ইংরেজদের ভীষণ অসুবিধায় ফেলে দেয় ; নির্মমভাবে দমন করে তারা এ বিদ্রোহ। তবুও আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের এ সংগ্রাম এবং তাদের কৌমজীবনের গৌরব-কথায় আলোচ্য উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হুলমাহা

৪.৭.১

১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল-বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঔপনিবেশিক শাসন, দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মূলোৎপাটন সর্বোপরি স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য কায়েম করার জন্য প্রায় দেড় বছরব্যাপী সাঁওতালরা কেবল তীর-ধনুক এবং বর্শা-টাঙ্গির সাহায্যে যে যুদ্ধ করেছে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, সমরে দক্ষ ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে – ইতিহাসে তা অনন্য। সাঁওতালদের ভাষায় 'বিদ্রোহ' মানে 'হুল' – এই হুলের সামগ্রিক কাহিনি *হুলমাহা*[১৫] উপন্যাসে ধারণ করা হয়েছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ, তাদের শোষণ-বঞ্চনার স্বরূপ এবং সাঁওতাল জীবনের নীতি-নৈতিকতা ও তাদের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার অনুপম জীবন-ভাষ্যে বিদ্রোহের পটভূমি এবং তাদের বিদ্রোহের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত নির্মাণ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী অসাধারণ মমত্ব ও আন্তরিক ভালবাসায়। সত্তর দশকের পরবর্তী সময় থেকে মহাশ্বেতা দেবী ভারতবর্ষের আদিবাসীদের নিয়ে তাঁর লেখনীকে সচল রেখেছেন। আদিবাসী-দরদী ভূমিকায় অনতিক্রম্য এ লেখকের পক্ষে সাঁওতাল-বিদ্রোহকে অবলম্বন করা অনিবার্য ছিল। তবে অনতিদূর কাল-পরিসরে সংঘটিত এ বিদ্রোহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম সংঘটিত যুদ্ধ বলে বহুল-চর্চিত এবং ইতিহাসে অনুপুঙ্খ বর্ণনা-সমেত রক্ষিত। ইতিহাসে যেহেতু এ বিদ্রোহের কারণ, সংঘটনের প্রতিদিনকার ঘটনাবলির ও চরিত্রের বিবরণ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরিত্রের মুখ-নিঃসৃত সংলাপ পর্যন্ত রক্ষিত রয়েছে সে-কারণে এখানে কল্পনার অবকাশ কম রয়ে যায়। এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রায় রেখায় রেখায় ইতিহাসকে আশ্রয় করেছেন – কোথাও সামান্যতম বিচ্যুত হননি তবে ঐতিহাসিক তথ্যসমূহকে তিনি উপস্থাপন করেছেন ব্যক্তিগত আবেগের আশ্রয়ে, সাঁওতাল জীবন এবং বিদ্রোহের নায়কদের মনোকথনে, আবেগের উৎসরণে সাঁওতাল বিদ্রোহের এক অনুপম ভাষ্য নির্মাণ করেছেন আর এখানেই ইতিহাস থেকে উপন্যাস স্বতন্ত্র হয়েছে, হয়েছে অনবদ্য।

৪.৭.২

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ সাল, সময় বেলা পৌনে দুই ; ফাঁসির মঞ্চে সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক কানু। ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে উচ্চারণ করে – "আমি আবার আসব – আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন

জ্বালিয়ে তুলব” (সুপ্রকাশ ২০০৯ : ৩)। স্বাধীনতাকামী এ মানুষটির মুক্তির স্পৃহাকে ইতিহাস যেমন সংরক্ষণ করেছে, তেমনি আবেগীয় অনুভবে ঔপন্যাসিক রচনা করেছেন ইতিহাস-ভিত্তিক এ উপন্যাস। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর পূর্বের আদিবাসী-জীবনাশ্রিত উপন্যাসগুলোর মতো এ উপন্যাসেও বীর-পূজার প্রবণতাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। সিধু-কানু এ বিদ্রোহের এবং এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। তারা এ বিদ্রোহকে ধর্মীয় আদেশ বলে প্রচার করে স্ব-ধর্মের মানুষের কাছে দেবতা বা ধর্ম-প্রচারক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। উপন্যাসেও সিধু-কানু-চাঁদ-ভৈরব বিদ্রোহের চার নায়ক এই চার ভাইকে সুবাঠাকুর বা দেবতার স্থান দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে স্ব-জাতির মানুষের প্রতি তাদের (বিশেষত সিধুর) মমত্ব, আন্তরিকতা এবং নিজ সম্প্রদায়ের স্বাধিকার রক্ষার সংকল্প ধ্বনিত হয়েছে।

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই সাঁওতালদের প্রতি মহাজনদের অমানবিক নির্যাতনের কাহিনি ধনরাম টুডুর আলেখ্যে প্রকাশিত। আর ধনরাম টুডুকে সাহায্য করার সূত্রে সিদু মুর্মু ও রাম লোহারের একাত্মতা প্রকাশ পেয়েছে। ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই আদিবাসী জীবনের সঙ্গে প্রান্তিক হিন্দু জাতির বা নিম্নবর্গ ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন মিলিয়ে দিয়েছেন এবং এটিও ঐতিহাসিক সত্য যে, সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালরা প্রধান ছিল কিন্তু একক ছিল না ; বঙ্গদেশের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো ও বিহারের ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের দরিদ্র পেশাজীবী জনসাধারণও সাঁওতালদের সক্রিয় সমর্থন ও বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছিল। নেতৃত্ব দিয়েছিল সাঁওতালরা, মূল যোদ্ধাও ছিল তারা কিন্তু তাদের সহায়ক শক্তি ছিল অ-আদিবাসীরা। দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থেই সাঁওতালদের সমর্থন জানিয়েছে ; কারণ, যে শত্রুর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সংগ্রাম, সে শত্রু তাঁদেরও শত্রু। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের কলকাতাভিমুখী যাত্রা সম্পর্কে অবহিত করে বঙ্গীয় সরকারের কাছে ভাগলপুরের কমিশনারের প্রেরিত ২৮শে জুলাই ১৮৫৫ সালের পত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ পত্রটি Bengal Govt. Records থেকে সংগ্রহ করে সুপ্রকাশ রায় তাঁর ‘সাঁওতাল বিদ্রোহ’ নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন –

> আমার হস্তগত সকল সংবাদ হইতেই জানা গিয়াছে যে, গোয়ালা, তেলি ও অন্যান্য শ্রেণীগুলি সাঁওতালদিগকে পরিচালিত এবং সন্ত্রাসমূলক কার্য করিতে উত্তেজিত করিতেছে, তাহারা সাঁওতালদের গুপ্তচরের কার্য করিতেছে, প্রয়োজন হইলে ড্রাম বাজাইয়া সাঁওতালদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে, ...তাহারা এবং কর্মকারগণ সাঁওতালদের জন্য ধনুকের তীর ও তরবারি নির্মাণ করিয়া দিতেছে (সুপ্রকাশ ২০০৯ : ২৪)।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক W. W. Hunter তাঁর ‘Santhal Rebellion, 1855’-এ সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণির অর্থাৎ দরিদ্র হিন্দু জনসাধারণের মিলনের কথা স্বীকার করেছেন :

> সাঁওতাল ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী অর্ধ-আদিবাসী শ্রেণিসমূহ এবং এমনকি নিম্নবর্ণের দরিদ্র হিন্দুরাও সাঁওতালদের বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল (উদ্ধৃত, সুপ্রকাশ ২০০৯ : ২৪)।

সাঁওতাল অভ্যুত্থানে সমস্ত নিচুতলার মানুষের মধ্যে যে সুগভীর ঐক্য গড়ে উঠেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় প্রায় সব ঐতিহাসিকের রচনায়। সে-দিক বিচার করলে সাঁওতাল বিদ্রোহে কেবল আদিবাসীদের স্বাধীনতা কামনা কিংবা নিজভূমির অধিকার ফিরে পাওয়া নয়, বরং অত্যাচারী, শোষকদের প্রতি শোষিতের বিদ্রোহ অর্থাৎ শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণি-যুদ্ধের কিছু ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

৪.৭.৩

সুদূর অতীতে সাঁওতাল এবং তাদের সমগোত্রীয় জাতি বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল এবং প্রধানত বিহার প্রদেশে বসতি গড়ে তুলেছিল। বন-জঙ্গল কেটে তারাই সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেছিল এবং কৃষির উদ্ভাবন করেছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। বহু হাজার বছর পর ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত তাদের জীবন-ধারায় তেমন কোন পরিবর্তন আসে নি। বিহার ইংরেজদের শাসনাধীন হবার পর ইংরেজ বণিক এবং ইংরেজ অর্থনীতি-সৃষ্ট দেশীয় পুঁজিবাদীদের শোষণ-উৎপীড়ন এবং মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির আক্রমণে পণ্য বিনিময়-প্রথায় অভ্যস্ত সাঁওতালরা তাদের সমাজ-জীবন বা পূর্বতনভূমি ত্যাগ করে বাইরে আসতে থাকে। সম্ভবত ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাঁওতালরা বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-বিহার সীমান্তে আসতে আরম্ভ করেছিল। জমিদার নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে তারা এ অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করেছিল। তারা প্রথম এসেছিল বীরভূম জেলায়, তারপর ক্রমে ক্রমে বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পাকুর, দুমকা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভাগলপুরের সাঁওতাল-প্রধান অঞ্চলের নাম 'দামিন-ই-কো'[১৬]। সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তীকালে এর নাম দেওয়া হয় 'সাঁওতাল-পরগণা'। এ অঞ্চলে সর্বাধিক সাঁওতালদের বাস ছিল এবং এ অঞ্চলই সাঁওতাল বিদ্রোহের এবং আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি।

নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত নাতিদীর্ঘ উপন্যাস *হুলমাহা*। প্রথম অধ্যায়ে মহাজন নগিনদাসের বান্ধাবেগার বা ক্রীতদাস ধনরাম টুডুকে উদ্ধারের মাধ্যমে সিদু মুর্মু ও তার তিন ভাইয়ের কাহিনিতে প্রবেশ। ক্রমে মহাজন-জমিদারদের শোষণ-নিপীড়ন ও সে-সূত্রে সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের বিরোধের ইঙ্গিত এবং তিলকা-মাঝির বিদ্রোহের ইতিবৃত্তে নতুন করে বিদ্রোহের সূত্রপাতের আভাস দেওয়া হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জমিদার-মহাজনদের উৎপীড়নের বিস্তৃত বিবরণ, বীরসিং মাঝি, গোচ্চো, বিজয় মাঝির অবমাননার সূত্রে সাঁওতালদের বিদ্রোহী হওয়ার সূচনা ঘটে। প্রথমার্ধে ধনী-মহাজনদের গৃহে ডাকাতির মধ্য দিয়ে তারা

তাদের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে ব্যাগ্র হয়। এ ডাকাতি প্রতিরোধে থানা-পুলিশ-জমিদার-মহাজন সকলে একাত্ম হয়ে সাঁওতালদের দমন করতে চায়, লাঠিয়াল এনে চরম অত্যাচারে তাদের নির্জীব, জড় যন্ত্রে পরিণত করতে চায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষার্ধে ঠাকুরের দৈবাদেশ পেয়ে সিদু হুলের ডাক দেয় – শালগাছের গিরা পাঠিয়ে সকল সাঁওতালকে বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষিত করে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্রপাতের ঐতিহাসিক ঘটনা তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় ঔপন্যাসিকের বিবরণে উঠে এসেছে। "১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০জুন বৃহস্পতিবার ভগনাডি গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বের মাঠে এক প্রাচীন ও বিশাল বটগাছের সামনে হাজার হাজার সাঁওতাল জমা হয়েছিল" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৯৬)। এ জমায়েতে সিদু তার ঠাকুরাদেশ প্রাপ্তির কথা জানিয়ে সাঁওতালরাজ কায়েম করার আহ্বান জানায়। তাঁর ভাষায় "ঠাকুর বলছে, সকল জুলুমবাজকে উচ্ছেদ করো, সাঁওতালরাজ কায়েম করো, দেলায়া বিরিদ্‌ পে, দেলায়া তিঙ্গুন পে" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৯৭)। এ লক্ষ্যে শনিবার যাত্রা শুরু করে পাঁচক্ষেতিয়া বাজারে পৌঁছে তারা মানিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত আর হীরু দত্ত নামক পাঁচজন অত্যাচারী মহাজনকে হত্যা করে। গণজমায়েত তাদের যে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল তাকে পুঁজি করে তারা পথিমধ্যে হত্যা করে দিঘি থানার মহেশ দারোগা ও কড়েরিয়া থানার নায়েব সুজাওয়াল প্রতাপনারায়ণকে। মহেশ দারোগা ছিল সাঁওতাল জীবনের এক ভয়ানক ত্রাস। মহাজনদের পক্ষ নিয়ে সে সাঁওতালদের বিনা বিচারে হাজতে নিত। সে-সময়েও সে মহাজন কেনারাম ভকতকে সাহায্য করার জন্য গর্ভু মাঝি ও হাড়মাকে মিথ্যে অজুহাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। বস্তুত, এই দারোগা-হত্যা থেকেই ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হল (সুপ্রকাশ ২০০৯ : ৩০)। কলকাতা অভিমুখে যাত্রার প্রয়োজনীয়তা আর অনুভূত হল না, বরং দামিন-ই-কো অধিকারের বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। আর সে লক্ষ্যে নিজভূমে পরবাসী সাঁওতালরা মহাজনদের ও ইংরেজদের উচ্ছেদ করে দামিনে সাঁওতালরাজ স্থাপন করেছিল।

দিক দিক থেকে গিরা (শালের ডাল) পেয়ে সাঁওতালরা যুদ্ধের বাসনায় সংঘবদ্ধ হয়ে সিদু-কানুর মূল দলের সঙ্গে যোগ দিতে চলল – তাদের নেতৃত্ব দিল স্থানীয় সাঁওতাল-সর্দার বা মাঝিরা। এ বিশাল সেনানীর খাদ্য যোগাতে গ্রামের পর গ্রাম এবং বাজার লুট হতে থাকল। লিটিপাড়া, জিতপুর, হিরণপুর, মানসিংহপুর, সংগ্রামপুর – সবগ্রামে নিজেদের অধিকার কায়েম করে তারা পাকুড় রাজবাড়িতে নিজেদের অধিষ্ঠিত করেছিল। পরে তারা কালিকাপুর, বল্লভপুর, বলিহারপুর, সাহাবাজপুর, নবীনগর দিয়ে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে এসে সেভন্‌থ রেজিমেন্ট নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির সেনাসামন্তের মুখোমুখি হয়েছিল এবং অনভিজ্ঞ সাঁওতালবাহিনী সাময়িক পরাজিত হয়েছিল। পরে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই, ভাগলপুর জেলার পিয়ালাপুরের নিকটবর্তী পীরপৈঁতির ময়দানে যুদ্ধে মেজর বারোজের আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনীকে

কেবল তীর-ধনুক ও টাঙ্গি দিয়ে পরাজিত করে নতুন খবর তৈরি করেছিল। ভাগলপুরের কমিশনার সাহেবের পত্রে এ যুদ্ধের নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায় –

> বিদ্রোহীরা নির্ভীক চিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র কেবল তীর-ধনুক আর এক প্রকারের কুঠার (টাঙ্গি)। তাহারা মাটির উপর বসিয়া পায়ের দ্বারা ধনুক হইতে তীর ছুঁড়িতে অভ্যস্ত। (সুপ্রকাশ ২০০৯ : ৩৪)

সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির নৃশংস বিবরণ আছে কাব্যময় ভাষায়। গেরিলা কায়দায় যুদ্ধরত সাঁওতাল যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলায় ব্যতিব্যস্ত ব্রিটিশ বাহিনী হাতি-কামান নিয়ে সাঁওতাল গ্রামগুলো ধ্বংস করে। ঔপন্যাসিক বিষয়টি ভাষারূপ দিয়েছেন এভাবে –

> টলমেইনের মৃত্যুতে কোম্পানির আর্মির ইংরেজ অফিসাররা 'রক্ত-আগুন ও আতঙ্ক' নীতি গ্রহণ করে। আগুনের নীতিতে ঘর জ্বলে। রক্তের নীতিতে কালো শরীর থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে ছোটে। আতঙ্কের নীতিতে যুবতী মেয়েদের টেনে নেয় ফিরিঙ্গি সৈন্য। কৃষ্ণা জননীর স্তনবৃন্ত থেকে কৃষ্ণ শিশুকে নিয়ে আছড়ে ফেলে দিয়ে আর্ত ক্রন্দনরত জননীকে ধর্ষণ করে। তাতে ওরা ভীষণ আতঙ্কিত হবে, কেননা এমন যে হতে পারে তা ওদের অজানা। লোলচর্ম বৃদ্ধকে বেয়নেটে চিরে ফেলো। ওরা আদিম ও অসভ্য তাই জানে, লড়াই হয় সমানে সমানে।
>
> এভাবে গ্রাম থেকে গ্রাম জ্বলে, হাজার হাজার মৃতদেহ থাকে পড়ে।(মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১১৪-১১৫)

হাতি দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করার বীভৎসতা সাঁওতালদের আরও বেশি প্রতিশোধ-পরায়ণ করে তোলে এবং অব্যাহতরীতিতে তারা এগিয়ে চলে সিউড়ি দখলের বাসনায়। সিউড়ির মাত্র ছয় মাইল পশ্চিমে তিলাবুনি দখল নিয়ে তারা গড় বা দুর্গ তৈরি করে এবং সে গড়ে মহাসমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করে। ইতিহাসে এ অধ্যায়টি অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে। দুর্গা সাঁওতালদের দেবী নয়। শক্তির প্রতীক এ দেবীর পূজা বঙ্গভূমিতে প্রধান উৎসব হিসেবে বিবেচিত অথচ নিম্নবর্গের হিন্দু অথবা সাঁওতালরা অচ্ছুত বিবেচনায় এ অনুষ্ঠানের অংশীদার হতে পারে না। তিলাবুনি গড়ে মুচির ছেলে প্রতিমা গড়ে এবং সাঁওতাল-ডোম-মুচি-কামারে তার পূজা করে। সমগ্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে এ এক মধুর প্রতিশোধ। এভাবে শক্তি দিয়ে তারা তাদের সব বঞ্চনাকে প্রাপ্তিতে পরিণত করতে চায় এবং সে উদ্দেশ্য সফলে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয়। এ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটে সাঁওতাল গ্রামে বৃটিশ বাহিনীর আক্রমণে একদল সাঁওতাল যোদ্ধার অসমসাহসী আত্মদানে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে সাঁওতালদের যুদ্ধনীতি, বৃটিশদের দমননীতি এবং ক্রমক্ষয়িষ্ণু সাঁওতালদের নতুন মনোবলে উদ্দীপ্ত হবার আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। সে সঙ্গে সমকালীন শিক্ষিত বাঙালিদের মানসিকতার পরিচয়ও তির্যকতায় প্রকাশ করেছেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সম্বাদ ভাস্বরে'র উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক

দেখিয়েছেন যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালিরা সদয় ছিল না। এ বিদ্রোহকে তারা বাঙালি ও হিন্দু নিধনের তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করেছে এবং সরকারের নিকট জোর সুপারিশ করেছে বিদ্রোহ নিবারণের। অথচ সাঁওতালরা চেয়েছে খুব সামান্য। তাদের বিদ্রোহের উদ্দেশ্যও সামান্য –

> স্বাধীন সন্তালরাজ ! গ্রামমাঝির শাসনে থাকব, চাষবাস করে ফসল তুলব, ধারকর্জে জড়াব না, আদালত-কাছারিতে যাব না, হাসব, গান গাইব, নাচব, মাদল বাজাব। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১২৭)

অথচ এ জীবন তো সভ্য জীবন নয় বলেই শিক্ষিত সমাজের ধারণা। তারা তাই সাঁওতালদের স্বদেশী ভাবেনি, সাঁওতাল বিদ্রোহকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আখ্যা দেয়নি বরং বৃটিশদের অধীনে সভ্যতার সূচনা হয়েছে মনে করে তারা এ সংগ্রামকে নিবারণ করতে চেয়েছে। স্বাধীনতা তাদের কাম্য নয়, কলকাতা-কেন্দ্রিক এ মনোভাবকে ঔপন্যাসিক গভীর তির্যকতায় বাণীরূপ দিয়েছেন–

> বাংলা মানে কলকাতা। তা, ডাকব্যবস্থা হয়েছে, রেললাইন বসছে, বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়ে যাবে। কত রকম সমিতি, কত সংবাদপত্র, কত বই-কেতাব, কত সামাজিক আন্দোলন, এ সবই এগিয়ে চলার লক্ষণ। সাঁওতালরা এ সবের মধ্যে কোথাও নেই, দেশের এগিয়ে চলাকে ওরা বুঝতেই পারবে না।(মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১২৭)

প্রকৃতঅর্থে ১৮৫৫-৫৬ সালের কলকাতা মানেই জমিদার এবং জমিদারি-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাঙালিদের আবাস। সুতরাং জমিদারি হটানো সাঁওতাল বিদ্রোহে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ বা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষিত হবে না – সেটাই স্বাভাবিক। ঔপন্যাসিক এ বিষয়টিও কথাপ্রসঙ্গে কাহিনিসূত্রে গ্রথিত করেছেন। তবে সিদুর জবানিতে সাঁওতাল সংগ্রামের যে অনবদ্য কথারূপ দেয়া হয়েছে এ উপন্যাসে তা উদ্ধৃতিযোগ্য –

> এবার সিদু বলে, হুল আমরা কেন করেছিলাম তা সবাই জানি। স্বাধীন সন্তালরাজের জন্য। তা হবে কি না হবে সে বিচার করব কেন ? বাবা তিলকা মাঝি এমনই হুতাশে জ্বলি জ্বলি হুলের ডাক দেয়, গিরা পাঠায়। সে হুলটায় রাজ হয় নাই আমরাদের। সেজন্যই তো আমরা, তার সত্তর বছর বাদে আবারও হুল করলাম। হুল করছি, তা চালাব। রাজ পাব কিনা পাব জানি না। কিন্তু যতদিন না সন্তাল লোক সুবিচার পায়, সে হুল করবে, অন্য জাতে কেউ লড়াই ডাকলে তাতে যাবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩ / ১১: ১৩০)

বস্তুত সিদুর এ সংলাপের তাৎপর্য অনেক। সাঁওতাল সংগ্রামের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত এতে রক্ষিত। তিলকা মাঝির হুলের উল্লেখ যেমন এতে আছে, তেমনি আছে পরবর্তী সংগ্রামের ইঙ্গিত। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট নির্দেশনাও পাওয়া যায় এতে। সর্বশেষ নবম পরিচ্ছেদে চাঁদ-ভৈরবের মৃত্যু, সিদু-কানুর গ্রেপ্তার এবং ফাঁসির বিবরণ আছে। 'আবার আসব'– ফাঁসিমঞ্চে কানুর এ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

৪.৭.৪

সাঁওতাল সংগ্রামের রেখাচিত্রের মধ্যে সাঁওতাল জীবনের, সংস্কৃতির পরিচয় গ্রথিত হয়েছে অনিবার্য রীতিতে। ১৮৫৫-৫৬ সালের বা সিদু-কানুর সংগ্রামের ইতিবৃত্ত অজানা নয় আমাদের। উপন্যাসের অবয়বে এ কাহিনি স্থান পেয়েছে ; তবে মহাশ্বেতা দেবীর স্বাতন্ত্র্য হল, তাঁর রচনায় সাঁওতাল জীবন, তাঁদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, মূল্যবোধ এমনকি স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার যে অনুপুঙ্খ পরিচয় মেলে – অন্যত্র তা বিরল। আদিবাসী-দরদী এ সাহিত্যিক ঘনিষ্ঠভাবে আদিবাসী-জীবন জেনেছেন এবং সাধারণ পাঠকের উপলব্ধির সীমানায় উপস্থাপিত করেছেন অনার্য আদিম অথচ আশ্চর্য সভ্য এ জাতি-বৈশিষ্ট্যকে। তবে এর কোনটি নিছক বর্ণনা কিংবা অতিরিক্ত সংযোজন নয় – কাহিনিসূত্রে গ্রথিত এ জীবনকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করা যায় সহজেই।

কাহিনির সূচনাতেই শৃঙ্খলিত ধনরাম টুডুকে সাহায্য করার সূত্রে সাঁওতাল ও নিম্নবর্গীয় হিন্দুর সম্প্রীতির উল্লেখ রয়েছে। অরণ্যচারী সাঁওতাল ও অস্পৃশ্য শ্রেণি জীবনযুদ্ধে পরস্পরের সহযোগী, সহযোদ্ধা। তাই ধনরামের পায়ের বেড়ি কেটে দেয়ার জন্য ডাক পড়ে রাম লোহারের, আবার ভালুকের হাত থেকে রামের জীবন রক্ষা করে সিদু-কানুর বাবা চুনার মুর্মু। সূচনাতেই সিদুর শ্লেষাত্মক মন্তব্যে তাদের প্রতি অন্যদের নিপীড়নমূলক মনোভাব এবং তাদের জ্বলে ওঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধনরাম টুডুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে রাম লোহার যখন মন্তব্য করে যে, ‘পায়ে বেড়ি, মাংস কেটে বসে গিছে রে!’ ‘মানুষ মানুষরে এমন করে?’ তাতে সিদুর শ্লেষাত্মক সংলাপ শোনা যায় – মানুষ কোথায়, এতো সাঁওতাল! (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৮০)

এতটুকু অতিরঞ্জন নেই এ উক্তিতে। কেননা সে-সময়ে তো বটেই, এখনও পর্যন্ত সাঁওতাল বা আদিবাসী সম্পর্কিত ভাবনায় মানবিকতার স্থান সামান্য। অথচ আদিম অসভ্য সাঁওতালরা তথাকথিত সভ্যতার ধ্বজাধারীদের ধর্মবোধ, মানবতাবোধ, সমাজবোধের দীক্ষা দিতে পারে। ঔপন্যাসিক একাধিক জায়গায় এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় সভ্যতার ব্যবচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ছোটলাট হ্যালিডে ও খ্রীশ্চান মিশনারি ফাদার ড্যানিয়েলের কথোপকথনে এ বিষয়ক ধারণার আভাস মেলে। আড়াই বছর সাঁওতালদের সংস্পর্শে থেকে ফাদার ড্যানিয়েল ছোটলাট হ্যালিডেকে জানাচ্ছে –

> সভ্যতা, সিভিলাইজেশন ? ধৈর্য, সহ্য, বিপদকষ্টকে হাসিমুখে নেবার ক্ষমতা, মেয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও শিশুদের বিশেষ বিবেচনা, মেয়েদের স্বাধীনতা দান, এসব যদি সভ্যতার লক্ষণ হয়, তাহলে প্যাঁচোয়া ও মামলাপ্রেমী মানুষ আর তেলচুকচুকে বদমাশ মহাজন, এদের চেয়ে আমার বিচারে, সাঁওতালরা অনেক সভ্য। ওদের গ্রাম সমাজে মাঝির শাসনে, কোনো নিরাশ্রয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-শিশু কখনো না খেয়ে মরে না।(মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১০৬)

ড্যানিয়েলের মুখনিঃসৃত এ বক্তব্য তথাকথিত সভ্যতার বিপরীতে সাঁওতাল সভ্যতার বিনির্মাণ ঘটায়। যুদ্ধ ও ছলচাতুরীর নীতিতে কৌশলী ইংরেজরা সংঘবদ্ধ সাঁওতাল-শক্তিকে দমন করতে চায়, গুড়িয়ে দিতে চায় তাদের সমাজব্যবস্থাকে ; নামিয়ে আনতে চায় তাদের কাতারে, তৈরি করতে চায় মেরুদণ্ডহীন অনুগত ভৃত্যে। শ্রেণি বা স্তরবিহীন সাঁওতাল-সমাজে তারা সৃষ্টি করতে চায় বহু স্তর। সে স্তরবহুল সমাজে মূল্যবোধ বা রীতিনীতি নয়, অর্থ প্রধান শক্তি। সর্বপ্রধান বা মাঝির শাসনাধীন সাঁওতাল-গ্রামে ধনী সাঁওতালও মাঝির অনুগত – বুর্জোয়া ইংরেজরা তা অটুট রাখতে নারাজ। কেননা তারা হতে চায় শ্রেষ্ঠ – সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবির লড়াইয়ে তারা কাউকে সামিল করতে চায় না। তাছাড়া সংঘবদ্ধ শক্তির পীড়নে তারা ভীত। তাদের সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা ড্যানিয়েলের উক্তিতে প্রকাশিত –

> আদিমতা কি টিকতে পারে সভ্যতার সঙ্গে এই অসম লড়াইয়ে ? সত্যি বলতে কি, কী আছে ওদের ধর্মবোধ, মানবতাবোধ, সমাজবোধ ছাড়া? (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১১৫)

> আমরা ওদেরকে দীর্ঘকাল ধরে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারব। ওদের বল ছিল... সে শক্তির উৎস নষ্ট করে দেব। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১১৫)

এভাবে ঔপন্যাসিক সাবঅলটার্ন তত্ত্বের বিশ্লেষণ ব্যবহার করেও সাঁওতাল-জীবনের রূপচিত্র তুলে ধরেছেন।

৪.৭.৫

সাঁওতাল সমাজে শ্রেণিভেদ নেই সত্য, তবে গোত্র বিভাজন আছে। পেশাগত এ বিভাজন তাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিভেদ তৈরি করে না, পেশাভিত্তিক বিভিন্ন পদবী তারা ধারণ করে থাকে –

> মুর্মুরা পূজা করে, সরেনরা লড়াই করে, হেম্ব্রমরা জাগীদার, মান্ডিরা ধনী। বাস্কেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, টুডু লোক নাগরামাদল বাজায় আর লোহালক্কড়ের কাজ করে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৮৬)

পেশার ভিন্নতার বিবরণ আমাদের জানিয়ে দেয় যে, সাঁওতালরা সকল পেশাজীবী-সমন্বয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে – কোন কিছুর জন্য তারা কারো মুখাপেক্ষী নয়। তবে সে-সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা হচ্ছে যে, পরিস্থিতি বদলেছে – পূর্বে সাঁওতালরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, তারা তাদের নিজভূমে বসতি গড়েছিল ; চাম্পা দেশে তারা কারও অধীন ছিল না, কিন্তু ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার কালে সমস্তভূমি যখন কর্নওয়ালিস-সৃষ্ট জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের করায়ত্ব – তখন ভূমির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-সংলগ্ন মানুষগুলোও তাদের দাসে পরিণত হয়। দিকু অর্থাৎ এদেশীয় জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগী মহাজনশ্রেণি,

কোম্পানি সরকার, নীলকর সাহেব সকলের অত্যাচার-শোষণে সাঁওতাল সমাজ ম্রিয়মাণ – তারা তাদের অতীত ঐতিহ্য খুঁজে পেতে চায় কিন্তু বাস্তবে সাযুজ্যবোধ করে নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষের সঙ্গে –

> এখন সকল পারিসের মানুষ – দিকুজন, কোম্পানি সরকার আর নীলকর সাহেবের গুঁতায় সমান হয়ে আছে। এখন রাম লোহার আর সকল কামার আমাদের আপনজন হয়(মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৮৬-৮৭)।

কেবল রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন তাদের অবক্ষয়ের একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। ঔপন্যাসিক আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সাঁওতাল সমাজের বর্তমান দুরবস্থার কিছু কারণ চিহ্নিত করেছেন। যেমন –

প্রথমত: সাঁওতাল সমাজে অর্থের প্রচলন নেই। বিনিময় প্রথায় তারা অভ্যস্ত। ধান দিয়ে সব কেনা-কাটা করে বলে তাদের ক্ষতির পরিমাণও বেশি – কেননা প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থার সমাজে বিপরীত-ধর্মীরা বা পশ্চাদপদরা স্বভাবতই বিপন্ন হবে। এ কারণে 'পবন মাঝি তিন টাকা শুধতে তিরিশ সাল বেগার খাটে।' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৯৮)

দ্বিতীয়ত: পণ্য-বিনিময়েও তারা খুব দক্ষ নয়। ওজন সম্পর্কিত ধারণায় সরল সাধারণ সাঁওতালরা অনভ্যস্ত। এ সুযোগে কৌশলী অসৎ ব্যবসায়ী বা মহাজনেরা দু'ধরনের বাটখারা ব্যবহার করত, দেবার সময় কম ওজনের এবং নেবার সময় বেশি ওজনের। ক্রমে আদিবাসীরাও এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং এক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করেছে নিম্নবর্গীয় হিন্দু, বিশেষত কামাররা। উপন্যাসে এ সম্পর্কিত তথ্য আছে জমিদার ও মহাজন শ্রেণির ভাষ্যে –

> কামারগুলো বেইমান। ওদের বাটখারা ওজনটি শিখিয়েছে। বড়বৌ বাটখারা নিতাম, ছোট বৌ বাটখারায় দিতাম, তাতে বাধা পড়ছে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৯৩)

নিম্নবর্গীয়দের সঙ্গে আদিবাসীদের একাত্মবোধের এটি আরও একটি প্রমাণ। সাঁওতাল-বিদ্রোহকে বাঙালি নিধনের বা বাঙালি নিপীড়নের ডামাডোল বা গণ্ডগোল বলে অভিহিত করা হয়েছিল কিন্তু নিম্নবর্গীয় বাঙালিদের সঙ্গে তাদের সহাবস্থানের বিবরণ পূর্ববর্তী তথ্যকে নাকচ করে দেয়। প্রকৃত সত্য অবশ্য একসময় চিহ্নিত হয়েছে এবং সিদু-কানুর নেতৃত্বাধীন এ বিদ্রোহকে উপনিবেশ-বিরোধী প্রথম বিদ্রোহের সম্মান দেয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত: কালের পরিবর্তনে স্বসমাজবদ্ধ সাঁওতালদের সামাজিক গণ্ডি পেরিয়ে অন্য জাতি বিশেষত বাঙালি ও অন্যান্য ব্যবসায়ী শ্রেণির সংস্পর্শে এলে তাদের জীবন-যাপনের ধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। কঠিন পরিশ্রম-লব্ধ খুব সামান্য খাদ্যশস্যে তারা সন্তুষ্ট ছিল। সামাজিক জীবন, ঘরে তৈরি মদ এবং নাচ-গানে তাদের জীবন পূর্ণ ছিল কিন্তু তুচ্ছ বিলাস-দ্রব্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ তাদের মহাজনদের কাছে ধার-কর্জ

করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। দিকপাল মাঝির জবানিতে ঔপন্যাসিক সে দিকটিও স্পষ্টভাবে উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন –

> ঘর ঘর হাঁড়িয়া বানাতে, খেতে, তাতে তো ধানকরজ হত নাই বাপ ? এখন দিকুর দোকানে চুড়ি-মালা কিনলে বউ-মেয়ে পরবে, ফলে মন উঠবে না। ছেলেদের ঘুনসি, তাবিজ, পিতলের কাঁকই চাই। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৮৭)

সাঁওতালদের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ নেয় বাঙালি ও পশ্চিম ভারতের মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণি। তারা যেচে ঋণ দিত কিন্তু সে-ঋণ শোধ করার কোন সুযোগ দিত না। মহাজনদের সুদের হার ছিল অবিশ্বাস্যরূপে উচ্চ। একজন সাঁওতালকে ঋণ শোধের জন্য জমির ফসল, লাঙ্গল-বলদ, এমনকি নিজেকে এবং তার পরিবারকে ক্রীতদাসে পরিণত হতে হত, আর ঋণ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলত – কয়েক পুরুষব্যাপীও তা শোধ হত না। এ সম্বন্ধে W. W. Hunter লিখেছেন –

> Many of the Santals had no land or crop to pledge for their little debts. If a man of this class required a few shillings to bury his father, he went to the Hindu zamider for it; and having no security to offer except his manual labour and that of children, he bound over himself and family as slaves till the loan should be repaid. ... The only inheritance he had to leave to his children was the debt, at first a few shillings, but now grown by compound interest at 33 percent into many pounds. If the slave refused to give up his whole time, the master stopped his food; if he worked for other people, the master took out legal execution against him person, and soon brought the ignorant creature to his knees, by awfully exaggrerating the terrors of the jail. (Hunter 1868 : 233)

ঐতিহাসিক এ সত্যকে নির্ভর করে ঔপন্যাসিক বক্ষ্যমাণ উপন্যাসে বেশ কয়েকটি সক্রিয় চরিত্র নির্মাণ করেছেন – ধনরাম টুডু, বিশালী, মঙ্গল ; এরা সকলেই মহাজন নগিনদাসের বন্ডেড লেবার বা বান্ধাবেগার। হুলের সংগঠনে এদের বেশ সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

৪.৭.৬

মহাজনদের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের নির্মমতাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় ঔপন্যাসিক চিরে দেখিয়েছেন উপন্যাসের প্রথমার্ধে। পুরুষানুক্রমিকভাবে তারা শোষণ করেছে আদিবাসীদের সরলতাকে পুঁজি করে এবং নিজেদের অবস্থানকে ধরে রাখার জন্য তারা এমনকি ভিনদেশ থেকে লেঠেল পাইক আনার পরিকল্পনাও করেছে। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তারা সাঁওতাল সমাজের প্রধানদের টার্গেট করে সমগ্র সাঁওতাল-সমাজকে নেতৃত্বহীন করতে চেয়েছে। বহুদিন ধরে কাছাকাছি বাসের ফলে আদিবাসী-সমাজের নাড়ী-নক্ষত্র চেনা এ মহাজনেরা জানে যে, সাঁওতালরা মূলত গ্রাম-প্রধান বা মাঝির বিধান অনুযায়ী তাদের জীবন বা

কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিজয় মাঝির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল-গ্রামে যে অসন্তোষ এবং জমায়েত হয় তাতে উদ্বিগ্ন নগিনদাস, মহিন্দর ভগত এবং অন্য মহাজনেরা। তাদের পরিকল্পনাতেও আদিবাসী-জীবনে নেতৃত্বের বিষয়টি প্রকটিত হয় –

> মহিন্দর ভকত বলে, ভাগলপুরে জেলের ঘানি টানানো দরকার কয়েকটা মাঝি-দেশমাঝি পরগনাইত দিয়ে। সমাজের কর্তাগুলোকে শাস্তি দিলে ওদের কোমর ভাঙবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৯৩)

উপন্যাসের অন্যত্রও এ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিদ্রোহের নায়ক সিদু-কানুর বাবা চুনার মুর্মু গ্রামমাঝি অর্থাৎ গ্রামপ্রধান। মহাজনদের নির্যাতনের প্রতিকারে সিদুরা যায় লছিমপুরে পরগনাইত বীর সিং মাঝির কাছে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় মান সিং মাঝি। লিটিপাড়ার বিজয় মাঝি এবং আমগাছিয়ার গর্ভু মাঝির হেনস্তা সাঁওতাল-সমাজের প্রতিবাদী, প্রতিরোধী হয়ে উঠতে বিশেষ সহায়ক। এরা দু'জনেই 'মাঝি' অর্থাৎ গ্রামপ্রধান। সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিতে এ ঘটনা ও চরিত্রগুলোর উল্লেখ এ বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, সাঁওতাল-সমাজ মূলত নেতৃত্বপ্রধান অর্থাৎ তাদের সমাজ-কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু বা নিউক্লিয়াস তাদের নেতা ; কৌম জীবনের প্রধান ভিত্তি এটি। স্বভাবতই কৌমসমাজের বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনের পরবর্তী ধাপ বা লক্ষণ – একাত্মবোধ, তাদের মধ্যে পাওয়া যায় অনিবার্যভাবে। উল্লেখ্য যে, গ্রামপ্রধান বা মাঝির সঙ্গেও সামাজিক কোনো পার্থক্য নেই সাধারণ সাঁওতালদের। বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন –

> There is no distinction of family rank between the Manjhis and their inferiors, all eat in company and inter-marry.(Quoted,[17] N. kaviraj 2001: 56)

এ উপন্যাসে বিভিন্ন ঘটনার সূত্রে এবং সংলাপের মাধ্যমে আদিবাসী জীবনের এ আবশ্যিক উপাদানটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়।

৪.৭.৭

বিদ্রোহে সাঁওতালদের প্রধান শক্তি তাদের দুর্জয় সাহস, অকুতোভয় মনোবৃত্তি, দীর্ঘদিনের শিকারী ঐতিহ্য কিংবা তীর-ধনুক বা টাঙ্গি চালনায় অসাধারণ দক্ষতা নয় ; একাত্মবোধই তাদের কেন্দ্রীয় অবলম্বন বা শক্তির উৎসভূমি। উপন্যাসের সূচনাংশেই সিদুর সংলাপে তাদের একাত্মবোধের বা শক্তির মত্ততা সুস্পষ্ট হয়। বারহাইতের হাটে মহাজন নগিনদাসের সঙ্গে কথোপকথনের এক পর্যায়ে সিদু জানিয়ে দেয় –

চারদিকে সাঁওতাল নিয়ে বাস করিস বাবু ! সে কথাটাও মনে রাখিস। তোর জাত নয় যে একে জুতা খায়, অপরে হাসে। সাঁওতাল একজনের গায়ে হাত তো আরো সাঁওতাল আগাবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৮৮)

এ বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সিদু গণজমায়েতের ডাক দিয়েছিল এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন বৃহস্পতিবার ভগনাডি গ্রামের দক্ষিণ-পুবের মাঠে এক প্রাচীন ও বিশাল বটগাছের সামনে প্রায় দশ সহস্রাধিক সাঁওতাল জমা হয়েছিল। সিদুর হুলের ডাকের দুদিন পর শনিবার কলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে প্রায় ত্রিশ হাজার সাঁওতাল (সুপ্রকাশ ২০০৯ : ২৯)। ইংরেজদের বন্দুক-কামানের সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা অথবা 'স্বাধীন সন্তাল-রাজ' কায়েম করার এ সংগ্রাম প্রায় দেড় বছরব্যাপী স্থায়ী হওয়া সম্ভব হয়েছিল তাদের একাত্মবোধের কারণে। এ একাত্মবোধকেই সব চেয়ে ভীতিজনক মনে করেছিল ইংরেজরা। তাই তারা প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে সাঁওতালদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল তুলতে চেয়েছিল। সিদু ও কানুর মাথার ওপর দশ হাজার টাকা পুরস্কার, অন্য নেতাদের জন্য পাঁচ হাজার করে, আরও নিচের সারির নেতাদের জন্য হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেও তারা ব্যর্থ হয়েছিল বলে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন। *হুলমাহা* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে, পুরস্কারের লোভে নয়, গ্রেপ্তার হওয়া সাঁওতালরা ইংরেজদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে শান্তির জন্য সিদু-কানুর খোঁজ জানিয়েছিল এবং তারা আশ্বস্ত হয়েছিল যে, সিদু-কানুর কোন ক্ষতি করা হবে না। কেবল বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদের ঘরে ফেরানো হবে। যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সিদু-কানুর সহযোগীরা অর্থের লোভে তাদের ধরিয়ে দিয়েছিল –

Sidhu was betrayed by a minor leader. Narrating the circumstances leading to the capture of Sidhu, Major Shuckburgh writes (30 August,1855) shortly after our arrival in camp, a man came in to say that, he got the head chief, Sidhu Manjhi bound in cords in a neighbouring village and if ordered to bring him in, he would do so. It was done, and the celebrated robber chief and rebel is now a prisoner in my camp and will be sent immediately to Bhagalpur. (Qouted[18], N.Kaviraj 2001: 98)

ঔপন্যাসিক অবশ্য স্পষ্টত বলেছেন যে, 'না, সিদুর গ্রেপ্তারের জন্য ঘোষিত দশ হাজার টাকা কেউ চায় নি, কেউ পায় নি।' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১৩৫)

উপন্যাসের প্রথমাংশে বাবা তিলকা মাঝির হুলেও একাত্মবোধের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিলকা মাঝি পাঁচ বছর ধরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। তার হুলের আগে সাঁওতালদের সম্প্রীতি বাড়ানোর লক্ষ্যে সই পাতানো প্রথা চালু হয়েছিল। সিদুর বাবা চুনার মুর্মুর জবানিতে ঔপন্যাসিক সে কাহিনি জানিয়েছেন –

হুল চলার আগে মেয়েরা সব সই পাতিয়েছিল, গল্প শুনেছি। এর দুই ছেলে, ওর দুই ছেলে, তেমন মায়ে-মায়ে সই পাতাল, খাওয়াদাওয়া গান হল। আমরা হড়হপনেরা, একসঙ্গে চলব, বলব, হাটে যাব, কাজ করব, এইটা

ভালবাসি। সই পাতালে তো আরো আপনজন হলে। হুলের কালে কেই যেন বিশ্বাস ভেঙো না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৮৫)

৪.৭.৮

সাঁওতালদের কৌম একাত্মবোধের গভীরে প্রোথিত আছে তাদের রীতি-নীতি বা ধর্ম-বিশ্বাস। সাঁওতাল কৌমসমাজে রীতিনীতির মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রকটিত। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অপরিবর্তনীয় গণ্ডিতে তারা আবদ্ধ নয় – সে কারণেই সিদুর প্রবর্তিত নতুন ধর্মাদেশকে তারা স্বাগত জানিয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সিদু নির্দেশিত পথে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ধাবিত হয়েছে। সিদুকে তারা ঠাকুরের অর্থাৎ স্রষ্টার আদেশপ্রাপ্ত বলে সুবাঠাকুর অভিধায় অভিহিত করেছে। কেবল সিদু নয়, এ বিদ্রোহের নেতৃত্বস্থানীয় সাঁওতালরা সকলেই সুবাঠাকুর অর্থাৎ ঠাকুরের প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে।

সিদুর ঠাকুরের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির ঘটনাটি ঔপন্যাসিক অত্যন্ত বাস্তবানুগ করে বর্ণনা করেছেন – যদিও সাঁওতালরা এর অলৌকিকতার মহিমায় বিশ্বাসী। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী অলৌকিকতাকে পরিহার করে বাস্তবতার শক্তভূমিতে এ কাহিনি স্থাপন করেছেন। প্রারম্ভিক ভূমিকায় মহাজন ও শাসকদের প্রতি সিদুর অনাস্থা ও ক্ষোভের উপায় অন্বেষণে সিদুর তৎপরতার ইতিবৃত্ত ভূমিকাসহ ব্যক্ত করেছেন। ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ ভাবনায় তা ভাষা পেয়েছে এভাবে –

> সে কোনো একটা নির্দেশ খুঁজছিল। কোনো একটা সংকেত।
>
> ঘরে বসে ভাবত সিদু। রাতের পর রাত।
>
> কোথায় কোথায় নির্দেশ? দামিন-ই- কোহ-র কান্না যে ছেলে শুনেছে, যে মায়ের বুক থেকে, শরীর থেকে দিকু ও সাহেবদের ঘৃণিত স্পর্শের সব চিহ্ন মুছে দিতে চায়, তাকে নির্দেশ দাও কেউ (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৯৪-৯৫)।

নির্দেশ প্রাপ্তির ঘটনাটিও বর্ণনা করেছেন খুব সহজে –

> এদিকে আষাঢ়ের মেঘে একদিন পুবে বাতাস বইল, ঝড়োবাতাস, বাদলা বাতাস, সিদু কানুর তপ্ত অঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল। দরজা খুলে দাও বাতাস আসুক। সেই বাতাসে ঘরের সব উলট-পালট। মাথাল খসে পড়ে দেয়াল থেকে, মায়ের হাতে সিলানো কাঁথা আড়ংবাশে দোলে, দড়ি ও বাবুই ঘাসের শিকা দোলে, বিদ্যুৎ চমকে কালো আকাশ চিরে যায়, কুলুঙ্গিতে রাখা বাইবেলের পাতা উড়ে পড়ল। চাঁদ এনেছিল। কেমন চকচকে পাতা, নতুন কাপড়ের সুগন্ধ। কোনোদিন কির্তা এলে তাকে দেবে। সিদুর গায়ে মাথায় কাগজ উড়ে পড়ল। তাই হোক, তাই। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৯৫)

তারপরই সিদু কানুকে জানায় যে, নির্দেশ এসে গেছে –

– এই নির্দেশ। ভগনাডি হতে আগুনটা জ্বলবে আর যেথা যত সন্তাল সে আগুন হতে আগুন নিবে। দামিন-ই-কোহ কাঁদে, কান্না শুনিস নাই? তারে তেমন শুচি করতে হবে যেমন শুচি চাম্পা ভূমি ছিল। আমরা সন্তাল! মায়ের ছেলে। নির্দেশটা এসে গেল কানু। তুই প্রচার দে!

– কি বলব দাদা?

– বলবি ঠাকুর এসেছিল, আদেশ দিয়েছে। তুই দেখেতে পাচ্ছিস না কানু? ওই বিদ্যুৎ চমকায়, বির্ মাতামাতি করে, জল পাবে বলে গুমানীর শুকনা বুকে কালি উড়ে। তুই বনে আগুন দেখেছিস, বৈশাখে সূর্য দেখেছিস, গ্রহণে ছায়া দেখেছিস, গরামদেবতা বৃক্ষরাজ শালগাছ দেখেছিস, সব তাতে ঠাকুরের নির্দেশ জানা যাচ্ছে। আমি অন্ধ ছিলাম, বুঝি নাই। ঠাকুর বলে না বলি দে, পূজা দে। ঠাকুর শুধু আমাকে জানাচ্ছে হুলের ডাক দে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৯৫)

বিভিন্ন ইতিহাস-গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় – একদিন ঝড়ের সময় ঠাকুর আবির্ভূত হয়ে সিদুকে সাদা কাগজে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু উপন্যাসের বর্ণনায় অলৌকিক সাদা কাগজ নয় – বাইবেলের সাদা কাগজ সিদুর গায়ে মাথায় উড়ে এসে পড়েছে – যে বাইবেল তারই ঘরে ছিল। দুমকার মিশনারিদের দেওয়া এ বাইবেল চাঁদ ঘরে এনে কুলুঙ্গিতে রেখেছিল – কির্তার জন্য। কির্তা হল তাদের সমাজের লেখাপড়া জানা এক সাঁওতাল। অর্থাৎ কেন ঘরে এনেছিল চাঁদ বাইবেলটা – তার কার্যকারণ উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কোন ঠাকুরের আগমন বাস্তবিক ঘটে নি কিন্তু সিদু তা প্রচার করতে বলেছে কানুকে। এটি ও সর্বাংশে মিথ্যে নয়, সিদু কানুকে জানাচ্ছে যে, প্রকৃতির মধ্যে সে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তার নির্দেশ শুনতে পেয়েছে। সাঁওতালদের হুলের সঙ্গে ধর্মীয় এ আখ্যানের সম্পৃক্ততা অবিচ্ছেদ্য। সিদু ও কানু তাদের নির্দেশিত হবার কাহিনি রচনা করেছিল, পশ্চাৎপদ ধর্মভীরু সাঁওতালদের উদ্বুদ্ধ করতে – একাত্ম করতে – ঐতিহাসিকেরা এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবী সিদুর মনোজাগতিক বিশ্লেষণে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে সাঁওতালদের প্রতি গভীর মমতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এ আখ্যান নির্মাণ করেছেন – এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য বা অভিনবত্ব।

প্রকৃতির কোলে লালিত-বর্ধিত সাঁওতালদের প্রায় সকল রীতি-নীতিতে প্রকৃতি-সংলগ্নতা অবশ্যম্ভাবী। যেমন – শালবৃক্ষ তাদের গ্রাম-দেবতা। শালের চারা লাগিয়ে তারা বসতি গড়ে তোলে। তাদের জীবনে শালের উপযোগিতাকে সমর্থন করে ঔপন্যাসিক সুরজ মাণ্ডি নামক এক চরিত্রের মুখে এ ভাষা দিয়েছেন –

খুব ঠিক কথা। শালের কাঠিতে দাঁতনকাঠি, শালের পাতায় আহার, শালের কাঠে ঘরের খুঁটা-কপাট-খিড়কি। শালের ছালে বেন্ধে মাংস সিজাব, ফুল রে, ফল রে, বীজ রে, শালগাছ কতরকমে আপনজন হয়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১২৮-১২৯)

শুধু তাই নয় সাঁওতাল রীতিতে যুদ্ধের সংবাদ পাঠানোর রীতি হল – শালের ডাল অর্থাৎ গিরা ভেঙে প্রেরণ। আদিবাসী জীবনে শালের উপযোগিতা নিয়ে অবশ্য মহাশ্বেতা দেবী একাধিক আখ্যান রচেছেন (শালগিরার ডাকে, সাগোয়ানা প্রভৃতি)।

৪.৭.৯

লড়াইয়ের আখ্যানে মহাশ্বেতা দেবী সাঁওতালদের বিয়ে বা পরবের উল্লেখ করে আদিবাসী জীবনের সমগ্র কথা পাঠককে জানিয়েছেন –

> বহুত বুড়া চরণ দেশমাঝি বলে গেল, সুবাঠাকুরের হুকুমৎ নিয়ে আয়। হুলের কালে বিয়ার কি হবে? সে বলে, বিপদকালে মেয়েরা কুমারী থাকতে নাই। এমন সময়ে রায়বারিচ (ঘটক) কোথা, সারসাগুন (শুভাশুভ) কে দেখে, হরঃচিন্‌হা (আশীর্বাদ)- টাকা চাল্- এত নিয়ম হয় কি করে? (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১০৮)

সুবাঠাকুরের জবাব জানায় ধনরাম –

> সে বলেছে, বিপদকালে ছেলেরা মেয়েদের কপালে তেল দিলেই বিয়ে হয়। তার নাম সাইহা বিয়ে। পরে হুল থামি গেলে বাদ্যবাজনায় বিয়ে হবে, মেয়ে বসত করতে যাবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১০৮)

শিকারী সাঁওতালদের শিকারপরব হয় সেন্দ্রারেয়াতের রাতে। সে পরবের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আছে অন্যত্র –

> শ্যাম পরগণাইত আস্তে বলে, সেন্দ্রা রেয়ান হবে, দিহ্‌রি পূজা করে ডাল নিয়ে ঘুরবে, জানাবে সকলেরে। মেয়েরা মহুলের মোয়া কি ছাতু সঙ্গে দিবে। সূর্য না উঠতে শুনব নাগারা-বাঁশি-শিঙা বাজে। সকলে দুপুডুপ চলি যাব একজোটে। যে-গ্রামদিয়ে যাব, সে-গ্রামের মেয়েরা পায়ে জল দিবে, হাতে দিবে চাঁপা ফুল, শিকারিরা তাদেরকে আর তারা শিকারিদেরকে জোহার করবে। গ্রামবাসী শিকারিদের মহুলের মোয়া আর জল দিবে। সেন্দ্রা-রেয়ানে সকল বিচার হবে। এই বিচার মানি লয়ে সবে ঘরে ফিরব। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১০৯)

বিয়ে এবং শিকার পরবের এই খুঁটিনাটি বিবরণ আদিবাসী জীবনের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে। কোনো জীবনকে খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ না করলে, তাদের প্রতি সত্যিকার আগ্রহ এবং সহানুভূতি-মমতা না থাকলে এ ধরনের বিস্তৃত বিবরণ সম্ভব নয়।

৪.৭.১০

সাঁওতালদের সামাজিক রীতি-নীতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে তাদের যুদ্ধনীতিও স্থান পেয়েছে উপন্যাসের ক্ষুদ্র কলেবরে। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে, বৃটিশদের যুদ্ধে কোন নীতি নেই – তারা জানে কেবল বিভিন্ন

কৌশলে জয় লাভ করতে। নারী-শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করে তারা আতঙ্কের নীতি গ্রহণ করে। কামান দেগে, হাতীপিষ্ট করে সমগ্র জনপদকে ধ্বংস করে তারা বিদ্রোহ দমন করতে চায়। বিপরীতে সাঁওতালরা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে। সিদুর জবানিতে জানা যায় –

> আমাদের হুল তো ধর্মের জন্য যুদ্ধ। সন্তালভূমে স্বাধীন সন্তালরাজের জন্য যুদ্ধ। ধর্মপথেই চলতে হবে। ওরা ধর্ম মানে না। কোথা কে সাঁওতালদেরান দেশ হতে আসি এমন জুলুম করে। ওরা মেয়ে-বুড়া-কচি ছেলে মারে। আমরা তাই করব ? সন্তাল অসভ্য, সন্তাল জংলি, কিন্তু সন্তাল ওদের ধর্ম শিখাতে পারে।...
>
> যুদ্ধেরও ধর্ম আছে। ওরা জানে না। যারা লড়তেছে তাদের পায় না তো বুড়া-মেয়ে-শিশু মারে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১২৩)

সাঁওতালদের যুদ্ধনীতি পৃথিবীর সকল জাতির শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। তারা যখনই কোন স্থানে আক্রমণ করত – তার আগে চিঠি পাঠিয়ে সাবধান করে দিত। কেবল মহাজন-জমিদার বা শাসক শ্রেণি ছিল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। নিরীহ রায়ত বা নারী-শিশুর ক্ষতি করা যাবে না, বরং তাদের রক্ষা করা হবে বলে উল্লেখ করা হত চিঠিতে। এ ধরনের একটি চিঠির উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে –

> জানুয়ারির বারো ও তেরো তারিখে, সরকারকে আগে চিঠি পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করে তবে সংগ্রামপুরের নীলকুঠি আক্রমণ করে সিদু ও কানু। আর জানুয়ারির মাঝামাঝি সুজারামপুরের কুঠিয়াল গ্রান্ট সাহেব একটি চিঠি পেলেন।
>
> শিবশাহ ভগতসুবার আজ্ঞানুসারে সুজারামপুরের কুঠিয়াল গ্রান্টকে লেখা হয়, এই চিঠি পাবার পরে তুমি নিজের জিনিসপত্র নিয়ে কুঠি ছেড়ে চলে যেও। কোনো প্রতিবাদ বা ওজর-আপত্তি করলে তা শোনা হবে না। বুধবার আমাদের সেনারা তোমাদের কুঠিতে উপস্থিত হবে। কোনো রায়তের ক্ষতি করা হবে না। বরঞ্চ তাদের রক্ষা করা যাবে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১২৩)

চিঠি দিয়ে সতর্ক করে তারপর আক্রমণ কিংবা রায়তের বা সাধারণ মানুষের ক্ষতি না করে যুদ্ধ চালানোর মতো বিষয় ইংরেজদের বিস্মিত করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল সাঁওতালদের তিরে বিষ ব্যবহার না করার বিষয়টি। অরণ্যচারী সাঁওতালরা গাছ-গাছড়া থেকে জীবনরক্ষাকারী ওষুধ তৈরির পদ্ধতি যেমন জানত, তেমনি জীবনহরণকারী মারাত্মক বিষ তৈরির পন্থাও তাদের আয়ত্তাধীন ছিল। তারা এমনও মারাত্মক বিষের ব্যবহার জানত, যাতে বিষ-মাখানো তিরের সামান্য ছড় লাগলেও বাঘ মরে যায়। এ মহাস্ত্রের জোরেই তারা বাঘ ও হিংস্র মাংসাশী প্রাণী-সঙ্কুল বনে বাস করতে বা বন কেটে বসতি স্থাপন করতে পেরেছে। বাঘের মতো হিংস্র শক্তিশালী জন্তু যাতে মারা যায়, তার ব্যবহারে হাজার হাজার ইংরেজ সৈন্যের মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও দক্ষ তীরন্দাজ সাঁওতালরা তাদের হুলে বিষ মাখানো তির ব্যবহার করেনি, কেননা তাদের রীতি অনুসারে বা তাদের যুদ্ধের রীতি অনুসারে "যুদ্ধের ধর্মে বিষ মাখানো তির ব্যবহার

করা চলে না" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৫-১২৬)। এ অভূতপূর্ব বিষয়টি ক্ষণিকের জন্য হলেও ইংরেজদের মূল্যবোধকে নাড়া দিতে পেরেছিল এবং তাদের মনে সাঁওতালদের প্রতি বিস্ময়মেশানো যে শ্রদ্ধাভাব এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ জেগেছিল ঔপন্যাসিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে তার ভাষারূপ দিয়েছেন এভাবে –

> এরা উন্নততর ফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ের কালেও বিষ ব্যবহার করে না। যুদ্ধের একটা ধর্ম আছে। মৃত্যুকে কত অবহেলে গ্রহণ করে। আমরা কাদের মারছি ? এরা অসভ্য, না অত্যন্ত সভ্য ? অনুন্নত, না অসম্ভব উন্নত ? এ একটা বিশেষ ব্যক্তির কথা নয়। একটা জাতের কথা। অসামরিক অফিসার ইডেন আর সামরিক অফিসার গোডেন দুজনেই একই চিন্তায় কিছুক্ষণ দীর্ণ হয়েছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১২৬)

কেবল ইডেন ও গোডেল নয়, এ ভাবনা আমাদেরও আপ্লুত করে। প্রশ্নের পর প্রশ্নের লক্ষ্যভেদী তির ছুঁড়ে মহাশ্বেতা দেবী পাঠকের মানসে এ বিবেচনাকে জাগ্রত করতে চান যে, তথাকথিত সভ্য সমাজ যাদের গায়ে আদিম অসভ্যের তকমা লাগিয়ে দিয়েছে, প্রকৃত অর্থে তারা অত্যন্ত উন্নত নৈতিকতার অধিকারী। তাদের সহজ-সরল অথচ নৈতিক জীবন থেকে সভ্য সমাজের শিক্ষণীয় আছে বহুকিছু।

অত্যন্ত ঈর্ষণীয় এবং অবশ্য অনুকরণীয় সাঁওতাল জীবনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল – আত্মসম্মানবোধ। সাঁওতালরা অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, যুদ্ধকালেও তাদের এ বৈশিষ্ট্যে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল –

> সাঁওতালদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা একেবারে অপরিচিত। আমরা বলি, 'সারেন্ডার'। সেটা ওদের কাছে ভীষণ অপমানের ব্যাপার। তাই ওরা আত্মসমর্পণ করে না, দাঁড়িয়ে মরে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১২৬)

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রাণে বাঁচার আকুতিতে আত্মমর্যাদাবোধ যখন বেনোর জলে ভেসে যায়, তখন আদিম অসভ্য (!) সাঁওতালদের জীবন ও জীবনবোধ আমাদের পীড়িত করে, যন্ত্রণাকাতর করে এবং শোধনের আকুতিতে উজ্জীবিত করে। আদিবাসী জীবন রচনায় মহাশ্বেতা দেবীর সার্থকতা এ জায়গাতেই।

৪.৭.১১

ঔপন্যাসিক সাঁওতাল জীবন-কথাকে সম্পূর্ণ করতে তাদের টোটেম 'মহিষ'কে ব্যবহার করেছেন সহজাত স্বাচ্ছন্দ্যে। হুল-পূর্ববর্তী সংশয়াদীর্ণ সিদু যখন তাদের গোত্রের প্রাচীন ও জ্ঞানী পুরুষ দুখিয়ার কাছে যায়, আধক্ষ্যাপা দুখিয়া তাকে মহিষের কথা বলে। জানায় যে, সে অপেক্ষা করছে এক মহিষের জন্য, তার গন্ধ

সে পাচ্ছে – মহিষটা এলেই তাকে ধরতে হবে, তবেই সাঁওতালরা তাদের পূর্বের গৌরবের জীবন ফিরে পাবে।

হুলমাহা উপন্যাসে হুলের এবং সে-সূত্রে সাঁওতাল সমাজের সমগ্র-বিবরণকে ধারণ করা হয়েছে, তবে ঔপন্যাসিক সাঁওতাল সমাজে বা হুলে সাঁওতাল নারীদের অবস্থানকে বিস্তৃত পরিসরে আনেননি[১৯]। বিশালী-মঙ্গল উপাখ্যানে বিশালীকে পেলেও যোদ্ধা হিসেবে সে জ্বলে ওঠেনি। অথচ হুলে সাঁওতাল রমণীদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক –

> Women played an important role in the revolt of 1855. ...they accompanied the Santal fauj, doing all sorts of accessory work. While the men, attacked and burnt the villages, there was always a number of women with them carrying off the spoils.(j.p. 20 Dec.55, no.93, j.p.23 August.55, no.35)Sometimes the plundering operation in the villages was done by small bodies of 20 or 30 men who came with their women and children and regularly cleaned out the village. The Magistrate of Birbhum speaks of a Santal woman who accompanied a Santal force which had gone to plunder the village of Deocha...................
>
> The following women prisoners were arrested on a charge of plundering in the company of RamManjhi; Raj Barooka, Radha,Heera,Tara, Monee, Rasoo, Bhookten, Bhowanee, all belonging to the same family. (N,Kaviraj 2001 : 109-110)

সম্ভবত ঔপন্যাসিক কেন্দ্রাভিসারি বলে হুল এবং হুলে প্রতিফলিত সাঁওতাল জীবনে ইতিবাচকতার উপর আলোকসম্পাতে অধিক মনোযোগী। সে-কারণে সাঁওতাল নারীদের পৃথক আখ্যান রচনায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে চাননি। লেখক এ বিদ্রোহকে বৃহত্তর গোষ্ঠীর ক্ষোভ ও অগ্রসরমানতার নিয়ামক হিসেবে দেখেছেন, সেখানে ব্যক্তি তুচ্ছ। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অরণ্য-বহ্নির* সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসের পার্থক্য ঘটেছে এখানেও। *অরণ্য-বহ্নির* সাঁওতাল-বিদ্রোহ অনেক বেশি নারী-কেন্দ্রিক বা নারী-নির্যাতন কেন্দ্রিক ; ব্যক্তিগত আক্রোশ সেখানে মুখ্য। সাঁওতাল নারী-পীড়ন এ হুল সংঘটনের অন্যতম কারণ, তবে আরও বহু নিপীড়নে ক্ষুব্ধ সাঁওতাল-মানসে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির যে আকাঙ্ক্ষা তাকে মহাশ্বেতা দেবী অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে শিল্পরূপ দিয়েছেন। *অরণ্য-বহ্নি-তে* ফ্যান্টাসি বা অতিবাস্তবের ছড়াছড়ি কিন্তু *হুলমাহা*তে কোন ফ্যান্টাসি বা অলৌকিকতা নেই বরং তার বিপরীতটি সত্য – পূর্বোক্ত আলোচনায় তা দেখানো হয়েছে। এ সম্পর্কে সমালোচকের মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে –

> তারাশঙ্করের সাঁওতাল-দ্রোহের কাহিনি নিয়ে রচিত *অরণ্য-বহ্নির* সঙ্গে মহাশ্বেতার আলোচ্য আখ্যানগুলো সে-অর্থে দূরতর। তিনি অনেক বেশি বিশ্লেষণাত্মক ও লক্ষ্যভেদী, আদর্শের প্রশ্নে আপসহীন, আদিবাসীদের সম্পর্কে আঁকাড়া বাস্তবের কারবারি। ফলে তাঁর আখ্যানক্রিয়ায় থাকে নিম্নবর্গীয় বাচ্য-বাচকতা, কেন্দ্র থেকে

পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ার তুমুল গতিমানতা ও ঘূর্ণি-ক্রিয়া, এবং 'পাতি-ইতিহাসের সমাজ-বিজ্ঞান' (আকতার কামাল ২০০৫: ১৬)।

৪.৭.১২

আদিবাসী জীবনের রূপকার মহাশ্বেতা দেবী তাঁর আদিবাসী-প্রীতিকে রাজনৈতিক কিংবা জনপ্রিয়তার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেননি। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে আদিবাসী রক্ষার আন্দোলনে মহাশ্বেতা দেবী হয়ে উঠেছেন একক এক প্রতিষ্ঠান। *হুলমাহা* উপন্যাস কেবল বিদ্রোহের নিছক এক আখ্যান নয়, আদিবাসী মানুষের স্বাধিকারবোধের এক বিশ্বস্ত দলিল ; ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম যারা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছিল, তাদের প্রতি সচেতনতার এক ইতিকথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুরজ গাগরাই

৪.৮.১

ছোটনাগপুরের সিংভূম অঞ্চলে বাঁধ তৈরি ও তার প্রতিরোধের আখ্যান *সুরজ গাগরাই* উপন্যাস। বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসের কাহিনির বাস্তবগ্রাহ্যতা নিয়ে মহাশ্বেতা নিজে বলেছেন –

> সুরজ গাগরাই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সুবর্ণরেখা নদী বাঁধ প্রকল্প সত্যি, ব্যাপক আদিবাসী মালিকানা জমি অধিগ্রহণ সত্যি। ওই বড়ো প্রকল্পের অঙ্গ খড়কাই নদী বাঁধ প্রকল্প। খড়কাই বাঁধ সংঘর্ষ সত্যি, তা ১৯৮২/৮৩ তে ঘটে। ওই সংঘর্ষের নেতা ছিলেন, চাইবাসার কাছাকাছি ইলিয়াগড় নিবাসী গঙ্গারাম কালুণ্ডিয়া। তিনি সেনাবিভাগে ছিলেন। শর্ট সার্ভিস কমিশন-এর পর, অথবা ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন।...
>
> ‘সুরজ গাগরাই’ সে সময়ের এবং ওই বাঁধ-সংঘর্ষ-এর এক প্রকৃত দলিল। গঙ্গারামের হত্যা, ওর ছাই থেকে উদ্ধার করা পিতল, লোহার রড, গুলি ইত্যাদি ধাতব বস্তুর ওজন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, চাইবাসা থেকে আদিবাসীদের বাঙালি বন্ধুরাই আমাকে পৌঁছে দেয়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১০)

গঙ্গারামের কাহিনিকেই সুরজ চরিত্রের আধারে নির্মাণ করা হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে; কাহিনির বিশ্লেষণে তার সত্যতা পাওয়া যায়। সুরজ গাগরাই চাইবাসার বা ডাংগোলের কাছাকাছি এক গ্রামের আদিবাসী যুবক। আদিবাসী স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া শেষে সে বিহারের ফৌজে যোগ দিয়েছিল। অসীম সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয় কিন্তু ফৌজিদের অন্যায় কাজে সমর্থন না করতে পারায় সে সেনাবাহিনী ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের শত শত কোটি টাকার প্রকল্প চেরো বাঁধের কাজ শুরু হয়। বাঁধ তৈরি হলে গ্রামসহ এলাকার একষট্টিটি আদিবাসী গ্রাম জলমগ্ন হবে, সেচ সুবিধা পাবে উত্তর বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল – যে অঞ্চলের অধিবাসী অধিকাংশই উচ্চবর্গীয়। যাদের গ্রাম প্লাবিত হবে – বাসভূমি থেকে যাদের উৎখাত করা হবে, তাদের বাসভূমি যোগান দেবে না সরকার ; দেবে কিছু অর্থ – যার সিংহভাগ যাবে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পকেটে। এমনকি প্রকৃত তথ্য আদিবাসীদের জানানো পর্যন্ত হয় না। এ কারণেই সুরজের নেতৃত্বে গড়ে উঠে ‘চেরো বাঁধ সংঘর্ষ কমিটি’। সুরজ এ কমিটির সম্পাদক। তার নেতৃত্বে আদিবাসীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাঁধের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নানা প্রলোভন ও কৌশল কার্যকর না হওয়ায় অবশেষে মিথ্যে মামলা দায়ের করে সশস্ত্র পুলিশ কর্তৃক

সুরজকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অবর্ণনীয় নির্যাতনে হত্যা করা হয়। সুরজের এ আখ্যান গঙ্গারামের সঙ্গে মিলে যায় বহুলাংশে। গঙ্গারামের কাহিনির বাস্তবনিষ্ঠ প্রমাণ মেলে সমকালীন ইতিহাসে –

> On April 2, 1982 Gangaram Kalundia, an ex-army man and recipient of President's medal was killed by Bihar police for protesting against the construction of the said dam. (Victor 1990 : 1626)

অন্যসূত্র থেকেও এ বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায় –

> Adibasis of chaibasa, Singbhum district, have been agitating against the contruction of kuju Dam, which will submerge their villages. The dam is part of the multi purpose subernarekha valley project. They have been agitating under the leadership of kharkai Ban Sangarsh samiti. In the early hours of 4, april, a police party, led by local DSP raided Illigara village and took away Gangaram Kalundia. Gangaram, 40, a retired Naib Subedar of Indian Army, was tortured to death. He was the general secretary of Kharkai Ban Sangarsh Samiti. (people's union for Democractic Rights 1983: 9)

বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে *সুরজ গাগরাই* রচিত এবং কাহিনি-বিন্যাসে আদিবাসীদের উপর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বঞ্চনার ইতিবৃত্ত গুরুত্ব পেয়েছে। এটি মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস। তবুও উপন্যাসের কাহিনিতে সংগ্রামের ইতিবৃত্তের বুনোটে আদিবাসী-জীবনের রঙিন সুতোর অস্তিত্ব বিদ্যমান। আদিবাসী জীবনকে না জানলে না বুঝলে, তাদের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যাবে না – এ প্রত্যয় ঔপন্যাসিকের ছিল এবং সে-কারণেই এ কাহিনি-বয়নে তিনি আদিবাসী জীবনকে বর্ণনা করেছেন গাঁথার (Ballad) আবহে এবং সে-জীবনের অনিবার্য পরিণতি দেখিয়েছেন সংগ্রামী নেতার মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী মানসিকতার মধ্য দিয়ে।

৪.৮.২

উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি 'কোলহান' – কোলদের দেশ – আধুনিক ভারতের মানচিত্রে যাকে 'সিংভূম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'কোল' কোন একক জাতিগোষ্ঠি নয় – সাহেবরা সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো সকলকেই 'কোল' বলে গেছে। ঔপন্যাসিক অবশ্য 'হো'-দের কেবল 'কোল' বলা ঠিক বলে মনে করেছেন। এ বিষয়ে গবেষকরাও প্রায় একই মত দিয়েছেন। পরমেশ প্রসন্ন রায় তাঁর 'ছোটনাগপুরি হো' প্রবন্ধে কোলদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন (পরমেশ ২০০৫ : ৯৮) এবং তাঁর বিভাজিত শ্রেণিত্রয়ের তৃতীয় বর্গ – লড়াই-কোল বা হো জাতি ; যাদের বাস সিংভূমের পার্বত্য প্রদেশে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘কোল জাতির সংস্কৃতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে ইউরোপীয় মতকে অনুসরণ করে বলেছেন –

> উড়িয়া, বাঙ্গালী ও বিহারিরা ‘কোল’ বলিলে, দ্রাবিড়-ভাষী ওঁরাও, কন্ধ এবং মাল-পাহাড়িদের বাদ দিয়া মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোরকু প্রভৃতিদেরই বুঝে ; সুতরাং এই ব্যাপক সংজ্ঞা ব্যবহার করাই ভাল। (সুনীতি ২০০৫ : ১২০)

ভারতবর্ষে যে ছয়টি বিভিন্ন জাতির নয়টি শাখা বিভিন্ন কালে এসেছে তাদের মধ্যে কোলদের সুনীতিকুমার Proto-Australoid বা ‘প্রাথমিক দক্ষিণাকার’ জাতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন (সুনীতি ২০০৫ : ১১৪), এ জাতি প্রথমে ভারতে আসে এবং অতি প্রাচীনকালে ভারত থেকে এদের একদল, দক্ষিণের মহাদ্বীপ অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়, অন্য দল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ও ইন্দোনেশিয়া বা দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, Melanesia বা কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জে এবং Polynesia বা পুরুদ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে এবং নানা ভিন্ন জাতির লোকের সঙ্গে মিলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের আধুনিক অধিবাসীরূপে পরিণত হয়। আর ভারতবর্ষের কোলজাতি অন্য জাতির লোকেদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর মিশ্রিত হলেও মুখ্যত প্রাথমিক দক্ষিণাকার জাতির বংশধর।

প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ কোলহান মূলত আদিবাসী অঞ্চল। ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, তামা, অ্যাসবেসটস, ক্রোমাইট, পারমাণবিক খনিজ ইউরেনিয়াম, সিলিকা, সোনা-কিরনাইট, অভ্র, লাইমস্টোন, বক্সাইট – সব ধরনের খনিজ সম্পদ পাওয়া গেছে এ অঞ্চলের মাটির নীচে, পাহাড়ের বুকে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় – “সিংভূমের মাটি শিল্পপতিদের কাছে সোনা। কী নেই সেখানে। খনিজ সম্পদের ‘ক’ থেকে ‘হ’ সবই আছে” (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৭৩)। নানা মূল্যবান সম্পদে শোভিত হয়েও এ অঞ্চলের আদিবাসীরা নিঃস্ব, নিপীড়িত, বঞ্চিত। কেননা “যা কোলহানের নিজের জিনিস, তাতে তো টাটা, বিড়লা, ডালমিয়াদের পুরো দখলে” (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৪৫)।

জঙ্গলবেষ্টিত কোলহানের জঙ্গল কোলদের বাঁচার অবলম্বন। খাদ্য ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব উপকরণ তারা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে। জঙ্গলের ফল-মূল-কন্দ তাদের খাদ্য, এমনকি পাতা পর্যন্ত তারা কাজে লাগায়। শিসল পাতা, কিতা পাতা, বিড়ি পাতা, সবই তাদের ব্যবহার্য। প্রান্তিক এ লোকেদের ছাতা কেনার সামর্থ্য নেই, রোদজল থেকে বাঁচার জন্য তারা চুটুর বানায় শিসল পাতা থেকে ; বিড়িপাতা থেকে বিড়ি তৈরি করে। কিন্তু জঙ্গল জাতীয়করণের ফলে তাদের নিজস্ব জঙ্গলে তারা পারমিট ছাড়া ঢুকতে পারে না, শিকার করতে পারে না। আবহমান কাল থেকে তারা জঙ্গলের রক্ষক, কোন ক্ষতি হয় না জঙ্গলের তাদের দ্বারা – তারাই আজ জঙ্গলে অনাহুত। বহুকাল ধরে তারা বন তথা প্রকৃতির রক্ষক – বৃক্ষকে তারা

দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। তাদের প্রার্থনায় তারা মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য ধন্যবাদ জানায় নদী ও ঝর্ণাধারাকে, পৃথিবীকে। পৃথিবীর ভূমি-জল-আকাশ-অরণ্যকে দেখে তারা জীবনের অংশ হিসেবে, পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মুনাফার উপাদান হিসেবে নয়।

অজ্ঞ, সরল আদিবাসীরা শোষণের নানা প্রান্ত তাদের জীবনে অনুভব করে প্রতি পদে। তাদের আজন্ম পরিচিত জঙ্গলের ডাক হয় প্রতিবছর। সরকারি নিয়মে আদিবাসী অঞ্চলের ভূমি কিংবা জঙ্গলের ডাক নেবার কিংবা মালিক হবার অধিকার কেবল আদিবাসীদের। অন্যদিকে ঠিকাদারেরা বেনামে বছরের পর বছর জঙ্গলের ডাক নিয়ে নির্বিচারে গাছ কেটে জঙ্গল নষ্ট করে আইনের মধ্যে থেকে – তাদের জন্য কিছুই বেআইনি নয়। সুরজ ও তার পিতামহ মাটা গাগরাইয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী পরিচয়কে ব্যবহার করে অ-আদিবাসীদের ফায়দা তোলার বিষয়টি স্পষ্ট আকার পেয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনেই আদিবাসী নামে জঙ্গলের দখল নেয়া হয় এবং দশ-বিশ টাকা আদিবাসীদের দিয়ে ঠিকাদারেরা লাখ লাখ টাকা মুনাফা করে। এ ধারা যেমন মাটা গাগরাইয়ের সময়ে ছিল তেমনি বর্তমানেও কার্যকর। বহুযুগের বঞ্চনা ও শোষণের ইতিবৃত্ত এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আদিবাসীদের সংগ্রামী হয়ে ওঠার কাহিনি এ উপন্যাসে ধারণ করা হয়েছে।

বারবার বঞ্চনার শিকার হয়ে আদিবাসীরা একসময় প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করে কিন্তু প্রতিবাদী হয়ে ওঠার জন্য তাদের প্রয়োজন হয় অকুতোভয় নেতৃত্বের। সুরজের পিতামহের কালে যেমন পাগুন জোঙ্কা নামে এক খেয়ালি আদিবাসী বন্দুক হাতে প্রতিরোধ করেছিল জঙ্গল ঠিকাদারদের। সে খাদে কাজ করে টাকা কামিয়ে বন্দুক কিনেছিল, কেননা তাদের বিশ্বাসে 'বন্দুক হাতে থাকলে সাহস থাকে' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৪৬)। পাগুন ঠিকাদারের কাছ থেকে জঙ্গলের ডাকে মাটা গাগরাইয়ের নাম ব্যবহার করা বাবদ হাজার টাকা পাইয়ে দেয়। মজুরদের নিয়ে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ তৈরি করে তারা সে বছর মজুরি বাড়িয়ে নেয় কিন্তু পরের বছরই পাগুন মরে যেতে জঙ্গল কুলি ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায় এবং মজুরিও কমে পুরনো হারে ফেরত যায়। সুরজের সমকালে কালু সুমরাইও সংঘবদ্ধ জনতার নেতৃত্ব দিয়ে ভুয়া নামে জঙ্গল ডাক বাতিল করে দেয় এবং তাদের পবিত্র সিমঝোরা জঙ্গল রক্ষা করে। পরবর্তী সময়ে ভোটের রাজনীতিতে তাকে যখন মেরে প্রায় পঙ্গু বানিয়ে দেয়া হয় – তখন আবারও তাদের সংঘবদ্ধ শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। দুটো ঘটনাই – আদিবাসী জীবনে সঠিক নেতৃত্বের অপরিহার্যতাকে চিহ্নিত করে। আবহমান কাল থেকে আদিবাসী প্রায় প্রতিটি গোত্র গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপন করে আসছে। তাদের সমাজে গোত্রপ্রধানই সর্বশক্তিমান – তাদের জীবনের সব সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে নৃতাত্ত্বিক-গবেষকের মত উদ্ধৃত হল –

হো-গণ এখন গভর্নমেন্টের খাস মহলের প্রজা। খাস মহলের নাম কোলহান। সমগ্র কোলভূমি অনেকগুলি পীর বা উপবিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক পীরের সামাজিক কর্তার নাম মানকি। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি পীর। প্রত্যেক গ্রামের মোড়লের নাম মুণ্ডা। মুণ্ডা ও মানকিগণ খাজনা আদায় করিয়া সরকারি খাজনা দেয়। ইহারা পুলিশের কার্যও করে। সুতরাং ইহারা অনেকটা স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করিতেছে। বাহিরের লোক ইহাদের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না (পরমেশ ২০০৫ : ৯৯)।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের শাসন মান্য করে বলেই শত শোষণ-অত্যাচারেও তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে না, যতদিন না তাদের কেউ লড়াইয়ের বা বিদ্রোহের আহ্বান করে। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই সিংভূমের হো-রা 'লকড়া হো' বা 'লাকরা-কোল' নামধারী হয়েও নির্বিবাদে বছরের পর বছর "দিকু বা বহিরাগতদের শোষণের শিকার হয়ে কোলহানের সন্তানরা নিজের দেশে ভিখারি হয়েই আছে" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৪৫)।

৪.৮.৩

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইংরেজ বিরোধী বহু আন্দোলন হয়েছে আদিবাসীদের মধ্যে। কোলরা বিদ্রোহী হয়েছে কয়েকবার – তার মধ্যে ১৮২০-২২ এবং ১৮৩১-৩২ সালের বিদ্রোহের ব্যাপকতা ছিল বেশি। উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, সুরগা ১৮৩১-৩২ সালের কোল-বিদ্রোহের নায়ক। ওই বিদ্রোহের আরেক নায়ক সিংরাই। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের মৌখিক ইতিহাসে তাদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তবে লিখিত ইতিহাস ও সাহিত্য তাদের নেই বলে কখনও কখনও এ নামগুলো বিস্মৃতির ধোয়ায় ধূসর হয়ে পড়ে কিন্তু যখনই জীবনে বিদ্রোহের, বঞ্চনার, প্রতিরোধের দামামা বাজে তখনই এ নামগুলো আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে ; কোনো কাঁচা রাস্তার ধারে পাথরের গায়ে লেখা দেখা যায় 'বীর সুরগা সড়ক' অথবা কোনো পাহাড়ের পাদদেশে কাঁচা হরফে সাদা রঙে লেখা হয় 'সিংরাই বুরু'। ১৮৩১-এর বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল প্রায় ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত – মূলত কোলহানে বহিরাগতদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধতা এবং নিজভূমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই ছিল এ বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। সম্ভবত এ কারণেই ১৮৩৭ সালে এখানে প্রণীত হয় উলকিনসনি ব্যবস্থা। তারপরেও যখন এই সরল মানুষগুলো বহিরাগত 'দিকু'দের কৌশলে পরাজিত হয়ে জমি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে তখন তাদের জমি রক্ষার জন্য ১৯০৮ সালে প্রণীত হয় প্রজাস্বত্ব আইন। এ দুই আইনের বলে 'ভারতের বাকি অংশ থেকে এ জায়গার সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা পৃথক ও বিশিষ্ট।' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৮৮)

ছোটনাগপুরের প্রজাস্বত্ব আইন ও উইলকিনসন ব্যবস্থার কল্যাণেই হোক কিংবা নিজেদের লড়াকু বৈশিষ্ট্যের কারণেই হোক 'অন্য সমাজের প্রভাব ও ধাক্কা ওরা সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ করেছে' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৭৩)। ঔপনিবেশিক শাসনামলেও তারা হিন্দু, ক্রিশ্চান বা অন্য ধর্ম সবচেয়ে কম গ্রহণ করেছে। কোলরা ব্রিটিশকেও দীর্ঘকাল ঢুকতে দেয়নি তাদের অঞ্চলে। চেরো অঞ্চলের হো আদিবাসীদের এ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারার পেছনে আরও একটা বড় কারণ হল ভূমি। এ অঞ্চলের আদিবাসীদের কিছু কিছু কৃষিজমি ছিল। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হলেও কিছু স্বাচ্ছন্দ্য তাদের মনোভাবকে দৃঢ় করেছিল এবং সে-কারণেই বাঁধ তৈরির বিরোধিতা তারা করেছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে তারা জেনেছে, আদিবাসীরা ভূমি থেকে উৎখাত হলে কখনও আর স্থিত হতে পারবে না। রাঁচিতে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং, তিতপানি ম্যাঙ্গানিজ খাদান, কোটাবুরু সিলিকা প্রকল্পে যারা প্রতিবার উচ্ছেদ হয়েছে তারা কেউই ক্ষতিপূরণের টাকা পর্যন্ত ঠিকঠাক পায়নি। নতুন করে পুনর্বাসনের সুযোগ তাদের দেয়া হয়নি – ফলে তারা বিভিন্ন খনির মজুরে পরিণত হয়ে উদ্বাস্তু-জীবন যাপন করেছে এবং নিজ জাতিসত্তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, আদিবাসী পরিচয় মুছে কেবল মজুরে পরিণত হয়েছে। সে কারণে চেরো বাঁধ সংঘর্ষ কমিটির সম্পাদক সুরজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় –

> জমিনে বদলে জমিন। নয় তো কোলহান থেকে হাত উঠাও (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৮০)।

কোলরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারলেও বহির্জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কারণে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। সরকার আদিবাসীদের জন্য স্কুল করেছে, সে স্কুলে পাঠরত প্রত্যেক ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ রয়েছে কিন্তু তার খবর তাদের অজানা। কিছু ছেলে পড়তে এলেও নিজ অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে পারে না, হয়ে থাকে অবহেলিত। আদিবাসীদের কিছু অংশ শিক্ষিত হলেও নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ জীবনে আবদ্ধ থাকে। আদিবাসীদের জন্য যে চাকরি বাকরির পদ সংরক্ষিত রয়েছে তার খবর তারা রাখে না, নামও লেখায় না এক্সচেঞ্জে, আর শেষ অবধি সে সব কাজ অন্য জাতের ছেলেরা পেয়ে যায়। আইনে থাকলেও নিজেদের অজ্ঞতায় তারা নিজ জমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। অজ্ঞতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য কোল সমাজে কিছু ধীর পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বর্তমান যুগের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তারা এবং অন্য আদিবাসীরাও তাদের ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাতে শুরু করেছে। ফলে আদিবাসীদের মধ্যেও কিছু অফিসার তৈরি হচ্ছে, যারা আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য লড়াই করছে। এ উপন্যাসের মোহন তিরকে তেমন একটি চরিত্র। ওঁরাও এ যুবকের উল্লেখ পাওয়া যায় সমগ্র উপন্যাস জুড়ে। এ ছাড়াও এক মুণ্ডা আই এ এস-র কথাও পাওয়া যায়। আদিবাসী ছাত্রের স্কুলে মাস্টারও একজন আদিবাসী। মোট কথা আদিবাসী সমাজেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগে ধীর গতিতে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে

দু'একজন অফিসার সমগ্র জাতিগোষ্ঠীর অবস্থানের পরিবর্তন করতে পারে না। আবার অনেকক্ষেত্রে শ্রেণিগত পরিবর্তনের কারণে তারা নতুন শ্রেণি তৈরি করে পুরনো জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে ভুলে। এ উপন্যাসে এমন একটি চরিত্র অরুণ সুমরাই ও তার সমর্থক আদিবাসীরা। অরুণ সুমরাই কংগ্রেস দলের রাজসভার সদস্য। তার জনৈক সমর্থক গঙ্গাধর জোংকো – জাতিতে হো – ডি. সি. র সঙ্গে চেরো অঞ্চলের মানকি-মুণ্ডা অর্থাৎ গ্রামপ্রধানদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেয় কিন্তু আদিবাসীদের পক্ষ নিয়ে লড়তে পারে না, কেননা তারও শ্রেণি-বদল হয়েছে। কংগ্রেসী বৃদ্ধ হো-কে তার নিজ শ্রেণির কেউ আপন করে নেবে না।

৪.৮.৪

চেরো বাঁধ প্রকল্প নিয়ে *সুরজ গাগরাই* উপন্যাসটির অবয়ব গড়ে উঠলেও এ উপন্যাসে প্রচ্ছন্নভাবে বারবার অলগখণ্ডের দাবি বিষয়ক লড়াইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে দীর্ঘদিনের শোষণ-বঞ্চনার শিকার আদিবাসীরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্যের বা অলগখণ্ডের দাবি করে আসছিল এবং সংগ্রাম করছিল বহুদিন ধরে। আদিবাসীদের সব দাবিই একসময় অলগখণ্ডের দাবিতে পর্যবসিত হয়েছে। সুরজের চেরো বাঁধ সংঘর্ষ কমিটি তাদের একটি সমস্যার সমাধানকল্পে গঠিত সংগঠন, তবে অলগখণ্ডের দাবির সঙ্গেও তারা একাত্ম বোধ করে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন –

> অলগখণ্ড নামের পিছনে একে একে দাঁড়াচ্ছিল; ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল কোলহানের সন্তানরা। সত্তরের দশকে। কোলহান ক্রান্তি দল, কোলহান রক্ষা দল, কোলহান সেনা সংঘ এমন সব নামের যে সব ছোটো ছোটো সংগঠন সময়ের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে আর বন্দুক বনাম তির ধনুকের অসম লড়াইয়ে হেরে গেছে বার বার, তারাও অলগখণ্ডের নামে আবার জোট বাঁধছিল। শাল কেটে সেগুন লাগাবার ব্যাপারে অলগখণ্ডের সঙ্গে সরকারের লড়াইয়ে বন্দুক চলছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৬৬)

শাল বনাম সেগুনের যুদ্ধের হাওয়ায়ও অলগখণ্ডের ঝাণ্ডা প্রাণ পায়। এ উপন্যাসে ভারতবর্ষীয় আদিবাসীদের জীবনের আরও একটি অধ্যায়কে খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্থান দেয়া হয়েছে। নাগরিক জীবনের আভিজাত্য পূর্ণতা পায় সেগুন ও তার তৈরি আসবাব ব্যবহারে। শালের তুলনায় তাই সেগুনের দাম কিউবিক ফুটের হিসেবে বেশি। সরকার বেশি লাভের আশায় শাল বন বিনাশ করে সেগুন লাগাবার পরিকল্পনা করে। সরকারি এ সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় আদিবাসীরা। কেননা শাল তাদের কাছে দেবতাসম। লেখকের ভাষায় –

শাল ওদের গরাম দেবতা। শালের পাতা, ফুল, ফল, বীজ, ছাল ও কাঠ ওদের হাজার উপায়ে পেটের খিদে মিটায়। হাজার কাজে লাগে। বনভূমিতে শালের অবস্থান স্নেহশীল কর্তাব্যক্তির মতো। শালবনের মাটিতে লালিত ও পুষ্ট হয় নানান ঝোপড়া গাছ। লতা, আর কন্দে-মূলে-ফলে গরিবের খিদে মেটে।

সেগুন হল স্বভাবে জমিদার। সে যে বনে জন্মায়, তার মাটিতে আর কোনো গাছ-লতা-ঝোপ থাকতে পারে না (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৬৬)।

ফ্রাঞ্জ ফেনো বলেছেন, উপনিবেশের সাফল্য তখনই ঘটে যখন সমস্ত বশ-না-মানা প্রকৃতি শেষপর্যন্ত বশে আসে (ফ্রাঞ্জ ফেনো ১৯৮৮ : ২০৬)। ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা যেমন রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অস্তিত্বহীন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে নির্বিবাদে প্রকৃতি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ; তেমনি স্বাধীন ভারতের নয়া-ঔপনিবেশিকরা আদিবাসীদের অস্তিত্বহীন করে তুলতে চায় শাল গাছ ধ্বংস করে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করার মধ্য দিয়ে। শাল গাছ কেটে সেগুন লাগাবার সরকারি সিদ্ধান্ত অরণ্যচারী, প্রকৃতি-পালিত আদিবাসীরা মানতে পারেনি, তারা সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে এ নিয়ে। তাদের ভাষায়–

শাল আদিবাসী
সাগোয়ানা দিকু–
সাগোয়ানা রোপাই–
বন্ধ করো।। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৬৭)

এ বিষয়টি অবলম্বন করে মহাশ্বেতা দেবী ‘সাগোয়ানা’ নামে একটি গল্প পর্যন্ত লিখেছেন।

আদিবাসীদের বিশেষত হো জাতির সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বা সমস্ত উৎসব শাল গাছের উপস্থিতি অপরিহার্য। হো জাতির সবচেয়ে বড় উৎসব মাঘে পরবে তারা এক সুপ্রাচীন শাল গাছকে নতুন ধান, ফুল ও মুরগি বলি দিয়ে পূজা করে, তারপর তাদের পরব শুরু হয়। সার্জোম-বাহা বা নতুন ফুল-পাতার বসন্ত উৎসব তারা পালন করে যখন শাল গাছে নতুন ফুল ফুটে। বাহা পরবে গ্রাম-দেবতার পূজা হয় শাল ফুলে, ডিয়াং[২০] নামক একপ্রকার পানীয় ও মুরগি বলি দিয়ে। এ পরব নারী-পুরুষ নেচে গেয়ে উদযাপন করে। বাহা পরব উদযাপন না করে তারা শালপাতার থালা বাটি তৈরি করতে পারে না, খেতে পারে না মহুয়ার ফলফুল কিংবা কোনো জংলা ফল।

হো জাতির বিশ্বাসের-ভূমিতেও শালগাছের অবস্থান সুদৃঢ়। রামপুর জঙ্গলমহালের অন্তর্গত সিমঝোরা পাহাড় ও তার নিচের শালবন হো জাতির লোকেদের কাছে অতি পবিত্র বলে গণ্য। তারা কেউ এ বনে ঢোকে না, এখানে কেউ গাছ কাটে না। তাদের বিশ্বাস, যতদিন এই পাহাড়, বন ও এ বনের পূজ্য প্রাচীন

শাল গাছটির পবিত্রতা বজায় থাকবে, ততদিনই কোলহানের কোল জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকবে এবং একদিন তারা আবার তাদের প্রাচীন গৌরব ফিরে পাবে।

অন্যান্য আদিবাসী জাতির মতো হো জাতির মানুষেরা অসুখ-বিসুখে দৈব-নির্ভরতাকে অবলম্বন করে। তাদের বিশ্বাসে তাদের অসুখ-বিসুখ ভাল করতে পারে দেওনারা। ডাইন বা ভূতে তাদের বিশ্বাস সর্বাধিক। ডাইন বা ভূতে ধরলে তাদের সোখা ছাড়ায়। অসুখ হলে দেওনা সারায়। সোখা বা দেওনা – দু' জনেই অলৌকিক বা দৈবীশক্তির অধিকারী বলে তারা মান্য করে। হাসপাতালের আধুনিক চিকিৎসার উপর খুব বেশি ভরসা তারা করে না – কেননা এ চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে তারা একেবারে অজ্ঞ।

চেরো গ্রামের অধিকাংশ হো সম্প্রদায়ের কিছু কিছু জমি আছে – তাই ভাত তাদের উৎসবের প্রধান খাদ্য। ভাত রাঁধলে তারা ভাতের ফেনে নুন আর মরিচ গুঁড়ো মেশায় এবং তা দিয়েই ভাত খায়। তাদের ভাষায় 'ভাতই তো একটা জীবনদায়ী ব্যাপার। ভাত থাকলে কি ব্যঞ্জন লাগে নাকি?' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৫২)

তবে অতিথি এলে ভিন্ন কথা। হো জাতি অত্যন্ত অতিথিবৎসল। অতিথির জন্য তারা ভাতের সঙ্গে শাক এবং ডাল রান্না করে। তাদের হিসেবে শাক, ডাল রান্না করা বা খাওয়া মানে অনেক খাওয়া, রীতিমতো উৎসবের খাওয়া। অতিথি এলে তারা অতিথির পা ধোয়াবে, জল এনে দেবে। ভুরা গুড় ও গোঁড় লেবুর শরবত খাওয়াবে। ডিয়াং নামক বিশেষ পানীয় এন সামনে দেবে এবং বিশেষ খাবারের আয়োজন করবে। একজন নৃতাত্ত্বিক-গবেষকের (গিরিবালা ২০০৫ : ১০৪) মত অনুযায়ী, এদের বিশ্বাস – মাটিতে শুলে অসুস্থ হতে হয়, তাই তারা দড়ির খাটিয়া প্রস্তুত করে শয়ন করে। ধনী-গরীব সকলের খাটিয়া আছে। অতিথি এলে তারা বিশেষ ধরনের সাবুই ঘাসের দড়িতে বোনা খাটিয়ায় বসতে দেয়। অতিথি আগমনের কথা জানলেই তারা নতুন করে খাটিয়া বুনতে লেগে যায়।

হো জাতির পোশাকও খুব সাধারণ। খালি গা, কোমরে কটি বস্ত্র, খালি পা, মাথায় পাগড়ি, এই তাদের জাতির পোশাক – তবে কেউ কেউ এখন জামা, ধুতিও পরে। তবে বিশেষ অনুষ্ঠানে নিজেদের ঐতিহ্যের পোশাকে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে।

"হো মেয়েরা খুবই স্বাধীন"(মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৫৪)। নিজ পছন্দের পাত্রকে তারা বিয়ে করতে পারে এবং পছন্দের পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন পরবে নাচতে পারে। বিয়ের সময় বরপক্ষকে প্রচুর ব্যয় করতে হয় কন্যাপণ মেটাতে। বিয়ের সময় মেয়েরা কন্যাপণের ওপর খুব জোর দেয়। মেয়ের বাবাকে দিতে হয় গরু-মোষ এবং সংখ্যায় তা কম নয়। জানা যায় পূর্বে "পঞ্চাশ-ষাটটা গরু বিবাহের পণ ছিল" (গিরিবালা

২০০৫ : ১০৯)। তাতে স্বামী ফতুর হয়ে গেলেও কোন পরোয়া নেই। হো মেয়ের মনে সান্ত্বনা থাকে যে, তার পরিশ্রম, তার কামাই তার বাবা পাবে না বটে কিন্তু এই গরু-মোষ তার বাবার অভাব ঘুচাবে। যদিও বাস্তবে তেমন ঘটে না – আকালের সময় এই গরু-মোষ বিক্রি হয়ে যায় পেটের চাহিদা মেটাতে। চড়া কন্যাপণের কারণে হো সমাজে অনেক ছেলে-মেয়ে আইবুড়ো থাকে শেষ পর্যন্ত। অনেকে আবার মহাজনদের কাছ থেকে কর্জ নিয়ে কন্যাপণ মেটায় কিন্তু বিয়ের পরই কর্জের দায়ে ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত হয় এবং সস্ত্রীক চলে যায় কোনো খনির কাজে মজুর বা ক্রীতদাস হয়ে। হো বিয়েতে গ্রাম-সমাজকে ভোজও দিতে হয় – তাতেও খরচ হয় বিস্তর।

বিয়ের মতোই আদিবাসী জীবনে মৃতদেহের সৎকার এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ উপন্যাসে মাটা গাগরাই ও সুরজ – দুজনের পারলৌকিক ক্রিয়ার বিবরণ আছে – তবে দুটোয় ভিন্নতা আছে। সুরজের পিতামহ মাটা গাগরাইয়ের মৃত্যু স্বাভাবিক। তাই তার মৃতদেহকে তেল-হলুদে স্নান করানো হয়। পরানো হয় নতুন কাপড়। মৃতের হাতে একমুঠো ধান দেয়া হয় আর নেয়া হয়। দেয়া-নেয়ার পর্ব তিনবার হলে সে-ধান কাপড়ে বেঁধে সংরক্ষণ করা হয় আগামী বছর সে-ধান ছড়িয়ে বীজ বোনা শুরু হবে বলে। অর্থাৎ শস্যের মধ্যে তারা মৃতের অস্তিত্বকে ছড়িয়ে দিতে চায়। তাদের বিশ্বাস এ ধানে ফসল ভাল হয়। মাটা গাগরাইকে সমাধিস্থ করা হয়। মৃতের মুখে পারলৌকিক পাথেয় হিসেবে দেয়া হয় পয়সা, সমাধিতে রাখা হয় মৃতের কাপড়, চাল ও ধান এবং একটি বাটি। তারপর শায়িত মৃতদেহ মাটিচাপা দেয়া হয়। সমাধিতে পাথর দিয়ে সমাধিসৌধ বা শ্মশানডিরি স্থাপন করা হয়। তারা সাধারণত দূরের পাহাড় থেকে সমাধি পাথর সংগ্রহ করে। তাদের বিশ্বাস যত দূর থেকে যত কষ্ট করে পাথর আনা যায়, তত বেশি সম্মান দেখানো হয় মৃতকে। কারও সমাধি না হলেও তার সম্মানে গ্রামে সমাধি-পাথর বসানো হয় – সুরজের বাবার বেলায় যেমনটা হয়েছিল। সুরজের বাবার মৃত্যু হয়েছিল গ্রাম থেকে অনেকদূরে টাটানগরে। তাই তার সমাধি হয়নি, সমাধির ওপর শ্মশান-ডিরি দেয়া হয়নি, তবে তার সম্মানার্থে গ্রামবাসী পায়ে চলা পথের ধারে একটি পাথর বসিয়েছিল আর তার ঠাকুরদা তার স্মৃতি হিসেবে উঠানে লাগিয়েছিলো একটি করম গাছ।

সুরজের মৃত্যু হয় অপঘাতে। তার মা ও স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী তাকে সমাধিস্থ না করে তার মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেয়া হয়।[২১] তবে তার আগে তাদের নিয়মিত সৎকার ক্রিয়া তারা পালন করে নিষ্ঠার সঙ্গে। তাদের নিয়মে যেহেতু মাটিতে শোয়া ঠিক নয় – সুরজের মৃতদেহও তারা মাটিতে শোয়ায় না। তার সম্মানার্থে উঁচু মাচাং বাঁধা হয় – গরম পানিতে স্নান করানো, নতুন কাপড় পরানো ও হাতে ধান রেখে তুলে নেয়া – সমস্তই পালন করা হয়।

জন্ম-মৃত্যু ও বিয়ে – এ তিনটি ক্রিয়াতে প্রায় সব সমাজেই রীতিমতো উৎসব করা হয়। আদিবাসীরা স্বভাবতই উৎসবপ্রিয় – সুতরাং তাদের সমাজে তাদের জীবনের এই বিশেষ পর্যায়গুলোর গুরুত্ব আরও বেশি। এ উপন্যাসে জন্মানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ নেই – তবে সন্তানের নামকরণের বিষয়টি আছে। তাদের সমাজে সচরাচর পিতামহের নাম পৌত্র পেয়ে থাকে। সুরজকে তাই 'মাটা' বলে সম্বোধন করা হয় – এটি তাদের নিজস্ব রীতি। উপন্যাসে মহাশ্বেতা জিয়াতাতা (পূর্বপুরুষ), আজি (দিদি), উন্দি (ছোটো ভাই), কিমিন (ছোটো ভাইয়ের বৌ), বাউহোনিয়ার (ভাসুর) প্রভৃতি সম্বোধনবাচক সম্পর্কের পারস্পরিক গভীরতা ও শ্রদ্ধাবোধকে আলোকিত করতে চেয়েছেন।

আদিবাসী জীবনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এ উপন্যাসে উঠে এসেছে – তা হলো তাদের ক্রীড়াপ্রিয়তা। আদিবাসীরা খেলাধুলা ভালবাসে, তীরন্দাজ হিসেবেও তাদের খ্যাতি আছে আর সে কারণেই ফৌজি হিসেবে তারা আদৃত হয়। কেননা তির চালনায় যারা লক্ষ্যভেদ করতে পারে, বন্দুকেও তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। হো জাতি ভীষণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। শত্রুদের শিক্ষা দিতে তারা 'ভেলুয়ার তেল' নামক এক প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে, যা অনেকটা অ্যাসিডের মতো ক্রিয়া করে। এ তেল তারা শত্রুর মলদ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। তেল যত টাটকা থাকবে তার ক্ষমতা হবে তত মারাত্মক, পুরনো হলে তা কিছুটা নিস্তেজ হয়ে যায়, তবুও কারও চামড়ার সংস্পর্শে এলে চামড়া পুড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে।

৪.৮.৫

স্বাধীনতার পর থেকেই কোলহানে নানা দল তৈরি হয়েছে স্বাধীন কোলাহানিস্তান গড়ার লক্ষ্যে। ১৮৩৭ সালে প্রবর্তিত ভূমি-ব্যবস্থা, যা উইলকিনসন ব্যবস্থা বলে প্রচলিত, তার ভিত্তিতে তারা স্বায়ত্তশাসন কামনা করেছে দীর্ঘকাল ধরে। তাদের আকাঙ্ক্ষা, "গ্রামের মুখিয়া থাকবে মুণ্ডা, আর করেকটা গ্রামের মাথা হবে মানকি, আর মানকি-মুণ্ডার শাসনই চলবে" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১৭৫)। এ লক্ষ্যে তারা গড়েছে কোলহান ক্রান্তিদল – যার ঝাণ্ডা সবুজ রং-এর – সবুজের বুকে একটি তির আঁকা। এ ঝাণ্ডা স্বাধীন কোলহানের কথা স্মরণে আনে। ঔপনিবেশিক আমলেও এমন ঝাণ্ডা নিয়েই অনেক লড়াকু হো সাহেবদের সঙ্গে লড়েছিল। তৈরি হয়েছে 'কোলহান রক্ষাদল'– যার নেতৃত্বে আছে দুই শিক্ষিত তরুণ– বরুণ জোংকো আর ভারত মিন্‌জ। বরুণ গ্র্যাজুয়েট, আর ভারত টাটায় ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে অফিসার। দুজনেই কাজ ছেড়ে স্বাধীন কোলহানিস্তানের আশায় নতুন দল গড়েছে। কোলদের সংগ্রামের এমন বিবরণ *সুরজ গাগরাই* উপন্যাসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মুখ্য চরিত্র সুরজ ও তা বাঁধ রক্ষার সংগ্রামের সত্যতা

পূর্বে নিরূপণ করা হয়েছে এবং এ উপন্যাসের অন্যান্য তথ্যের সত্যতা নিরূপণ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী নিজেই –

> *সুরজ গাগরাই* অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।
>
> *সুরজ গাগরাই*-এ বর্ণিত অন্যান্য সব ঘটনাই সত্যি। সে সময়ে আমি ওদের সঙ্গে চলতাম, জীবনে জীবন যুক্ত ছিল, কাছের মানুষ ছিলাম। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১২ : ১০)

একজন কাছের মানুষ হিসেবে, একজন আদিবাসী-দরদী ব্যক্তি হিসেবে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে অত্যন্ত মমতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে আদিবাসী জীবনের রেখাচিত্র টেনেছেন, আলোকিত করেছেন এক প্রান্তিক জনজাতিকে।

নবম পরিচ্ছেদ

জঙ্গল

৪.৯.১

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর আদিবাসী জীবনভিত্তিক উপন্যাসসমূহে বরাবর আদিবাসী জীবনের গৌরব, বীরত্ব-ব্যঞ্জক কাহিনি, শোষণ-বঞ্চনার ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেছেন অসীম মমতা ও দায়বদ্ধতায় ভারাক্রান্ত হয়ে। সে-দিক দিয়ে *জঙ্গল*[২২] উপন্যাসের কাহিনিবয়নে কিছুটা ভিন্নতা এসেছে। আদিবাসী জীবনের কুসংস্কার, বিশেষত সাঁওতাল সমাজের ডাইনি-ভাবনা এ উপন্যাসে প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে। সাঁওতাল সমাজের কুসংস্কার ডাইনি ভাবনাকে অ-আদিবাসী দিকু সমাজ কী করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে তার ইতিবৃত্ত কাহিনির কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে খেড়িয়া শবরদের অপরাধী-বৃত্তান্ত ঔপন্যাসিক কৌশলে বিবৃত করেছেন।

জঙ্গল উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র 'মকর মুদি' নামক এক নিম্নবর্গীয় দৈহিক প্রতিবন্ধী। নিজের দৈহিক ক্ষুদ্রতাকে সে অতিক্রম করতে চায় বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে – ক্ষমতাসীনদের তাবেদার হয়ে সে নিজেও ক্ষমতার উচ্চে আরোহণ করে দৈহিক উচ্চতার অভাবকে পূরণ করতে চায়। নিজ পছন্দ ও জেদকে বজায় রাখতে সে বিয়ে করতে বাধ্য করে মুদির কন্যা ছাতিমকে। কিন্তু দৈহিক ক্ষুদ্রতায় সে পূর্ণ যুবতী ছাতিমের জীবন-যৌবন কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না। অবধারিতভাবে ছাতিম পালিয়ে ঘর বাধে মোহন শবরের সঙ্গে। নিজ লজ্জাকে ঢাকা দিতে বিবাগী হয় মকর এবং দেড় বছর পরে ফিরে আসে তথাকথিত দৈবশক্তির অধিকারী হয়ে। তার অধিষ্ঠানের পশ্চাতে থাকে এক সুযোগসন্ধানী পুঁজিপতি দণ্ডেশ্বর ধাড়া – রাতারাতি মকরকে সে ঠাকুরে পরিণত করে, প্রচার করে মকর অন্ধ-খোঁড়া রোগী সারাতে সক্ষম। প্রাচীন সাঁওতাল পর্বত হাঁসদার কাছে চিকিৎসা শাস্ত্রে তালিম নিয়েছিল মকর আগেই – বনৌষধির ব্যবহারে কিছু রোগীকে সে সুস্থও করে তুলেছিল। সে দক্ষতাকে পুঁজি করে দণ্ডেশ্বরের তৈরি ঘরে অবস্থান করে, দণ্ডেশ্বর নির্ধারিত রোগী পিছু আড়াই টাকা দর্শনীর বিনিময়ে এবং অভূতপূর্ব প্রচারের জোরে মকর প্রায় দেবতায় পরিণত হয়। দৈবী ক্ষমতার বলে সে সাঁওতাল সমাজের সংস্কার বা কুপ্রথা ডাইনি নিরূপণ করতে সক্ষম বলে দাবি করে এবং তার পূর্বতন স্ত্রী ছাতিমকে ডাইনি সাব্যস্ত করে ধরে আনে। অরণ্য-শবর মোহন সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে ছাতিমকে কেড়ে নিলে মকর পাগল হয়ে যায়। দণ্ডেশ্বর, মাহাতো, পালধি বাবুর ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির জন্য নতুন এক মকরের প্রত্যাশায় উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে।

৪.৯.২

জঙ্গল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মকর হলেও সে মূলত ক্ষমতাসীনদের ক্রীড়াণক হিসেবেই পরিচালিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক তাঁর অধিকাংশ রচনায় নিম্নবর্গীয় ও আদিবাসী জীবনকে পাশাপাশি পরস্পরের সমলগ্ন করে উপস্থাপন করেছেন – এ উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। আদিবাসী ও নিম্নবর্গীয় জীবনের সহাবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায় সাঁওতাল গোত্রীয় পর্বত হাঁসদার কাছে মকর মুদির শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং মকরের বউ, সনাতন মুদির মেয়ে ছাতিমবালার সঙ্গে খেড়িয়াশবর মোহনের প্রণয় এবং সংসার-যাপন – এই দ্বিবিধ ঘটনায়। ছাতিমবালা শবর-গৃহিণী হয়ে খেড়িয়া গোত্রভুক্ত হতে পেরেছে কেননা তার নিম্নবর্গীয় জীবন খেড়িয়া শবরের জীবন থেকে খুব বেশি পৃথক ছিল না। মকর ক্ষমতার শীর্ষচূড়ায় অবস্থান করেছে কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকেছে সর্বদা উচ্চবর্গীয়দের হাতে। ছাতিমকে সে বিয়ে করতে পেরেছে উচ্চবর্গীয় মাহাতো ও পালধির কূটকৌশলে – তারা সনাতনকে নানাভাবে হেনস্তা করে মকরের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে অনিবার্য করে তুলেছে। প্রচারের প্রসারকে অবলম্বন করে মকরকে দেবতায় পরিণত করেছে দণ্ডেশ্বর – রোগীপিছু মকরের দর্শনী আড়াই টাকা তবে সেই রোগী ও তার সঙ্গীরা প্রথমে দণ্ডেশ্বরের ‘মকর মহিমা’ অফিসে মাথাপিছু পাঁচটাকা দিয়ে তবেই মকরের কাছে আসতে পেরেছে। মকর তাঁর কাছে ব্যবসায়ের এক পুঁজিমাত্র, মকরকে সে ‘মাল’ বলে অভিহিত করে এবং নিজস্ব লোক দিয়ে তার অর্থাৎ নিজ সম্পত্তি সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নিজের অবস্থানই সুরক্ষিত, মকরের নয়। দণ্ডেশ্বরের ভাষায় –

> এমন কত জনকে তুললাম। পাঁচ বছর টিকে তো ইনভেস পুষিয়ে যায়। তারপর হয় পাবলিক ওকে নামাবে, নয় পাবলিক ক্ষেপিয়ে আমি ওকে নামাব। যাও চলে মকর মুদি। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ২৪৬)

দণ্ডেশ্বরের মতোই সুবিধাবাদী মাহাতো ও পালধি নিজেদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই মকরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। মকরের কল্যাণে মাহাতো সরকারি জমিতে সার সার ঘর তুলে দর্শনার্থী রোগীদের ভাড়া দেয়, পালধি খাবার ও চায়ের দোকান বসিয়ে প্রচুর ব্যবসা করে এবং মকর উন্মাদ হলে, মকরের স্থলাভিষিক্ত করতে নতুন একজনের প্রত্যাশা করে তারা।

৪.৯.৩

জঙ্গল উপন্যাসে খেড়িয়া শবর জাতির জীবন আংশিকভাবে কাহিনিবৃত্তে স্থান পেয়েছে। মেদিনীপুরের লোধা শবর, পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবরসহ ভারতের ২০২টি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে ব্রিটিশরা ১৮৭১-১৯১০ সালের ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত বা 'নোটিফায়েড' করে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে স্বাধীন ভারতবর্ষে ১৯৫২ সালে এসব সম্প্রদায় 'ডিনোটিফায়েড' বা 'বিমুক্ত জাতি' ঘোষিত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রচারে তাদের গা থেকে অপরাধীর তকমা খোলে না। উল্লেখ্য যে, মহাশ্বেতা দেবী ১৯৮৩ সালে খেড়িয়া শবরদের নিয়ে কাজ করতে পুরুলিয়া আসেন। ১৯৬৮-সালে প্রতিষ্ঠিত 'পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি'র অন্যতম পৃষ্ঠপোষক তিনি। অবহেলিত, নিপীড়িত খেড়িয়া শবর জাতির উন্নয়নকল্পে গৃহীত তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপ, দীর্ঘদিন তাদের সংস্পর্শে থাকার অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিভূমিকেও উষর করেছে। খেড়িয়া শবরদের অপরাধপ্রবণতার পেছনের কারণ তিনি এ উপন্যাসে নির্দেশ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, শবররা অপরাধ সংঘটনের হাতিয়ার মাত্র, মূল অপরাধীরা সমাজের উঁচু জায়গায় অবস্থান করে ধরা-ছোয়ার বাইরে থেকে যায়।

উপন্যাসের প্রারম্ভেই ঔপন্যাসিক জানিয়ে দেন, সরকারি জঙ্গলে গাছ কাটে খেড়িয়াশবররা। এ কারণে তারা জেলেও যায়। কিন্তু গাছ কাটে তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে নয় – সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরাই তাদের দিয়ে গাছ কাটায়। ঔপন্যাসিক এর ভাষারূপ দিয়েছেন –

> এ ব্যাপারে অঞ্চলের দুই বিবাদি নেতা তেরঙ্গী পালধি আর লালঝাণ্ডা মাহাতো গোপনে হাত মিলিয়েছিল। মাহাতোর ভাই ঠিকাদার, গাছ কাটবে। কাটা গাছ পৌঁছবে পালধির কাঠগোলায় (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ২৩৫)।

মাহাতো এবং পালধির সব অপরাধের দায় বহন করে খেড়িয়ারা। কেননা নিরন্ন খেড়িয়ারা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নেতাদের হয়ে তাদের সব দুষ্কার্য সম্পাদন করে এবং জেলে যায় অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে, অথবা নেতারা তাদের এ পরিচয়ের এ ভিত্তিকে আরও মজবুত করে নিজেদের প্রয়োজনে। ঔপন্যাসিক বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন দু'তিন বাক্যে –

> কিছু খেড়িয়া গাছ কেটে জেলে যায়। কিছু খেড়িয়া পালধির কথায় মাহাতোর জমির পাকা ধান জ্বালিয়ে জেলে যায়। কিছু খেড়িয়া মাহাতোর কথায় পালধির বাঁধের আল কেটে জেলে যায়। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ২৩৫)

জেলে যাওয়াই যেন তাদের নিয়তি। বংশ পরম্পরায় নিয়তির অনিবার্যতাকে মেনে নিয়েই যেন তারা জীবনধারণ করে। তবে সময়ের পরিবর্তনে তাদের মনেও সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস জাগে। আদিবাসীরাই আদিবাসীদের কথা ভাবে, তাদের স্বার্থ রক্ষার উপায় খোঁজে – সেখানে তারা একাত্ম। সাঁওতালদের সঙ্গে খেড়িয়া শবরদের বা মুণ্ডাদের সঙ্গে সাঁওতালদের কোন দ্বন্দ্ব নেই – বরং শিক্ষিত সাঁওতাল চন্দ্রচূড় হাঁসদার

সংগঠন বিনাবিচারে আটক খেড়িয়াদের জেল থেকে ছাড়াবার জন্য লড়ে। ওদের সচেতন করার প্রয়াসে উচ্চারণ করে –

> হা রে খেড়িয়া ! কার জন্যে জেলে যাও, কার জন্যে মরো ? ওরা তোমাদের কাঁধে টাঙ্গি রেখে ফায়দা উঠায়। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ২৩৫)

খেড়িয়ারা সবই বোঝে কিন্তু দীর্ঘদিনের যাপিত জীবন-চক্র থেকে তাদের মুক্তি নেই। তাই জেল থেকে ফিরেই মোহনকে মাহাতোর কাছে হাজিরা দিতে হয় – শুরু করতে হয় আবার নতুন করে জেলে যাবার প্রস্তুতি। কোনো কোনো গ্রামে সাঁওতালদের পাশে কয়েকঘর শবরও বাস করে।

নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই মাঝে মাঝে তাদের সংগ্রামী বা কৌশলী হতে হয়। জঙ্গল বেঁচে থাকার অন্যতম উৎস আদিবাসী জীবনে। তাই দিকুরা যখন আদিবাসীদের দিয়ে নির্বিচারে প্রাচীন বৃক্ষাদি কর্তন করিয়ে সেখানে বাণিজ্যিক ভাবে মূল্যবান ইউক্যালিপটাসের মতো বনবিধ্বংসী গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করা হয় তখন মোহন শবরের মতো তুচ্ছ মানুষেরা উপায় খোঁজে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। অনৈতিক হলেও কখনও কখনও ছলনা বা মিথ্যার আশ্রয় নেয় ; শোর তুলে প্রাচীন কোন গাছকে দেবতা বা 'গড়াম' করে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়। গাছদেবতার পূজা অবশ্যই আদিবাসী জীবনের অন্যতম অঙ্গ। যেকোনো শুভ উৎসবে তারা তাদের নির্দিষ্ট প্রাচীন কোন গাছদেবতাকে পূজা দেয়। *জঙ্গল* উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই এক বিশাল অর্জুন গাছের উল্লেখ করা হয়েছে – যে গাছটিকে কাটার জন্য বারবার চিহ্নিত করা কিন্তু কাটা হয়নি। মোহন শবর এটিকে গড়াম বা গাছদেবতা বলে প্রচার করায় "এখন গাছটির গায়ে কাগজ ও পাতার মালা জড়ানো, গোড়াটি মাটির বেদিতে ঘেরা। যে সব ডালপালা ঝুলে পড়েছে, তাতে সুতোতে বাঁধা ঢিল" (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ২৩৫)। আদিবাসীদের মনস্কামনার চিহ্ন এ ঢিলগুলো। বস্তুত প্রাচীন এ বৃক্ষ এবং তৎসংলগ্ন বনভূমি রক্ষার তাগিদেই এ প্রচার কিন্তু খেড়িয়াশবর ছাড়াও যখন অন্যান্য আদিবাসীরা তাতে সমর্থন দেয়। বিষয়টি রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্ব পায় বনভূমিকে রক্ষার্থে অর্জুন গাছটিকে দেবতা করে নেয়ার দৈবাদেশ প্রচারিত হলে –

> অর্জুন গাছ ঘিরে বেদি বাঁধিয়ে শত শত লোক বাজনা বাজিয়ে তাকে দেবতা করে পূজা দেয়। এই বন আমাদের, একে কাটতে দেব না, এ আহ্বানে যখন বিপদবারণ মুর্মু, কানাই বাস্কে, লঘুরাম সরেন এবং সূর্য মাহাতোও সদলবলে সাড়া দেয়, তখন রাজনীতিক চিত্র খুব বিগড়ে যায়। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ২৪০)

কেবল আদিবাসীরা নয়, সবধর্মের লোকজন এ বৃক্ষকে দেবতা বলে মান্য করে ; ফলে ইউক্যালিপটাস লাগানোর পরিকল্পনা স্থবিরতা পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহাশ্বেতা দেবী দীর্ঘদিন শাল কেটে সেগুন কিংবা প্রাচীন বৃক্ষাদি কেটে ইউক্যালিপটাস লাগানোর সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

জানিয়েছেন। তাঁর একাধিক প্রবন্ধেও[২৩] (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৫৫৫) তিনি ইউক্যালিপটাসের বিধ্বংসী ক্ষমতা তথা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন তথ্য-প্রমাণাদিসহ। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ১৮৪৬ সালে নীলগিরির নীলমণি উটকামন্ডের জ্বালানি কাঠের সমস্যা দূর করতে ইংরেজরা অস্ট্রেলিয়ান এ গাছটি রোপণ করেছিল। দুনিয়ার সবচেয়ে জল-খেকো এ গাছটি অস্ট্রেলিয়াতে জলা ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গার মাটি শুকাবার জন্য লাগানো হয়। ভারতভূমির নদীকেন্দ্রিক অঞ্চলে এ গাছ নদী শুকিয়ে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় করতে পারে, মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জীবনের রেখাচিত্রে তাঁর পরিবেশ বিষয়ক এ ধরনের তথ্যাদি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সন্নিবেশিত করেছেন, কেননা প্রাকৃতিক পরিবেশ-নির্ভর আদিবাসী জীবনেই পরিবেশ বিপর্যয়ের সরাসরি প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি।

৪.৯.৪

পরিবেশবাদী ইঙ্গিতধর্মী বক্তব্য দিয়ে উপন্যাসটির কাহিনি শুরু হলেও মূল কাহিনির ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে – আদিবাসী জীবনের কুসংস্কার, কুপ্রথাকে কেন্দ্র করে দিকুদের ফায়দা তোলার জটিল কৌশলের চালচিত্র নিরূপণ করেছেন ঔপন্যাসিক *জঙ্গল* উপন্যাসে। সাঁওতাল সমাজে বহুকাল থেকেই ডান-ডাইনির কুসংস্কার প্রচলিত। তবে তা কখনও তীব্র রিরংসাকে জাগিয়ে তোলেনি। 'জানী' ও 'সোখা' সাঁওতাল সমাজের ডানডাইনি নিরূপণ ও নিবারণের দুটি পদ। অনেকটা ওঝা বৈশিষ্ট্যধারী জানী ডাইনি ধরে জরিমানা আদায় করে তার বা তার পরিবারের কাছে এবং তারপর সমাজ বসিয়ে সে জরিমানার টাকায় তারা খাওয়াদাওয়া করে – গভীর বিশ্বাসের সংস্কারে আবদ্ধ এ এক অবিনাশী চক্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক সাঁওতাল স্বসমাজের অনগ্রসরতাকে দূর করতে আরও বহু পদক্ষেপের মধ্যে ডাইনিপ্রথার বিরুদ্ধেও প্রচারণা চালায়। অবশ্য সরকারিভাবেও ছবি দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে ডানডাইনি নেই। তবে এ ব্যাপারে সরকারও কড়াকড়ি করতে ভয় পায়। এ ভয় ভোট কমে যাবার ভয়। সাঁওতাল সমাজের প্রথাকে দূর করতে গিয়ে যদি তাদের কোপে পড়ে, যদি ভোট কমে যায় – এ ভয়ে সরকার প্রচারণা চালালেও অপ্রত্যক্ষ মদদে ডানডাইনি প্রথা জিইয়ে রাখে। ডাইনি সংক্রান্ত ব্যাপারে মুখ খোলে না সমাজের নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। 'ওটা ওদের ব্যাপার' বলে বরং ডাইনি বিশ্বাসটি জাগিয়ে রাখে আদিবাসীদের ব্যাপক সমর্থন পাবার প্রত্যাশায়। সাঁওতালদের মধ্যে চন্দ্রচূড়, জলেশ্বরের মতো শিক্ষিত সাঁওতাল যখন 'ডাইনি প্রথা বন্ধ করো' আন্দোলনে নামে, তাদের বিরুদ্ধে পালধি ও মাহাতোর মতো নেতারাই সাঁওতালদের ক্ষেপাতে সক্ষম হয় এবং জলেশ্বরকে জীবন দিতে হয় অন্ধ মূঢ় ভয়ার্ত স্বজাতির লোকেদের হাতে, চন্দ্রচূড়কে গ্রামছাড়া হতে হয়। কেননা জলেশ্বর, চন্দ্রচূড় 'মদ হাড়িয়া

বন্ধ করো', 'জঙ্গল কাটা বন্ধ করো' এসব আন্দোলন করে এ নেতাদের বৈষয়িক ক্ষতি করছিল। উপরন্তু তারা সাঁওতালদের জন্য কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় গড়ে স্বসমাজের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ঘটাতে চেয়েছে – যা কোনোভাবেই সুযোগসন্ধানী নেতাদের কাম্য নয়।

ডানডাইনি সাঁওতাল সমাজেরই সংস্কার – অন্য আদিবাসী, এমনকি খেড়িয়া সমাজও এ সংস্কার থেকে মুক্ত। খেড়িয়ারা অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় কিছুটা উগ্র স্বভাবের ; তাদের এ স্বভাবের উল্লেখ আছে উপন্যাসের মধ্যে। চন্দ্রচূড় ও থানা দারোগা চটখণ্ডীবাবুর কথোপকথনে এ বিষয়টি ধরা পড়ে এভাবে –

> খেড়িয়া ক্ষেপলে বাপও মানে না, দাপও মানে না। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ২৬৬)

তবে কেবল উগ্রতার উত্তাপকে তারা ছড়িয়ে দিতে চায় তাদের সংস্কৃতির মাধ্যমে। প্রতি খেড়িয়াই তাদের নিজস্ব 'ছো' নাচের মাধ্যমে নিজের আবেগকে প্রকাশ করে। খেড়িয়াদের ছো নাচ বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

৪.৯.৫

আদিবাসীদের জীবন বঞ্চনার জীবন। খাবার জোগানোই তাদের দৈনন্দিন প্রধান কাজ, এমনকি পিপাসার জলও তারা সর্বদা প্রকৃতি থেকে পায় না – উচ্চবর্গীয়রা কৌশলে তাদের সব মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়। ঔপন্যাসিক আদিবাসী জীবনের জলকষ্টকে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। এ উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি –

> পুরুলিয়ার নদী! বর্ষায় তবু জল, শীত থেকেই শুকায়, বৈশাখে লুকায়। তবু তো ঝালা নদীর বুক খুঁড়েই শবরজাতি জল নেয়। তাদের নামে সরকার কুয়া মঞ্জুর করে। কুয়া বসে মাহাতো, মণ্ডল, পালধি, ওদের দরজায়। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ২৩৯)।

প্রকৃতি ও মানবসৃষ্ট বঞ্চনার সমুদ্রে আদিবাসী জীবন কোনোক্রমে বেঁচে থাকে দৈবী শক্তির ভরসায়। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে তারা দেবতা ও তার দৈবী শক্তির অস্তিত্ব খুঁজে ফেরে। "শবরের মনও আদিম অরণ্যের মতো আদিম, সেখানে আদিম অন্ধকারে গড়াম, সন্ন্যাসী, বড়ামশীতলা, কানাইশর জীউ, ভৈরব এমন সব দেবদেবী আদিম ও অমোঘ অধিকারে বেঁচে থাকেন। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ২৩৯)

এ আদিম বিশ্বাস বা সংস্কারকে কখনও কখনও বহিরাগত সুযোগসন্ধানী মানুষেরা হাতিয়ার করে আদিবাসী জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। এ ধরনের একটি উপাখ্যান *জঙ্গল* উপন্যাসে উপজীব্য হয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদ

টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা

দশম পরিচ্ছেদ

টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা

৪.১০.১

ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজ, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-বঞ্চনা, শোষণ-সংগ্রাম – এ সমস্ত বহুকাল ধরেই মহাশ্বেতা দেবীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। '*টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা*' সে-ধারার এক বিশেষ সংযোজন। বিশেষ এ অর্থে যে – এ উপন্যাস কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা, নির্দিষ্ট আদিবাসী সম্প্রদায় বা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে রচিত নয় বরং ভারতবর্ষের সমগ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অনেক অনেক সমস্যা, তাদের প্রতি রাষ্ট্রযন্ত্রের বঞ্চনার নির্মমরূপের বিস্তৃত বিবরণে এ উপন্যাসের শরীর গড়ে উঠেছে। উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ শারদীয় 'প্রতিক্ষণ' ১৩৯৪/১৯৮৭ খ্রিঃ। 'প্রতিক্ষণ'-এ প্রকাশিত উপন্যাসের শেষে লেখকের নিম্নোক্ত মন্তব্য মুদ্রিত ছিল –

> এই লেখায় মধ্যপ্রদেশ, নাগেসিয়া, কোনোটিই আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। মধ্যপ্রদেশ এখানে ভারতবর্ষ, নাগেসিয়া জনপদ সমগ্র আদিবাসী সমাজ। বিভিন্ন অস্ট্রিক আদিবাসী জনজাতি ও গোষ্ঠীর আচার-প্রথা-রীতি আমি ইচ্ছে করেই মিলিয়েছি এবং পূর্বপুরুষের আত্মা ব্যাপারটিও এখানে আমার কল্পনা। টেরোড্যাকটিলের মিথ দিয়ে ভারতের আদিবাসী সমাজের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা-জাত সিদ্ধান্তটি বলতে চেয়েছি মাত্র। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ৫৬৭)

সংশোধন ও সংযোজনসহ ডিসেম্বর ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এ অংশটি বর্জিত হয়ে একটি বিস্তৃত ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে – যদিও সেটি এ উক্তিরই বিস্তৃত রূপ। এ ভূমিকায় লেখক সংযোজন করেছেন যে, তাঁর আদিবাসী অভিজ্ঞতার শেষ সিদ্ধান্ত এ লেখার উপজীব্য। মূলস্রোত ও আদিবাসী সমাজের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ তিনি এ রচনায় নির্দেশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে উত্তর-স্বাধীনতা ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ (আদিবাসী প্রেক্ষিতে) কেমন – সে সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশও তিনি করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের আদিবাসীরা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদকল্পে যে সকল আদিবাসী রক্ত দিয়েছে – ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাদের নাম রক্ষিত হয়নি, তাদের সংগ্রামকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দেয়া হয়নি। স্বাধীন ভারতে তারা বরাবর মূলস্রোতের সমান্তরালে পৃথক স্রোত বা সত্তা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাদের অস্তিত্বকে প্রায় ভুলে গিয়ে বা বলা যেতে পারে উপেক্ষা করে আজকের স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের, আরও বৃহৎ অর্থে ভারতবর্ষের প্রশাসনিক-কাঠামো, আইন-কানুন গড়ে উঠেছে। আদিবাসীরা তাতে সম্পৃক্ত না হতে পেরে ক্রমে অপসৃত হচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হচ্ছে – এ বিষয়টিই 'টেরোড্যাকটিল'[২৪] মিথের অনুষঙ্গে এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।

৪.১০.২

‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’ উপন্যাসে সাংবাদিক পূরণ সহায় আদিবাসীদের জীবন নিয়ে ভাবে, তাদের শোষণ-বঞ্চনা ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা সভ্য-সমাজের কাছে পৌঁছে দেয় বর্ণমালায় গেঁথে – এটি তাঁর পেশা। জীবিকার সন্ধানে সে খবরের পেছনে ছোটে – সেখানে মানবিকতা, আন্তরিক আবেগ কখনও খুব তীব্র হয়ে তার পেশাদারিত্ব ছাপিয়ে উঠতে পারে না। তবে পিরথার অভিজ্ঞতা তাকে বদলে দেয় সম্পূর্ণ। মধ্যপ্রদেশের পিরথা ব্লকে তার অভিজ্ঞতা এবং তার মনোজগতের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি গভীর প্রত্যয়ে পৌঁছানোর অভিজ্ঞতা এ উপন্যাসের মূল থিম। পিরথা ব্লকের বি. ডি. ও বাল্যবন্ধু হরিশরণের আহ্বানে খবরের সন্ধানে নিতান্ত পেশাদারী প্রয়োজনে পূরণ পিরথায় যাত্রা করে। মূল ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পূর্বেই সে শুনতে পারে ‘পিরথা’-র উপর দিয়ে রহস্যময় ছায়া ফেলে উড়ে গেছে এক অজানা প্রাণী, যাকে গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করেছে তাদেরই পূর্বপুরুষের আত্মা বলে। উপন্যাসে তার বিবরণ মেলে এভাবে –

> বাদুড়ের মতো যার জোড়া ডানা, অতিকায় গোসাপের মতো শরীর, নখওয়ালা চারটি পা, হাঁ-করা বীভৎস মুখে দাঁত নেই (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৫৩)।

পূরণ তার সন্ধানে যায়। এই যাত্রাপথের মধ্যে ঔপন্যাসিক মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অঞ্চলগুলোর পরিস্থিতি, প্রশাসনের জটিলতায় তাদের অসহায়ত্ব এবং সভ্যজগতের সঙ্গে তাদের দূরত্বের কার্যকারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হলেও উপন্যাসের গতি তাতে মন্থর হয় না। টেরোড্যাকটিলের ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে আদিমকালের জীবন-যাত্রার প্রতিভূ এই আদিবাসীদের জীবনের বাস্তবতা, তাদের ক্ষোভ-হতাশাও বঞ্চনার ইতিহাসকে আমরা জেনে যাই।

৪.১০.৩

সত্যি সত্যি ‘পিরথা’ গ্রামে এসে পড়েছে এক আদিম কালের ‘টেরোড্যাকটিল’। পত্রকার পূরণ সহায় পিরথা গ্রামে পৌঁছে প্রথম রাত্রিতেই বৃষ্টিহীন ভীষণ খরা এবং জল-বঞ্চিত অঞ্চলে বৃষ্টির দেখা পায় – তার আগমনের সঙ্গে মিলিয়ে এই অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদে আদিবাসীরা পূরণকে নিয়ে গল্প, গাঁথা রচনা করে ; তাকে স্থান দেয় তাদের মৌখিক ইতিহাসে। বৃষ্টিস্নাত এ রাতে খানিক বাতাসে ভেসে, খানিক নখ আঁচড়ে আদিবাসী শংকরদের পূর্বপুরুষদের আত্মারূপী টেরোড্যাকটিল পূরণের বাসগৃহে ঢুকে যায় এবং কোটি কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হওয়া এ প্রাণীর দেখা পেয়ে পূরণ হয় হতকম্পিত, বিমূঢ়। তবুও সে এ দুনিয়া-

কাঁপানো সংবাদটি চেপে রাখে। আদিবাসী তরুণ নির্বাক বিখিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে এ প্রাণীর জন্য জল, ঘাস, শ্যাওলা, মাছ জোগাড় করে এবং প্রাণীটির মৃত্যুর পর আদিম গুহার অন্ধকারগর্ভে চিরদিনের জন্য তার দেহকে লুকিয়ে ফেলে। এ কাজটি সে করে একান্তই মানবিক আবেগপ্রসূত হয়ে – কেননা সে জানে সমগ্র দুনিয়া উন্মুখ হয়ে এ খবর শোনামাত্র আদিবাসীদের একান্তভূমিতে ছুটে আসবে এবং আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে এ স্থানকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আধারে পরিণত করবে। পূরণের মর্মমূলে নাড়া দেয়া এ মনোভাবকে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন এভাবে –

> কোহিনূর নয়, তার চেয়ে অনেক দামি, দুস্প্রাপ্য, সমস্ত পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেবার মতো খবর।
>
> পিরথার আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে দুনিয়ার সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, আসছে, আসছে। মাধোপুরা কেন, পিরথা পৃথিবীর ম্যাপে। 'হোয়াই ও হাউ' নিরূপণ করতে বিখ্যাত সব ফাউন্ডেশন। শেষ অবধি যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় দুনিয়া যে, 'একমাত্র উপবাসী, জীবন্ত নরকঙ্কাল অধ্যুষিত আদিবাসী এলাকাই অসম্ভবের আবিষ্কার করতে পারে। পৃথিবীর বয়স নিরূপণে সঠিক সাহায্য করতে পারে এবং প্রমাণ করতে পারে যে, এখনও ভারতবর্ষে কোনো কোনো জায়গায় আদি পৃথিবীর এক টুকরো থেকে গেছে অনাবিষ্কৃত ?' (মহাশ্বেতা ২০০৪/ ১৫ : ২৬৫)

নাগেসিয়াদের বাসভূমি পিরথাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় না বলেই পূরণ সাংবাদিক হয়েও পৃথিবী-কাঁপানো এ সংবাদটি গোপন করে এবং এ খবর যেন কখনও সভ্য-সমাজের গোচরে না আসে তারও জন্য প্রয়োজনীয় সকল সতর্কতা অবলম্বন করে। কিসের তাড়নায় পূরণের পেশাবিমুখ এ বৃত্তি – তা পাঠককে ঔপন্যাসিক তার বর্ণনার মধ্য দিয়েই জানিয়ে দেন। পিরথায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালসার এ মানুষগুলো পূরণের অস্তিত্বকে নাড়া দেয় – তাদের দারিদ্র্য নয় কেবল, তাদের আত্মসম্মানবোধ, প্রাচীনকে, নিজ-সংস্কৃতিকে অবিকৃত রাখার সতত চেষ্টা এবং তার কারণে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে গণ-আত্মহত্যার বা ডেথ-উইশের বিস্তৃতি পূরণের মানবিকতাকে জাগরিত করে। পূরণের চিন্তায় এ আদিবাসীদের মনোগত ভাবনার ছায়াপাত ঘটেছে এভাবে –

> বৃষ্টি ওদের পাওনা নয়, রিলিফ ওদের পাওনা নয়, পূর্বপুরুষদের আত্মা ছায়া ফেলে ঘুরে গেছে, তাই নিঃশেষে মৃত্যুই ছিল ভবিতব্য। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৭৩)

এ ভবিতব্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে পূরণ সহায়, ব্লক অফিসার হরিশরণ, এ অঞ্চলের তরুণ এস. ডি. ও.। সমগ্র সভ্যজগত যাদের পরম অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়েছে – এ তিনজন তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এ মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ; 'পিরথা'কে মধ্যপ্রদেশের ম্যাপে তুলে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি অনুকম্পায় এ এলাকার মানুষদের বাঁচার উপযোগী করে তাদের অবধারিত ধ্বংসকে রোধ করতে চায়।

টেরোড্যাকটিলের অন্তর্ধানের পর পাঁচদিন অশৌচ পালন করে আদিবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পূরণ অবশেষে ফিরে যায় বুকের মধ্যে ভালবাসার এক গভীর বোধ নিয়ে। সমগ্র কাহিনিকে ঔপন্যাসিক একটি অনুচ্ছেদে সীমাবদ্ধ করেছেন এভাবে –

> বই পড়ে, তত্ত্ব পড়ে তবে জীবনকে জানা অনেক নিরাপদ। কিন্তু পিরথা ব্লকে নিরন্তর অনশনের দুর্দিনে টেরোড্যাকটিল যদি ছায়া ফেলে ওড়ে, পিরথার আদিবাসীরা যদি মনে করে তাদের বিলুপ্ত জনপদে পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্র অবমানিত তাই শোকার্ত হয়ে ফিরে এসেছে পূর্বপুরুষদের আত্মা, এবং বিখিয়া, এক নিরক্ষর আদিবাসী তরুণ যদি পাথরের দেয়ালে এঁকে রাখে টেরোড্যাটিল এবং তা দেখে, তার ছবি তুলে যদি পত্রকার সূরজপ্রতাপের মস্তিষ্কে ঘটে বিস্ফোরণ, এবং তার তোলা ছবি যদি লুকিয়ে ফেলে এস. ডি. ও. 'না, কোনো অসম্ভবকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। কেননা টেরোড্যাকটিলকে যদি মেনে নিতে হয়, হোমো স্যাপিয়েন্স-ম্যাপিয়েন্স কোথায় থাকে ? দুজনের পৃথিবী তো আলাদা' – এই যুক্তিতে, এবং পিরথা জনপদ যখন অশৌচে অশুচি, সে সময়ে যদি হরিশরণের এস.ও.এস. পেয়ে মঞ্চে ঢোকে পত্রকার পূরণ, (উচ্চারিত আবেদন, পিরথাকে দেশের ম্যাপে তোলা এবং অনুচ্চারিত আবেদন হোয়াট অ্যাবাউট দি মোস্ট মিস্টিরিয়াস মিস্ট্রি অফ দি সেন্চুরি ?) এবং সঘন গহন বরষা রাতে যখন বৃষ্টি পড়ছে, তখন যদি পূরণের ঘরে আগড়হীন দরজা দিয়ে ঢোকে টেরোড্যাকটিল, এবং চলে যায় দেবতাহীন গর্ভগৃহে (অমন সিধা চলে গেল, আগেও কি ও ওখানেই থাকছিল ?) এবং তা দেখে পূরণের মাথায় ঘটে বিস্ফোরণ (এ সত্য গোপন রাখতে হবে, এ আবিষ্কার), এবং ব্রাহ্মমুহূর্তে বিখিয়া আসে ও নির্বাক থেকে নতমস্তক হয়, এবং সকাল না হতে পূরণ যখন তার আশ্চর্য, ব্যাখ্যাতীত আবিষ্কারের ধাক্কায় একেবারে দিশাহারা, তখন যদি সে জানে কাল যারা ওকে বহিরাগত শত্রু মনে করেছে, আজ তারাই ওকে 'এ এল, এর পায়ে পায়ে বৃষ্টি এল, মাটি ও আমাদের, নদী ও কুয়ার তৃষ্ণার জল' বলে অন্য চোখে দেখছে, – তখন পূরণের যে কী কর্তব্য, সে বিষয়ে কোনো বই লেখা হয় নি।" (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৭৮)

অনুচ্ছেদের পূর্বের ও শেষের অংশে বই পড়া সভ্যমানুষের প্রতি তির্যকতায় আধুনিক সভ্যতার অসারত্ব প্রকাশিত হয়েছে। জীবন ও প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন আধুনিক মানুষ পুথিবদ্ধ জ্ঞানেই জীবনকে পূর্ণ করতে চায়, তার চতুর্পার্শ্বের মানুষকে দেখে না, তাদের জীবনকে পাঠ্য করে নতুন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। প্রথাবদ্ধ এ সভ্য মানুষের প্রতিভূরূপে ঔপন্যাসিক এ স্থানে পূরণকে প্রতিস্থাপন করে তার জ্ঞানের অসারত্ব ব্যবচ্ছেদ করেছেন। পূরণ – যে কি না দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছে ; মানুষের জীবনের বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করেছে, রাঁচিতে মুণ্ডা গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে কিন্তু আদিবাসী জীবনকে অনুভব করতে পারেনি বরং এস. সি. রায়ের বই পড়ে ওদের কথা জেনেছে। ঔপন্যাসিক পূরণের মতো আধুনিক সভ্য-মানুষকে তির্যকভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন উপন্যাসে –

> পূরণ এই তিন দিনে রক্ত কোষে, মস্তিষ্ক কোষে জেনেছে যে এত তদন্তমূলক সমীক্ষা লেখার পরেও সে কিছুই জানে না, জানে নি। মানুষের কাছে প্রথম পাঠ না নিয়েই সে শতাব্দীর অন্তিম পর্বে পৌঁছে গেল। অথচ সে তো মানুষকে দেখেছে দুঃসহ দুর্দিনে, অত্যাচারে স্বৈরাচারে প্রতিবাদ করতে এবং প্রতিবাদের প্রতিবাদে অত্যাচারীর

রক্তোৎসব, সে তো দেখেছে শাল বনাম সেগুনের যুদ্ধ, অ্যাসবেস্‌টস খাদানে বিষাক্ত অ্যাসবেস্‌টসের ধূলিতে আক্রান্ত মানুষের প্রতিবাদ শিল্পপতির বিরুদ্ধে, দেখেছে বন্দিদের অন্ধ করে পুলিশের আত্মসমর্থন। এমন দেখেছে কত, দেখেছে এবং লিখেছে এবং ফিরে এসেছে নিজের নিরাপদ ঘরে যেখানে তার বই গুছিয়ে, ধুলো ঝেড়ে, সরস্বতী বসে থাকে প্রতীক্ষা করে, কবে পূরণ বলবে, 'এসো, আমার ঘরে এসো আমার ঘরে'– কিন্তু তাও পূরণ বলে নি।

কিছুই জানে নি সে, জানতে চায় নি বলে। এবং অমন এক আধা-মানুষ, শিকড়হীন পরগাছার কাছেই আসে দুঃসহ কোনো সাবধানী সংবাদ জানাতে প্রাচীনা পৃথিবীর দূত। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৭৮)

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর আদিবাসী অভিজ্ঞতার শেষ সিদ্ধান্তকে জানাতে চেয়েছেন এ উপন্যাসের মাধ্যমে। মূলত ১৯৮৭-এ প্রথম প্রকাশিত এ উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে আরও কিছু হিসাব-নিকাশ কাজ করেছে মনে হওয়া অযৌক্তিক নয়। উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশকে। মধ্যপ্রদেশে বহু গোষ্ঠীর আদিবাসীর বাস। উপন্যাসেই হিসাবটি রক্ষিত হয়েছে এভাবে –

একাশি সালের হিসাবে মধ্যপ্রদেশ এক কোটি উনিশ লক্ষ সাতাশি হাজার একত্রিশ তফশিলি আদিবাসীরবাস। মোট জনসংখ্যার বাইশ পয়েন্ট নয় সাত অনুপাত। ছেচল্লিশ গোষ্ঠীর আদিবাসী, তাদের উপগোষ্ঠীর ভাগ আবার একশো সাতচল্লিশ। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৩৯)

স্বাভাবিকভাবে আদিবাসী-প্রেমী মহাশ্বেতা মধ্যপ্রদেশকে বা মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের নিয়ে লেখার তাগিদ অনুভব করেছেন। দ্বিতীয়ত : ১৯৮৪ সালে সংঘটিত ভূপাল গ্যাস ট্রাজেডি। মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড কারখানায় গ্যাস ট্রাজেডিতে যে ব্যাপক প্রাণহানি ও মারাত্মক পরিবেশ-বিপর্যয় ঘটে – তার বিপরীতে ঔপন্যাসিক পরিবেশ-বান্ধব প্রকৃতি-লালিত আদিবাসী জীবনের প্রসঙ্গ টেনেছেন, দেখিয়েছেন যে, এরাও পরিবেশ-দূষণের ভুক্তভোগী। তৃতীয়ত : মেসোজোয়িক যুগের কিছু গুহাচিত্র সত্যিই পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশে।[২৫] সুতরাং মেসোজোয়িক যুগের এক মিথকে এ প্রদেশের পটভূমিতে স্থাপন করা যায় খুব সহজেই। চতুর্থত : লিপিবিহীন এ আদিবাসীদের ঐতিহ্যের লিখিত বিবরণ নেই বলে এ Oral tradition হারিয়ে যাবার উদ্বেগে আক্রান্ত ঔপন্যাসিক এ অবস্থার পরিবর্তন চান, আদিবাসীদের প্রতি মূলস্রোতের মনোযোগ কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে ভূমিকায় স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন –

মূলস্রোতের নিদারুণ অবজ্ঞা-উপেক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য আদিবাসী সমাজের সঙ্গে মূলস্রোতের মধ্যে এই সমান্তরতার ব্যবধান, যে ব্যবধান ঘোচাবার দায় মূলস্রোতের ছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২২৮)

সে-দায়ভারে আক্রান্ত হয়ে ঔপন্যাসিক টেরোড্যাকটিল মিথের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মূল কাঠামোর আধারে আদিবাসীদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থান, রাষ্ট্রযন্ত্রের ঔদাসীন্যের এবং সুবিধাবাদী শ্রেণির ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে।

৪.১০.৪

উপন্যাসের শুরুতেই পিরথাগামী পত্রকার পূরণ সহায়কে এস. ডি. ও.-র ব্রিফ করার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের প্রকৃত দুর্দশা-চিত্র রক্ষিত আছে। এস. ডি. ও.-র জবানিতে জানা যায় যে, ভূপালে যখন গ্যাস ট্রাজেডি হল, তখন পিরথা ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলতে দিল না সরকার, আদিবাসী এলাকা থেকে যখন আন্ত্রিকের রোগী শহরে যাচ্ছিল তখন এস.ডি.ও. গুলি চালালো অন্ধকারে, তিনজন মরে গেল। বছর বছর অনাহারে মারা যায় বহু লোক। চিরদুর্ভিক্ষের এলাকা পিরথা জলহীন অথচ সরকারি রিপোর্টে রয়েছে এর বিপরীত তথ্য। কেননা সরকারি বিশেষজ্ঞ টিম বর্ষাকালে পিরথায় গিয়ে অনেক জল দেখতে পায়। এ সম্পর্কে এস. ডি. ও. সখেদে প্রশ্ন করে ও নিজেই উত্তর ঠাওরাবার চেষ্টা করে –

> জলহীন রুখা এলাকা দেখবার টাইমটা এরা বর্ষাকালে ফেলে কেন ? পিকনিক বাস্কেট নিয়ে গেলে ওখানে খুব আনন্দে কয়েক ঘণ্টা কাটানো যায়। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৩৩)

সুতরাং সরকারি রিপোর্টে পিরথা জলহীন নয় অথচ জল সেখানে নেই – এমনকি খাবার জলও নয়। 'পানীয় জল তো ওরা রেশন করেই খায় বরাবর' (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৪৯)। স্থায়ী বাঁধ করে এ অবস্থার নিরসন করা সম্ভব কিন্তু তাতেও সরকারি প্রশাসনের গেরো – কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েও এ প্রচেষ্টা সফল করা যায় নি। প্রতিবারই মাধোপুরা আর ভূপালের মাঝামাঝি ফাইল হারিয়ে যায়। স্থায়ী দুর্ভিক্ষের শিকার এ অঞ্চলের মানুষেরা পেটের দায়ে নিজ ছেলেমেয়েদের বিক্রি করে দেয় কয়েক বস্তা খাদ্যশস্যের বিনিময়ে, কখনও নিজেকেও। তাদের প্রধান খাদ্য খাজড়ার কন্দমূল। জলের অভাবে বছরে তিনমাস খাবার মত খাদ্যশস্যও তারা পায় না – সরকার একে দুর্ভিক্ষ বলতে নারাজ ; কেননা দুর্ভিক্ষ মানেই সরকারি ব্যর্থতা – তার প্রচার সরকারের কাম্য নয়। এ পরিস্থিতি এবং বিপরীতে মূলস্রোতের জীবনকে পাশাপাশি সাজিয়ে ঔপন্যাসিক মানুষের বিবেককে নাড়া দিতে চেয়েছেন। আদিবাসী দরদী হরিশরণের জবানিতে প্রসঙ্গটি এসেছে এভাবে –

> একেকবার কিছু রিলিফ আনছি দাঁতে নখে লড়াই করে। রাজ্যমন্ত্রী মায়লেকে ধমক দিয়েছে যে রিলিফ মানেই দুর্ভিক্ষ রিলিফ। জোর করে তোমরা সরকারকে দিয়ে দুর্ভিক্ষ বলাতে চাইছ। এটা হতে পারে না।

দুর্ভিক্ষ ! কোনো জেলায় অত্যন্ত, চরম খাদ্যাভাব, জলের মতো জিনিসের নিদারুণ অভাব, খাদ্যাভাবের জন্য খাদ্যবস্তুর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্যাপক ক্ষুধা, অনশন।

কিন্তু ভারতের আদিবাসী অঞ্চলের প্রেক্ষিতে বলতে হয়, অয়ি অভিধান যত, মূক করো মুখের ভাষণ, ওগো মিথ্যেবাদী ! কেমন করে তোমার কথা মানি, শুনি তোমার বাণী ?

কেননা মাধোপুর জেলাতে চরম খাদ্যাভাব হয়নি। মাধোপুর, সদরে খাদ্যশস্য ডিলারদের বড়ো দোকান, খাবারের দোকানে মিঠাই যত মাছিও তত। একটি শিবমন্দিরের চাতালে উপবিষ্ট ষাঁড়কে জনৈক যুবতী বধূ জিলিপি খাওয়াচ্ছিল এবং শিবের মাথায় যত দুধ ঢালা হচ্ছিল তা জমছিল দুধপচা দুর্গন্ধ আবিল এক কুণ্ডে, ভক্তরা দুধকুণ্ডের সে দুধ নিচ্ছিল, খাচ্ছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৫১)

বড়ো তির্যকতায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যকে পাশাপাশি সাজিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কেবল আবেগ নয়, নানা তথ্য-উপাত্ত, আইনের সূত্র ধরে ধরে মহাশ্বেতা বরাবরই আদিবাসী-নিম্নবর্গের মানুষদের পক্ষাবলম্বন করেছেন, কলমের তীক্ষ্ণ খোঁচায় সভ্য সমাজের বা আধুনিক মানুষের গায়ে হুল ফোটাতে চেয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের পিরথা নামের ব্লকটি কল্পিত, মেসোজোয়িক যুগের টেরোড্যাকটিল আজকের যুগে অন্তর্হিত, রীতিমত মিথে রূপান্তরিত – কিন্তু এ উপন্যাসে বর্ণিত বহু ঘটনাই সত্য। আদিবাসী সমাজের বিপন্ন অবস্থা কাল্পনিক নয় – একান্তই বাস্তব। মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তারা তাদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতিচেতনা, সভ্যতা সব মিলিয়ে যেন নানা সম্পদে শোভিত এক মহাদেশ। ভূমিহীন তারা, বহিরাগতদের আগ্রাসনে তারা একসময় নিঃস্ব হয়েছে কিন্তু নিজেরা কখনও নিপীড়কের ভূমিকায় নিজেদের দাঁড় করায়নি, শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন এ শব্দগুলোর সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত আদিবাসীরা ; পূরণের জবানিতে ঔপন্যাসিক এ তথ্য আমাদের নির্ভুলভাবে জানিয়ে দেন –

সিংভূমের হো-ভাষী, হো-জাতীয় পশুপতি জোংকো বিরসা মুণ্ডার জীবনী হো ভাষায় অনুবাদ করার সময়ে নম্র বিস্ময়ে বলেছিল যে হো ভাষায় 'শোষণ', 'বঞ্চনা' – এর সমার্থক শব্দ নেই । (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৪৬)

সমগ্র জীবন যাদের কাটে শোষণে-বঞ্চনায় তাদের অভিধানেই এ সমস্ত শব্দের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি মূলত তাদের শ্রেণি-চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু সে-সঙ্গে ঔপন্যাসিক কোথায় কবে কাদের উপর কিভাবে নিপীড়ন ঘটেছে সে-ইতিবৃত্ত খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে পাঠককে জানাতে কার্পণ্য করেন না –

সেটা 'সেগুন হটাও, শাল বাঁচাও', সাগোয়ানা লড়াইয়ের সময়। আরণ্য সিংভূম উত্তাল, উত্তাল। গুয়াতে গুলি চলেছিল। হো ভাষায় 'শোষণ' শব্দের সমার্থক শব্দ নেই। তারপর কত গুলি চলল কতবার। হো, মুণ্ডারি, সাঁওতালিতে শাল হল সার্জোম, কিন্তু সাগোয়ানার সংগ্রাম যেখানে অসমাপ্ত সেখানে 'শোষণ' শব্দ বোঝানো যায় না। তারপর ইলিয়াগড়ে খড়কাই বাঁধ সংঘর্ষে বীর কোল্‌হা গঙ্গারাম কালুণ্ডিয়া মরে যায়। গুয়াতে আবার মরে বিদর নাগ নির্মম প্রহারে, আর পশুপতি জোংকো বলে দাদা! ' শোষণ' শব্দ তো হো ভাষায় নেই। পূরণের মনে

হয়, যাদের জীবনে শুধুই শোষণ, শুধু বঞ্চনা, সেই আদিবাসীদের কোন ভাষাতেই কি আছে 'শোষণ' শব্দের সমার্থক শব্দ ?(মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৪৬)

লেখার যাদের লিপি নেই, সে-সমস্ত আদিবাসী গানে গানে ধরে রেখেছে অতীতের কথা। এক সময় এদের সব ছিল – এ ভূখণ্ডের বন, পাহাড়, নদী, গ্রাম, ঘর, জমি সব-ই ছিল । তখন কেবল আদিবাসীরাই ছিল। শংকর নাগেসিয়ার ভাষায় – "তখন আমরা ছিলাম, শুধু আমরা ছিলাম।" (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৪৭) তারপর এল ভিনদেশি মানুষ দলে দলে। শোষণ-বঞ্চনার ধারণাহীন সরল আদিবাসীদের সকল জমি নিল তারা নিজেদের করে। আদিবাসীদের কোণঠাসা করে বিতাড়িত করল অরণ্য কেটে গড়ে তোলা জনপদ কিংবা সমতল চাষের ভূমি থেকে; তাড়িয়ে নিয়ে গেল তাদের পাহাড়ে, অরণ্যে। এ অনুভূতিকে ঔপন্যাসিক আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শংকরের ঘোরের গাঁথায় প্রকাশ করেছেন এভাবে –

... আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, মুছে যাচ্ছি মাটি থেকে। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৪৭)

অন্যত্র লেখক নিজেই ভারতের অস্ট্রিকদের বৈশিষ্ট্য জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন যে, অস্ট্রিকরা ভারতীয় সভ্যতার ভিত স্থাপন করে। তারা ধান চাষ করত, সবজি ফলাতো এবং আখ থেকে গুড় বানাত। ভারতীয় পুরাণে যাদের দেবতার স্থান দেয়া হয় – তাদের মধ্যেও অস্ট্রিকদের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন – কৃষ্ণের রং কালো, রামও কালো – এ তথ্যের উপস্থাপনে পাঠকের মনে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করতে চান ঔপন্যাসিক ; খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেন যে, পুরাণে বর্ণিত দেবতারা সবাই আর্য কী না। এক বৃদ্ধ সাঁওতাল একশো ষোল বছর আগে পূর্বপুরুষদের কথা যেমন বলেছিল (হরফ রোমান, ভাষা সাঁওতালি) "পূর্বপুরুষগণ বলিয়াছেন জানা যায়, পুরাকালে রাম রাজা থাকিবার সময়ে সমস্ত আদিম লোক তাঁহার সঙ্গে লঙ্কায় গিয়া রাবণ রাজাকে পরাজিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন" (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৯১)।

পিরথার গ্রামপ্রধান বা সরপঞ্চ ভান্ সিং পরিচয়ের সূত্রে নিজেকে গোণ্ড রাজা শংকর সিং শাহের বংশধর বলে দাবী করে, যে শংকর সিং স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন শহীদ। কিন্তু কোনো স্বীকৃতি যে তারা কখনও পায় নি – তা জানাতেও ভুলে যায় নি। ঔপন্যাসিক ভূমিকায়ও তাঁর এ বিষয়ক ক্ষোভের কথা বলেছেন। বস্তুত স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজদের বিরোধিতা করে যে সকল আদিবাসী প্রাণদান করেছেন – তাদের মূল্যায়ন হয়েছে খুব সামান্য। গুটিকয়েক দরদী মানুষ প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে কিন্তু তাতেও পদে পদে বাধা। এ উপন্যাসে এস. ডি. ও. নিজেকে আদিবাসী-দরদি হিসেবে প্রচার করতে নারাজ। কেননা তিনি জানেন যে, 'দরদি' বলে প্রচার পেলেই তাকে বদলি হতে হবে এবং উপন্যাসের অন্যত্র দেখিয়েছেন যে, 'যেখানে দুর্ভিক্ষ নেই, সেখানে দুর্ভিক্ষ আবিষ্কার' করার অপরাধে এস.

ডি. ও. প্রথমে, তারপর বি. ডি. ও. হরিশরণও দ্রুতগতিতে বদলি হয়ে গিয়েছিল। বদলি হবার আগে এস. ডি. ও. পূরণকে তার বা তাদের বাধার কথা জানিয়েছিলেন স্পষ্টভাবে –

> কুয়া কাটাব, বাধা আসে। রাস্তাটা বাড়াব...ঠিকাদাররা আর রাজনীতিকরা আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী... তবে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র আমি করে ফেলব। আর ইলাকায় চারটা কুয়া, আর পিরথা নালা পাহাড় থেকে যেখানে পড়ে, সেখানে বাঁধ... এসব লিখবেন না । বরঞ্চ উপকার হবে, অফিসার কত অকর্মা, হৃদয়হীন লিখলে। যদি অ্যাসেম্বলিতে কথাটা ওঠে, 'কেন কাজ করছ না' হুমকি আসে, তাহলে হয়তো...(মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৩৫)

বি. ডি. ও. হরিশরণের সাহায্য করার বয়ান তো কিছুটা কৌতুককরও। হরিশরণ পূরণকে জানায় যে, সরকারি অর্থে পিরথা গ্রামের সকল ঘর-পিছু গরু দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু গ্রামবাসী তা নেয়নি – কেননা যেখানে মানুষের খাওয়ার মতো শস্য জন্মায় না, না খেয়ে মানুষ মরে সেখানে গোরুকে তারা খাওয়াবে কী? অল্প আহারে যাদের প্রাণ বাঁচে – সে-ছাগল দেয়া হয়েছিল তাদের, কিন্তু কিছু শস্যের বিনিময়ে তারা শহুরে লোককে ছাগল দিয়ে দিয়েছে, মুরগিও দিয়েছিল বি. ডি. ও. – কিন্তু মুরগি, ছাগলের মতো স্বল্পভুক প্রাণীকে পালন করার মতো খাবারও তাদের নেই। আর এভাবেই প্রসঙ্গ চলে আসে আদিবাসী সমস্যার মূলবিন্দু ভূমিতে। কৃষিযোগ্য কোনো জমিই আদিবাসীদের নেই বলেই তারা দুর্ভিক্ষপীড়িত। এ দুর্ভিক্ষ স্থায়ী – কেননা তাদের ভূমিগত অবস্থানও স্থায়ী। সরকার আদিবাসীদের জন্য ভূমি-সংক্রান্ত যে আইন তৈরি করেছে তা প্রকৃতপক্ষে একেবারে অকার্যকর। ঔপন্যাসিক ভূমি-সংক্রান্ত আইন উপন্যাসের কাঠামোর ভেতর গ্রথিত করেছেন –

> আদিবাসী জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ এবং বিগত বারো বৎসরের মধ্যে (পশ্চিমবঙ্গ আইন সংশোধনের পর বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে) জমি হস্তান্তরিত হইলে আপাতদৃষ্টিতে তাই আইনসম্মতভাবে কোবালা, দানপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে হইলেও, অ-আদিবাসী কর্তৃক খরিদ জমি আদিবাসী প্রমাণ দাখিলে তাহা ফেরত পাইবেন। এমন ক্ষেত্রে আদিবাসী আদালত সাহায্যে এ জমি ফেরত পাইবেন। এই মামলা আদালতে গেলে আদিবাসীর স্বার্থ দেখার বিশেষ অধিকার পাইয়াছেন তফশিলি জাতি ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের অফিসার এবং স্পেশাল অফিসার। এ জাতীয় মামলার ক্ষেত্রে তাঁহারা ভূমি রাজস্ব বিভাগের স্পেশাল অফিসারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৫১)

কিন্তু বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি কোথাও। ভারতের সর্বত্রই রাজনৈতিক সহায়তায় অ-আদিবাসী জাল আদিবাসী নামে আদিবাসীর জমি কিনছে। সকলে তা জানলেও কিছুই করার ক্ষমতা কারো নেই। যারা অসৎ – অর্থের ভাগ পেয়েই তারা সন্তুষ্ট। সৎ যারা তারাও চুপ করে থাকা ছাড়া কোনো গত্যন্তর দেখতে পায় না – কেননা রাজনৈতিক চাপে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এবং হয়ও। সুতরাং আইন-আদালতের কোনো সাহায্য আদিবাসীরা পায় না এবং মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে লোপ পেতে থাকে তারা। এ

দুর্ভিক্ষে খাদ্য সহায়তা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কৌশলজী পিরথায় প্রবল আপত্তির মুখে খাদ্য-বিতরণের ভি. ডি. ও. করেন। এ ছবি বহির্বিশ্বে দেখিয়ে তার স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আয় করবে অঢেল বৈদেশিক মুদ্রা। তিনি পিরথার আদিবাসীদের সরিয়ে নিতে চান তার আশ্রমে। কেননা এদের সরাতে পারলে নদী-পাহাড় শোভিত এ এলাকাটি আকর্ষণীয় পিকনিকের জায়গায় পরিণত করে লাভবান হতে পারবেন তিনি। সরকারের এবং রাজনীতিকদের উপর কৌশলজির অসামান্য প্রভাব এবং এদের কারণেই আদিবাসীরা আজ ভূমিহীন, নিঃস্ব, নিশ্চিহ্ন প্রায়।

ঔপন্যাসিক প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়ে পাঠকের মনোজগতকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। তবে তাঁর প্রশ্ন কেবল প্রশ্নের কাঠামোর ভেতর বদ্ধ থাকে নি – বিভিন্ন তথ্যের সমাহারে সে প্রশ্নগুলো আদিবাসীদের ঐতিহ্য ও বর্তমান দুরবস্থার সংবাহন-বিন্দু হয়ে ওঠেছে –

> গুহাচিত্রগুলি কে এঁকেছে খোদাই করে ? আজকের মানুষের ছবি ? আদিম গুহাচিত্র না হলে তো কোনো বিক্রয় বা বিজ্ঞাপন বা দূরদর্শন-মূল্য নেই। মধ্যপ্রদেশে চৌদ্দ পয়েন্ট চারভাগ জমি সেচ পায়। মালব অঞ্চলে উর্বর কালো তুলো চাষের জমি, কার দখলে ? প্রধান খাদ্যশস্য জওয়ার, গম ও চাল। কারা খায় ? কেদো, কুটকি, সোমা, এসব নিকৃষ্ট শস্যও জন্মায়। এ রাজ্যের বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য তৈলবীজ, তুলা ও আখ। এক ভীল তার পরিবারের ছয়জনসহ দারিদ্র্যের কারণে সেদিন আত্মহত্যা করেছে, যদিও আদিবাসীদের অলিখিত অভিধানে আত্মহত্যা নিদারুণ পাপ। মধ্যভারত সয়াবিন চাষে শীঘ্রই সাড়া জাগাবে। সবুজ বিপ্লবের পরই কি সয়াবিন বিপ্লব ? এই সয়াবিনের পাউডার, নিউট্রি নাগেট তেল, গোটা দানা কারা খাবে ? (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৩৯)

এ প্রশ্ন এবং প্রশ্ন-সম্বন্বিত তথ্য সত্যই সচেতন পাঠককে ভাবায়। কেবল প্রশ্নই নয় বিভিন্ন আইন কিংবা নিরেট তথ্যও উদ্ধৃতিচিহ্ন-বদ্ধ করে উপন্যাসে রক্ষিত হয়েছে – অবশ্যই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। মাইগ্রেন্ট লেবার অ্যাক্টের উল্লেখ আছে সে-সঙ্গে এ প্রশ্নও ছুড়ে দেয়া হয়েছে যে, এ আইন যাদের জন্য, দেশের নিরন্ন আদিবাসী, নিরন্ন গরিব দুটো ভাতের জন্য দাস-মজুরদের কেস কেন ওঠে সুপ্রিম কোর্টে ?

ভারতের কৃষিক্ষেত্রের অসামান্য সাফল্য এবং তুলনামূলক দরিদ্র দেশগুলোতে ভারতের খাদ্যশস্য পাঠাবার তথ্য আমরা উপন্যাস থেকে জানি। পূরণের মনোগত বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিক পাঠককে এ তথ্য জানিয়ে দেন যে, ভারতবর্ষ ১৯৮৫-৮৬ তে (উপন্যাসের রচনাকাল সময়ের তথ্যই দেওয়া হয়েছে) ১৪৬ মিলিয়ন টন থেকে ১৪৮.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য এবং ৩২.৬ মিলিয়ন টন তৈলবীজ এবং ১৭৫ মিলিয়ন টন আখ, ৮.৫ মিলিয়ন বেল তুলা এবং ১১.৪ মিলিয়ন বেল পাট ও মেস্তা উৎপাদন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের শতকরা পঁচিশ ভাগ মশলা ভারত পাঠায় (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৫৩) অথচ পশ্চাৎপদ আদিবাসী এলাকায় 'চির মন্বন্তর' লেগে থাকে এবং তা উচ্চারণ করাও কঠোরভাবে হয় নিষিদ্ধ। এ অবস্থাকে

ঔপন্যাসিক 'ফাইট দি ফেমিন অন ওয়ার ফুটিং' আখ্যা দিয়েছেন এবং রচনা করেছেন দীর্ঘ অনুচ্ছেদ । দীর্ঘ হলেও আদিবাসীদের প্রকৃত অবস্থা এবং সরকারি শাসন-যন্ত্রে পিষ্ট হবার এক অসামান্য দলিল হিসেবে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃতিযোগ্য –

> 'ফাইট দি ফেমিন অন ওয়ার ফুটিং'। প্রাথমিক গোদা সত্য, সবুজ বিপ্লবভূমি মধ্যপ্রদেশের এক অণু, অত্যন্ত পশ্চাৎপদ আদিবাসী ইলাকায় 'চির মন্বন্তর', তা বলতে দেবে না কেউ। যুদ্ধ! যুদ্ধ আকাশে-মাটিতে-জলে! খাদ্য কর্পোরেশনের গুদামে জায়গা অপ্রচুর বলে খাদ্য পচে যাবে কিন্তু সে খাদ্য পিরথা বা কালাহান্ডি বা কোরাপুটে কখনো পৌঁছবে না, পৌঁছায় না। খাদ্য যায় আফ্রিকায়, শ্রীলঙ্কায়, সার্ক সম্মেলনে যৌথ শস্য খামার গঠনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, দেওয়া হোক, সকলকে সব দাও, খাদ্যশস্য উৎপাদনে তোমার প্রচুর বাড়তি উৎপাদন যখন, একই সঙ্গে কেন কালাহান্ডি জেলা এবং মাইক্রো-ইলাকা পিরথা, কেন উত্তরবঙ্গে অরণ্য-বসতির গ্রামবাসীদের মাথা গোনো আদমশুমারিতে, 'তফশিলি আদিবাসী নির্বাচনী কেন্দ্র' প্রস্তুতকালে, এবং কেন তাদের তৃষ্ণার জল থেকে চলার পথ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, সব দায়িত্বের বেলা তখন তাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আনো না, আই.টি.ডি.পি. আওতায় আনো না, তখন হাত ধুয়ে ফেলে দাও ও বল 'ওরা অরণ্য-মন্ত্রক অধীনে', যখন অরণ্যমন্ত্রক ওদের শুধু দাস-মজুর করে রাখে, 'ফালতু' বলে খাটায়, দেয় না কিছুই, দেয় না কখনো। ঠিক একই নিয়মে ব্রাত্য করে রাখ উত্তরবঙ্গ ডুয়ার্সের আদিবাসীদের, যাদের গোনা হয়, (সংখ্যাটা নির্বাচনী কেন্দ্রের জন্য দরকার) এবং তাদের বেলাও অ থেকে হ, প্রতিটি নূন্যতম মানবিক দাবি পূরণ কর না, বল 'চা-বাগান মালিকরা ওদের দেখবে' এবং বাগানমালিক বাগিচার কুলিদের মাথা-পিছু তিরাশি পয়সা মঞ্জুর করে উনিশশো সাতাশিতে, যখন 'শতাব্দীর অন্ত্যকাল পশ্চিম গগনে সূর্যে, দীর্ঘ ছায়া তার' – এবং বাগিচামালিক এ দুঃসহ ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে কেননা মালিকদের ঘাঁটায় না কোনো সরকার, চা-বাগিচার মালিক কোটিপতি হোক, ওই কুলিরা থাকুক খরচের খাতায়; যখন আদিবাসী পরিচালিত একমাত্র চা-বাগান সোনালি সমবায়, গ্রাস করতে থাকে বেনাম ও ভুয়া মালিক এবং কৌশলি প্রশাসন নেয় দর্শকের নিরাপদ ও লাভজনক ভূমিকা। যখন রাঁচি ও পালামৌয়ের নাগেসিয়া আদিবাসীদের নাম বিহার রাজ্যের আদিবাসী-তালিকায় থাকে না শুমারির পর শুমারি, এবং আসাম ডুয়ার্স ও সমতলে অন্য রাজ থেকে দেড়শো বছর আগে যাওয়া সাঁওতাল-ওঁরাও-মুণ্ডা ও অন্যদের বেলা তারা 'আদিবাসী' নয় 'জাতি' (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৮২)।

৪.১০.৫

মহাশ্বেতা দেবী *টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা* উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের বিস্তারিত ও অনুপুঙ্ক্ষ বিবরণ ধারণ করেছেন। একদিকে তাদের সামাজিক আচার, স্বপ্ন-সাধ, নিরন্তর অভাবের তাড়না, অন্যদিকে প্রশাসনের বৈরিতা এবং আধুনিক মানুষের অবহেলায় ক্রমে বিস্তৃতির অতলে হারিয়ে যাবার ইতিবৃত্ত। উপন্যাসে বারবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনটি শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে –'পূর্বপুরুষের আত্মা',

‘সমান্তরাল’ ও ‘সংবাহন’। বস্তুত ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা-কথনের চাবিশব্দ এগুলো । পিরথা গ্রামে এক অতিকায় সরীসৃপ সদৃশ পাখির (আধুনিক মানুষ জানে যে, এটি সাড়ে সাত কোটি বছর পূর্বের মেসোজোয়িক পৃথিবীর এক প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী – যার নাম দেয়া হয় টেরোড্যাকটিল) ছায়ায় আতঙ্কিত গ্রামবাসী এ প্রাণীকে তাদের পূর্বপুরুষের আত্মা বলে মনে করে। বস্তুত ‘টেরোড্যাকটিল’ একটি সময়ের প্রতীক।[২৬] প্রাচীন পৃথিবীর এ প্রাণীটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ – এ জন্য যে, পৃথিবী ও মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতার ইতিহাস এ সূত্রে বিন্যস্ত। টেরোড্যাকটিল বা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অস্তিত্বের ধারণার উপরই মানব-জাতির বা বর্তমান পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস ভিত্তি পেয়েছে। টেরোড্যাকটিলের সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর আদিবাসীদের একটি মিল রয়েছে। মেসোজোয়িক মহাযুগের শেষে কোনোজোয়িক মহাযুগের (যা এখনও চলছে)সূচনা – যখন মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, ঋতু ও আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে – তখন প্রাচীন পৃথিবীর অতিকায় প্রাণীদের বিলুপ্তি ঘটছে এবং জন্ম নিচ্ছে নতুন প্রাণ – মানুষের পূর্বপুরুষের সূচনা তখনই। একযুগের শেষে অন্যযুগের আগমন অবধারিত, টেরোড্যাকটিলের মতো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের রক্ষা করতে পারেনি পৃথিবী (যদিও এখনও গভীর সমুদ্রে মাঝে মাঝে প্রাগৈতিহাসিক মাছেদের দেখা পাওয়া যায়) কিন্তু প্রাচীন পৃথিবীর আদিম সভ্যতা-সংস্কৃতির আদিবাসী মানুষকে (যারা আজ নিশ্চিহ্ন প্রায়) তো রক্ষা করতে পারে অসীম শক্তিধর আধুনিক যুগের মানুষ – একই প্রজাতির হয়েও কেবল সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিন্নতায় কেন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কেন তাদের সঙ্গে কোন সংবাহন-বিন্দু তৈরি হবে না – ঔপন্যাসিকের মতো সচেতন সকল মানুষের মনেই এ বোধ জাগরিত। ঔপন্যাসিকের ভাষায় –

> টেরোড্যাকটিলের সঙ্গে আমাদের কোনো সংবাহন-বিন্দু নেই। আমরা দুই পৃথিবীর এবং নো কম্যুনিকেশন পয়েন্ট। টেরোড্যাকটিলের ব্যাপারটায়, ও বাস্তব-অবাস্তব যাই হোক, একটা মেসেজ ছিল আমরা ধরতে পারলাম না। মিস্ করে গেলাম। ভীষণ ক্ষতি হল আমাদের, অথচ আমরা তা জানলাম না ! প্রথম থেকেই টেরোড্যাকটিল মিথ ও মেসেজ। আমরা বাস্তব টেরোড্যাকটিলের আবিষ্কারের আতঙ্কে কেঁপে গিয়েছিলাম। ...
>
> আদিবাসীদের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগের কোনো সংবাহন-বিন্দু তৈরি করিনি আমরা । অনাবিষ্কৃত রেখেই ধীরে, সভ্যতার নামে, ধ্বংস করেছি এক মহাদেশ। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ৩০৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে –

> আদিম জাতিগুলির জাতিসত্তা নিষ্পেষিত, প্রকৃতির মতো ধরিত্রীর মতো ধারয়িত্রী তাদের প্রাচীন সভ্যতা কোনো মর্যাদা পেল না, পরিচিতি ঘটল না, শুধু ধ্বংস হল, ধ্বংস হচ্ছে। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৭৭)

টেরোড্যাকটিলকে পূর্বপুরুষদের আত্মা বলে মনে করাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আদিবাসীদের প্রাচীনত্ব এবং তাদের বিপন্নতাবোধের প্রতীক হয়ে ওঠেছে এ প্রাণীটি। আদিবাসীরা তাদের পূর্বতন অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনায় হতাশ, রিক্ত। তারা একসময় যে ভূমির রাজা ছিল, আজ সেখানে তারা প্রজা ও দাস। তাদের পূর্বপুরুষদের অধিকৃত ভূমি তারা রক্ষা করতে পারে নি। তাদের পালয়িত্রী অরণ্য আজ অন্তর্হিত, অশুচি। এমনকি পূর্বপুরুষদের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রও তারা হারিয়েছে। ভূমিকাতে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২২৮) যে, সিংভূমে হো আদিবাসীরা অরণ্য আন্দোলনে সেই সব জায়গায় জঙ্গল কেটেই দখল নিয়েছেন, যেখানে একদা তাঁদের পুর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্র ছিল এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপক শ্মশান-প্রস্তর ছিল। পবিত্র সমাধিক্ষেত্র চলে গেলে আদিবাসী বড়ো অসহায়। তাদের সমাধি গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে তৈরি হয়েছে পথ, বাড়ি, স্কুল ও হাসপাতাল – অথচ এগুলো তারা চায়নি এবং এগুলো তাদের জন্যও তৈরি হয়নি ; তারা আধুনিক যুগের সকল সুবিধা-বঞ্চিত।

টেরোড্যাকটিলরূপী পূর্বপুরুষদের অশান্ত আত্মার আগমনে তারা বিহ্বল-অপরাধবোধে তাড়িত। দীর্ঘকাল-ব্যাপী তারা অশৌচ পালন করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে তাদের আত্মাকে অশান্ত করেছে বলে এক ডেথ-উইশে সমগ্র জনপদ বিপন্ন হয়। দুর্ভিক্ষ-তাড়িত হয়ে তারা মারা যায় কিন্তু খাদ্য-সাহায্যের প্রার্থনা জানায় না, নির্বিকার কণ্ঠে উচ্চারণ করে, "বড় জোর মরে যাব, তার বেশি তো নয়"(মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ৩০৪)। ওরা ধরে নিয়েছে কিছুই ওদের প্রাপ্য নয়, এমনকি প্রকৃতি-প্রদত্ত বৃষ্টিও। কারণ খোঁজে তারা তাদের দুরাবস্থার কিন্তু প্রকৃত তথ্য খুঁজে পায় না বরং আত্মপীড়নে নির্জীব করে নিজেদের –

> আমাদের কি পূজা পরবে কোনো ক্রটি হয়েছিল ? ফাল্গুনে গাছে নতুন ফল, নতুন পাতা, নতুন ফুল আসার আগে কি কেউ পরবপূজা না হতে ছিঁড়েছিল গাছের পাতা ? শিকারে গিয়ে কেউ কি মেরেছি গর্ভিণী হরিণ ? প্রাচীন বয়স্কদের কেউ কি অসম্মান করেছিল ? সমাজের নিয়ম অনাথ শিশুকে রক্ষা করা, কোথাও কি সে নিয়ম মানা হয় নি ? জানি না, কোথায় দোষ হয়ে গেল আমাদের। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৪৭)

প্রাচীন নিয়মের প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও বিশ্বাসে আদিবাসীরা তাদের সংস্কার, তাদের সভ্যতাকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে সভ্য বা আধুনিক মানুষেরা গড়েছে অনিয়মের এক পৃথিবী – যেখানে অনাথ, বয়স্ক কিংবা গর্ভবতী প্রাণী বা মানুষকে রক্ষা করার মূল্যবোধ অন্তর্হিত, যেখানে অসত্য-অন্যায়ের পথ প্রশস্ত। প্রকৃতি-বান্ধব নয়, প্রকৃতির বিধ্বংসী অবস্থানে দৃঢ় যন্ত্র-সভ্যতামুখী আজকের মানুষের সঙ্গে আদিবাসীদের অবস্থান সমান্তরাল। ঔপন্যাসিক একাধিক স্থানে তা বলবার চেষ্টা করেছেন। যেমন –

১. অতীত থেকে আজ, আর্য ও অনার্যদের, জীবিত ও মৃতদের চলার দীর্ঘ পথ তো সমান্তরাল। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৬৫)

২ পথ বড়ো সমান্তরাল, সেই সুদূর অতীত থেকে। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৯৬)

সমান্তরাল বলেই আদিবাসীরা আজ আধুনিক যুগের সকল সুবিধা-বঞ্চিত। এমনকি বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুবিধাও তারা পায় না। বিশ্ব যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের শীর্ষ সাফল্য ভোগ করছে, ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিরও যখন নিরাময় করা সম্ভব তখন আদিবাসীরা অসুস্থতাকে ভাবে দৈব রোষ, ডাইনির নজর প্রভৃতি। একজন আদিবাসীর চাওয়া খুব সামান্য। সভ্যতার কাছে তারা কোনো সাহায্য চায় না। ঔপন্যাসিকের ভাষায় –

আদিবাসী চায় মানুষের স্বীকৃতি, সম্মান, কেননা সে প্রাচীন সভ্যতার সন্তান। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৯১)

তাদের স্বপ্ন-সাধের বিবরণ থেকেও তাদের বাস্তবতার ভিন্নতা আমরা খুঁজে পাই। একাধিক উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের স্বপ্ন-সাধের সামান্যতাকে স্পষ্ট করেছে, এ উপন্যাসেও একস্থানে বলেছেন –

নেংটি-সর্বস্ব তরুণ গিধারী নাগেসিয়া বলেছিল, ও কোনোদিন একটি পেট্রল লাইটার কিনবে, দেশলাইয়ের দাম অনেক বেশি। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৫৮)

তরুণ গিধারীর এ স্বপ্নের সামান্যতায় আমরা বিস্মিত হই – একই সঙ্গে শিহরিত হই তুচ্ছ মূল্যের দেশলাইয়ের দাম বেশি ভাবায় – অর্থাৎ তাদের অর্থনৈতিক চিত্র যেন আমাদের কল্পনার সীমাকেও হার মানায়।

বস্তুত আদিবাসী সম্পর্কিত ঔপন্যাসিকের বিপুল অভিজ্ঞতা এবং তাদের অবস্থানের পক্ষে জনমত তৈরির প্রচেষ্টায় এ উপন্যাসের কিছু উক্তি রীতিমতো সুভাষিত উক্তির পর্যায়ে পড়ে। দুটি উদাহরণে বিষয়টি সীমিত করা হল (যেহেতু অগণ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে) –

১. জালের বেড়া ঘেরা বন্যপ্রাণী কোথায় পালাবে ? চারদিক থেকে ঘিরে আসা বর্তমানকাল অতীতকে খেয়ে নেবে নিঃশেষে। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৯০)

২. শহরের মানসিকতা দিয়ে ওদের বুঝবেন ? একটা স্কেল দিয়ে ভারত মহাসাগর কত গভীর, তা মাপবেন ? (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ২৩৫)

আদিবাসীদের বুঝতে হলে, জানতে হলে, তাদের রক্ষা করতে হলে, তাদের সঙ্গে সংবাহন-বিন্দু তৈরি করতে হলে কোনো আইন নয়, কোনো রীতি বা প্রথা বা সামাজিক বিপ্লব নয় ; আমাদের মনোজগতে সামান্য ভালবাসার সৃষ্টি করতে হবে। আদিবাসীদের প্রাচীন নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করে তাদেরকে আধুনিক সভ্যতার ন্যূনতম সুবিধাটুকু দিতে হবে। তবে তা একদিনে সম্ভব নয় । ঔপন্যাসিকের নির্দেশনায় তার পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে –

> কয়েক হাজার বছর ধরে আমরা ওদের তো ভালোবাসিনি, সম্মান করিনি। এখন সময় কোথায় শতাব্দীর শেষ সময়ে ? সমান্তরাল পথ, ওদের পৃথিবী আমাদের পৃথিবী আলাদা, ওদের সঙ্গেও কোনো প্রকৃত আদান-প্রদান হয় নি, যা আমাদের সমৃদ্ধ করত। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ৩০৫)

উপন্যাসের শেষপ্রান্তে তা-ই ঔপন্যাসিক তাঁর দীর্ঘ উপলব্ধিজাত সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন পূরণের মাধ্যমে। টেরোড্যাকটিল কী বলতে এসেছিল পূরণের কাছে, শরণার্থী হয়ে, সম্ভবত আদিবাসী তরুণ বিখিয়া তা বুঝেছে এবং পূরণের কাছে তা অবোধ্য থেকে গেছে। পূরণের অভিজ্ঞতা-জাত উপলব্ধি হল যে –

> বুঝিনি আমরা, বুঝতে চাইনি বলে এবং এখন দেখা যাচ্ছে বিখিয়ারা শেষ পর্যন্ত অনেক সভ্য, প্রাচীন সভ্যতার ধারক, সে জন্য ওরা শেখেনি আমাদের বর্বরতা, ওদের ভাষাতেও বোধ হয় 'শোষণ' শব্দের প্রতিশব্দ নেই। আমাদের দায়িত্ব ছিল ওদের রক্ষা করবার। ওদের চোখ তাই বলছিল।
>
> ভালোবাসা, প্রচণ্ড, নিদারুণ, বিস্ফোরক ভালোবাসা পারে এ কাজে এখনও আমাদের ব্রতী করতে শতাব্দীর সূর্য যখন পশ্চিম গগনে, নইলে ভীষণ দাম দিতে হবে এই আগ্রাসী সভ্যতাকে, প্রতিবার আগ্রাসী সভ্যতা নিজেকে ধ্বংসই করে অগ্রসরণের নামে, ইতিহাস দেখ।
>
> ভালোবাসা, নিদারুণ ভালোবাসা, তাই হোক প্রথম পদক্ষেপ। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ৩০৬)

প্রতিটি উচ্চারণ প্রতিটি শব্দ গভীর তাৎপর্যবহ – আদিবাসী অভিজ্ঞতা কিংবা আদিবাসীদের প্রতি আন্তরিক দায়বদ্ধতা থেকে উৎসরিত। টেরোড্যাকটিল-ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক নিশ্চিতভাবেই তাঁর আদিবাসী-অভিজ্ঞতার শেষ সিদ্ধান্তকে উপস্থাপন করেছেন। সে-কারণেই পিরথা-ব্লকের নাগেসিয়া আদিবাসীদের সঙ্গে অস্ট্রিক জাতির সকল বৈশিষ্ট্যকে মিলিয়ে দিয়ে তাদের সকল আদিবাসী জাতির প্রতীক করেছেন এবং 'পিরথা' নামের মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে প্রতীকায়িত করেছেন। বহু তথ্য-উপাত্ত পূর্ণ হলেও উপন্যাসটি সর্বোতভাবে তার শিল্পগুণ হারায়নি বরং সমালোচকের এ মন্তব্যকেই যথার্থ প্রতিপন্ন করেছে, 'এমন একটি সর্ব অর্থে সম্পূর্ণ সংহত আকার অথচ বিশাল উপলব্ধির উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি পড়েছি বলে মনে করতে পারি না।'[২৭]

আমাদের উপলব্ধিতেও এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের জীবনকে তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় করেছেন গভীর মমতায় এবং প্রচণ্ড দায়বোধ থেকে। তাদের জীবনের সমান্তরালে নয়, একাত্ম হয়ে একজন আদিবাসীর মতো আদিবাসী বোধকে অনুভব করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। মানুষের প্রতি, মানবিকতার প্রতি ভালোবাসার এমন প্রকাশ বাংলা সাহিত্যেই কেবল সম্ভব। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়েছে তাঁর লেখনীতে।

৪.১০.৬

ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্য মহাশ্বেতা দেবী এ উপন্যাসে গতানুগতিক নন। আদিবাসী সংক্রান্ত অধিকাংশ উপন্যাসের চরিত্রের মুখে তিনি যে ব্রাত্য বা বিশেষ আঙ্গিকের ভাষা ব্যবহার করেছেন – এ উপন্যাস গঠনে সম্পূর্ণ ভিন্নতা এসেছে। এ উপন্যাসে নাগেসিয়াদের ভাষাকে চলিত বাংলাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি তাদের গান বা গাঁথাও চলিত বাংলায় রূপান্তরিত। সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বলেই (মধ্যপ্রদেশের ভাষা তো বাংলা নয়, সুতরাং *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* বা *অরণ্যের অধিকার*-এর আদিবাসীদের ভাষা থেকে তা যুক্তিসঙ্গত কারণেই পৃথক হবে) ভাষা-ব্যবহারে তিনি এ কৌশল অবলম্বন করেছেন। তবে বিষয়ানুযায়ী ভাষার ব্যবহারে আমরা আবেগ নয়, তথ্যের (জানানো বা ধারণ করা) উপযোগিতা বেশি দেখতে পাই। একজন সমালোচক এ সম্পর্কে বলেছেন, "এমন বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার আঙ্গিক ও তার ভাষা তাই 'পাথুরে' হয়ে গেছে।" (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ৭৭)

'পাথুরে' বিশেষণটি এখানে নেতিবাচক অর্থে নয় বরং 'কাঠিন্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। মহাশ্বেতা দেবী যে বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন তা কেবল শিল্প-সৃষ্টির প্রয়োজনে নয় বরং তা সৃষ্ট সমাজ-সত্যের প্রতি তাঁর তীব্র দায়বদ্ধতায় ; এবং সে-কারণেই কঠিনভাবে তিনি তাঁর যুক্তি, নানা তথ্য এবং বর্তমান অবস্থা প্রতিবিধানের রেখাচিত্র 'পূরণ সহায়' চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন এবং সফল হয়েছেন এ কথা বলা যায় নির্দ্বিধায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রথম পাঠ

৪.১১.১

ইতিহাসপ্রিয় মহাশ্বেতা নকশাল আন্দোলন ও তাতে অংশগ্রহণকারী সূর্যসন্তানদের প্রতি ছিলেন প্রবলভাবে দুর্বল। তাঁর এই দুর্বলতা তিনি তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাসে প্রকাশ করেছে পূর্বাপর। *হাজার চুরাশির মা* উপন্যাসে তিনি এক নকশাল ছেলের মায়ের অন্তর্বেদনাকে চিত্রিত করেছেন নকশাল আন্দোলনে নিহতদের প্রতি গভীর মর্মবেদনায়। *প্রথম পাঠ* উপন্যাসেও একই আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে – তফাত কেবল স্থানিক পটভূমি ও চরিত্রায়ণে। যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন দুর্গম ঝাড়গ্রাম নিকটবর্তী শালবাড়ি অঞ্চলের আদিবাসী ধনঞ্জয় মাহাতো এ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। শালবাড়ি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের আদিবাসী গ্রামগুলোর শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা এবং নকশাল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং নিহত অজয় মাহাতোর পিতা ধনঞ্জয় মাহাতোর স্মৃতিচারণায়, পিতৃহৃদয়ের অনিঃশেষ যন্ত্রণাকে সাহিত্যিক স্ফূর্ততায় প্রকাশ করা হয়েছে।

আদিবাসী জীবন নিয়ে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম উপন্যাস *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। পরবর্তী বছরগুলোতে বেশ কিছু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন, যেখানে আদিবাসী জীবন অবলম্বিত হয়েছে বিষয় হিসেবে। অধিকাংশ উপন্যাসে তিনি যে আদিবাসী জীবনের রেখাচিত্র এঁকেছেন, যে জীবন সভ্যতার সংস্পর্শরহিত আদিম অরণ্যচারী যৌথ শুদ্ধ জীবন। সে-জীবনে একতা আছে, সংগ্রাম আছে, নৈতিক মূল্যবোধের শুদ্ধতা আছে কিন্তু নেই আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বচ্ছলতা কিংবা প্রাচুর্য অথবা আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ অথবা ক্ষমতার অংশ হিসেবে উপস্থাপন। সে-দিক দিয়ে *প্রথম পাঠ* উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। এ উপন্যাসে বিশ শতকের সত্তরের দশকে ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন তেরোটি আদিবাসী গ্রামের সামগ্রিক চিত্রে এই প্রথম শিক্ষিত আদিবাসী, জোতদার আদিবাসী, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আদিবাসী এবং সর্বোপরি নকশাল আদিবাসী চরিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়। সমগ্র উপন্যাসটিতে অবশ্য আদিবাসী জীবনে শিক্ষার বিস্তারের উদ্যোমী উদ্যোগ এবং তাতে নানা প্রতিবন্ধকতার বাস্তবতাকে গ্রথিত করা হয়েছে। উপন্যাসের নামকরণেও শিক্ষা, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে আদিবাসী জীবনে শিক্ষার বিস্তারের পেছনের যে দুঃসহ বঞ্চনার ইতিবৃত্ত আছে – তাও ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রথমার্ধেই জানিয়ে দেন এবং অবশ্যম্ভাবীভাবেই যেন সে বঞ্চনার ইতিবৃত্তে ভূমি মালিকানার বিষয়টি কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে ক্রিয়াশীল থেকেছে।

৪.১১.২

উপন্যাসের শুরুতেই গোবিন্দপুর গ্রামে একটি জুনিয়র হাইস্কুলের সরকারি অনুদান প্রাপ্তির আবেদন এবং কিছু স্মৃতিচারণ থেকে আদিবাসী জীবনে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব অনুধাবিত হয়। গোবিন্দপুর গ্রামের পূর্বনাম লোধাডি – সেটেলমেন্ট রেকর্ডে 'লোধাডি' নামটি এখনও রক্ষিত আছে। লোধাডি নামটি লোধা জাতির নামানুসারে হয়েছিল কেননা এ স্থানে লোধারা বসবাস করত। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোধা এবং সাঁওতাল, ভূমিজ, কোড়া প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা ঝোপজঙ্গল কেটে ডাহি জমি সমান করে আবাদি জমি তৈরি করেছিল কিন্তু তাদের দখলি স্বত্ব প্রমাণের কোন কাগজ ছিল না। নিরক্ষর আদিবাসীরা জানত না কাগজ কত পরাক্রমী। কাগজের স্বত্বের জোরে তিনটি নির্বাচনে জয়ী মধ্যস্বত্বভোগী গোবিন্দ মহাপাত্র যখন এ স্থান থেকে লোধা ও অন্যান্য আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে – প্রচলিত আইন তাতে সায় দেয় এবং এই প্রথম শালবাড়িতে স্থানান্তরিত আদিবাসীরা কাগজ তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মর্ম অনুভব করে। কেবল লোধাডি নয়, সেটলমেন্ট রেকর্ডে আশেপাশের সব গ্রামেরও আদিবাসী নাম পাওয়া যায় – লোধাডি, লোধাগেড়িয়া, মুর্মুর দোয়েম। তাতে বোঝা যায় আদিতে বসত ও আবাদি জমি তৈরি করে গ্রাম গড়ে তুলেছিল আদিবাসীরা কিন্তু প্রচলিত আইন অনুযায়ী জমিস্বত্ব লিখিতভাবে না থাকায় তাদের উচ্ছেদ হতে হয় এবং অন্য জাতের বা মূলধারার লোকজন তা দখল করে নেয়। এভাবেই মূলভূমি থেকে উচ্ছেদীকৃত হয়ে প্রান্তিক জীবনবৃত্তের অধিকারী হয়েছে আদিবাসীরা। রবীন্দ্রনাথের উপেনের দু'বিঘা জমির মতোই আদিবাসীদের তাদেরই উচ্ছেদকর্তার কৃপাপ্রার্থী হয়ে দিনযাপন করতে হচ্ছে। জমিস্বত্ব হারানোর সূত্রেই আদিবাসীদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের কারণ হিসেবে জমির দলিল পড়তে পারা, বুঝতে পারা কিংবা আইন-আদালতে হাকিম-উকিলদের সঙ্গে কথা বলার সামর্থ্য অর্জন ইত্যাদি প্রায়োগিক বিষয়কে জোর দিয়েছেন; তাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ভূমির অধিকার। অনেক আদিবাসী প্রাকৃতিক জ্ঞানের অধিকারী। *প্রথম পাঠ* উপন্যাসের এমনি এক চরিত্র ভেকু সরেন। তিনি ছিলেন সাঁওতাল কবিরাজ। বনজ লতাপাতার ব্যবহারে তিনি কঠিন রোগকে আরোগ্য করতে জানতেন –

> ভেকু জানিতেন, অতকীর বা কুমারিকা মূল সেবনে যৌনব্যাধি আরোগ্য হয়, (বাবুরা গোপনে কেহ কেহ সেবন করিতেন), আরবারি বা ঘেঁটু চর্মরোগ, ক্রিমি ও ম্যালেরিয়া নাশক, কাদামেট বা ভুঁই-জাম হাঁপানি ও বাতে উপকারী, এতকেক বা বাজবারণ বাত, দাঁত ব্যথা, পোকা পড়া ঘা আরোগ্য করে।
>
> এভাবে তিনি বনৌষধির মূল, পাতা, ছাল সবার খবর দীর্ঘ সাধনায় জানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা জ্ঞানী মানী বলিয়া সম্মান করিতাম। ... মোট কথা ভেকু সরেন ছিলেন সকলের একটা ভরসা। (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ৮৯)

তিনি গোবিন্দ মহাপাত্রের মধুমেহ রোগ আরোগ্য করেন ; অথচ এই গোবিন্দ মহাপাত্র দ্বারাই বাস্তহারা হন। কবিরাজির কল্যাণে আদিবাসীদের মধ্যেও তিনি যথেষ্ট অবস্থাপন্ন ছিলেন। তাঁর বাগান ও জমি ছিল – গৃহপালিত পশুপাখি, মেটে দোতলা ঘরে সমৃদ্ধির কমতি ছিল না। একদিকে সে নিরক্ষর ও অন্যদিকে অসীম প্রকৃতি-জ্ঞানী। ব্যবহারিক জীবনের সব তথ্য সকলে তাঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ করে। করম-বাঁধনা-সারহুল পরব পালনের কারণ ও পালনীয় আচার – সব তার জানা। আদিবাসীদের অতীত অলিখিত ইতিহাস, ঐতিহ্য তাঁর কণ্ঠস্থ। খেরোয়াল অর্থাৎ সাঁওতাল অনার্য জাতিরা আর্য রাম রাজাকে রাবণ নিধন কালে কত সাহায্য করেছিল – সে গৌরব-ইতিহাস তিনিই স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর জাতির নবীন কর্ণধারদের। নিজ জাতির কাছে মহাজ্ঞানী সমাদৃত হয়েও নিরক্ষর হওয়ায় খুব সহজেই তাকে তাঁর নিজ জমি থেকে উচ্ছেদ করা গেছে – কেননা সভ্য সমাজের আইনে কাগজে লেখা, রেকর্ড করা তথ্যই সর্বশক্তিমান। উদ্বাস্তু ভেকু তাঁর পরবর্তী জীবনে তাঁর পরের প্রজন্মের আদিবাসী তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছেন লেখাপড়া শিখতে। কাগজের শক্তিমত্তার কথা তাঁর কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে। নিজ জীবনের উত্তাপে তিনি কাগজের ক্ষমতাকে উপলব্ধি করেছেন। ধনঞ্জয়ের স্মৃতি-কথকতায় এ বিষয়ে ভেকুর কণ্ঠস্বর শোনা যায় –

> ভেকু সরেন বলত, কাগজ বড় শক্তিমান হে। আকাশ দেখে বলে দিব জল কখন হবে। মাটি দেখে বলে দিব নীচে জল আছে কি না। কিন্তু এ সকল জ্ঞান হয় না হে ধনঞ্জয়। এ সবের কোন ক্ষমতা নাই। সকল ক্ষমতা ধরে কাগজ। অথচ তা আমরা জানি নাই।
>
> ভেকু সরেন বলত, গোবিন্দপুর, কিশোরপুর, গোপালগঞ্জ – সেটলমেন্টে দেখগা' লোধাডি, সার্জোমগেড়িয়া, সলগেড়িয়া, বিরিডিহা, ডাঙসল। সকলই আদিবাসী নাম। আমরা পড়া জানতাম না। কাগজের ক্ষমতা বুঝলাম না, তাতেই সব চলি গিছে। ডাংরাটা, গরুটা পালালে ধরে আনতে পারি। দেশটো চলি গেলে ধরি কেমনে ? (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ৯৮-৯৯)

ভেকু সরেনের কথা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথমত, প্রাকৃতিক জ্ঞানের আপাত মূল্যহীনতা অর্থাৎ সভ্য সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক বা কাগুজে শিক্ষার দাপটে জীবন কিংবা প্রাকৃতিক শিক্ষা যে অসার হয়ে পড়েছে তা প্রতিপন্ন করা। দ্বিতীয়ত, ভূমি কেন্দ্রিকতা ; আদিবাসী জনজীবনে ভূমির কার্যকরী ভূমিকার তাৎপর্য আভাসিত হয়।

ভিকুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এ উপন্যাসের মূল চরিত্র ধনঞ্জয় মাহাতো প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে শিক্ষক হিসেবে নিজ জীবন অতিবাহিত করে। তবে শিক্ষা সম্পর্কিত সচেতনতা তৈরি হলেই আদিবাসী জীবনে শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হয় নি – পাহাড়-প্রমাণ বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে

আজও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকারি কৌশলও আদিবাসী শিক্ষা বিস্তারের প্রতিকূল। কেননা আদিবাসী অঞ্চল সবচেয়ে অনুন্নত – প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে দুর্লভ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই-ই। চতুর্থ শ্রেণির স্কুল আছে তেরোটি গ্রামের মধ্যে কেবল দুই গ্রামে। জুনিয়র হাই স্কুল নেই – সুতরাং পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সুযোগ নেই। কেউ কেউ বহুদূরের স্কুলে যায় – কদাচিৎ দু'চারজন প্রবেশিকা পাশ করে, একজন বা দুইজন হয় গ্রাজুয়েট।

সরকারি কৌশলগত বা কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা তো আছেই, আরও আছে প্রকৃতিগত দারিদ্র্য। 'ঘরে ভাত না থাকলে অ-আ থেকে ঐক্য-বাক্য-মাণিক্যে উত্তরণ বড়ো কঠিন (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ৯৭), অথবা 'ভাত না থাকলে ছাত্র চলে যাবে' (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ৯৭) – এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা সহজ নয়। সত্তরের দশকে এসে দেখা যায় আদিবাসীদের মধ্যেও শ্রেণিভেদ আছে। কিছু অঞ্চলের আদিবাসীরা শিক্ষার দিকে কিছুটা এগিয়ে, যেমন– 'শিলদার দিকে সাঁওতালরা খুব অগ্রসর।'(মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯: ১০৩) আবার ভূমিজ, মাহাতো প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে জোতদার পর্যন্ত আছে। বিশেষত মাহাতোরা অপেক্ষাকৃত গৌর বর্ণ এবং অবস্থাপন্ন হওয়ায় তাদের অনেক অঞ্চলে আদিবাসী বলে গণ্য করা হয় না। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র ধনঞ্জয় মাহাতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পেরেছেন ঘরে খাবারের সংস্থান, বাবার পনেরো বিঘা জমি ছিল বলে। ধনঞ্জয়ের শ্বশুর প্রবল প্রতাপান্বিত ময়ূরেশ্বর মাহাতো জরিপ কাজে পারঙ্গম ছিলেন, চাষবাসের নাড়ীনক্ষত্র বুঝতেন – সুতরাং রীতিমতো জোতদার হয়ে উঠেছিলেন। তিনিই আবার মাহাতোরা কেন আদিবাসী বলে গণ্য হবে না, তা নিয়ে আন্দোলন করতেন।

ভেকু সরেনের কন্যা রানীর স্বামী ধর্মরাজ কিসকু রাপাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। লোধা ছেলে সুভাষ ক্লাস এইট অবধি পড়ে সেচবিভাগে কাজ পেয়ে যায় – জমি কিনে বাড়ি করে। এমন বেশকিছু অবস্থাপন্ন আদিবাসীর উল্লেখ এ উপন্যাসেই আছে। তবে এরা সংখ্যায় নগণ্য – যদিও সমাজের নেতৃস্থানীয় তারাই। কিন্তু সমাজের মূল আদিবাসী জনস্রোত নিরন্ন, দিনমজুর বা ক্ষুদ্র চাষী – অভাব যাদের নিত্যসঙ্গী। সাঁওতাল, লোধা, ভূমিজ – এদের মধ্যে দরিদ্রই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশেষত আদিবাসীদের মধ্যেও লোধারা বড় বেশি বিপন্ন। ব্রিটিশরা তাদের অপরাধপ্রবণ জাতি বলে চিহ্নিত করে গিয়েছিল। ১৯৫২ সাল থেকে স্বাধীন ভারতে ওদের বিমুক্ত জাতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু আজও জেল, পুলিশ ও প্রতিবেশী সমাজের অত্যাচার থেকে লোধারা মুক্তি পায় নি। "অপরাধপ্রবণ শব্দটি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে কাগজে" (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ৯৮) , বাস্তবে নয়।

৪.১১.৩

আদিবাসীদের মধ্যে বিগত কয়েক দশকে শিক্ষিতের হার বেড়েছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জন্য কোটা রাখা হয়েছে, চাকরিও তারা পাচ্ছে। ঝাড়গ্রামে লোধা সেল, লোধা অফিসার, অফিস কর্মী থাকছে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে যাচ্ছে অশিক্ষার অন্ধকারে। কেননা সরকারি উদ্যোগে আদিবাসী স্কুল স্থাপিত হয় না, ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠলেও তা সরকারি অনুদান পায় না – ফলে ব্যক্তি উদ্যোগে স্কুল চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। আলোচ্য উপন্যাস 'শালবাড়ি পরমি সরেন স্মৃতি বিদ্যালয়' এর সরকারি অনুদান প্রাপ্তির প্রস্তাবনায় সূচিত হয়েছে। এক নিরক্ষর আদিবাসী রমণীর সর্বস্ব – বাস্তুভিটা ও জমির অনুদানে স্থাপিত শালবাড়িতে জুনিয়র হাইস্কুলের অনুদান মেলে না বছরের পর বছর – সরকারি সব নিয়ম মেনেও। এ বিষয়ে উপন্যাসে যেমন তুলে ধরেছেন, বারবার বিভিন্ন প্রবন্ধেও স্পষ্টভাষায় তীব্রভাবে মহাশ্বেতা দেবী বারবার উচ্চারণ করেছেন –

> সে জন্যেই আদিবাসী সংগঠন পরিচালিত হিন্দি মাধ্যম প্রাথমিক স্কুল (বিধাননগরে সুভাষ পল্লিতে) অনুমোদিত হবার সব শর্ত পূরণের পরও কুড়ি বছরেও অনুমোদন পেল না। (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ৪৯৮)

প্রথম পাঠ উপন্যাসটির কাহিনি-বিন্যাসে বৃত্তায়ন ঘটেছে মূলত একটি জুনিয়র হাই স্কুলের সরকারি অনুমোদনের সিলমোহর প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের সূচনা হয় এ স্কুলের অনুমোদনপ্রাপ্তির জন্য সরকারি দলের এম .এল .এ.-এর নিকট আবেদনপত্র লেখার মধ্য দিয়ে এবং সমাপ্ত হয় সেই আবেদনপত্র জননেতা তোতাবাবুর হাতে সমর্পণের মধ্য দিয়ে এবং এই প্রত্যয় জাগিয়ে যে, সতেরো বছরের সাধনা হয়তো সিদ্ধি পেতে চলেছে অর্থাৎ স্কুলটি সরকারি অনুমোদন পেতে যাচ্ছে। আদিবাসী অঞ্চলের এই বিদ্যালয়ের অনুমোদনের অনুবর্তনে আদিবাসী জীবনের বঞ্চনা ও সামনে এগুনোর সংগ্রাম, তাদের জীবন-যাত্রার নানা খুঁটিনাটি দিক এবং এই শোষণ-বঞ্চনার প্রতিবাদে-প্রতিরোধে হাতিয়ার হাতে সংগ্রামী হয়ে ওঠার অর্থাৎ আদিবাসীদের নকশাল আন্দোলনের সামিল হওয়ার প্রসঙ্গটি কাহিনিবৃত্তে স্থান দেয়া হয়েছে। শিক্ষা-বিস্তার ও বিদ্যালয়-স্থাপনের মূল কাহিনিস্রোতে আদিবাসী জীবনের সামগ্রিক পরিস্থিতি, তাদের বঞ্চনা-ক্ষোভ এবং স্বপ্ন-সাধের খণ্ডিত কিছু জীবনচিত্রও আছে।

৪.১১.৪

দিন পাল্টেছে – আদিবাসীরাও আজ আর পুরোপুরি অরণ্যচারী নয়। কিন্তু তাদের জীবন একসময় অরণ্য-নির্ভর ছিল – সে-জীবন থেকে বিচ্যুত হতে হয়েছে তাদের স্বেচ্ছায় নয়, বরং সভ্যতার করালগ্রাসে বনভূমি

ধ্বংসের কারণে। বন-জঙ্গল উজার করার ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারাই। এই আধুনিক সময়েও অনুন্নত আদিবাসী জীবনে চিকিৎসার একমাত্র অবলম্বন ছিল কবিরাজ এবং বনজ লতা-পাতা দিয়ে তৈরি ওষুধ। প্রকৃতি-নির্ভর এ চিকিৎসা-ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক বা বুজরুকি নয় – তার প্রমাণও পাওয়া যায় ভেকু সরেন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তাঁর ঔষধে বাবু সমাজের অনেক হোমরা-চোমড়া আরোগ্য লাভ করেছেন বটে কিন্তু জীবনের শেষপর্যায়ে এসে তিনি আর তাঁর পূর্বতন চিকিৎসা-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন নি। বন-জঙ্গল নির্বিচারে কাটা পড়ায় প্রকৃতিজ বনের ছায়ায় বেড়ে ওঠা ঔষধি লতা-পাতা দুর্লভ হয়ে পড়ে। ভেকু সরেন নিজেও মারা যান তাঁর ওষুধের অনুপান দুর্লভ হয়ে পড়ায়। "ভেকু সরেন পুরাতন উদরাময় রোগে মারা যান। যতকাল বঙ্গটলতা বা সালেমমিশি লভ্য ছিল, ততদিন দাবে রাখিয়া তিনি লাঙ্গলের ও কোদালের বাট বানাইতেন, নিমবীজ পাড়িতেন। ঔষধ অলভ্য হইল তো মন ভাঙিয়া গেল" (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ৯১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঔপন্যাসিক শালবৃক্ষ কর্তনের উপর বিশেষ জোর দিয়ে একাধিকবার জানিয়েছেন যে, শাল বৃক্ষের ছায়ায় ছোট গাছ বা লতা-পাতা ভাল জন্মে, কেননা শাল গাছ বনমৃত্তিকার সরসতা বাড়ায়। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সিমবায়োসিস (Symbiosis) পদটি ব্যবহার করে উদ্ভিদ জগতের পারস্পরিক সহযোগিতাকে চিহ্নিত করেন। সিমবায়োসিস বলতে বোঝায়, শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য যেমন একটি বড় গাছের ছায়ার প্রয়োজন, তেমনি বড় গাছটিও শেওলার রসে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে – প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার এ প্রক্রিয়া খুবই জরুরী।[২৮] শাল গাছ বিষয়ে আদিবাসীদের স্পর্শকাতরতাকে মহাশ্বেতা তাঁর বেশ কিছু রচনার কেন্দ্রে নিয়েছেন। আজীবন ভেকু সরেন বন থেকে আহরিত অমূল্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করেছে, তাই জঙ্গলের বিনাশ তাঁর বুকে বেজেছিল বড়ো বেশি। তাঁর মৃত্যুশয্যায়ও বিড়বিড় করে কেবল একটি শব্দই উচ্চারণ করেছে 'সেংগেলদা! সেংগেলদা!' (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ৯০) আদিবাসী পুরাণ অনুযায়ী – সৃষ্টিকর্তা একসময় জীবজগতের উপর রুষ্ট হয়ে আকাশ থেকে ভয়ানক এক অগ্নিবৃষ্টি বা সেংগেলদা বর্ষণ করিয়েছিলেন – যাতে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভেকুও বনভূমির বিনাশ দেখে জানিয়ে যেতে চেয়েছেন ভবিষ্যত প্রজন্মকে 'সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। তোমরা সজাগ হও।' (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ৯১)

ভেকু সরেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। কেননা, ভেকু কোনো উত্তরসূরি রেখে যেতে পারেননি। তাঁর ওষুধ-লতা সংগ্রাহক চামটু মল্লিক লোধা কিছু ওষধি লতা চিনতেন কিন্তু বনভূমি ধ্বংসের কারণে তিনিও কবিরাজি পেশার চর্চা করতে পারেননি। এ বিষয়টি ঔপন্যাসিক ক্ষোভের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন –

> সাঁওতাল, লোধা, মুণ্ডা সকল আদিবাসী কবিরাজ জানে ওষুধ দিতে, অসুখ যখন চেনা। করোনারি, সেরিব্রাল আক্রমণ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, এনকেফালাইটিস, মেনিনজাইটিস, ক্যান্সার, ভাইরাসবাহি মেনিনজাইটিস এসব তো ডাক্তারই ধরতে পারে না। দেরি করে। এ সব রোগের অষুধপালা তারা জানবে কি করে ?
>
> তাদের যদি শেখানো হতো, ছবি ও চার্টের সাহায্যে এ সব রোগের কথা বোঝানো যেত, তারা যা জানে তার উপর গবেষণা করে অষুধপালার জীবক উদ্যান তৈরি করা যেত, তাহলে...
>
> আমি দেখেছিলাম, এ সেতুবন্ধন হয় নি।
>
> সে ঐতিহ্যপরম্পরায় যে জ্ঞান লাভ করেছে তাকে পাত্তা দেয় নি কেউ। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এনে দিতে পারেনি শালবাড়ি গ্রামে পরমি সরেনের দরজায়। বনৌষধির পালয়িত্রী, জন্মদাত্রী প্রাকৃতিক বনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর আজ, সব যখন শ্মশান, তখন পণ্ডিতদের ডেকে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করে 'সাঁওতাল মেডিসিন' নিয়ে হইচই করছে, যে সেমিনারে ভেকু সরেন বা চামটু মল্লিক ব্রাত্য। ওদের তো সার্ট, প্যান্ট, জুতো, সানগ্লাস নেই। ওরা তো 'করাইডোর' বা 'সিটুয়েশন' বা 'স্কেডিউল' বলতে শেখে নি। এসব বহিরঙ্গ ছাড়া আদিবাসী বিশারদ হওয়া যায় না। (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ১৩৯)

সেই সঙ্গে এও স্পষ্ট ভাষায় ঔপন্যাসিক জানিয়ে দিচ্ছেন –

> আদিবাসী শব্দটা যেন মূলধন। যে পারছে, ব্যবসা করে খাচ্ছে। (মহাশ্বেতা ২০০৭/১৯ : ১৩৮)

সভ্য সমাজে আজ সাঁওতালি আদিবাসী চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা-সেমিনার হচ্ছে, টাকার খেলা চলছে তাতে অথচ সেখানে আদিবাসীরা নেই – তাদের কোন উপকারে আসছে না তা। এ এক অদ্ভুত Paradox, মহাশ্বেতা দেবী ধরে ধরে এই Paradoxগুলোকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন নিরলসভাবে বহু বছর ধরে। বহিরাগত দিকুদের মতোই বহিরাগত ভাইরাসবাহী মেনিনজাইটিসকে ঠেকাতে পারে না আদিবাসীরা – ফলে প্রাণ হারায় অকাতরে। আবহমান কাল ধরে এ খেলা চলছে আদিবাসীদের সঙ্গে ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষের বাইরে সমগ্র বিশ্বে। ইতিহাস থেকে আমরা জানি, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর দখলকারীদের বাহিত রোগ-জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে রেড-ইন্ডিয়ানরা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

৪.১১.৫

বিশ শতকের শেষার্ধে আদিবাসীরা যখন স্বসমাজে শিক্ষা-বিস্তারের সংগ্রাম করে, সরকারি কোটায় চাকরি পাবার জন্য এক্সচেঞ্জে নাম লেখায় তখনও নিজেদের একান্ত পরিচয়বাহী উৎসবাদি ত্যাগ করে না। আজও আদিবাসী গ্রাম বাঁধনা পরবে উৎসবের কলরোলে মেতে উঠে। পাঁচদিনব্যাপী উৎসবে গাই খেলানো বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিকার পরবে আজও তারা কাঁড় নিয়েই ছোটে – যদিও অরণ্যচারীর জীবনের অংশ নয় তারা। মৃতদের শেষকৃত্য করে তারা নিজেদের নিয়মে – তেল হলুদে রঞ্জিত করে মৃতদেহকে উজ্জ্বল, সুন্দর করে তোলে ; খই ও তুলাবীজ ছড়িয়ে দেয়, নতুন বস্ত্রে ঢেকে সুসজ্জিত চিতায় দক্ষিণে মাথা উত্তরে পা দিয়ে শোয়ায় ; মুরগি বলি দেয় একটি, যে মুরগি তাকে নিয়ে যাবে স্বর্গে – তারপর মুখে আগুন, চিতাগ্নিতে দাহন। এ একেবারেই তাদের নিজস্ব আচার – মৃতের সম্মানে পরিবারভুক্ত স্বজনেরা পাঁচদিন পর্যন্ত অশৌচ পালন করে এবং 'তেল-নাহান' করে অশৌচ মুক্ত হয়। এ উপন্যাসে পরমি সরেনের সূত্রে ঔপন্যাসিক পাঠককে জানিয়ে দেন – সরেন গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক সপ্তর্ষি, মুর্মু গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক নীল গাই। খেরোয়াল অর্থাৎ সাঁওতালরা 'তুই' ছাড়া সম্বোধন করে না। এ ধরনের ছোটোখাটো নানাতথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় উপন্যাসের কাহিনি-বয়নে। আদিবাসী জীবন বিশেষজ্ঞ মহাশ্বেতা তাঁর পাঠককেও উপন্যাসসূত্রে আদিবাসী জীবনের খোঁজখাঁজ জানাতে চান, কৌতূহলী করার চেষ্টা করেন।

বঞ্চনা-শোষণ-কষ্ট ছাড়া আদিবাসী-জীবন তো অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত। তাই এ উপন্যাসেও যথারীতি আদিবাসী-জীবনের বঞ্চনার কথা লিখেছেন মহাশ্বেতা অপার মমতায়। মূলকেন্দ্র ছিল শিক্ষা কিন্তু এর পাশাপাশি ভূমিহীনতা, দারিদ্র্য, জলকষ্ট – জীবনের প্রতিটি গ্রন্থিকেই তিনি উন্মোচন করতে চেয়েছেন যতই ক্ষুদ্র পরিসরে হোক। প্রকৃতি-লালিত এ মানুষগুলো সারাবছরই অন্নাভাবে ভোগে, শুষ্ক মৌসুমে জলাভাবেও। নদীর বুক খুঁড়ে খুঁড়ে জল বের করতে হয়। গ্রীষ্মকালে নিদারুণ কষ্ট। সরকারি কুয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক – উচ্চবর্গীয়দের পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য, আদিবাসীদের জন্য কখনও কুয়া দেয়া হয় না – হয়তো আদিবাসীদের নামে বরাদ্দ হয় টাকা। এমেলে, এম. পি. এমনকি মন্ত্রীও যদি হয় আদিবাসী – মূলস্রোত থেকে সে হয় বিচ্ছিন্ন, আদিবাসী জনজীবনের কোনো খবরই সে রাখে না।

শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সত্তরের দশকে নকশালরা যে আন্দোলন করেছিল, অনেক অঞ্চলের আদিবাসীরাই তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। *প্রথম পাঠ* উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনে নিহত অজয় মাহাতোর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল আদিবাসীদের প্রতীকায়িত করেছেন। নকশালরা তো নিপীড়িত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্যই সংগ্রাম করেছিল আর আদিবাসীদের

চাইতে নিপীড়িত আর কে আছে ? সংগত কারণেই আদিবাসীরা এ আন্দোলনে অংশ নিয়ে নিজেদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষুধা

৪.১২.১

ক্ষুধা (১৯৯২) এক আদমখেকো কৌয়ার বা সামন্তপ্রভুর কাহিনি, পালামৌ অঞ্চলের বন্ডেড লেবার বা দাসমজুরদের সংগ্রামী হবার কাহিনি, আদিবাসীদের বনজ সম্পদে অধিকার ক্ষুণ্ণ হবার কাহিনি, অধিকার পাবার কাহিনিও বটে। আশির দশকের বিহার তোলপাড় করা এক সংবাদের সূত্রে কাহিনির সূচনা এবং বিশ বছরের কাল ব্যবধানে নানা শোষণ-বঞ্চনা জনিত ক্ষোভের বিস্ফোরণে সেই সংবাদ প্রণেতা সামন্তপ্রভুকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে কাহিনির সমাপ্তি।

আশির দশকে ভারতবর্ষের স্বাধীন হবার বহুকাল পরে পালামৌয়ের লারাতু প্রদেশের সর্বশক্তিমান জমিদার পরমজিৎ সিং কৌয়ার এক আদিবাসী যুবতী কুনারী ভুঁইনকে নিজ লালসার শিকারে পরিণত করে সন্তানসহ তাকে হত্যা করে এবং তার নিজস্ব চিড়িয়াখানায় বন্দি বাঘের খাদ্য হিসেবে খাঁচায় ফেলে দেয়। ঘটনা প্রকাশ পেলে রাজ্যজুড়ে প্রচুর হৈ চৈ হয়, কৌয়ারের নিন্দা হয় কিন্তু কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয় না। যদিও কুনারী কৌয়ারের প্রথম বা শেষ শিকার নয়, তবুও কুনারীর ঘটনায় কৌয়ারকে অপদস্থ হতে হয় বলে ঘুরে ফিরে কৌয়ারের স্বপ্নে কুনারী বারবার ফিরে আসে। 'ছোটজাতের রক্ত দান করলে ভূমি প্রসন্না হন' (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ৩৭) – এ বাক্যে বিশ্বাসী রাজপুত জমিদাররা সুদূর অতীত থেকে আদিবাসীদের রক্তে রঞ্জিত করেছে পালামৌয়ের ভূমি। সংবাদপত্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে আজ সভ্যসমাজ তা জানতে পারছে। আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা পরিণত হয়েছে তাদের বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহে। তাদের বিদ্রোহ বাস্তবতা পেয়েছে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা বনজ মৌয়া (মহুয়া) ও কাঠ কুড়ানোর অধিকার নিয়ে। জওহরলাল নেহেরুর 'পঞ্চশীল পরিকল্পনার' অন্তর্ভুক্ত আদিবাসী উন্নয়নের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে 'আদিবাসীদের জঙ্গল ও ভূমির উপর অবাধ স্বাধীনতা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জমিদাররা আদিবাসীদের দাসমজুর হিসেবে ব্যবহার করে তাদের দিয়ে সংগৃহীত মৌয়া নিজেরা বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকায় – আদিবাসীদের কখনও দু'এক টাকা দেয়, আবার কখনও কিছুই দেয় না। পালামৌয়ের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বনজ সম্পদে অধিকার কেবল সামন্তপ্রভুদের। তারা আরণ্যক মানুষের ফল-ফুলের অধিকার কেড়ে নিজেরা আরও অর্থবান হয়, লরির পর লরি কাঠ দিয়ে বোঝাই করে অবৈধভাবে ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করে। প্রশাসন তাদের পোষা – তাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং সহায়ক ভূমিকা পালন

করে। স্বাধীনতার বহু পরেও এ অঞ্চলে বন্ডেড লেবার বা দাসপ্রথা কার্যকর থাকে নির্বিবাদে। এ নিয়ে সংগঠিত আদিবাসীরা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং দীর্ঘদিনের বঞ্চনা-শোষণের প্রতিবাদে আদিবাসী নারী এবং পুরুষেরা সম্মিলিতভাবে শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

৪.১২.২

ক্ষুধা উপন্যাসে লেখক আদিবাসী জীবনের নানা শোষণ-বঞ্চনার ইতিবৃত্তের প্রেক্ষাপটে তাদের প্রতিবাদী হওয়ার আখ্যান রচনা করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনির সত্যতা নিরূপণে মহাশ্বেতা দেবী নিজেই বলেছেন, "ক্ষুধা-র প্রতিটি অক্ষর সত্যি" (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০: ৯)। ১৯৬৫ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছর লেখক নিয়মিত পালামৌ অঞ্চলে ঘুরেছেন, সেখানে দাস মজুরদের প্রতি অত্যাচার নিজের চোখে খুব কাছ থেকে দেখেছেন (কৃপাশঙ্কর ১৯৯৯ : ৫৪), আদিবাসী জীবনকে পরম মমতায় নিজ অনুভবে ঠাঁই দিয়েছেন। এ উপন্যাসের 'লারাতু' বাস্তবে 'মানাতু'। এ রাজ্যের জমিদার 'মানাতুর মানুষখেকো' অভিধায় অভিহিত হয় কেননা সে তাঁর নিজস্ব চিড়িয়াখানায়, খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘকে, তাঁরই বন্ডেড লেবার বা ভূমিদাসদের মাংস মাঝে মাঝে যোগান দেয় ; মহাশ্বেতার জবানবন্দি ছাড়াও ভিন্ন উৎস থেকে উদ্ধৃত করে এর সত্যতা নিরূপণ করা যায় –

> Two decades ago, Zamindar Jagdishwarjeet Singh's word was the law in Manatu block of Daltonganj, now in Jharkhand. Rumours are that at the slightest defiance one would be thrown into the cage of a hungry tiger. His whip was said to have always been wet with blood. People talk with awe about the doings of the fabled landlord in Hazaribagh, Jagdishwarjeet Singh who earned the infamy of being the Man-eater of Mantu. (উদ্ধৃত, পম্পা ২০১৩ : ২০৪)

মা ও শিশুকে হত্যা করে বাঘের মুখে ফেলে দেয়ার এই লোমহর্ষক কাহিনি কল্পিত নয় – বাস্তব, দাসমজুর প্রথাও বাস্তবিক ঘটনা, আদিবাসীদের 'ক্রান্তিদল' কিংবা 'শোষিত মুক্তি দল'-র পতাকাতলে আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষেও প্রমাণ মেলে ; কেবল কুনারীর হত্যাকারী পরমেশ্বরজিৎ সিং-এর হত্যার ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই। লেখক এখানে তাঁর নিজের প্রতিবাদী সত্তাকে আদিবাসীদের মধ্যে স্থাপন করে তাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে বাস্তব করে তুলেছেন। খণ্ড খণ্ড ঘটনার ধারাবাহিকতায় এক অসম লড়াইকে বিবৃত করেছেন লেখক। লড়াইটা অসম – কেননা সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ একপক্ষে – অন্যপক্ষে নিরন্ন ভূমিহীন অন্ত্যজ আদিবাসীরা – যাদের মানুষ হিসেবেই সমাজ গণ্য করতে চায় না। উপন্যাস মধ্যে ঔপন্যাসিক এই শক্তিধর পক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন এভাবে–

পালামৌ ইতিহাসের অগ্রগতিগুলি এখনও লেখেনি কোনো ইতিহাসকার, কোনো পণ্ডিত। সে ইতিহাসটা লেখা হলে তবে তা দিকনির্ণয় হতো। 'প্রশাসন- পুলিশ-সামন্ততন্ত্রের শুভবিবাহ' যা এক অচলায়তন, কোন কোন আন্দোলন দ্বারা তার ভিতে ঘা পড়েছিল, কারা সূচনা করেছিল সে ইতিহাসের, তা এখনও লেখা হয়নি। (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ৭৯)

অলিখিত ইতিহাসকে এ আখ্যানে গ্রথিত করেছেন লেখক এবং এ আশায় উজ্জীবিত হয়েছেন যে, নিম্নবর্গীয় প্রকৃত ইতিহাস রচনা করবে নিম্নবর্গীয়রাই। নিম্নবর্গীয়ের অবদানকে যেভাবে চলমান ইতিহাস অস্বীকার করেছে – ভবিষ্যত ঐতিহাসিকেরা সে ভুল শুধরে নেবে এবং তার উত্থান হবে সমাজের তলা থেকেই।

ইতিহাস কেবল কাগজে কলমে লেখা হয় না – ইতিহাস রচিত হয় মানুষের কর্মের মধ্য দিয়ে। হয়তো সে-কর্মের উল্লেখ থাকে না লিখিত ইতিহাসে কিন্তু সময়ের বুকে সে-কর্ম যে ছাপ ফেলে তা মুছে যায় না ; তা বীজকারে সুপ্ত থাকে অন্ধকার ভূমিগর্ভে লোকান্তরালে এবং কোনো এক ভবিষ্যতের মহীরুহ হয়ে বিকশিত হয়। উনিশ শতকে পালামৌ অঞ্চল চেরো, খারোয়ার বিদ্রোহে কেঁপে উঠেছিল – ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা হয়েছিল বিপর্যস্ত। ১৮০০-১৮০২ সালে প্রথম এ অঞ্চলের চেরোরা বিদ্রোহ করে কিন্তু এ বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না কোথাও। এরপরও এসব বিদ্রোহের উল্লেখ আছে ঘটনাক্রমে – বিবরণ নেই। কেননা নিম্নবর্গীয় মানুষের বিদ্রোহকে – জাগরণকে কোনকালেই উচ্চবর্গীয়রা সুনজরে দেখেনি – লেখকের ভাষায়–

সমাজে চিরকালের দাবিয়ে রাখা মানুষের বিদ্রোহ, কী ইংরেজ শাসনে, কী স্বাধীন ভারতে, সবচেয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ।

অথচ অবহেলিত, শৃঙ্খলিত, দরিদ্র ও ধনীর অদ্ভুত সমাহারের মিলনভূমি পালামৌয়ে রচিত হচ্ছে ইতিহাস, এখনি, এই মুহূর্তে। সেই ইতিহাসের একটি সূচনা, নারী মুক্তি বাহিনী।" (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ৭৯)

খুব সামান্য উপলক্ষ্যে পালামৌয়ে গড়ে উঠেছিল 'শোষিত মুক্তি দল' এবং নারী মুক্তি বাহিনী। জঙ্গলের কাঠ এবং মহুয়া কুড়ানোয় সামন্তশ্রেণির বাধাদান তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্রোধের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে ঘটে বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড। রাতের আঁধারে আদিবাসী গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে আগত জমিদারের তসিলদার ও তার চার অনুচরকে হত্যা করে শোষিত মুক্তি দল। একে তারা হত্যা নয়, আত্মরক্ষা বলেই মনে করে। সহিংসতা প্রতিরোধে তারাও সহিংস হয়ে ওঠে। চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা শোষকশ্রেণির প্রতিভূ কৌয়ারকে হত্যা করে – আদিবাসী নারীর সম্ভ্রম ও প্রাণ বাঁচানোর মহত্তম উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং কুনারী হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের তাড়নায়। শোষিতের অবস্থানের এ পরিবর্তনকে

লেখক ধাপে ধাপে বিকশিত করেছেন এবং সবশেষে প্রকৃতিও সে সত্যকে গ্রহণ করেছে তা ইঙ্গিতবহ ভাষায় বিবৃত করেছেন –

> আগুন আজ ক্ষুধার্ত। এই প্রথম পালামৌয়ের আগুন হরিজন বা আদিবাসীকে খাবে না। উচ্চবর্ণ রাজপুতকে খাবে বলে পালামৌয়ের আগুনের আজ ভীষণ ক্ষুধা (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ১১২)।

৪.১২.৩

শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বমুখর প্রতিবেশে আদিবাসী যে জীবনকে মহাশ্বেতা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন সে-জীবন বঞ্চনার-অবহেলার এবং কিয়দংশে সংগ্রামের। আদিবাসী জীবনের এক বড় অভিশাপ 'বন্ডেড লেবার' বা দাসমজুর প্রথা। ১৯৭৬ সালে সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ প্রথার উচ্ছেদ ঘটান কিন্তু তা কেবলই কাগজে কলমে ; বাস্তবে তা কার্যকর আছে ভিন্ন নামে, ভিন্ন রূপে। সেওকিয়া, কামিয়া, হরোয়াহা, চরোয়াহা – কত নাম পালামৌয়ের দাসমজুরদের ! বর্ণপরিচয়হীন নিরীহ সরল মানুষগুলো নিতান্ত প্রয়োজনে মহাজনের কাছ থেকে যদি বিশ টাকা ধার নেয় – নিরবিচ্ছিন্ন শ্রম দেওয়ার পরও চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে বাড়তে বাড়তে বিশ বছর পর তা আড়াই হাজার টাকায় রূপান্তরিত হয়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তখন কেবল নিজে নয় – তার পুরো পরিবারসহ মালিকের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। পূর্বপুরুষের সামান্য ঋণের দায়ে পরবর্তী প্রজন্ম আজীবন পরাধীন জীবন-যাপন করে, কখনও মুক্ত হতে পারে না। লেখকের তাই আক্ষেপভরা উচ্চারণ –

> সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে মালিকের কাছে একবার ধার নেবার পর কোনো গরিব ভুঁইয়া-দুসাদ-চামার-রবিদাস-গঞ্জু-ওরাওঁ-নাগেসিয়া-খারোয়াড় কখনো মুক্ত হতে পারে? (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ১৬)

তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সুযোগ নেয় এই ভূমিদাসেরা। ট্রেন বা লরিতে চেপে তারা কখনও ঠিকাদারদের সঙ্গে চলে যায় পাঞ্জাব, কানপুর, রাঁচি বা টাটায়। যদিও তাতে তাদের অবস্থা হয় আরও শোচনীয়। জমিদারের নিপীড়নে বিপর্যস্ত হয়ে কখনও সমগ্র গ্রামের আদিবাসীরা পালায়। *ক্ষুধা* উপন্যাসে খেড়ি গ্রামের নাগেসিয়ারা রাতারাতি গ্রাম ছেড়ে পালায়। ভূমিলগ্ন জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা শিল্পনগরী টাটায় মজুর পরিচয় ধারণ করে। শ্রমপরিচয় পাল্টালেও তাদের আদিবাসী পরিচয়, নাগেসিয়া পরিচয় মুছে যায় না বরং অন্যান্য আদিবাসী মজুরদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে টাটার উপান্তে বানিয়ে নেয় ঝুপড়ি পল্লী 'নয়া খেড়া'। অতীত জীবনকে তারা মুছে ফেলে না, রূপান্তরিত করে। লেখকের ভাষায় – "এ ভাবেই খেড়া গ্রামের নাগেসিয়ারা মাটি থেকে শিকড় ছিঁড়ে টাটার উপান্তে ভাসমান, দেশান্তরী, দিনমজুরদের সমাজে মিশে যায়" (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ২৩)।

এ চিত্রের বিপরীতটাও লেখক একই কাহিনীর বৃত্তে স্থান দিয়েছেন। খড়ি-বাঁধ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ত্রিশটি গ্রামের সাতশো উনিশটি পরিবার আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলায় জিতে অর্থ পায় এবং সে অর্থে লারাতু স্টেটে জমি কিনে নয়াখেড়ি গ্রাম গড়ে তোলে – যে গ্রাম কোনো জমিদারের অধীন নয়, স্বাধীন। এমন স্বাধীন গ্রাম অবশ্য আরও আছে। যেমন – বড়াটোলি মাহাতো গ্রাম; তারা সরকারকে খাজনা দিয়ে জমি চাষ করে। জমিদার বা কৌয়ারের অধীন নয় তারা। তাই নাগেসিয়ারা চলে যাওয়ার সময় তাদের ছাগলগুলো বড়াটোলির মাহাতোদের দিয়ে বিনিময়ে যৎসামান্য টাকা, বস্তা বোঝাই ছাতু ও ভুরাগুড় নিয়ে গ্রাম ছাড়ে। কৌয়ারের অধীন নয় বলেই তারা কৌয়ারের প্রজাদের সঙ্গে বিনিময় করতে ভীত হয়নি বরং সাগ্রহে রাজী হয়েছে। অন্যদিকে নয়া-খেড়ির লোকেরাও কৌয়ারের বিরোধিতা করেছে সজ্ঞানে। কৌয়ারের তসিলদারের গালির জবাবে তার জামা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলতে পেরেছে –

> মুখ সামলে সিং। আমি ভক্ত খারোয়ার, আর খারোয়ার কখনো কামিয়া থাকে না। করো অপমান সহ্য করে না। আমি নয়া- খেড়ির লোক। তোমাদের কামিয়া প্রজা নই (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ৫৭)।

কামিয়া নয় বলেই এ উচ্চারণ করা সম্ভব হয়েছে।

মূল কাহিনির আখ্যানে টুকরো টুকরো বিবরণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীদের পরিচয় যথাসম্ভব দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক। যেমন – খড়ি-বাঁধ প্রকল্পের উপাখ্যানে জানিয়েছেন যে, চেরো ও খারোয়ার আদিবাসীরা একসময় পালামৌয়ের রাজা ছিল। তারা সবচেয়ে চাষিবাসী আদিবাসী ; সাবারা নদীর জল-বিধৌত উর্বর ভূমি তাদের অধিকারে ছিল বলে এবং চাষাবাদে অসাধারণ দক্ষতার সুবাদেই হয়তো তারা রাজার পদমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল একদা। এ উপাখ্যানে খড়কা বাঁধ সংঘর্ষের নেতা গঙ্গারামের উল্লেখও আছে – যাকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছিল ; মহাশ্বেতা যাকে নিয়ে বা যার সংগ্রাম নিয়ে সুরজ গাগরাই নামে স্বতন্ত্র উপন্যাস রচনা করেছেন।

আবার, খেড়া গ্রামের নাগেসিয়াদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই তথ্যের উপস্থাপন করেছেন লেখক। কৌয়ারের অধীন যে জমিতে ক্রীতদাস হিসেবে নাগেসিয়ারা শ্রম দেয়, একসময় তারা নিজেরাই এ জমির মালিক ছিল;বহিরাগত কৌয়ারের বংশ তা দখল করে নিয়েছে। এ দখলদারিত্বের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। সেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই বহিরাগতদের আক্রমণে নাগেসিয়ারা বিপর্যস্ত হয়েছিল। সে-কারণে তারা পাহাড়ে উঠে ঘর বাঁধে যাতে শত্রু কোনদিক থেকে আসবে তা দেখা যায়। এ বৈশিষ্ট্য বর্তমানেও ধারণ করে আছে তারা। আজও নাগোসিয়ারা ঘর বাধঁতে টিলা বা ডুংরি খোঁজে। খেড়া গ্রামটিও ছিল নাতিউচ্চ টিলার উপর। বস্তুত ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি প্রীতির প্রতি দায়বদ্ধতা তাদের তড়িত করে এ বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করতে।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সব অদিবাসী-ভিত্তিক রচনাতেই আদিবাসী জীবনের যে প্রান্তটির উপর আলোকসম্পাত করেছেন তা হলো তাদের একাত্মবোধ। এ উপন্যাসেও প্রথমাবধি সমস্ত ঘটনাংশের পশ্চাতে আদিবাসীদের এই একাত্মবোধের পরিচয় উদ্ভাসিত হয়। অবশ্য সভ্য সমাজের চোখে তাদের কৌম জীবন দলবদ্ধ জানোয়ারের সঙ্গে তাদের তুলনীয় করে তোলে। সভ্য মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতাকে সভ্যতার উৎকর্ষ বিবেচনা করে। দলবদ্ধ জীবন তাদের কাছে আদিম, অসভ্য জীবন। অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধও অসার এবং অগ্রহণযোগ্য। পালামৌয়ের সামন্তপ্রভু ও তার অনুচরদের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে মহাশ্বেতা দেবী সম্ভবত পুঁজিবাদী আধুনিক সভ্য সমাজের দৃষ্টিকোণকে আভাসিত করেছেন। অথচ আদিবাসী জীবনের স্বকীয়তার একমাত্র উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য তাদের একাত্মবোধ ; জন্ম, মৃত্যু, উৎসব – সবই তারা সমাজবদ্ধজীবনে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে উদ্‌যাপন করে। তাই 'এক ঘরে জন্মালে সবার অশৌচ' এক ঘরে মরলে সবার অশৌচ' (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ১৭)। একাত্মবোধের এ শক্তিই তাদের বিদ্রোহী হতে উজ্জীবিত করে।

যন্ত্রসভ্যতাসমৃদ্ধ আধুনিক পৃথিবী নানা পরিবেশ বিপর্যয় এবং ভবিষ্যত দুর্যোগের হুমকির মুখে 'প্রকৃতির কাছে ফিরে চলো' কিংবা 'পরিবেশ রক্ষা কর, জঙ্গল বাঁচাও' এ ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলেছে। পরিবেশবাদী এ আন্দোলন সভ্য সমাজের গা বাঁচানোর আন্দোলন। যে সভ্যতা নিজেদের সীমাহীন লোভে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করেছে – আজ বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবন ও অস্তিত্ব সুরক্ষায় তারা সে-পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চায়। তবে এ ধরনের শৌখিন পরিবেশবাদীদের মতো আন্দোলন করে না আদিবাসীরা। জঙ্গল তাদের জীবন, বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ; জ্ঞাতসারে তারা জঙ্গল ধ্বংস করে না বরং বহুবছরের অর্জিত অভিজ্ঞানে তাকে রক্ষা করতে চায়, নানা সংস্কারের বেড়াজালে নিজেদের কার্যক্রম ও আচরণকে সীমাবদ্ধ করে। জঙ্গল বাঁচাও – এটি তাদের আন্দোলন নয়, তবে জঙ্গল বাঁচাবার জন্য তারা লড়াইয়ে নামতে প্রস্তুত। বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য তারা সভ্য মানুষের মতো গাছ কাটে না। গাছ কেটে তারা জ্বালানি সংগ্রহ করে বটে কিন্তু সে গাছ কাটার মধ্যেও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ছন্দ তারা মেনে চলে। গাছ তাদের কাছে দেবতা – গাছের পূজা করে তারা। শুদ্ধ, পবিত্র না হয়ে তারা গাছের কাছে যায় না, পাছে তাদের দেবতা রুষ্ট হন, গাছের কোনো ক্ষতি হয়। কৌয়ারের অনুচরেরা খেড়াগ্রামের আদিবাসীদের মহুয়া কুড়াতে জোর করলে তারা এ উত্তর দেয় –

> আমরা অশৌচে আছি, গাছের ক্ষতি হয়ে যাবে মালিক। গাছ আমরা পূজা করি। অশৌচে আছি। গাছের নীচে যেতে পারি ? (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ১৭)

এটি অবশ্য অজুহাত – কুনারী ভুঁইয়ার মৃত্যুর প্রতিবাদে তারা মহুয়া কুড়ানো বর্জন করে কিন্ত তাদের জীবন রীতি যে উল্লেখ আছে তা মিথ্যে নয়, আর মিথ্যে নয় বলেই কৌয়ারের লোকেরা তাতে অবিশ্বাসের কারণ খুঁজে পায় না।

৪.১২.৪

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরিবর্তন ঘটে, সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হয় অথচ পালামৌয়ে চলতে থাকে আদিম শাসন ব্যবস্থা – বিক্রম সংবৎ। বিক্রমশাহী ব্যবস্থায় ধর্মের অনুশাসনে বা তার সেবায় নিয়োজিত থাকে সমগ্র রাজ্য। বৃটিশ শাসন পেরিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের পালামৌয়ে এবং কোথাও কোথাও এখনও বিক্রমশাহী শাসন ব্যবস্থা বা সংবৎ চালু আছে সামন্তপ্রভুদের মর্জিতে। এখনও ভারতবর্ষে রূপকানোয়ারের মতো নারীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ‘মহাসতী’ আখ্যা দেয়া হয়, বিধবা বিয়েকে এখনও ঘৃণ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয় – এমন অনগ্রসর সমাজে আদিবাসী বা নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন তো মূল্যহীন, তুচ্ছ।

এই তুচ্ছ আদিবাসীদের কোনো সম্মান, তাদের নারীদের সম্ভ্রম নেই বলেই উচ্চবর্গীয়দের ধারণা। শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন লেখক –

> এখন হাওয়া লেগেছে সব, মালিকের ভোগে গেলে নাকি ইজ্জত চলে যায়। ইজ্জত যাবে তো বর্ণহিন্দুর, রাজ পুতের। এদের ইজ্জত আছে বলেই জানত না তসিলদার। কত কামিয়া মেয়েকে, কত বছর ধরে কৌয়ারের জন্যে . . . অছুত-আদিবাসী মেয়েদের কৌয়ার চিড়িয়াখানার কাছের চত্বরে নিয়ে যেতেন। (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ৭১)

তসিলদাররের মনোকথনে যুগযুগান্তের নিপীড়নের চিত্র প্রতিভাসিত হয়েছে। মূলত সামন্তপ্রভুদের পাশাপাশি তসিলদারের মতো ছোটো প্রভুর অনুশাসনও মেনে চলতে হয়েছে প্রতিটি রাজ্যের নিপীড়িত মানুষদের। ঔপন্যাসিক তো স্পষ্ট জানিয়েছেন,

> পরমজিৎ সিং কৌয়ার থাকুক, লারাতুর মধু চুষে নেবে তসিলদার। (মহাশ্বেতা ২০০৮/২০ : ৩৪)

যুগের পর যুগ এ ধরনের শোষকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ আদিবাসী ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের দৃঢ় মেলবন্ধনে গড়ে উঠে প্রতিরোধের বলয়। আশির দশকের পালামৌয়ে উচ্চবর্গীয় রাজপুত বিন্দা সিং শোষক রাজপুতদের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, গড়ে তোলে ‘ক্রান্তি ফৌজ’ – এ ইতিহাসকে এ আখ্যানের পরিসরে ঠাঁই দেয়া হয়েছে। বিন্দা সিং বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে আদিবাসী জনতা বনজ সম্পদে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়েছে, মনোযোগী হয়েছে এবং সম্ভবত এর ফলস্বরূপ, সংশোধিত

আইনে বনবিভাগ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকার বনজ সম্পদে আদিবাসী সমাজের অধিকার দেয়া হয়েছে।

৪.১২.৫

ইতিহাস মহাশ্বেতার প্রিয় বিষয়। তবে তাঁর রচনায় "সমস্ত ইতিহাস শেষ পর্যন্ত এসে মিলে যায় এমন একটা কেন্দ্রবিন্দুতে যখন দেশের লাখো লাখো মানুষ মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পপতি-জমিদার-জোতদার-মহাজন-উচ্চবর্ণের মানুষ সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের দিকে আঙুল তুলে প্রতিবাদ করে বলতে থাকে, তারা কোনও দিন কারও কাছ থেকে বাঁচার ন্যূনতম অধিকারও পায় নি।" (রাহুল ১৪১৮ : ২২৫)

ক্ষুধা উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি – এ উপন্যাসের প্রতিটি প্রান্তে আদিবাসী জনতার গৃহীত জীবনকে উন্মোচিত করা হয়েছে গভীর ক্ষোভে ও ভালোবাসায় । অন্তিমে কুনারীর মৃত্যুর বদলা নিয়েছে আদিবাসীরা কৌয়ারকে আগুন জ্বালিয়ে কিন্তু এ প্রতিশোধের আখ্যানে কোথাও শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলন বা শ্রেণিসংগ্রামের চিত্র সুস্পষ্ট নয়। এ ঘটনা যেন বরজুর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থের বা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আদিবাসী নারীর সম্ভ্রমরক্ষার প্রতিরোধ প্রতিবাদ। আশির দশকের ঝাড়খণ্ড আন্দোলন থেকে এ জনতার অবস্থান বহু দূরে।

ভারতের প্রচলিত ইতিহাস সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস – এ ইতিহাসে আদিবাসীরা ভীষণভাবে উপেক্ষিত। মহাশ্বেতা দেবী এই উপেক্ষিত জনজীবনকে শিল্পে ঠাঁই দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে সমাজতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণে তিনি আদিবাসী জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্যের রূপরেখা নির্মাণ করেছেন একাগ্র নিষ্ঠতায়। পালামৌ অঞ্চল কেবল নয়, সমগ্র ভারতের আদিবাসীদের মানসপ্রতিমা নির্মাণে মহাশ্বেতা দেবীর লেখনী পেয়েছে এক অভাবনীয় সফলতা। সমালোচকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই আমরাও বলতে চাই –

> ভবিষ্যতে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় আদিবাসীদের নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর লেখা উপন্যাসগুলিই হয়ে উঠবে ভারতের সমাজ-ইতিহাসের সাবলটার্ন স্টাডিজ (মাজী ২০০৫ : ৬১)।

টীকা

১. মহাশ্বেতা দেবীর মোট উপন্যাসসংখ্যা কত তা নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব নয়। ৯১ বছরের সুদীর্ঘ জীবনে লিখেছেন তিনি দু'হাতে। গ্রন্থাকারে, রচনাবলিতে ও পত্রিকায় স্থান পাওয়া ১১৬ টি উপন্যাসের নাম পাওয়া যায় অমর দে সম্পাদিত গল্পসরণি, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ : বার্ষিক সংকলন : ১৪১৮-এ

২. A simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson, as told by Jesus in the Gospels.

(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/parable)

A parable is a succinct, didactic story, in prose or verse, which illustrates one or more instructive lessons or principles.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Parable)

৩. "চম্পাদেশের রাজা রোমপাদের সঙ্গে এক ঋষি পালকাপ্য বা পালকাপ্পের সুদীর্ঘ বাক্যালাপ হইয়াছিল হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে। গ্রন্থাকারে গ্রথিত এই সুদীর্ঘ কথোপকথনই হস্ত্যায়ুর্বেদ (বা গজ-চিকিৎসা, বা গজবিদ্যা, বা গজবৈদ্য বা গজায়ুর্বেদ)-গ্রন্থ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। লৌহিত্য যেখানে হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে সেইখানে ছিল ঋষি পালকাপ্যের আশ্রম। পালকাপ্যের নাকি জন্ম হইয়াছিল কাপ্যগোত্রে, এক ঋষির ঔরসে, হস্তিনীর গর্ভে। আর, রোমপাদ নাকি ছিলেন রামায়ণ-কীর্তিত দশরথের সমসাময়িক ! সমস্ত বর্ণনাটিই পৌরাণিক স্বপ্ন-কল্পনার সৃষ্টি, সন্দেহ নাই। পালকাপ্য নামে যথার্থ কোনও পুরুষ ছিলেন কিনা তাহাও সন্দেহজনক; দ্রবিড় ভাষায় পাল অর্থই হস্তী এবং কপিও এক অর্থে হস্তী। তবে, গ্রন্থটি বিদ্যমান এবং দশম-একাদশ শতকের আগেই যে ইহা রচিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ একাধিক।" (নীহাররঞ্জন ১৪২০ : ৫৭২)

৪. উল্লেখ করা হয়েছে মহাদেব চক্রবর্তীর 'আদিবাসী প্রশ্ন ও কতিপয় সমস্যাঃ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা' অনু. জিয়াউল হক বাবলু, প্রকাশিত হয়েছে *বিপন্ন ভূমিজ*, সম্পাদনা- মেসবাহ কামাল, আরিফাতুল কিবরিয়া, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯।

৫. উল্লেখ করা হয়েছে মহাদেব চক্রবর্তীর 'আদিবাসী প্রশ্ন ও কতিপয় সমস্যাঃ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা' অনু. জিয়াউল হক বাবলু, প্রকাশিত হয়েছে *বিপন্ন ভূমিজ*, সম্পাদন – মেসবাহ কামাল, আরিফাতুল কিবরিয়া, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৯।

৬. এ নিয়ে বিতর্ক আছে বিস্তর। আদিবাসী বলে যারা ভারতে বিবেচিত তারা সবাই যে আর্যদের আগে এসেছে তা নয়। যেমন – নাগাল্যান্ডের নাগারা এসেছে আর্যদের পরে এবং মিজো জাতি তাদের বর্তমান ভূ-খণ্ডে বসতি গড়ে তোলে ষোড়শ শতাব্দীতে। (মহাদেব ২০০৯ : ২৯৪)

৭. ত্রিকোণ পৃথিবীর মূলে রয়েছে পৃথিবীকে নারী হিসেবে গ্রহণের ইতিবাচকতা। পৃথিবীকে ত্রিকোণ নারী লিঙ্গের প্রতিতুলনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিশীলতার ব্যাপারটিই প্রতীকায়িত হয়েছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে আলাপের এক পর্যায়ে মহাশ্বেতা দেবী বলেন, "আল্পনার পৃথিবী ত্রিকোণ। এই যে ত্রিকোণ পৃথিবী, সেই ত্রিকোণ পৃথিবীর মূলে আছে নারী লিঙ্গের পরিকল্পনা" (সমীরণ ১৯৯৭ : ১০৫)

৮. মূল গ্রন্থের শিরোনাম : *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর*। কিন্তু রচনাবলিতে ব্যবহৃত হয়েছে *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তির*, যদিও প্রচ্ছদের চিত্রে মূল গ্রন্থের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভে গ্রন্থ-নাম ও উদ্ধৃতি ব্যতীত সর্বত্র 'তির' বানানটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৯. 'সীগাল বুকস' থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কর্তৃক মহাশ্বেতা দেবী রচিত *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ *Chotti Munda and his arrow* গ্রন্থে এ সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবীর বলা কথাগুলো ছিল এই : Chotti is my best beloved book. (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৯)

১০. কৃপাশঙ্কর চৌবের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা বলেছেন, "১৯৬৫ সালেই আমার যাতায়াত শুরু হয়েছিল ম্যাকলুকিগঞ্জ আর পালামৌ। বছরে দু-বার তো যেতামই।"(কৃপাশঙ্কর ১৯৯৯ : ৫৩)

১১. মহাভারতের একলব্যের আখ্যানে তিরন্দাজিতে বনচারী একলব্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২. রথীন্দ্রনাথকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন (১৯৩০ সাল) "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদের সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে। উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে – জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ-সুবিধে সবকিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে – উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" (রাশিয়ার চিঠি-১, রবীন্দ্রনাথ ১৪০২/১০ : ৫৫৫)

১৩. 'সীগাল বুকস' থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কর্তৃক মহাশ্বেতা দেবী রচিত *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ *Chotti Munda and his arrow* গ্রন্থে এ সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবীর বলা কথাগুলো ছিল এই: আসলে বইটি যে কেবল দুদিক থেকেই অবাধ তা নয়, এটির কেন্দ্রেও এই মুক্তি আছে। (গায়ত্রী ১৪১৮ : ৩৭৯)

১৪. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (মহাশ্বেতা দেবীঃ অরণ্য, প্রকৃতি – কোরক, মহাশ্বেতা সংখ্যা, বইমেলা ১৯৯৩), ঊর্মি দাস (অগ্নিগর্ভ, কোরক, মহাশ্বেতা সংখ্যা, বইমেলা ১৯৯৩), ইরাবান বসুরায় (সত্তর দশকের বাংলা উপন্যাস, অনুষ্টুপ, বর্ষ ১৫, শারদীয় ১৩৮৭) তপোধীর ভট্টাচার্য, ('মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস ও জীবনভাষ্য, 'মানুষ মানুষের জন্য', উৎসব সংখ্যা, ১৯৮৩), অরূপকুমার দাস (ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য' শীর্ষক গবেষণাপত্রে 'গ্রামবাংলার গড়ন ও বসাইয়ের মহাবিশ্ব' পরিচ্ছেদে) সকলে *অপারেশন? বসাই টুডু*-কে উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অন্যদিকে গল্প হিসেবেও কিছু সমালোচক মত দিয়েছেন। তন্মধ্যে সোমা পাল (মহাশ্বেতা দেবী ও বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ১-২, বৈশাখ-আশ্বিন ১৪০৫), মৃন্ময় রায় (অগ্নিগর্ভ বাংলার গল্প, 'প্রস্তুতি পর্ব' সংস্কৃতি সাময়িকী, বৈশাখ ১৩৮৫) গল্প হিসেবেই অভিহিত করেছেন। মহাশ্বেতা নিজেও গ্রন্থের ভূমিকায় একে গল্প বলে অভিহিত করেছেন। অগ্নিগর্ভের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট বলেছেন, '*অপারেশন? বসাই টুডু* গল্পের কালী সাঁতরা সি.পি.এম. দলভুক্ত..' (মহাশ্বেতা ২০০৩ / ৮: ৩২৫) প্রকৃত পক্ষে 'অপারেশন? বসাই টুডু' রচনাকে গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা কিছুটা দুঃসাধ্য, কেননা জীবনের খণ্ডরূপ নয়, বরং জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনার সংযোগে অখণ্ড জীবনকে এ রচনায় সম্পূর্ণতা দেয়া গেছে বলেই আমার ধারণা, এ প্রসঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে; তিনি একে Novelette বলে অভিহিত করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমার গবেষণাপত্রে একে উপন্যাস হিসেবে নেয়া হয়েছে; যদিও 'অগ্নিগর্ভ' গল্পগ্রন্থ এবং এতে সংকলিত 'দ্রৌপদী', 'জল',' এম.ডব্ল্যু. বনাম লখিন্দ' অবশ্যই গল্প। এ প্রসঙ্গে ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে –

"এ কথা ঠিক যে মহাশ্বেতার ছোটগল্প বেশিরভাগ সময়েই এত বেশি সত্যি জীবনের প্রতিভূ হয়ে আসে যে ছোটগল্পের নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তাকে বাঁধা যায় না, কেননা মানুষের সত্যিকারের যাপিত জীবনকে কোনো সীমা-সংজ্ঞার মধ্যে, নির্দিষ্ট লক্ষণসমূহের মধ্যে সীমায়িত করা যায় না। যে জীবনকে তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আনতে চান, বস্তুতঃ সে জীবন দুঃখের প্রাচুর্যে এত ঋদ্ধ ও বিশাল যে সে জীবনকে কোনো শিল্পরূপের খাতিরেই ছাঁটকাট করা চলে না। (মহাশ্বেতা ২০০৩ / ৮: ৫৫১)

১৫. প্রথম প্রকাশ শারদীয় যুগান্তর ১৩৮৯ / ১৯৮২। *হুলমাহা* পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এটি ১৯৮৫খ্রি. প্রকাশিত *সিধুকানুর ডাকে* নামক দুটি কাহিনির সংকলনগ্রন্থের শিরোনামহীন প্রথম রচনা।

১৬. The name is persian, meaning the skirt of the hills, it was a Government estate in the district of Santal Parganas, extending over 1356 square miles and including portions of Rajmahal, Pakur, Godda and Dumka sub-division.

(O'Malley, *District Gazetteer, Santal Parganas*: 245)

১৭. Quoted in Macpherson - Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Santal Parganas, 1898-1907: 30.

১৮. Qouted from Judicial proceedings, Government of Bengal 4 oct.1855, No.27.

১৯. গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবীকে মেয়ে যোদ্ধাদের নিয়ে লিখতে বলেছিলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন ধানী মুণ্ডার স্মৃতিতে অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবীর মুণ্ডা বিদ্রোহের কাহিনিতে সেসম সাহসী মেয়েদের কথা নেই – যারা সত্যি সত্যি বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। একজন সাহিত্য-সমালোচক বা অনুবাদক হিসেবে নয়, একজন পাঠক হিসেবে গায়ত্রী অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাদের কথা লিখতে। (গায়ত্রী ১৪১৮: ৩৮৪-৮৫)

২০. ডিয়াং এক বিশেষ ধরনের মদ। ভাত পচিয়ে এ মদ প্রস্তুত করা হয়, যা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায়। এ মদ দেখতে অনেকটা আমানির মতো। কয়েকটা গাছের শিকড় কেটে ছোট ছোট সাদা কদমার ন্যায় তৈরি করা হয় এবং দু'একদিন

ভাত জলে ভিজিয়ে রেখে তার কয়েকটি পচা ভাতে মেশানো হয় এবং তার দুই তিন দিন পর তা ব্যবহারোপযোগী হয়। ডিয়াং বেশি খেলে মাতাল হতে হয় কিন্তু কম খেলে তা ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সহায়ক হয়। (গিরিবালা ২০০৫ : ১০৮)

২১. মূল ঘটনায় কিছু ভিন্নতা আছে। জানা যায় যে, ঐ এলাকার এম এল এ দেবেন্দ্র মাঝির উপস্থিতিতে পুলিশ গঙ্গারামের মৃতদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেছিল। প্রশ্ন ওঠে যে, এম এল এ সেখানে উপস্থিত ছিল কী গঙ্গারামের মৃতদেহ যাতে প্রথানুযায়ী সমাধিস্থ না করে দাহ করা হয়, তা নিশ্চিত করতে ? পরবর্তী সময়ে যেন মৃতদেহ সমাধি থেকে তুলে কোন প্রমাণ বিচার বিভাগের সম্মুখে উপস্থিত না করা যায়! (Victor 1990 : 1626)

২২. *জঙ্গল* উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ ঋতুপত্র গাঙ্গেয় পত্রিকায় ১৯৮৬ খ্রি.। এটি পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। লেখক কর্তৃক সংশোধিত পাঠ গৃহীত হয়েছে মহাশ্বেতা রচনাসমগ্রের ১৪ খণ্ডে জানুয়ারি ২০০৪-এ।

২৩. 'শুধু ইউক্যালিপটাস লাগিয়ে সর্বনাশ', যুগান্তর, ১৯৮৩; 'ইউক্যালিপটাস নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন', যুগান্তর, ১১.৮.১৯৮৩ ; 'বনবাসী কখনো বন নষ্ট করে না', যুগান্তর, ১০.১২.১৯৮৩ ; প্রভৃতি প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে তাঁর জোরালো বক্তব্য রেখেছেন।

২৪. Pterodactylus means `winged finger'. Ptero means finger ; `dactyl' means wing. Pterodactylus is a genus of Pterosaurs, whose members are popularly known as Pterodactyls. It is currenly thought to contain only a single, species, Pterodactylus antiquus, the first Pterosaur species to be named and identified as a flying reptile.

The fossil remains of this species have been found primarily in the Solnhofen limestone of Bavaria, Germany, dated to the late Jurassic period (early Tithonian) about 150.8 - 148.5 million years age, though more fragmentary remains have been tentatively identified from else where in Europe and in Africa.

It was a carnivore and probably preyed upon fish and other small animals. Like all Pterosaurs, Pterodactylus had wings formed by a skin and muscle membrane stretching from its elongated fourth finger to its hind limbs.

(http:// en, wikipedia.org/wiki/ Pterodactylus)

২৫. সিগাল বুক্‌স-এর পক্ষ থেকে নবীন কিশোর ২০০২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে নানা বিষয়ে কথা বলেন। ইংরেজি ভাষায় এই কথোপকথনটি ২০০৩ সালে সিগাল বুক্‌স্ কর্তৃক Mahasweta Devi - The Selected Works গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। গল্পসরণি, ষোড়শ বর্ষ, বার্ষিক সংকলন ১৪১৮, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যায় সাক্ষাৎকারটি বাংলায় অনূদিত করে প্রকাশ করা হয়। এ কথোপকথনের এক পর্যায়ে মহাশ্বেতা দেবী বলেন –

'টেরোড্যাটিল.....'-এ আমি প্রাচীন গুহাচিত্রের কথা লিখেছি। ১৯৯৮-এ যখন সেখানে গিয়েছিলাম, ওরা আমাকে তেজগড়ে নিয়ে যায়। ওটা ভীল উপজাতিদের এলাকা। দূরে একটা উঁচু পাহাড় ছিল। আমাকে বলেছিল ওখানে

আদিবাসীদের আঁকা ছবিতে পূর্ণ দুটি গুহা আছে। ভোপাল থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে কার্বন পরীক্ষা করে দেখেছেন সেগুলি ৮০০০ বছর আগের আঁকা। আদিবাসীদের আঁকা ঘোড়ার ছবি। শুনে আমি একটা পাথরের উপরে বসে পড়েছিলাম। 'কি হল?' – ওরা জিজ্ঞেস করেছিল। ঠিক এই জিনিসই আমি ১৯৯৬-এ 'টেরোড্যাকটিল....' এ লিখেছিলাম।

২৬. *প্রথম আলো* পত্রিকায় ১০ জানুয়ারি ২০১৪ প্রকাশিত বদরুন নাহারকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা বলেছেন, "টেরোড্যাকটিল হচ্ছে একটা সময়। সে সময় যুক্ত হয়ে গেছে অতীত থেকে বর্তমানে। পূরণসহায় ও পিরথা, পিরথা নামটা পৃথিবীর সমান।"

২৭. 'সাহিত্যের লক্ষ্য ও মহাশ্বেতা দেবী' শীর্ষক নিবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন। নিবন্ধটি সুবর্ণ সংখ্যা, প্রমা ১৯৯১ এ প্রকাশিত। তবে মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র-১৫,পৃ.৫৭২ থেকে উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হয়েছে।

২৮. সমাজবিজ্ঞানীগণ সম্প্রদায়ে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক পাঠে সিমবায়োসিস পদটিকে কাজে লাগান। এভাবে পদটি Plant Ecology থেকে Human Ecology- তে অনুপ্রবেশ করেছে (মুহাম্মদ হাবিবুর ১৯৯৪ : ৪১)

পঞ্চম অধ্যায়

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী জীবন

৫.১

বিন্দুর মাঝে সিন্ধুদর্শনের অভিপ্রায়ে রচিত বাংলা ছোটগল্প উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বর্তমানে একুশ শতকের প্রথমভাগেও নিরবিচ্ছিন্ন বহতায় বেগবান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচর্যায় যে ছোটগল্প বিকশিত হয়েছিল পূর্ণমাত্রায়, পরবর্তী সময়ে কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতির যুগে তা সমাজ-রাজনীতির অভিসঙ্গে লাভ করেছিল নতুন তাৎপর্য। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬- ১৯৫৭), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০১-১৯৭৬) প্রমুখের গল্পে কয়লাকুঠি, বস্তি, ফুটপাত, গ্রাম-বাংলার অবজ্ঞাত জনতার জীবন প্রতিভাসিত হয়েছে। তবে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা নিম্নবিত্তের জগৎ-জীবনকে দেখেছেন মধ্যবিত্তসুলভ আবেগীয় দৃষ্টিতে। পরবর্তী সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় মাটি-মানুষের অন্বেষণ করেছেন এবং ছোটগল্পের শিল্পিতভুবনে প্রান্তিক মানুষকে স্থান দিয়েছেন অপার মমতায়। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে অরণ্যচারী মানুষের পদচারণা প্রথম দৃশ্যমান হয় ; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই ঘরানার লেখক। মার্কসবাদী লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছেন এবং তাদের জীবনকে তাঁর ছোটগল্পের আধেয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

জগদীশ গুপ্ত, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু এবং পরবর্তী সময়ের প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায় বাংলা ছোটগল্পে নতুন বাঁক এনেছেন। প্রান্তিক মানুষের জীবন এবং মনোজগতকে গল্পের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা ছোটগল্পে আধুনিকতাকে নিয়ে আসেন তাঁরা। এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যসাহিত্যে কুলি-কামিন, জনমজুর, ভাগচাষি কিংবা সর্বহারা মানুষের জীবনবৃত্তে প্রবেশ করে। প্রতিনিয়তই গল্প নেয় নতুন বাঁক ; 'কালিকলম' এবং 'কল্লোল'-র সময়কে ছাড়িয়ে জন্ম নেয় আর একটা নতুন সময়। এই নতুন সময়ের কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী – রূঢ় জীবন ও জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে উপাদান করে তিনি শতাধিক[১] ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে অন্ত্যজ জীবন, বিশেষত আদিবাসী জীবন-কথা। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত না হলেও অথবা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না থাকলেও আবাল্য তাঁর পারিবারিক পরিবেশ, তাঁর বাবা মণীশ ঘটক, কাকা ঋত্বিক ঘটক, পরিণয়-পরবর্তী জীবনে স্বামী বিজন ভট্টাচার্যের সান্নিধ্য তাকে রাজনীতি-

সচেতন করে তুলেছিল নিঃসন্দেহে। বিপন্ন মানবতার প্রতি, মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাকে সমাজতন্ত্রের শ্রেণি বিভাজনহীনতার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, তাঁর বিভিন্ন রচনায় তার প্রমাণ মেলে। আদিবাসী গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে শ্রেণি-বিভাজনহীনতা, তাদের সরল আড়ম্বরহীন পরিশ্রমী জীবন মহাশ্বেতাকে প্রবলভাবেই আকর্ষণ করেছিল ; তাছাড়া ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন আদিবাসী জাতির সংগ্রামমুখর লড়াকু জীবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তিনি। মূলত, গোষ্ঠীজীবন এবং ইতিহাসপ্রিয়তা – এ দ্বিবিধ প্রবণতার প্রাবল্যে আদিবাসী জীবন অধিকার করেছে মহাশ্বেতা মানসকে এবং ভারতীয় আদিবাসী জীবনকে অত্যন্ত সততার সঙ্গে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

৫.১.১

উনিশ ও বিশ শতক মূলত বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক প্রাবল্যের যুগ – এ সময়ে নিম্নবর্গীয় জীবনও প্রধানত রোমান্টিক বাস্তবতায় পর্যবসিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। মহাশ্বেতা রোমান্টিক বাস্তবতার অনুসারী ছিলেন না, তা নয় – পেশাদারিত্বের প্রয়োজনে এ ধারায় তিনি বহু গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু প্রাণের তাগিদে যখন তিনি কলম ধরেছেন, বিষয় করেছেন আদিবাসী এবং অস্পৃশ্য জীবন, তখন রোমান্টিকতা নয় বরং সংগ্রামশীলতাকেই বেছে নিয়েছেন। অত্যন্ত সাহসী এ লেখক সামাজিক দায়বোধে তাড়িত হয়ে অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের সমস্যা-সংকটের সমাধান চান সকল মানুষের বিবেকবোধকে জাগিয়ে, তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এ লক্ষ্যে তিনি তীব্র, তীক্ষ্ণ ভাষার অব্যর্থ তীরন্দাজিতে সচেতন মানুষের মননকে লক্ষ্য করে তাদের জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন আজীবন।

গল্প-উপন্যাসের লেখক মহাশ্বেতার নবজন্ম ঘটে ষাটের দশকের শেষপর্বে। ঐ সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সমাজতান্ত্রিকদের একাংশ ও সাধারণ নিপীড়িত মানুষের যৌথ বিপ্লব ঘটে গ্রাম-জনপদে ; তাতে বিপর্যস্ত হয় সমগ্র রাজ্যের প্রশাসন ও গ্রামীণ মহাজন শ্রেণি। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন লেখক সমাজও এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়েছেন সর্বাধিক – প্রতিষ্ঠিত একজন লেখক হিসেবে মহাশ্বেতা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছেন নিজেকে এবং প্রথাবিরোধী বিপ্লবী বা নকশালদের প্রতি সহমর্মিতার বন্ধন অনুভব করেছেন। অথচ সর্বোচ্চ প্রশাসনও তখন নকশালদের নির্মূল করার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন (আগস্ট, ১৯৭০) : They (Naxalites) would be fought to the finish. (রামকুমার, ২০০০ : ৪-৮)[২] আইনের ঊর্ধ্বে পুলিশ বাহিনীকে স্থান দিয়ে প্রশাসন নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে নকশাল বিদ্রোহ দমন

করেছিল, মানবতাবাদী লেখক হিসেবে মহাশ্বেতা তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছেন তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায়।

মূলত ১৯৭৮-এ প্রকাশিত *অগ্নিগর্ভ* নামক গল্প-উপন্যাস সংকলনে প্রথম আদিবাসী জীবন নিয়ে মহাশ্বেতার গল্প পাওয়া যায় এবং যেন অবশ্যম্ভাবীভাবে তা হয় নকশাল আদিবাসী জীবনের বিদ্রোহকেন্দ্রিক।

৫.১.২

মহাশ্বেতার আদিবাসী জীবনভিত্তিক ছোটগল্পে ঘুরে-ফিরে কয়েকটি বিষয়ই অবলম্বিত হয়েছে। আদিবাসী নারী নিপীড়ন, ক্রীতদাস বা কামিয়া প্রথার অমানবিকতা, খেতমজুর ও মহাজনের সাংঘর্ষিক সম্পর্ক, নকশাল আন্দোলন, আদিবাসী জীবনে শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম – এসব ঘুরে ফিরে বিষয় হিসেবে অবলম্বিত হয়েছে তাঁর গল্পে। তবে বিষয়কে ভিত্তি করে তাঁর আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক গল্পগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভাজন করা সম্ভব হয় না। কেননা তার একই গল্পের আখ্যানে একাধিক বিষয় মুখ্য হয়ে এসেছে। যেমন – 'দ্রৌপদী' গল্পটি নারীচরিত্র প্রধান, নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে গল্পটির কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে এবং একই সঙ্গে আদিবাসীদের জীবনের নানা বঞ্চনা ও সংস্কার এবং গৌরবের প্রান্ত কাহিনি-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বিভাজন সম্ভব নয় বলে সাধারণভাবে কাছাকাছি বিষয়ের গল্পগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচিত হল।

৫.২.১

আদিবাসী জীবনভিত্তিক মহাশ্বেতার উপন্যাস কখনও নারীচরিত্র প্রধান হয়ে ওঠেনি। একজন লেখক হিসেবে মহাশ্বেতা বরাবরই নারীসুলভ প্রবণতাগুলোকে এড়িয়ে চলেছেন সচেতনভাবে। তাঁর লেখার বিষয় তাই কেবল নারী জীবনের দুর্ভোগের কথকতা হয়ে ওঠেনি তেমনভাবে কখনওই। অবশ্য তাঁর প্রথম রচনা নারীজীবনকেন্দ্রিক – *ঝাঁসির রানী*, কিন্তু এ রানী কেবল একজন নারী নন, স্বাধীনতাকামী এক বিদ্রোহী শাসক, অস্ত্র হাতে যিনি পুরুষের পাশে থেকে পুরুষের মতোই যুদ্ধ করেছেন। ইতিহাসসচেতন মহাশ্বেতা তাঁর রচনায় রানীর সে পরিচয়ই মুখ্য করেছেন – তাঁর নারী-জীবন নয়। পরবর্তীকালে আদিবাসী বিদ্রোহের এবং সামগ্রিকভাবে আদিবাসী জীবন প্রাধান্য পেয়েছে, বিশেষ করে আদিবাসী নারীর কথা কোথাও উচ্চকিত হয়নি। সত্তরের দশকের শেষপর্বে 'দ্রৌপদী' (১৯৭৭) রচনার মধ্য দিয়ে তিনি এক

অবিস্মরণীয় আদিবাসী নকশাল নারীচরিত্র গড়ে তোলেন – সমগ্র বাংলা সাহিত্য তার জুড়ি খুব বেশি নেই। নারীর চিরন্তন দুর্বলতা নগ্নতাকে তিনি শক্তি হিসেবে, বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এ গল্পে। কী বিষয়বিন্যাসে, কী ভাষার সূক্ষ্ম-বয়নে, কী এক্সপ্রেশনে – 'দ্রৌপদী' সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

নকশাল সহযোগী দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলন মাঝি একটি আন্দোলন প্রতিরোধের জ্বলন্ত সময়ের প্রতীক হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার গল্পে। সেনানায়ক ও তার সহযোগীকৃত ধৃত এবং সমস্ত রাত ধর্ষিত হয়ে সকালে রক্তাক্ত নগ্ন দেহে দ্রৌপদী যখন প্রৌঢ় রণকুশলী সেনানায়কের সামনে এসে দাঁড়ায় প্রখর সূর্যালোকে, তখন সভ্যতার সমস্ত কাঠামো যেন ধসে পড়ে। উপস্থিত সকলকে পুরুষ বলে অস্বীকার করে সে 'হেতা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১৮) এবং দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকলে 'এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১৮)। নকশাল আন্দোলন, প্রশাসনের অত্যাচারের পাশবিকতা এবং এক প্রতীকায়িত সমাপ্তিতে সত্তরের জ্বলন্ত সময়কে শিল্পরূপ দেয়া হয়েছে এ গল্পে। গল্পের সমাপ্তিতে নগ্নতার সামাজিকতাকে দীর্ণ করে নারীশক্তির উন্মেষকে প্রতীকায়িত করেছেন মহাশ্বেতা। 'দ্রৌপদী' নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ; সাঁওতাল সমাজে নামটি অপ্রচলিত – কেননা আদিবাসীদের যৌথজীবনে ব্যক্তিনাম মুখ্য নয় – তাই তারা সন্তানদের নামকরণ করে যেন তেন ভাবে – অধিকাংশ ক্ষেত্রে বারের নামানুসারে। নামকরণের তথ্য গল্পকার প্রথমেই জানিয়ে দেন এ গল্পে। তথাকথিত উচ্চবর্গীয় জোতদার সূর্য সাহুর বউ দ্রৌপদীর নামকরণ করেছিল ; জন্মদানের সময় তার মা এ বাড়িতে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিল – তাই নামকরণের মতো বিষয়টিও ফয়সালা করেছে মালিকপক্ষ। আর্যসভ্যতার বা সনাতন ধর্মের এক পুরাণাশ্রিত নামকরণের মাধ্যমে নারীশক্তির উদ্বোধনই ঘোষিত হয়েছে। পুরাণের দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের লজ্জাকে প্রতিহত করতে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার বস্ত্রহরণ করা যায়নি। এ গল্পের দ্রৌপদী ধর্ষিত হয়ে বস্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে – নগ্নতাকে সে লজ্জাকর মনে করেনি বরং প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে – এ যেন হাজার বছরের ভীত, লজ্জিত নারী অস্তিত্বের উজ্জ্বল মুক্তি। সরব না হলেও কালো দেহের নগ্ন রক্তাক্ত দ্রৌপদী কী নীরবে ভারতীয় ঐতিহ্যের শক্তির প্রতিভূ মা কালীর সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করে না ? শক্তির এই মহাউত্থানের নির্ঘোষ জয়ধ্বনিতে যেন মুখরিত হয় গল্পের সমাপ্তি। অবশ্য মহাশ্বেতা নারীবাদী লেখকের খোলস কখনও গ্রহণ করেননি, সুতরাং সচেতনভাবে তিনি নারীশক্তির জয়ধ্বনি উচ্চকিত করেছেন – সে-ভাবনাকে বরং প্রসারিত করা যায় এ ভাবনায় যে, নগ্ন দ্রৌপদী এখানে নিরন্ন জনগণের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এবং নিরন্ন মানুষের সম্মিলিত অকুতোভয় অগ্রসরে অত্যাচারী শোষক শ্রেণির প্রশাসনের বুক কেঁপে ওঠেছে ভয়ে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'দ্রৌপদী' গল্পের তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য। তবুও এতসব তাৎপর্য ও ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গত

মিলিয়ে এ গল্পে আদিবাসী সাঁওতাল জীবনের কিছু আপাত বিচ্ছিন্ন সূত্র রয়েছে, একত্রে যেগুলো আদিবাসী জীবনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে।

দ্রৌপদী নামকরণে সাঁওতাল সমাজে ব্যক্তি নামকরণের গৌণতার বিষয়টি ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। বস্তুত যৌথ জীবনে ব্যক্তি গৌণ, সুতরাং তার নামও গৌণ – এ কথা সত্য, তেমনি শ্রেণিবিভক্ত সমাজের তলদেশে যাদের অবস্থান, কোনো রকমে বেঁচে থাকাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য – তাদের জীবনে নামকরণের বৈচিত্র্য বিলাসিতা মাত্র। নিম্নবর্গীয় জীবনে নারীর নামকরণ হয় পুরুষের পরিচয়ে। কারো মেয়ে, বউ কিংবা মা – এ তিন পরিচয়ে পরিচিত হয় তারা। আদিবাসী জীবনের কোনো কোনো গোষ্ঠী মাতৃপ্রধান (গারো), সাঁওতাল সমাজ তা নয়। তবে সাঁওতাল কিংবা অন্য কোনো পিতৃপ্রধান আদিবাসী গোষ্ঠীতেও নারীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকে। নারীর প্রতি সম্মান বা সমীহ কার্যকর থাকে প্রায় সব আদিবাসী জীবনে। আদিবাসী জীবনের নারীরা কেবল গৃহকোণে বন্দি নয়, পুরুষের পাশাপাশি জীবন-যুদ্ধে তারাও লড়ে ; ক্ষুধার অন্ন যোগাতে, সংসার গড়ে তুলতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। এ গল্পে তবুও দ্রৌপদীর সমান্তরালে কোনো নারীচরিত্র পাওয়া যায় না। তার সহযোগী একটি মাত্র চরিত্র মুসাই টুডুর বউ – যার নিজস্ব নাম উল্লেখিত নেই। দ্রৌপদীর ছদ্মনাম উপী – গতানুগতিক সাঁওতালি নাম। তার স্বামী দুলন এবং অন্যান্য পুরুষ নাম – বুধাই, সোমাইয়ের নামও গতানুগতিক। মূলত বারের নামানুসারে আদিবাসীদের নামকরণ হয়, যেমন – বুধবারে জন্ম হলে বুধনা, সোমবারে হলে সোমাই। দ্রৌপদী নামকরণের ব্যতিক্রমতা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যৌথজীবনের বৈশিষ্ট্যকে পাঠকের দৃষ্টিগোচরে আনে। নামকরণ একটি সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণিগত অবস্থান, সে-সমাজের মানস-গঠন এবং বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে থাকে। সাঁওতাল সমাজের কৌম বা গোষ্ঠীপ্রধান জীবন, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা এবং শ্রেণিগত অবস্থানকে নির্দেশ করে গল্পকার দ্রৌপদী নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

গল্পের মূল ঘটনা বর্ণনার ফাঁকফোকরে আদিবাসী সমাজের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কেও গ্রথিত করেছেন মহাশ্বেতা সুকৌশলে। অপারেশন বাকুলির পরবর্তী সময়ে আত্মগোপনকারী দুলন ও দ্রৌপদীর অবস্থানকে নির্দেশ করে গল্পকার 'নিয়ানডারথাল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অভিধানিক অর্থ 'আদিম' – নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এ শব্দটি আদিম মানুষ বা মানুষের পূর্বপুরুষকে বোঝায়। উনিশ শতকে জার্মানির দুসেল (Dussel) নদীর নিয়েনডার (Neander) উপত্যকায় এ প্রজাতির মানুষের ফসিল প্রথম পাওয়া যায় বলে উৎপত্তিস্থলের নামানুসারে এ নামকরণ হয়। লক্ষ লক্ষ বছর আগে এ আদিম মানুষের অস্তিত্বের বিদ্যমানতার প্রমাণ দাখিল করেছেন নৃতাত্ত্বিকেরা এ ফসিলের মাধ্যমে। এ শব্দের ব্যবহারে মহাশ্বেতা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রাচীনত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন –

> দুলন্ ও দোপ্দী দীর্ঘদিন নিয়ানডারথাল অন্ধকারে নিখোঁজ থাকে এবং বিশেষ বাহিনী সে অন্ধকারে সশস্ত্র সন্ধানে বিদ্ধ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু দাওয়ালী সাঁওতাল সাঁওতালনীকে তাদের অনিচ্ছায় সিংবোঙার কাছে যেতে বাধ্য করে (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১০)।

উদ্ধৃতাংশের আরেকটি শব্দে আদিবাসী বিশেষত মুণ্ডাগোত্রীয়দের (সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল) সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ভাবনার প্রকাশ আছে। সাঁওতাল সমাজ-ভাবনায় 'সিংবোঙা' তাদের সৃষ্টিকর্তা। তাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন পুরাণ-গল্পে সিংবোঙা এবং তাঁর সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কিত নানা কথা প্রচলিত আছে – এ গল্পে অবশ্য তা বিস্তৃত হয়নি, কেবল 'সিংবোঙা' এই একটি শব্দে তাদের ধর্ম-দর্শনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। একই অনুচ্ছেদে সাঁওতাল গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক আরও একটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে ; পুলিশের ও আর্মির বিশেষ বাহিনী দুলন ও দ্রৌপদীভ্রমে বেশ কিছু সাঁওতাল দম্পতিকে হত্যা করে কেননা তাদের চোখে সকল সাঁওতাল এবং মুণ্ডা গোষ্ঠীর সন্তানের চেহারা এক মনে হয়। বস্তুত, অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুণ্ডা গোষ্ঠীর অবয়বগত সাদৃশ্য[৩] বিশেষ বাহিনীকে বিভ্রান্ত করে।

আদিবাসীরা নিজস্ব গোত্রের শুদ্ধতা নিয়ে গর্ব করলেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে বহিরাগতদের আক্রমণে কিংবা যুদ্ধকালীন সময়ে বিদেশি সৈন্যদের দ্বারা সাঁওতাল রমণী ধর্ষিত হলে কিছু মিশ্ররক্তের সন্তান জন্মায়। সাঁওতালরা তাদের সমাজে নিতে পারে না, আবার সাঁওতাল রমণীর প্রতি সহমর্মিতাবশত তাদের ফেলেও দিতে পারে না। তবে এ সন্তানেরা অনেক সময় শুদ্ধ রক্তের ঐতিহ্য ও গর্বে আঘাত হানে। সাঁওতালদের জীবনে বেঈমানী বা বিশ্বাসঘাতকতার কোনো স্পর্শ নেই। দীর্ঘদিনের যাত্রাপথে নানা বিধি-নিষেধের বৃত্তে সাঁওতালরা আজও তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেছে – এটি তাদের পরম গর্বের বিষয়। অন্য সব জাতির মতো সাঁওতাল বা অন্যান্য গোষ্ঠীও একসময় অন্য কোনো স্থান থেকে এসে এ ভারতভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রাচীন ভূমির নাম চম্পাদেশ – নানা গল্প-গাথায় সে-ভূমি থেকে বর্তমান ভূমিতে তাদের অবস্থানের ইতিহাস, নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কার নিয়ে গঠিত সাঁওতাল-জীবন। দ্রৌপদীর ভাবনায় তার বিচ্ছুরণ ঘটে –

> দোপ্দির রক্ত চম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত, নির্ভেজাল। চম্পা থেকে বাকুলি, কত লক্ষ চাঁদের উদয়াস্তের পথ। রক্তে ভেজাল মিশতে পারত, দোপদির পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব হল। তারা কালো কুঁচের কুচিলায় মেয়েদের রক্ত পাহারা দিত। সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়নডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুওআর্ডস রাঢ়ভূমি। নইলে কাক যদি বা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামি করে না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১৬)

ভীষণ নির্মম দৃপ্ত এ উচ্চারণ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দৃঢ়তা, ঐতিহ্য ও সংস্কারপ্রিতা এবং নিজ পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যে গর্বের সুরকে বহন করে।

জন্মযোদ্ধা তারা। নিরক্ষর তবে শিক্ষাহীন নয়। 'দুলনা ও দোপদি নিরক্ষর বলে অস্ত্র অভ্যাস করছে জন্ম পরম্পরায়' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১১)। অসীম সাহস ও অকুতোভয় হুংকারে নিজস্ব অস্ত্র টাঙি-হেঁসো-তির-ধনুক ইত্যাদিতে একসময় যেমন ইংরেজ বাহিনীকে সন্ত্রস্ত রেখেছিল, তেমনি নিজেদের অধিকার আদায়ে স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রের প্রশাসনের বিরুদ্ধেও তারা যুদ্ধে নামে ; কখনও স্বতন্ত্রভাবে এবং সত্তরের দশকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নকশাল সহযোগী হিসেবে। যুদ্ধকালেও নিজস্ব অস্ত্রের মতো, নিজস্ব কৌশল, রীতি-নীতি তারা অবলম্বন করে। শত্রুপক্ষের হামলার মোকাবিলায় সাইরেন চিৎকারে অগ্রবর্তী দল 'কুলকুলি' দেয়, যা শত্রুপক্ষকে যেমন হতচকিত করে তোলে, তেমনি নিজেদের পশ্চাৎ দলকে সতর্ক করে দেয়। শিকারজীবী সাঁওতালরা চিরকাল শিকার শেষে নিহত পশুকে ঘিরে নাচ-গান ও উল্লাস করেছে। শত্রু যখন মানুষ, তখনও তার ব্যত্যয় হয়নি, নিহতদের ঘিরে উল্লাস সংগীত গেয়েছে তাঁরা সাঁওতালী ভাষায় –

সামারে হিজুলেনাকো মার্ গোয়েকোপে

এবং

হেন্দে রাম্‌ব্রা কেচে কেচে
পুনডি রামব্রা কেচে কেচে।' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১১)

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুলনা মাঝি 'মা-হো' বলে যে হাঁক দেয়, তার অর্থ হফম্যান জেফার, গোলডেন পামার প্রমুখ সাঁওতালী ভাষার বিশেষজ্ঞদের অভিধানে পাওয়া যায় না। জীবনঘনিষ্ঠ সে-শব্দের তাৎপর্য জানায় সেনাক্যাম্পের জলবাহী সাঁওতাল চমরু। সে জানায় – এটি লড়াইয়ের ডাক ; এ ডাকের একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসও আছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গাঁধীরাজা তথা গান্ধী-সেনা হিসেবে মালদহের সাঁওতালরা এ হুংকার ব্যবহার করেছিল[৪]। এ প্রসঙ্গটি দ্বিবিধ তাৎপর্যমণ্ডিত – একদিকে এটি স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসীদের অংশগ্রহণকে স্মরণ করিয়ে দেয়, অন্যদিকে জানিয়ে দেয়, যে স্বাধীনতার জন্য তারা যুদ্ধ করেছিল, সে-স্বাধীন দেশে নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তারা আবার স্বাধীন দেশের প্রশাসনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে – অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের সুফল অন্তত তারা ভোগ করছে না।

ছোটগল্পের স্বল্প-পরিসরে 'দ্রৌপদী' গল্পে আদিবাসী জীবনের বঞ্চনার ইতিবৃত্তও সামান্য এসেছে – নতুবা কেন তারা আজ প্রশাসনের শত্রু ; সে হিসাব মেলানো যেত না। জোতদার-মহাজনের কৃপায় এ ভূমের আদিম অধিবাসীরা আজ ভূমিহীন, জোতদারের জমির দাওয়াল। নিরন্ন এ মানুষগুলো খরার সময় জল পর্যন্ত পায় না। সরকারি সব কুয়া তৈরি হয় ক্ষমতাবানদের ভূমিতে। বাকুলির সূর্য সাউ প্রশাসনের যোগসাজসে দু'বছরে তার নিজের বাড়িতে দু'টো টিউবয়েল বসায়, কুয়ো খোঁড়ায় তিনটে, কিন্তু খরার সময় জলসেচ করতে দেয় না তার নিজ শস্যের জমিতে। কেননা সেচ পেলে ফসল ভাল হবে, তাতে

অর্ধেক ধান আধিয়ার নেবে। ধান বেশি হলে আধিয়ার তথা ক্ষেতমজুরদের ঘরে খাবার থাকবে – ফলে মহাজনের কাছে ধার করে ক্রীতদাসে পরিণত হবে না। সূর্য সাউয়ের সহজ হিসাব – 'উনো ধানে সবাই বশ' (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৪১৫)।

নিম্নবর্গকে আরও নিম্নে নামিয়ে চিরকাল তাদের উপর প্রভূত্ব করার বাসনায় যুগ যুগ ধরে এ ধরনের নিপীড়নকে সঙ্গী করেছে নিরন্ন খেতমজুর আদিবাসী। তাই নকশালদের হামলায় যখন সূর্য সাউয়ের পতন ঘটে – সূর্য সাউয়ের হত্যার প্রথম দাবীদার দাঁড়ায় দুলন ; কেননা সামান্য ধার শুধতে না পেরে দুলনের বাবা সমগ্র জীবন সূর্য সাউয়ের কাছে বেগারী দিয়েছে। বস্তুত নকশাল আন্দোলন বা আন্দোলনকারীদের প্রতি মহাশ্বেতা দেবীর নৈতিক সমর্থন ছিল বটে কিন্তু তিনি এ বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন যে, আদিবাসীর প্রতি বঞ্চনা-শোষণের মাত্রা অসহনীয় ছিল বলেই 'সিস্টেম' পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে আদিবাসীরা নকশালবাদকে গ্রহণ করেছে – কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব বা নীতির অনুগামী হয়ে নয়।

অনার্য দেবী কালীর প্রটোটাইপ আরোপ করে অনার্য সাঁওতাল রমণী দ্রৌপদীর মাধ্যমে মহাশ্বেতা নগ্নতার সামাজিক সমীকরণকে দীর্ণ করে নারী শক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছেন এ গল্পে। তবে দ্রৌপদী চরিত্রে নারীত্বের চেয়েও আদিবাসী বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী এবং আদিবাসী-জীবনের বিবিধ বৈশিষ্ট্যে বলীয়ান 'দ্রৌপদী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য।

৫.২.২

ইটের পরে ইট (১৯৮২) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত চারটি গল্প যথাক্রমে 'এজাহার', 'শনিচরী', 'রাজাবাসার রূপকথা', 'ইটের পর ইট' – প্রতিটি গল্পই নারী চরিত্রকেন্দ্রিক এবং প্রতিটি গল্পেই মূলত নারী নির্যাতনের ইতিবৃত্ত ধারণ করা হয়েছে। আদিবাসী-হরিজন সমাজের মানুষেরা প্রথাগতভাবেই উচ্চশ্রেণির দ্বারা শোষিত হয় যুগের পর যুগ। তাদের মেয়েরা নিগৃহীত হয় দু'ভাবে – এক শ্রেণিগতভাবে, দুই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী হিসেবে। সুতরাং নিম্নশ্রেণির এ নারীদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে মহাশ্বেতা যে গল্পগুলো লিখেছেন সেগুলো কেবল নারী নির্যাতন নয়, শ্রেণি নির্যাতনেরও প্রত্যক্ষ দলিলরূপে বিবেচিত হতে পারে। 'এজাহার' তেমনি একটি গল্প। নকশালকর্মী দ্রৌপদীর পর ক্রান্তিদল ফৌজের কর্মী মুসাম্মিন দুসাদীনের উপর প্রশাসনযন্ত্রের পাশবিক নির্যাতনের এক প্রত্যক্ষ দলিল এ গল্প। অনেকটা স্যাটায়ারের ভঙ্গিতে রচিত এ গল্পের সমাপ্তিতে মূল পট উন্মোচিত হয়েছে। ধর্মভীরু দারোগা চতুর্বেদীর তথা সমগ্র প্রশাসনের নির্লজ্জ স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে গল্প-অন্তে। নারী নির্যাতন যে শোষক শ্রেণির দমন নীতির এক

প্যাটার্ন, শ্রেণি নির্যাতনের অঙ্গ, লেখক সুকৌশলে তা আমাদের জানান এবং আরও জানান ধর্ষিতা নারীর আরও বিপদ ঘটে যে থানায়, তার কথা। ধর্ষিতা নারী দ্বিতীয় দফায় গণধর্ষণের শিকার হয় থানায়; এজাহার নেয়ার আরেক নাম যে, নারী নির্যাতন সে সত্যটি উদঘাটন করেন লেখক কিছুটা তির্যক ভঙ্গিতে, কিছুটা কৌতুকময় ভাষায়। সমাপ্তিতে এ গল্পের সঙ্গে মোঁপাসার (১৮৫০-১৮৯৩) 'নেকলেস' (১৮৮৪) গল্পের সাদৃশ্য আছে ; উভয় গল্পের অন্তিমে অপ্রত্যাশিত সত্য উদঘাটনের আকস্মিকতা বিমূঢ় করে পাঠককে।

'এজাহার' গল্পের চুম্বক চরিত্র মুসাম্মিন দুসাদীন আদিবাসী নয়, দুসাদ বর্গভুক্ত। তবে মহাশ্বেতা পূর্বাপর হরিজন ও আদিবাসীদের অবস্থানকে একাকার করে উপস্থাপন করেছেন এবং এ গল্পেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দুসাদ, গঞ্জু, ধোবি, রবিদাস, ঘাসি, পারহাইয়া, নাগেসিয়া – এদের তিনি একই পর্যায়ভুক্ত করে একত্রে উপস্থাপন করেছেন। রাজপুত প্রতাপ সিং তার বেঠবেগার কামিয়াদের চিড়মা কয়লা খনিতে নিয়ে গিয়ে কাজ করায় এবং শ্রমিক যেহেতু তার কামিয়া বেঠবেগার অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ক্রীতদাস, সেহেতু শ্রমিকদের মজুরি না দিয়ে তা জমা করে অসংগতরকম ধনী হয়ে ওঠে সে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদে এক রাতদুপুরে বালি নাগেসিয়া প্রতাপকে হত্যা করে দেশান্তরী হয়। তখন হরিজন ও আদিবাসী সকলের ঘরে 'বালি' নাম রাখার ধুম পড়ে যায়। এ বর্ণনায় লেখক আদিবাসী ও হরিজনদের যৌথ জীবনকে ইঙ্গিত করেছেন। আবার সিংদের কামিয়াদের বিবরণে বলছেন – 'ওদের গ্রামপঞ্চকে অনেক কামিয়া। দুসাদ, গঞ্জু, রবিদাস, ওঁরাও ঔর নাগেসিয়া, ঘাসি'(মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৬১)। শ্রেণিগত অবস্থান তাদের একীভূত করলেও বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে কিছু ভিন্নতা আছে, আর সে ভিন্নতাকে সন্তর্পণে গল্পের পরিসরে নির্দেশ করেছেন মহাশ্বেতা। পার্টির মদদধারী মাস্তান গণেশ সিং সরকার কর্তৃক খেতাবপ্রাপ্ত হয়, যখন সে চিড়মা খাদানে 'নকসাল মদতদার' সোর উঠিয়ে তিরিশজন আদিবাসী কুলিকে মেরে ফেলে। হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে সে সগর্বে মন্তব্য করে –

> আর মজুরির লড়াইও উঠাবে না, আর ফুল পরেও নাচবে না। সব বদমাশি খতম। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৬১)

দানবসদৃশ গণেশের এ আস্ফালনে ফুল পরে নাচা আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি এবং সে সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টার চিহ্ন ধরা পড়ে এ গল্পে। আদিবাসী জীবনের কৌমিয়তি, বেঠবেগারি, মজুরির লড়াইয়ের উল্লেখ মহাশ্বেতা তাঁর প্রায় সব গল্প উপন্যাসেই অল্প-বিস্তর করেছেন। এ গল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। এছাড়াও আদিবাসী জীবনের আরেক বঞ্চনার প্রান্তকেও সামান্য বিস্তারে ধারণ করা হয়েছে এ গল্পে ; তবে তা বর্তমান প্রেক্ষাপটের নয়, ব্রিটিশ শাসনামলের। ব্রিটিশ মালিকানার চা-বাগান, কফি-বাগান, কয়লা খনিতে কাজ করার জন্য কিছু সুযোগসন্ধানী অ-আদিবাসী মানুষ আদিবাসী অঞ্চলের মানুষের সরলতার

সুযোগ নিয়ে তাদের প্রলুব্ধ করত এবং তাদের বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যেত সুদূরে। আদিবাসীরা এদের আড়কাঠি বলে অভিহিত করত। নিজভূমে পরবাসী আদিবাসীরা ভূমির নিজস্ব মালিকানার অধিকারী ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তাদের সরলতার সুযোগে জোতদার, মহাজনেরা তাদের জমি কুক্ষিগত করে রেখেছে। সুতরাং নিজস্ব জমির প্রতি তাদের যে বাসনা তাকে বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন দেখিয়ে আড়কাঠিরা খুব সহজেই আদিবাসীদের তাদের জালে আবদ্ধ করতে পারতো। আড়কাঠিদের কৌশলের বিবরণ দিয়েছেন লেখক এ গল্পে এভাবে –

> তারা মেয়েদের জন্য আনতো দস্তার চুড়ি, পুঁতির মালা, সস্তার আয়না। পুরষদের জন্যে আনতো মাথায় গোঁজার কাঠের কাঁকই, টুকটুকে লাল গামছা। আর সবচেয়ে আগে গ্রামপ্রধানকে সম্মান জানাত সস্তার চুরুট আর রুপোর একটা টাকা দিয়ে। তখন চলে যেত আদিবাসী নরনারী। সে সময়ের কথা এখনও তারা গানে গানে গেয়ে পাথর ভাঙে, পথ পিটাই করে (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৪৮)।

আড়কাঠি, বেঠবেগারি, নারী নিগ্রহ – আবহমান কাল ধরে আদিবাসী সমাজ, হরিজন সমাজ এ যন্ত্রণাকে বহন করে চলেছে এবং তাদের জীবনের এ দুঃখ-সন্তাপকে মহাশ্বেতা শিল্পের আগুনে পুড়িয়ে নিখাঁদ পরিবেশনায় সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা ছোটগল্পের জগতকে।

৫.২.৩

'শনিচরী', 'রাজাবাসার রূপকথা', 'ইটের পর ইট' – তিনটি গল্পের কাহিনি একসূত্রে গাঁথা। শাহরিক প্রয়োজন মেটাতে শহরের পাশের কৃষি জমি বন্ধ্যা করে যে অসংখ্য ইটভাটা গড়ে উঠেছে, তার মজুর হিসেবে নেয়া হয়েছে আদিবাসী নারীদের। আদিবাসীরা শ্রমিক হিসেবে দক্ষ, ফাঁকি দিতে জানে না। 'অলগখণ্ড' আন্দোলনে অংশ নেয়ায় প্রশাসনের বিরাগভাজন আদিবাসীরা কেবল পেটভরে খাওয়া ও পরনের কাপড়ের জন্য যে কোনো মজুরিতে কাজ করে অনেকটাই ক্রীতদাস হিসেবে। আদিবাসী মেয়েরা দিনে শ্রম দিতে বাধ্য হয়, রাতে দেহ – কিন্তু কোনো পয়সা পায় না, সব মালিক মহাজন মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কখনও বছর শেষে এই মেয়েরা ঘরে ফেরে – কখনও হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য। মালিকের রক্ষিতা হয়ে যৌবন শেষে কোনো আদিবাসী মেয়েই হয়তো সর্দারনি হয়ে আবার নতুন মেয়ের খোঁজে ফেরে নিজ অঞ্চলে। বাবা মাকে নগদ পঞ্চাশ টাকা, মেয়েটিকে নতুন একটি কাপড় দিয়ে, বহু টাকার স্বপ্ন দেখিয়ে ইট ভাটার মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয় সামান্য টাকার বিনিময়ে। মধ্যস্বত্বভোগী সেই সর্দারনি হয়ে ওঠা আদিবাসী নারী হয়তো মাথাপিছু পায় দশ-বিশ কিংবা তিরিশ টাকা – মালিক ফায়দা তোলে লক্ষ টাকার। শ্রমিক মেয়েটি তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়

এবং সম্ভ্রম হারিয়ে, (কোনো ক্ষেত্রে জীবনও) কখনও ঘরে ফেরে একটা নতুন কাপড়, একটা রেলের টিকিট অথবা দিকুর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। উপর্যুপরি তিনটি গল্পেই কেবল নয়, বেশ কিছু কলাম এবং প্রবন্ধেও মহাশ্বেতা দেবী বারবার এ বিষয়টির প্রতি সচেতন মানবতার মমতাময় স্পর্শ কামনা করেছেন। 'বন্দিমুক্তি আন্দোলন চাই' (দৈনিক বসুমতী, ২৯.০৮.১৯৮১), 'সংগ্রাম কখনো ফুরায় না' (দৈনিক বসুমতী, ০১.০৫.১৯৮১) প্রভৃতি লেখায় মহাশ্বেতা পশ্চিমবঙ্গের ইট ভাটায় কর্মরত শ্রমিক, বিশেষত নারী শ্রমিকদের বিষয়ে সরেজমিন তদন্তের ভিত্তিতে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন। এ সময়ই তিনি এ গল্পগুলো লিখেছেন – শিল্প রচনার তাগিদে নয়, বরং সামাজিক মানুষ হিসেবে নিজের বিবেকের কাছে দায়মুক্ত থাকার তাড়নায় এবং জনমত সৃষ্টির প্রেরণায়।

লেখকের ভাষায় –

> বাড়ি উঠেছে, প্রাসাদ উঠেছে, একটি একটি ইট বসিয়ে। এই ইটগুলি দাস শ্রমিকের রক্তে তৈরি। তাদের দুঃখের আগুনে পোড়ানো।
>
> এইসব বন্দিদের মুক্তি চাই, সেজন্য চাই আন্দোলন। এ আন্দোলন অনেক ধৈর্যে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক নিষ্ঠায় গড়তে হবে। নইলে ইট ভাটার মজুর মেয়েদের উপর ব্রিটিশ আমলের চা-বাগান মার্কা শোষণ ও অত্যাচার থামবে না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৫৩৭)

এ গল্পত্রয়ের বিষয় ইট ভাটার বন্দি শ্রমিক হলেও তাদের আদিবাসী পরিচয়ের প্রেক্ষিতে তাদের ভাবনা, স্মরণ-বিস্মরণে আদিবাসী জীবনের বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য এবং তাদের জীবনের ছাপচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

'শনিচরী' গল্পের শনিচরী এক ওঁরাও মেয়ে। 'আদি জাতি রক্ষা মোর্চা'র লড়াইয়ের বাতাসে যখন জঙ্গলের জীবনে আগুন লাগে, তির-ধনুকে প্রতিরোধ তখন করতে পারে না আদিম জন-জাতি। মিলিটারি পুলিশ জ্বালিয়ে দেয় তাদের সব। বহু আদিবাসী জীবন দেয়, কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসে না বরং জুলুম হয় আরও তীব্র। পুলিশের জুলুমে জঙ্গলে পালানো শনিচরী ও অন্যান্য তরুণী পরনের কাপড়ের জন্য গোহুমন বা গোখরার ছোবল খায় অর্থাৎ সর্দারনির ফাঁদে পড়ে ইট ভাটায় আসে। প্রথমে মালিকের শয্যা সহচর এবং পরে রেজা হিসেবে কাজ করে নয় মাস পর যখন একটা কাপড় ও রেলের টিকিট সম্বল করে সে গ্রামে ফিরে আসে তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। সমাজের নিয়মে দিকুর সন্তান জন্ম দিয়ে সে সমাজ বহির্ভূত বিবেচিত হয়। তবুও বেঁচে থাকে, জীবনকে টেনে নিয়ে যায় জীবনের পথে।

আদিবাসী জীবনের নানা সংস্কার-আচারের সন্ধান পাওয়া যায় শনিচরীর কাহিনিতে। শনিচরীর আজ্জি অর্থাৎ ঠাকুমার মুখে শোনা যায় তাদের ছেলেবেলার কথা – যখন আদিবাসীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক

ঐতিহ্য রক্ষা করে রাতের পর রাত গল্প বলার আসর জমাতো, গান গাইতো। ছেলেরা যেতো জোংখা-এরপায়, আর মেয়েরা পেল-এরপায়। এ দুটোই মূলত হো, ওঁরাও ছেলে-মেয়েদের গল্পের আসর। গল্প-গানে মাতোয়ারা সে-দিন ছিল অন্যরকম। অর্থাৎ সে-সময়ে তাদের জীবন আগুনের তাপে তেতে ছিল না, ছিল বরং অনেক স্নিগ্ধ। আজও শনিচরীদের জীবনে গান আছে, তবে তা দুঃখ-গাথা কেবল। ঘরে ঘরে কালো কালো দুঃখিনী মায়েরা গায় আজ –

> আমার মেয়ে বাঁচত খেয়ে কান্দা মূল
> আমার মেয়ে পরত কানে পাতার দুল
> বনে গাছে শাড়ি ফলে না তো
> তাই তো মেয়ে বলল আমায়, মা গো !
> ইট ভাটাতে যাই ? মা গো, ইট ভাটাতে যাই ? (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৭৪)

দারুণ খরা, অজন্মায় যখন কোন শস্য ফলে না, বনে মেলে না কন্দমূল এবং অধিকারের লড়াইয়ে যখন মিলিটারি পুলিশ পোড়ায় ঘর-বাড়ি, পরনের কাপড় ; তখন জেনেবুঝেও গোখরা সাপের ছোবল খায় শনিচরীরা ; দূরের ইট ভাটায় যায় কাজ করতে, ফেরে দিকুদের সন্তান গর্ভে ধারণ করে। আদিবাসী সমাজের রীতি অনুযায়ী সামাজিক আইন বহির্ভূত কাজ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, সমাজের সকলকে ভোজ দিতে হয়। শনিচরীও দেয় কিন্তু সন্তানসহ সমাজ তাকে গ্রহণ করে না। সন্তানকে ফেলে দিতে তারা বলে না, কেননা, ‘হো ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতাল সমাজ শিশু ভালোবাসে’ (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৭৭)। কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর এ সমাজ কিছুতেই মিশ্ররক্তকে নিজ সমাজে ঠাঁই দেয় না। এ ধরনের সন্তানদের বিয়েও হয় না স্বসমাজে ; মিশ্র রক্তের অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হয় খাওয়াসিন রীতিতে – যা আদিবাসীদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার। আদিবাসীরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেই সামাজিক নিয়ম-কানুনে কঠোর। তাদের ‘নাইগা’ বা পুরোহিত স্বীকার করে শনিচরী নির্দোষ ; তবুও সমাজের নিয়ম ভাঙ্গার সাধ্য তার নেই।

সামাজিক নিয়ম-কানুনের কঠোরতা অনেক সময় অনেক আদিবাসীর স্বাতন্ত্র্যকে বিপন্ন করে। আদিবাসী সমাজে কেউ অপরাধ করে জেলে গেলেও তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে, সমাজকে ভোজ দিতে হয়। সে ভোজের টাকা যোগাড়ে তাকে আবারও সমাজ ছেড়ে দূরে যেতে হয়, হয়তো আর ফেরা হয় না। এ গল্পের মংরু ওঁরাওর বেলায় তা ঘটেছিল।

৫.২.৪

‘রাজাবাসার রূপকথা’ গল্পেও কাহিনি একই, প্রেক্ষাপট আলাদা। এ গল্পের স্থানিক পটভূমি কোলহান ; রাজাবাসা গ্রামের সার্জোম পূর্তি ও তার স্ত্রী জোসমিনা পাত্রপাত্রী। শোষকের ভূমিকায় যথারীতি মহাজন নন্দলাল সাহু ; ইট ভাটার বদলে শোষণস্থল পাঞ্জাবের জোতদার-গৃহ ; বাদবাকি সবই এক। সার্জোম, জোসমিনাকে চারশো টাকায় পাঞ্জাবের নিরঞ্জন সিংয়ের কাছে বিক্রি করে মধ্যস্বত্বভাগী নন্দলাল। দিনে ষোল থেকে আঠারো ঘণ্টার পরিশ্রম ক্ষেতে ও গৃহে ; জোসমিনার সম্ভ্রমহরণ – দিকুর সন্তান ধারণ করে পালিয়ে এসেও জাতিচ্যুত হবার ভয়ে জোসমিনার আত্মহত্যা সমস্তই পূর্ববর্তী গল্পের অনুরূপ। বস্তুত আদিবাসী মানুষগুলোর জীবনের এ সমীকরণ ভাঙতে পারেন না লেখক – তাই শুধু দায়বদ্ধতায় লিখে যান তাদের জীবনের কাহিনি, সত্য কাহিনি।

জীবন সংগ্রামের বৃত্তে লেখক বরাবরের মতোই আদিবাসী জীবন বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছেন কাহিনি-বয়নে। আদিবাসীদের মধ্যে কন্যাপণরীতি বিদ্যমান। বিয়ের সময় কনের বাপকে কন্যাপণ দিতে হয় বেশ কয়েকটি গরু – তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বরকে ধার করতে হয় মহাজনের কাছে এবং সে ধার শুধতে হয় সমগ্র জীবন দিয়ে। বিয়েতে বাজনা বাজে – গ্রামবাসীকে ভোজ খাওয়াতে হয় – ভাত, কুরথি ডাল এবং মাংস। তাতেও ঋণ করতে হয়। তির ধনুকের ব্যবহারে বন্য পশু শিকার করে তারা সাধারণত মাংসের যোগান দেয়। তবে ঋণ শোধের ব্যাপারে আদিবাসীরা খুব সচেতন। আদিবাসী বিশেষত কোলহানের হো জাতি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মরতে ভীষণ ভয় করে। তাদের বিশ্বাসে প্রোথিত থাকে, ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে মৃতকে গ্রহণ করে না তাদের পূর্বপুরুষ জিয়াতাতারা ; তখন মৃত হয়তো কোনো ইতর প্রাণীর রূপ পায়। মৃত্যু পরবর্তী বিভীষিকা এড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা করে তারা ঋণ না রাখতে। মহাজনেরা সে সুযোগটা নেয় পুরোমাত্রায়। ক্রীতদাসের মতো বিনাপয়সায় খাটায় ঋণগ্রস্তকে। তাদের সংগৃহীত মৌয়া, চিরঞ্জি, শালবীজ বিনা পয়সায় নিয়ে বাইরে বিক্রি করে বহু টাকায়। কখনও পাঁচ টাকার লবণ দিয়ে বিনিময় মূল্যে নেয় দশ টাকার শালবীজ। তবুও তাদের ঋণ শোধ হয় না, বরং বেড়েই চলে। আর আদিবাসীরাও সমগ্র জীবন, কখনও কখনও বংশ পরম্পরায় বাঁধা থাকে মহাজনের খেদমতে।

হো আদিবাসী সমাজে সন্তানের নামকরণ আনুষ্ঠানিকভাবে হয়। নামকরণের এ অনুষ্ঠানের নাম ‘তুপুনামিক্রব’। এ অনুষ্ঠানে জলে চাল ভাসিয়ে মা ছেলেকে অনেক নামে ডাকে – যে নামটা শুনে ছেলে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে – তার জন্য সে নামটিই সঠিক বিবেচিত হয়। সার্জোম জোসমিনার ছেলের নাম এভাবে স্থির হয় মাসিদাস। কিন্তু পরবর্তী দুঃসময়ের কশাঘাতে জর্জরিত জোসমিনার মনে হয়, হয়তো ছেলের নামের দোষেই তাদের এত ভোগান্তি। ‘মাসিদাস’ নামটি সাধারণত ধর্মান্তরিত ক্রিশ্চান

আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত। জোসমিনার মা এবং অন্যেরা নিষেধ করেছিল এ নামকরণে কিন্তু তারুণ্যের সাহসদীপ্ত উচ্চারণে নাকচ করে দিয়েছিল সার্জোম। পরে মাসিদাস বদলে মাটা রাখে তারা ছেলের নাম।

হো সমাজেও দোষ-ত্রুটি হলে গ্রামসমাজ দোষীকে শাস্তি দিয়ে 'জাতিএত্‌কা' অর্থাৎ একঘরে করে রাখে। তখন পূজা দিলে, 'জাতিমায়ডি' খাওয়ালে গ্রামসমাজকে – সব দোষ কেটে যায়। কিন্তু বিদেশি বা দিকুর সন্তান পেটে ধারণ করলে সে-দোষ কখনও ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হয় না। সমাজ তাদের জাতিএত্‌কা করে দেয়, পূজা দিয়ে জাতিমায়ডি, অর্থাৎ সমাজকে ভোজ দিলেও হয়না জাতিরাকাব অর্থাৎ জাত ফিরে না। জাতিএত্‌কাদের ঘর হয় স্বসমাজ, স্বগ্রাম থেকে দূরে, তারা মরলে হাগার বা পারিবারিক শ্মশান জমিতে তাদের সমাধি হয় না। লেখকের ভাষায় –

> কিন্তু কোল্‌হান যে বড়ো ক্ষমাহীন। দিকুজন কোল্‌হানের সন্তানদের ধর্ম, গান-নাচ, ভাষা, জমি, বন, খনিজ সম্পদ কেড়ে নেয়। কোল্‌হান কিছু করতে পারে না। কিন্তু দিকু যদি কোল্‌হানের মেয়ের রক্তে বীজ বোনে তবে সে জমিতে বিষের বীজ, সে জমি জ্বালিয়ে দাও। সে মেয়েকে ত্যাগ কর। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৮৯)

এ সূত্রে কোল্‌হানের অতীত ঐতিহ্যের আরেক উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। হো পুরাণ মতে 'ছোটনাগপুর' নামকরণ হয়েছে লোহায় ঢালাই আশ্চর্য দুই নাগরার নামানুসারে। এ নাগরা আছে বনে, তাতে মরচে ধরে না, তার রয়ক্ষয় নেই। আধুনিক মানুষেরা ইস্পাত তৈরির বহুশত বছর আগেই কোলহানের আদিম মানুষেরা এ নাগরা বানিয়েছিল। পরে একটি নাগরাকে কেন্দ্র করে মন্দির গড়ে উঠে। মন্দির তৈরি করে দিকুজন – নাগরা ঘিরে পাঁচিল তুলে আদিবাসী মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ এ নাগরা এককালে আদিবাসীদের অধিকারে ছিল। বহিরাগত শত্রুদের আগমনে সকলকে সতর্ক করা হতো নাগরা বাজিয়ে। আর নাগরা বাজানো হতো যখন কোনো হো নারীর গর্ভে দিকুর সন্তান জন্মাতো। আজন্ম এ সংস্কার মিশে আছে জোসমিনা রক্তকণিকায়। তাই অন্তঃসত্ত্বা জোসমিনা সকলের অলক্ষ্যে একাকী লোহার নাগরার শব্দ পায় – ভীষণ ভয়ে স্বামী-সন্তানের সমাজচ্যুত না হবার উপায় হিসেবে সে আত্মহত্যা করে।

কোয়েনার জলে ডুবে মরার আগে সে কাপড়, রূপাদস্তার চুড়ি, হার, কানের গুঁজি সব খুলে রাখে পাথরের উপর যাতে তার সমাধিতে এসব দেয়া যায়। মানুষ মরলে তার অন্ত্যেষ্টি বা টোপাজাং করে তারা। ঘরের কাছের শ্মশানভূমিতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করে। তারপর সাতদিনের দিন ঘরের দরজা খোলা রেখে মেঝেতে ছড়িয়ে দেয় ছাই। সারারাত মৃতের নাম ধরে ডাকা হয় এবং বাইরে চাল ছুঁড়ে দেয়া হয়। সকালে যদি দেখা যায় মেঝেতে কোনো পায়ের ছাপ নেই তাহলে তারা বিশ্বাস করে যে, মৃতকে গ্রহণ করেছে তাদের পূর্বপুরুষ জিয়াতাতারা। আর যদি মেঝেতে কোন ইতর প্রাণীর ছাপ পাওয়া যায় তাহলে ধরে নেয়া হয়

যে, কোনো পাপের কারণে মৃত ঐ প্রাণীর মধ্যে নতুন রূপ পেয়েছে। এমনি নানা সংস্কার-কুসংস্কারে জড়িয়ে আছে আদিবাসীদের অপরিবর্তিত জীবন-ধারা।

কোলহানে আছে অভাব, দারিদ্র্য – আছে শরতের আকাল। প্রতিবছর গোরা ধান কাটার আগে অবধি উপোসের কাল চলে কোল্হানে। আবার বসন্তে তারা যাপন করে সার্জোমবাহ পরব। ক্লান্তিকর এ পুনরাবৃত্তি ঘটে সার্জোমদের জীবনীতে – তাই লেখক এ জীবনকে রূপকথা বলে অভিহিত করেছেন। লেখকের ভাষায় –

> রূপকথা সেই কাহিনি, যার জন্ম থাকে, মৃত্যু থাকে না। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৮৯)

সার্জোম জোসমিনার জীবন কাহিনির পুনরাবৃত্তি ঘটে আদিবাসী জীবনে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন পটভূমিতে কিন্তু তাদের অন্তহীন দুঃখের কোনো সমাপ্তি ঘটে না। তাদের জীবন তাই রূপকথার জীবন – বেঁচে থাকাই তাদের জীবনের সবচেয়ে অলৌকিক ঘটনা।

৫.২.৫

'ইটের পরে ইট' গল্পে হো তরুণী জোসিন ইটভাটার কাজে যেতে বাধ্য হয় পুলিশ মিলিটারির জুলুমে। সুন্দরী তরুণী জোসিন ভাটার মালিকের বাঁধা মেয়েমানুষে পরিণত হয় এবং মালিকের পোষা গুণ্ডাদের অত্যাচারে মারা যায়। চুরির মিথ্যে অপবাদ প্রচার করে গুম করে ফেলা হয় তার মৃতদেহ এবং একসময় সে-লাশ আবিষ্কারে 'স্বরাজ' ইটভাটায় বিদ্রোহের প্রতিবাদের ঝাণ্ডা ওড়ে। পূর্ববর্তী গল্পদ্বয়ের কাহিনি অনুরূপ ; তবে এ গল্পের বিস্তৃত পরিসরে লেখক আদিবাসী জীবন, তাদের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পরিচয়ের রেখাচিত্র টেনেছেন স্পষ্টভাবে।

এ গল্পে এবং অন্যান্য কিছু গল্পেও লেখক আদিবাসী দরদী এক চরিত্রকে এনেছেন, যাকে আদিবাসীরা 'বাউ' বা 'দাদা' বলে জানে, মানে। নাম তার জানুম সিং। হো ভাষায় 'জানুম' মানে 'কাঁটা'। তার ভূমিকা প্রশাসনের কাছে কাঁটা তুল্য তবে আদিবাসীদের কাছে 'বাহ্' বা ফুলের মতো। বাস্তবেও এ চরিত্রের অস্তিত্ব মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন প্রবন্ধে পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন আদিবাসীদের কল্যাণ করার ব্রত নিয়ে এ মানুষটি আদিবাসী অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরেছেন এবং সবিস্তারে সব তথ্য জানিয়েছেন মহাশ্বেতাকে। লেখক সত্যি ঘটনাকেন্দ্রিক গল্পে সত্যি চরিত্রকেও স্থাপন করেছেন এবং তার মন্তব্যে, সংলাপে পাঠককে জানিয়েছেন আদিবাসী জীবনের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

১৯৫৭ সালে সিংভূমে এগারো কোটি আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশো সাতাত্তর একর জমি জঙ্গলভূমি বলে বিবেচিত হয়। এ জঙ্গলভূমিকে আবার বিভক্ত করা হয় ছয়টি বিভাগে। চাইবাসা, ধলভূম, পোরাহাট, কোল্‌হান, সারান্ডা, ধানবাদ। ধলভূম ও ধানবাদ ছাড়া বাকি সবগুলো বিভাগের সদর দপ্তর চাইবাসা। শুধু ধলভূমের জামশেদপুর এবং ধানবাদের সদর দপ্তর ধানবাদে।

অসংখ্য মূল্যবান বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এ জঙ্গলভূমি। সারান্ডার শাল গাছ বিখ্যাত। শাল, আমান, ধৌরা, জাম, বিজা, করম, শিমুল, কেন্দু, অর্জুন, গামার, বাঁশ বন মূল্যবান সম্পদ। বিশেষ জাতের ঘাস সাবাই কাগজের কলে যায়। মউলে কুসুমে লাক্ষা ফলে। ঝিটা জঙ্গলে আছে সালাই, ঝিঙ্গন, বধেরা, সিধা বহু দামী গাছ। সরকার এ জঙ্গল থেকে খাজনা আদায় করে ত্রিশ কোটি টাকা। এ টাকায় গোটা সিংভূমের জলকষ্ট দূর করা যায় ; সকল আদিবাসীর ঘর-জমি হয়, সকলে ভাত-ডাল খেতে পারে। অথচ একটি টাকাও জঙ্গল ভূমির প্রকৃত বাসিন্দাদের জন্য ব্যয় হয় না। যা কিছু বরাদ্দ, তা আদিবাসীদের কাছে এসে পৌঁছায় না, মধ্যস্বত্বভাগীরা তা লুট করে নেয়। লেখকের ভাষায় –

> তফশিলি ও আদিবাসীর নামে মঞ্জুরি হওয়া চাকরি, টাকা, বৃত্তি, ঠিকাদারি, ব্যবসায়ে লাইসেন্স বর্ণহিন্দু পাবে – সিংভূমের কোল্‌হানে এটি মহান ভারতীয় নীতি ও ঐতিহ্য। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৩০৬)

আদিবাসীরা অবশ্য পরমুখাপেক্ষী নয়। জঙ্গলকে অবলম্বন করে তারা নিজেদের জীবিকার পথ করে নেয়। তারা কেন্দুর পাতা তুলে, ফল খায়, মউল করঞ্জ, কুসুম গাছে লাক্ষার চাষ করে। শিয়ালপাতার মাথাল, ঘোগর তৈরি করে বিক্রি করে। এ পাতাও বিক্রি করে হোটেলে – যেহেতু পাতায় ভাত খাওয়া যায়। সাবাই ঘাসের দড়ি বুনে তা বিক্রি করে জীবিকার্জন করে লক্ষ মানুষ। কিতা গাছের পাতায় চাটাই বুনে এবং যে গাছে ফুলঝাড়ু হয় তা শুকিয়ে বিক্রি করে কোনো রকমে খাদ্য যোগাড় করেই আদিবাসীরা আনন্দে, শান্তিতে থেকেছে বহুকাল। কিন্তু তাতেও বাধ সাধে দিকু বা উচ্চবর্গীয় বিদেশিরা। ক্রমাগত শোষণ-নিপীড়নের চাকা সচল রেখে তারা আদিবাসীদের সামান্য সুখটুকুও কেড়ে নেয়।

সরকারি নিয়মে চাইবাসার জঙ্গলের যে নিলাম বা ডাক হয়, তা ডাকবে একজন আদিবাসী। এ নিয়মের বার্তা পৌঁছায় না আদিবাসী গ্রামে। আর পৌঁছালেও শত শত লোক লাগিয়ে গাছ কেটে, গাছ চালান দেওয়া তাদের সাধ্যাতীত। কোনো আদিবাসীর থাকে না লক্ষ টাকা। সুতরাং ডাক হয়, জঙ্গল বিলি হয় আদিবাসীর নামে আর তা নেয় উত্তর বিহারের বা অন্যত্র এলাকার কোনো ঠিকাদার। জঙ্গল যখন ঠিকাদারের তখন জঙ্গলের ফল, পাতা, কান্দামূল সংগ্রহেও লাগে ঠিকাদারের পারমিট, জঙ্গল অফিসের পারমিট। ১৯৭৮ সালে সিমডেগাতে আদিবাসীরা এর প্রতিবাদে মিছিল বের করে। বিদ্রোহের এ স্ফুলিঙ্গকে

দমাতে গ্রেপ্তার করা হয় মিছিলকারীদের। জেলমুক্তির আন্দোলনে চলে গুলি – মরে একত্রিশ জন আদিবাসী। বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ক্রমে দাবালনে পরিণত হয় ; জঙ্গলভূমিতে গড়ে ওঠে অলগখণ্ডি আন্দোলন।

প্রকৃত অর্থে কোল্হানে যুগে যুগে ঘটে বহু আন্দোলন, বিদ্রোহ। কখনও কোলবিদ্রোহ, কখনও হুলমাহা, কখনও উলগুলান – বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহের দাদামা বাজে জঙ্গলমহলে। হো জাতি কখনও কারও বশ্যতা স্বীকার করেনি – তাই তাদের নাম হয় লড়কা হো বা কোল। শত শত বছর ধরে সিং রাজা, শাহী বংশের দুধনাথ শাহী, জগন্নাথ শাহী, ময়ুর ভঞ্জের বামনঘাটি মহাপাত্র বারবার অসংখ্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে কোলহান অধিকার করতে চেয়েছে – কিন্তু তির-ধনুকের জোরে আদিবাসীরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে, ঢুকতে দেয়নি ; এমনকি লম্বা লম্বা বারুদ ঠাসা বন্দুকের মোকাবিলা পর্যন্ত তারা করেছে। ইংরেজদের বারবার তাড়িয়েছে তারা এবং পরবর্তী সময়ে ইংরেজ ও দেশীয় রাজাদের সম্মিলিত আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে ; অথচ রাজাদের হয়ে বহুবার তারা সাহেবদের সঙ্গে লড়েছে। রাজাদের বেঈমানিতে ক্রুদ্ধ হয়ে তারা সাহেবদের সঙ্গে সন্ধি করে এ শর্তে যে, রাজাদেরকে সাহেব ও আদিবাসীদের মাঝে রাখা যাবে না। কিন্তু সাহেবরা শর্ত ভেঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এ আদিবাসীদের রাজাদেরই অধীন করে দেয়। আর সরল সত্যবদ্ধ আদিবাসীরা কথা দিয়ে কথা রাখার প্রত্যয়ে মানতে বাধ্য হয় তাদের জন্য অবমাননাকর সকল শর্ত – সাহেবদের মান্য করা, রাজাদের লাঙল পিছু খাজনা দেয়া, কোলহানের ভিতর দিয়ে অন্য জাতির লোককে যেতে দেয়া – সমস্ত শর্ত। দু'শো বছর আগেও হো জাতি কোলহান দিয়ে বিদেশি যেতে দেয়নি। জগন্নাথধামে রথ দেখতে যারা যেতো, তারাও দূর দিয়ে ঘুরপথে যেতো। সকল জাতির লোকেদের গ্রামে বসতি করতে দিয়ে তাদের জানমান রাখা, ওড়িয়া, হিন্দি ভাষা শেখা সব শর্ত তারা মেনে নেয়। এতে তাদের ভাষা, গান, নিজস্ব সংস্কৃতি বিনষ্ট হয় – লাভ কিছু হয় না। কথা দিয়েছিল তারা সাহেবদের যে, জমিদার-রাজা জুলুম করলে তারা ধনুক উঠাবে না, সাহেবদের দুয়ারে যাবে। সে-কথাও রাখা হয় কিন্তু বিচার তারা পায়নি ; সাহেবদের দুয়ারে গিয়ে তাদেরই গুলি খেয়েছে। হো সমাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো – তারা কখনও ধর্মান্তরিত হয়নি ; স্বধর্ম বজায় রেখেছে, স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রেখেছে। তবে তারা আজ আত্মসমালোচনা করতে শিখেছে। মাটা গাগরাই বোঝে তাদের পূর্বপুরুষের সরলতা আজ তাদের ভিখারি করেছে। মাটার মেয়ে লুদরির মতে, তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সময়ের সঙ্গে চলতে না পারা। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে জীবনের মৌলিক অধিকার মেটানোর দাবিতে তারা সোচ্চার হয়, বিদ্রোহী হয়। হো সমাজে কন্যাসন্তান পুত্র সমতুল্য। অনেক সংসারেই বড়ো মেয়ে বিয়ে না করে সংসার সামলায়। 'গ্রামাঞ্চলের হো মেয়েরা বেশ স্বাধীনচেতা' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১: ৫৩৬)। এ গল্পের লুদরি মাটার সংসার স্থির রাখে – কোল্হানের, অলগখণ্ডের কাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে।

বনের কন্দ কচু যাদের প্রধান খাবার, সেই হো আদিবাসীরা ভাত খায় কেবল উৎসবে, অতিথি সৎকার করে ভাত দিয়ে, তাও শুধু ভাত ; ব্যঞ্জন হলো ফেনের মধ্যে লবণ আর মরিচগুড়ো। মাছ ডিম কখনও জুটে না তাদের, শিকারে মাংস মেলে কদাচিৎ। তারা এমনকি মাসে দু-একবার আলু পর্যন্ত খেতে পায় না। তবে খিদে চেপে রাখতে বিড়ি-খইনি-ডিয়াং-এর নেশা তারা করে। অতিথি বাউকে তারা চা করে দেয় লবণ দিয়ে। তবে উৎসব তারা করে যথানিয়মে। সার্জোমবাহাতে মহুল ফুল শুকিয়ে পিঠা বানায়, মাড়োয়ার ছাতু রাখে, অতিথি এলে ছাতুর শরবত দেবে বলে। সার্জোমবাহা তাদের প্রধান উৎসব। বাহ্ পরবে নতুন শালপাতার পাত্রে শালফুল, মুরগির মাংস আর ডিয়াং দিয়ে গ্রামদেবতাকে পূজা যতক্ষণ না দেয়, ততক্ষণ বনের ফল তারা খায় না। পরব না ফুরালে নতুন শালপাতার পাত্র ব্যবহার করে না। শুচিশুদ্ধ হয়ে তারা শাল ফুল তোলে, শালপাতা ভাঙে, পূজা দেয়। পূজা হলে খোঁপায় শালফুল পরে নাচে গানে রাতযাপন করে।

নাচে গানে উৎসব তারা করে বটে কিন্তু তাদের জীবন সংগ্রামময়। ভূমিহীন এ মানুষেরা দিনমজুর হিসেবে পরের জমিতে, খনি-খাদানে খাটে – কিন্তু মজুরি পায় না যথাযথ। এ চিত্র তাদের জীবনে চিরকালীন ; পার্থক্য সামান্য। জোসিনের মা কাজ করেছে এক টাকা মজুরিতে, জোসিন দুই টাকায়। জীবনের সকল উল্লাস, দুঃখকে তারা ধারণ করে গানের সুরে। নিরক্ষর আদিবাসীরা গানের সুরে নিজেদের জীবনেতিহাস কালের বুকে অক্ষয় করে রাখে। মজুরি বিষয়ে জোসিনের মায়ের ধ্বনিত হয় গান –

> উড়িষেরেন ডালমিয়া দিকু
> কাদানা যে কুলায়োতানা –
> উড়িষ্যা কোম্পানী দিকু ডালমিয়া
> এসে খাদানটি খুলল
> খাদানে আমরা কাজ করি
> দিকু বলে, চলো চলো।
> জলদি জলদি খাটি
> টাকা টাকা মজুরিতে কাজ করি
> না অসুখে অষুধ পাই
> না পানীয় জল
> দিকুজন আদিবাসীর উপর জুলুম করে
> আমরা এভাবে কাজ করার পরেও
> গরিব মজদুর! এক টাকা পাই। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৯২-২৯৩)

আদিবাসী জীবনে বঞ্চনার সবগুলো প্রান্ত প্রকাশিত হয়েছে একটিমাত্র গানে। শ্রমিক জীবনের বঞ্চনা, দিকুদের অমানবিকতা, জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা চিরকালীন, তাই এ কথাগুলোকে গানের সুরে ধরে রেখে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা একই অভিজ্ঞতার শরিক হয়।

আবার, সার্জোমবাহে জোসিনের গানে উল্লাস ধ্বনিত হয় –

বাবুরে সার্জোম বা !
পাহাড়ে শালগাছ
হাওয়ায় দুলছে
আঙিনা গোবর নিকালাম
এসো আমরা শালের ফুল নিয়ে আসি
ঘর দুয়ার লেপেছি
মৌয়া টপ টপ ঝরে পড়ছে
দাদা গো! একটা টুকরি কেনো
মৌয়া কুড়াতে যাব–
যখন খিদে পাবে,
মৌয়া সিজিয়ে খাব
বেঁধে রাখব পোঁটলায়,
আকালে খাব–
বাহ-পরবটা হয়ে যাক,
যাবো রে বোন, যাবো ॥ (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৩২২)

উৎসব উল্লাসের এ গানেও ক্ষুণ্নিবৃত্তির তাড়না, আকালের প্রস্তুতির উল্লেখ আছে। সার্জোম-বাহ্ বা শালফুলের দিনের উৎসব প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে উদ্বেলিত হয়ে ঘোষিত নয় ; বরং প্রকৃতি প্রদত্ত খাদ্যের প্রাচুর্যের কারণেই এ সময়টাকে উৎসবের সময় বলে ধরা হয়।

জীবনের সাময়িক বিপর্যয়কেও তারা গানের সুরে বেধে নেয়। আকালের সময়, আন্দোলনে-সংগ্রামে, মিলিটারি পুলিশের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে মেয়েদের ইটভাটায় কাজ করতে পাঠাতে বাধ্য হয়ে মায়েরা গান করে –

আমার মেয়ে বালি
পেট ভরাতো বনের যতো কন্দমূলে
ঘুমিয়ে যেত বনের কোলে

আমার বালি
পায়নি শুধু লজ্জা ঢাকার
কাপড়খানা, আমার বালি –
পায়নি তাহা বনের কাছে
তাই তো আহা
ইটভাটাতে কলকাতাতে
কলকাতাতে ইটভাটাতে
গেলো চলে
আমার বালি ! (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৩১১)

জীবনের সকল পর্বকেই তারা গানে গানে স্মরণ করে। গানেরই মধ্যে পাওয়া যায় আদিবাসীদের সত্যিকার ইতিহাস।

আদিবাসী জীবনে মৃত্যু এবং মৃতদেহ সৎকার এক অবশ্য পালনীয় পবিত্রকর্ম। সংগ্রামী পুরুষকে তারা স্নান করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে চারদিক ঘুরাবে, বলবে, এ জঙ্গল পাহাড় যার মা ছিল সে যেন সে মায়ের কাছে ফিরে যায়। তারপর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে যে ভূমির জন্য সে লড়াই করেছে, তার দিকে দিকে পুঁতে দেবে, পাথর রেখে দেবে সমাধিতে ; যেন মৃত্যুর পরও অতন্দ্র প্রহরী হয়ে থাকে এ ভূমির। সাধারণ লোকের মৃত্যুতে মৃতদেহ গরম জলে স্নান করিয়ে তেল হলুদ মাখানো হয়। মৃতের ডানহাতে কিছু ধান রেখে তা তুলে নেয়া হয় বীজধান হিসেবে এবং সে বীজধান বুনবে বীজ ছড়াবার পরবে দামুরাইয়ের কালে। নতুন কাপড় পরিয়ে মুখে পয়সা, সঙ্গে ধান চাল, পুরনো কাপড়, খাবার থালা দিয়ে কবরে মাটি দেবে এরপর। সাত দিনের পর দিন মেঝেতে ছাই ছড়িয়ে মৃতকে ডাকা হবে এবং সমাধিতে পাথর স্থাপন করবে যাকে শোসানডিরি বলে। যাদের মৃত্যু হয় দূরে, লড়াইয়ে, সমাধি যাদের করা যায় না – তাদের স্মরণে রোপণ করা হয় কোনো বনস্পতি ; তেজস্বী বৃক্ষের চিহ্নে স্মরিত হয় তারা।

সময়ের পরিবর্তনে সবই পরিবর্তিত হয়। হো-রা দীর্ঘকাল নিজেদের ধর্ম-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে কিন্তু নতুন পুঁজিবাদী সমাজে নিজেদের শ্রেণিগত ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারে নি। যৌথ জীবনের আগল ভেঙে নান্দির মত কিছু আদিবাসী নয়া পুঁজিপতির লেজুড়বৃত্তি করে নিজেদের উত্তীর্ণ করে ভিন্ন শ্রেণিতে। শ্রেণিচ্যুত নান্দি সকলকে সমাজচ্যুত করে প্রতিশোধ নিতে চায়। শোষকের হাতিয়ার হয়ে সে আদিবাসী মেয়েদের বিক্রি করে দেয় ইট ভাটায় ; পুলিশের গুপ্তচর হয়ে সে স্বসমাজকে পর করে দেয়। নান্দির এ শ্রেণি-বদল অবশ্যই দারিদ্র্যের তাড়নায়, টিকে থাকার বাসনায় – তবুও আদিবাসী সমাজে তা ঘৃণ্য ;

কেননা আদিবাসীরা মরতে রাজী কিন্তু আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে নয়। প্রবল আত্মাভিমানের প্রকাশে তাই আদিবাসী জীবন মহিমান্বিত মহাশ্বেতার গল্পে-উপন্যাসে।

৫.২.৬

বন্ডেড লেবার বা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লিখেছেন মহাশ্বেতা বহুদিন। বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং আদিবাসী জীবন নিয়ে লিখিত উপন্যাসের আধারে লেখক বার বার এ জঘন্য প্রথার উল্লেখ করেছেন। দাস মজুরদের নিয়ে মহাশ্বেতার অনন্য গল্পগ্রন্থ *দৌলতি* (১৯৮৫)। এ গল্পগ্রন্থটির অন্তর্গত তিনটি গল্প – 'দৌলতি', 'পালামৌ' ও 'গোহুমনি'-র মূল উপজীব্য দাসমজুর প্রথা। তবে এ গল্পত্রয়ে আদিবাসী নারী দাসের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পালামৌ জেলার সেওরা গ্রামের গনোরি নাগেসিয়ার মেয়ে দৌলতি। গনোরিকে সকলে বলে টেড়া নাগেসিয়া। কেননা চন্দেলা সিং-এর কামিয়া হিসেবে সে মালিকের ধান বোঝাই গাড়ি তুলতে গিয়ে ভেঙ্গে চুরে টেড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনশো টাকা কর্জ দিয়ে যে নাগেসিয়ার জীবনমরণের মালিক বনে গিয়েছিল চান্দেলা সিং, জনমভোর ক্রীতদাসের মতো বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়েও তার ঋণ কখনও শোধ করা যায় না। তবে গনোরির জীবনে ঘটে অত্যাশ্চার্য ঘটনা, যখন দেবতারূপে আবির্ভূত পরমানন্দ সিং তার সমস্ত কর্জ মিটিয়ে তাকে কামিয়া থেকে মুক্ত মানুষে পরিণত করে। বিনিময়ে সে বিয়ে করে গনোরির মেয়ে দৌলতিকে। ব্রাহ্মণ হয়ে আদিবাসী কন্যাকে বিয়ের নাটক সে করে বটে ; প্রকৃতঅর্থে সে দৌলতিকে কিনে নেয় তিনশ টাকার বিনিময়ে। বাবার পরিবর্তে কামিয়া হয় তার মেয়ে – এ এক অনিবার্য নিয়তি আদিবাসী জীবনে। দৌলতিকে নিয়ে তোলে সে তার নিজস্ব পতিতালয়ে। দৌলতি, সোমনি, ঝালো, গোহুমনি আরও বহু আদিবাসী নারী – যাদের বাবা বা স্বামী পরমানন্দের কাছে ঋণগ্রস্ত – তারা নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে সে ঋণ শোধ করে। বিনিময়ে পায় না পেট ভরে খাবারটুকু। কাপড়, জামা ও অন্যান্য যা কিছু খরচ হয় তাও তাদের মূল ঋণের সঙ্গে যুক্ত হয়, শোধ হয় না কিছুই।

১৯৬২ সালে তিনশ টাকা লগ্নি করে দৌলতিকে দেহব্যবসায়ে বাধ্য করে তার পারিশ্রমিক হিসেবে ১৯৭০ সালের মধ্যে পরমানন্দ তুলে নেয় চল্লিশ হাজার টাকারও বেশি। তবুও মূল তিনশো টাকা এবং জামাকাপড় বাবদ বায়ান্নো টাকা শোধ হয় না। পরমানন্দ মারা গেলে তার ছেলে বৈজনাথ হয় দৌলতিদের নয়া মালিক। সে আরও দ্রুত টাকা উপার্জনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে দৌলতিদের। প্রতিদিন গ্রাহকের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় এবং খাবার খরচ ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে যায় – ফলে দৌলতির মতো মেয়েরা দুরন্ত

যৌনব্যাধি ও ক্ষয়রোগে অকালে বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যু অবধি তারা ঋণগ্রস্ত কামিয়া পরিচয়েই শ্রম দিয়ে যায় মালিক-মহাজনদের। দৌলতির মৃত্যুকে লেখক মহিমান্বিত করেছেন গল্পের অন্তিমে করুণ অথচ ঝাঁজালো বর্ণনায়। স্বাধীনতা দিবসে স্কুলের আঙিনায় আঁকা ভারতের ম্যাপের উপর পড়ে থাকে দৌলতির রক্তাক্ত শব –

> আসমুদ্র হিমাচল ভারত-উপদ্বীপের সবটুকু জুড়ে হাত-পা চিতিয়ে পড়ে আছে বনডেড লেবার, কামিয়া-রেণ্ডি দৌলতি নাগেসিয়ার নির্যাতিত, যৌনব্যাধি গলিত শব, ঝাঁঝরা ফুসফুসের সবটুকু রক্ত বমি করে।
>
> আজ, পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা পতাকাদণ্ড প্রোথিত করার একটু জায়গাও দৌলতি মোহনদের ভারতবর্ষে রাখে নি। মোহন এখন কী করবে ? ভারত জোড়া হয়ে দৌলতি। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৩৭৯)

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য স্কুলের আঙিনায় আঁকা ভারতের ম্যাপের উপর পড়ে থাকা দৌলতির রক্তাক্ত, পঁচন-ধরা শব প্রতীকী অর্থ বহন করে। সমগ্র স্বাধীন ভারত জুড়ে, কামিয়া, সেওকিয়া, বেঠবেগার, হরোয়ারা, চরোয়ারা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে দাস মজুর প্রথার অস্তিত্ব ঘোষণা করে দৌলতি।

দাসমজুর প্রথার প্রকৃত চিত্র উদঘাটন এ গল্পের মৌল অভিপ্রায় এবং তার পেছনের কার্যকারণ নির্দিষ্ট করতে অনিবার্যভাবে তাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র উপস্থাপন অবশ্যম্ভাবী। আদিবাসী জীবনের প্রান্তিকতা, অভাব-দুর্দশা চিরন্তন তবুও তার বর্ণনা পাঠক মনে বিস্ময়ের নতুন তাৎপর্যে জাগরুক হয়। গল্পের প্রথমেই লেখক আদিবাসী নাগেসিয়াদের জীবনে খাদ্যের অপর্যাপ্ততার বিষয়টি পাঠকের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করেন –

> কোনো নাগেসিয়াকে কোনো বউ সকালে ভাত ডাল পুরী কচৌরি দেয় না। এটা ওদের গভীর দুঃখের কথা। কিংবা যে স্বপ্ন সত্যি হয় না, সেই স্বপ্নের কথা। নাগেসিয়াদের বউরা সকালে স্বামীদের দেয় মকাই ছাতু বা কুরথি কলাই ঘাটো। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৩২৩)

ভাতের মতো সাধারণ খাবারও তাদের জীবনে স্বপ্ন-বিশেষ। ভাত তারা খায় বিশেষ উৎসবে, পালা-পার্বণে, করম পুজোয়, সোহরাইয়ে, দেওয়ালিতে। বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তারা ভাত খেতে পায় যদি তাদের জীবনচক্র থাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে। লেখকের ভাষায় –

> ভাত একটা স্বপ্নে-পাওয়া সম্পদ। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৩৫১)

তবে নাগেসিয়ারা তাদের এ দুর্দশাকে ললাটের লিখন বলে মেনে নিয়েছে। সৃষ্টিকর্তার বিধান বলে মেনে নেয়ায় তাদের নিরন্ন জীবনে কোন উচ্চাশা নেই। তাদের মধ্যে প্রচলিত উপাখ্যান অনুযায়ী তারা জানে এবং মানে যে, একটি নাগেসিয়া শিশুর জন্মের ষষ্ঠদিনে আকাশ থেকে বিধাতা পুরুষ পৃথিবীতে নেমে

আসে ঝুলিয়ে দেওয়া একটি হলুদ রঙা হলুদে ছোপানো সুতা ধরে। এ বিধাতা পুরষের চেহারা উচ্চবর্গীয় নেড়া-মাথা ব্রাহ্মণের মতো। এই ব্রাহ্মণ চেহারাধারী বিধাতাপুরুষই নির্ধারণ করে দেয় তাদের ভাগ্যের রেখা। নাগেসিয়াদের ঘরে সে ঢোকে না – ঝোপড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে খেরো খাতায় মোটা কলমে কায়থি হিন্দিতে সে লিখে দেয় তাদের অপরিবর্তনীয় জীবনের বৃত্তান্ত। ঝোপড়িতে থাকা, অর্ধাহারে জীবন কাটানো – একে নিয়তির লিখন হিসেবেই তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়। লক্ষণীয় যে, বিধাতা পুরুষের যে বিবরণ তাদের বিশ্বাসে আছে – তা কোনো অলৌকিক পুরুষের নয় বরং উচ্চবর্গীয় মানুষের সঙ্গেই যেন তার সাদৃশ্য বেশি। 'নেড়া-মাথা বামুনের চেহারা,' 'কায়থি হিন্দিতে খেরো খাতায় মোটা কলমে লেখা' – এসব উচ্চবর্গীয় মহাজন শ্রেণির মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে তারাই তো এসব আদিবাসীদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিধাতাপুরষের মতোই এদের হাতে নিয়তি বাঁধা থাকে ওঁরাও, নাগেসিয়া ও অন্যান্য আদিবাসীদের। শতশত বছর আগে এই জঙ্গলে পাহাড়ের দেশে যখন থেকে বহিরাগত রাজপুত ব্রাহ্মণেরা এসেছে এবং সব জমি দখল করে আদিবাসীদের সেই জমিতেই সস্তা খেতমজুর হিসেবে নিয়োগ করেছে এবং দাদন বা ঋণ দিয়ে দাস বানানো শুরু করেছে তখন থেকেই আদিবাসীদের বিধাতা পুরষ হয়ে উঠেছে তারা। তাই আদিবাসীদের বিশ্বাস সংস্কারে ও অবচেতনে বিধাতাপুরুষরূপে তারা উচ্চবর্গীয়দের প্রতিরূপই গ্রহণ করেছে।

উচ্চবর্গীয়রা তাদের স্বার্থসিদ্ধিতে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় পুরাণকে হাতিয়ার করে যুগের পর যুগ ধরে। অন্ত্যজ আদিবাসীরা যাদের দেবতা বলে সম্বোধন করে তারাই সগর্বে প্রচার করে যে, 'রামায়ন ঔর মহাভারতে লিখা আছে যে কামিয়ৌতি খতম করা অধর্ম' (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৩৭০)। ধর্মের দোহাই দিয়ে চলে তাই দাসপ্রথা সমগ্র ভারত জুড়ে বিভিন্ন নামে। অন্ধ্রের মাতাংগী, জাগ্‌গালি, মালাজাংগম, মাহার আর অন্যান্য জাতের মানুষেরা যখন দাস হয় তখন তাদের নাম হয় গোধী। বিহারের নাগেসিয়া, পারহাইয়া, দুসাদের নাম দেয় হয় কামিয়া বা সেওকিয়া। গুজরাটের চালওয়াডী, নালিয়া, ঠোরি ও অন্যরা হয় হালপাতি। কর্ণাটকের অন্ত্যজরা যখন দাস হয় তখন তাদের নাম জীথো, মধ্য প্রদেশে হয় হরোয়াহা। ওড়িশায় গোঠী আর রাজস্থানে সাগ্‌রি। তামিলনাড়ুর চেট্টি রায়তরা রাখে ভূমিদাস। উত্তরপ্রদেশে ভূমিদাসদের নাম মাত্‌ বা খান্ডিত-মুন্ডিত বা সঞ্জায়ত। লাক্ষাদ্বীপের ভূমিদাসেরা হল নাদাপু। নাম যাই হোক প্রথাটি দাসপ্রথা ; বহু নামে তা বিদ্যমান সমগ্র ভারত জুড়ে। আদিবাসী, অন্ত্যজরা এ প্রথার বলি হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

আদিবাসী সংস্কারে আদমশুমারি বা মানুষ গণনা খুব অধর্মের কাজ। ১৯৬১ সালে লোক গণনা বা আদমশুমারিতে মোহন ও অন্যান্য নাগেসিয়া সরকারি লোকদের শুমারিতে সহায়তা করেনি কেননা তাদের

বিশ্বাসে মানুষ গুণলে আকাল আসবে, ঘরে ঘরে বোবা আর কালা সন্তান জন্মাবে। নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকলেও অজ্ঞতা বা সংস্কারবশত তাতে অংশগ্রহণে তারা অনিচ্ছুক। নির্বাচনের পর মুনাবর সিংয়ের কাছারির সামনের বেলগাছটি চৈতালি ঝড়ে পড়ে গেলে রটিয়ে দেওয়া হয় যে, এতদিন এক বরমপিশাচ গাছটি থাকতেন, তিনি রেগে চলে গেলেন এবং তাতে সামনে অমঙ্গল আসছে। বলা বাহুল্য যে, বরমপিশাচ নির্বাচনের কারণেই রেগে গেছেন। বস্তুত এ সমস্ত সংস্কার আদিবাসীদের নিজস্ব নয় বরং উচ্চবর্গীয় কর্তৃক আরোপিত। আদমশুমারি বা নির্বাচনের অংশ নিয়ে ব্যক্তি হিসেবে আদিবাসীদের আত্মপ্রকাশ তাদের কাম্য নয় – সে কারণেই তারা সুকৌশলে আদিবাসীদের মনে এ ধরনের ভীতির আবরণ সৃষ্টি করে এবং তাদের ব্যক্তি হয়ে ওঠার পথ নিরুদ্ধ করে দাস হিসেবে বহাল রাখে আবহমান কাল ধরে।

উচ্চবর্গীয়রা অন্ত্যজ আদিবাসীদের দামিয়ে রাখতে ধর্মের পাশাপাশি নিপীড়ন, নির্যাতনকেও ব্যবহার করে সমানভাবে। আদিবাসীরা ঘর তুললে, মোষ কিনলে বা জমি কিনলে মালিক বা উচ্চবর্গীয়রা তা কেড়ে নেবে। মাথার ছাতা, পায়ের জুতো কিনলে ঘরের উঠোনের খুঁটিতে বেঁধে পিটাবে। ছেলের বিয়ে বা মেয়ের দ্বিরাগমনে বা মায়ের ক্রিয়া-কর্মে মালিকের পায়ের কাছে নজরানা নামিয়ে অনুমতি চাইতে হবে। স্বাধীন আদিবাসীদের সমগ্র জীবন আজ কমৌয়তির শৃঙ্খলে মালিকের কাছে বাঁধা। সে-বন্ধন থেকে যেন মুক্তি নেই কারো। মূলত পেটের খিদে মেটাতে তারা ঋণগ্রস্ত হয় – কামিয়া বনে। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন বিয়ের জন্য, শ্রাদ্ধের জন্য, পালাপরবের জন্য, প্রায়শ্চিত্তের সমাজভোজের জন্য আদিবাসীরা ঋণগ্রস্ত হয়। তাদের সমাজে জেল খেটে বেরোলে বা কোনো অপরাধ করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সমাজকে ভোজ খাইয়ে – সামাজিক এ প্রথা অনেক সময় তাদের ঋণের দাস হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে আদিবাসীদের ভূমিহীনতাই এর মূল কারণ। আদিবাসীদের জমি দখল করে নিয়েছে উচ্চবর্গীরা। কৃষিযোগ্য ভূমিহীন আদিবাসী সমগ্র জীবন কোনোরকমে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগড়ে থাকে সচেষ্ট অথচ তাদের জীবনেও থাকে বিয়ে, শ্রাদ্ধ নানা সামাজিকতা। সে-দায় মেটাতে ছুটতে হয় মহাজনের কাছে, যে মহাজন ছিনিয়ে নিয়েছে তাদেরই জমি। মহাজনের কাছে একবার ধার নিলে তা শোধ হয় না সাতপুরুষেও – কেননা ধারের একশো টাকা কোন হারে একপুরুষে দশ হাজার টাকায় পরিণত হয় – তা বুঝে উঠতে পারে না নিরক্ষর সরল আদিবাসীরা। ভূমিহীন আদিবাসীরা তাই অনিবার্যভাবে পরিণত হয় ভূমিদাসে।

৫.২.৭

'দৌলতি' গল্পে দাসমজুর বা নারী দেহবিক্রির যে সত্য ঘটনাবলি অবলম্বিত হয়েছে, 'পালামৌ' গল্পের মূল ঘটনাও অনুরূপ, তবে এ গল্পে দাসমজুর জীবনের জাগরণকে ধারণ করা হয়েছে। 'পালামৌ' গল্পের মূলচরিত্র বাসমোতি ভুইন অন্ত্যজ নারী, আদিবাসী নয়। তাদের সংলগ্ন গ্রামে খারোয়ারদের বসতি। লেখকের ভাষায় – 'ভুঁইয়ারা অন্ত্যজ, খারোয়াররা আদিবাসী' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৩৮০)। অন্ত্যজ আদিবাসী সমাজকে মিলিয়ে দেখেছেন মহাশ্বেতা তাঁর অধিকাংশ রচনায়। অন্ত্যজ নারী এবং খারোয়ার মাধে সিং এর প্রণয়-সম্পর্ককে তিনি একসূত্রে গেঁথেছেন। মাধোর সূত্রে খারোয়ারদের ঐতিহ্যময় অতীতকে স্মরণ করেছেন। চেরোরা যতবার মুগল, মারাঠা, ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করেছে, খারোয়াররা চেরোদের সঙ্গে থেকে লড়াই করেছে। কোলদের বিদ্রোহেও তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে আর লড়েছে তাদের নিজস্ব লড়াই, যাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল সাঁওতাল তথা খারোয়ার বীর নীলাম্বর আর পীতাম্বর; ভারতের ইতিহাসে যে সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ হয়নি। তবে পালামৌয়ের দুর্ধর্ষ বীরের জাতি খারোয়াররা তাদের অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে তুলে আবারও মেতে উঠে বন্ধুয়া মুক্তি সংগ্রামে। পালামৌ-এ দাসমজুরদের আরেক নাম বন্ধুয়া – ১৯৭৬ সালে আইন করে এ প্রথা বাতিল করা হয়। সরকারি দপ্তর থেকে মুক্ত বন্ধুয়া পরিবার পিছু চার হাজার টাকা এবং জমি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বাস্তবে সে-অর্থ সাহায্য পৌঁছে না বন্ধুয়াদের কাছে – তাদের মালিকেরাই তা দখল করে নেয় প্রশাসনের যোগসাজসে। 'পালামৌ' গল্পে এ প্রথার স্বরূপ ও প্রথামুক্তির প্রচেষ্টা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৫.২.৮

দৌলতি গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'গোহুমনি' – যার শাব্দিক অর্থ মাদী গোখরা সাপ। বিশাল ভুঁইয়ার বিধবাকে সবাই গোহুমনি বলে, তার প্রকৃত নাম ঝালো। নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য গোখরা সাপের মতো প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছিল বলে তার নামকরণ হয় গোহুমনি। আদিবাসী অন্ত্যজ সমাজে ঘটনাটি ব্যতিক্রম – কেননা অন্ত্যজ মেয়েরা বরাবরই মালিক-মহাজনের কাছে নিজেদের সম্ভ্রম বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয় – প্রতিবাদ, প্রতিরোধ হয় না কখনওই। সে প্রেক্ষিতে ঝালো এক সাহসী নারী ভুজঙ্গের মতোই আত্মরক্ষায় প্রস্তুত।

দৌলতি গল্প সংকলনের ভূমিকায় লেখক 'গোহুমনি' গল্প সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতার কথা জানিয়েছেন। পালামৌ জেলায় ভারতের বহু জায়গার মতো ভূমিদাস বা বনডেড লেবার প্রথা খুবই প্রচলিত। ১৯৭৬

সালে প্রথাটি নিষিদ্ধ হলেও আজও তা চালু আছে বহু অঞ্চলে। ১৯৭৯/৮০ সালে পালামৌ জেলায় সংগঠন গড়ে বনডেড লেবাররা, ভারতে প্রথম। এরা আন্দোলনও করে। 'গোহুমনি' সেই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লেখা।

আদিবাসীদের সঙ্গে মহাশ্বেতার আত্মিক সম্পর্কের সূত্রপাত পালামৌ ডালটনগঞ্জ থেকেই হয়। ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি এ অঞ্চলে বহুবার যাতায়াত করেছেন। ১৯৮২ সালে তিনি তাঁর কর্মস্থল বিজয়গড় কলেজ থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে দৈনিক যুগান্তরের গ্রামীণ সংবাদদাতা হিসেবে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ান এবং প্রধানত আদিবাসী অন্ত্যজ জনমানুষের জীবন-যাপনের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে খুব কাছে থেকে চিহ্নিত করে প্রশাসনের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য সাপ্তাহিক কলামে নিয়মিত লেখেন। ১৯৮৪ সালে কলেজের চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় আদিবাসী হরিজনদের সমস্যাগুলো সমাধানের নিমিত্তে নিয়মিত কলাম লিখতে থাকেন। এ সময় পালামৌয়ের বনডেড লেবার প্রথার বিষয়ে প্রচুর লিখেছেন পত্রিকায় এবং একই সঙ্গে গল্প ও উপন্যাসে। কেবল লিখেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেননি তিনি – সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন পালামৌয়ের বন্ডেড লেবারের মুক্তি ও অধিকার আদায়ে। এ লক্ষ্যে ডালটনগঞ্জের সাংবাদিক রামেশ্বরমের সঙ্গে মহাশ্বেতা ১৯৮৩ সালের মে দিবসে এক সভার আয়োজন করেন এবং এ সভায় গঠিত হয় 'পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তিমোর্চা'।

মহাশ্বেতার গল্প-উপন্যাসের আদিবাসী জীবন কল্পিত নয় – বাস্তব, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর একটি বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন –

> "এই বই দুটির প্রেক্ষাপট, মানুষজন, গ্রাম, নদী, রাস্তা সবই আমার নিজের দেখা এবং নিজের জানা।" তিনি আরও জানিয়েছেন – ''এমন একটা ঘরের বর্ণনা দিইনি যেখানে নিজে থাকিনি, এমন খাদ্যের কথা লিখিনি, যা খাইনি, এমন নদী বা পুকুরের কথা লিখিনি, যেখানে স্নান করিনি।" (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ১১-১২)

লেখকের এ বক্তব্য কোনো নির্দিষ্ট রচনার জন্য নয়, বরং তাঁর অন্য সব রচনার জন্যও প্রযোজ্য।

৫.২.৯

নৈঋতে মেঘ (১৯৭৯) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'শিকার' গল্পটি আদিবাসী নারী-চরিত্র প্রধান। আদিবাসী নারীর প্রতিশোধ নেয়ার কাহিনি এটি। গল্পের প্রধান চরিত্র মেরী ওঁরাও জন্মগতভাবে পুরোপুরি আদিবাসী নয়। তার মা ওঁরাও, বাবা অস্ট্রেলিয়ান সাহেব ডিক্সন। যদিও সে জীবন-যাপন করে আদিবাসীর ; কিন্তু আদিবাসী সমাজ তাকে নিজেদের বলে কাছে টেনে নেয় না, কোনো আদিবাসী ছেলেও তাকে বিয়ে করতে

রাজি নয়। জালিম নামে এক মুসলমান ছেলেকে সে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে। ঘটনাসূত্রে গ্রামে আগত ঠিকাদার তশীলদার সিং মেরীর অধিকার পেতে জোর খাটায়। শিকার পরবের রাতে মেরী তশীলদার সিংকে প্রলোভিত করে নির্জনে নিয়ে তাকে হত্যা করে। সবচেয়ে বড় শিকার নিষ্ঠুর মানুষকে কেটে টুকরো করে খাদে ফেলে সে পালিয়ে যায় তার প্রণয়ী জালিমের কাছে। মেরী যেন তার জন্মের প্রতিকার করে এ ঘটনার মাধ্যমে ; বিদেশিরা আদিবাসী মেয়েদের প্রলোভিত বা বাধ্য করে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে এবং তার ফল ভোগ করে মেরীর মতো দোআঁশলা সন্তানেরা – আদিবাসী সমাজ যাদের গ্রহণ করে না। এ কাহিনিকেও সত্য বলে অভিহিত করেছেন মহাশ্বেতা, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সঙ্গে কথোপকথনের[৫] এক পর্যায়ে তিনি বলেন –

> গল্পে যাকে মেরি ওঁরাও বলেছি, তাকে দেখেছি। বিহারেও আছে বাৎসরিক শিকার পরব। এ ছিল ন্যায় বিচার উৎসব। শিকারের পর সমাজপতিরা অপরাধীর বিচার করতেন, ওরা পুলিশের কাছে যেত না। সাঁওতালী ভাষায় এটা ল-বির্। 'ল' মানে আইন, 'বির' মানে জঙ্গল। আর বিহারে, প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এটা 'জানী-পরব।' মেয়েদের শিকার উৎসব। ওই গল্পে বর্ণিত সকল ঘটনাই সত্য। সেদিন মেরি যা করে, ওখানে তা বারবার ঘটেছে। আদিবাসী সমাজে নারী ধর্ষণ, স্ত্রীলোককে অমর্যাদা, অবমাননা করা বৃহত্তম অপরাধ। ধর্ষণ ওরা জানে না। আদিবাসী সমাজে মেয়েদের সম্মান আছে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৫৬১)

আদিবাসী চেতনাসমৃদ্ধ 'শিকার' গল্পে আদিবাসী জীবনের দুর্দশা ও গৌরব – উভয় প্রান্তই আলোকিত হয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদে আদিবাসীরা এক সময় দলে দলে মিশনের আশ্রয় নিয়েছে, ধর্মান্তরিত হয়ে ক্রিশ্চান ধর্ম গ্রহণ করেছে, আবার দুঃসময় কেটে গেলে প্রয়োজনবোধে ক্রিশ্চান ধর্মের খোলস ছাড়িয়ে স্বধর্মে ফেরত এসেছে। ঔপনিবেশিক কালপর্বের নিম্নবর্গীয় সমাজের এ এক সাধারণ চিত্র। এ গল্পে মেরীর মা ভিকনি ক্রিশ্চান ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং সে-সূত্রে সাহেব বাংলাতে কাজ পায় ; পরবর্তী সময়ে যখন সায়েবের ছেলের সন্তান মেরীকে জন্ম দেয় – গীর্জার পাদরি মেরীর নামকরণ করেন। কিন্তু সায়েবদের স্বদেশে ফিরে যাবার পর রাঁচির প্রসাদজী বাংলো কিনে নিলে, প্রসাদজীর চাপে চাকরি টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ক্রিশ্চান ধর্মকে সে ত্যাগ করে। নিম্নবর্গীয় জীবনে ধর্ম কোনো বিশ্বাসের তাৎপর্য নিয়ে আসে না ; বেঁচে থাকা, নিজ সন্তানাদিকে বাঁচিয়ে রাখাই তাদের একমাত্র ধর্ম ; লৌকিক ধর্মাদি সেখানে তুচ্ছ। যখন তখন প্রয়োজনে ধর্মের নির্মোকমুক্ত হতে পারলেও সংস্কারকে ছাড়তে পারে না আদিবাসীরা, কেননা সংস্কার মিশে থাকে তাদের রক্তের প্রতিটি কণিকায়। ওঁরাও যুবকরা মেরীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে কিন্তু তার কাছে আসতে পারেনি। লেখকের ভাষায় –

> আদিবাসী যুবকদের কাছে মেরীর গায়ের রং একটা প্রতিরোধের দেওয়াল। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৩৫২)

আদিবাসীরা স্বজাতের বাইরে বিয়ে করে না বা করার কথা ভাবতেও পারে না। মেরী ওঁরাও মায়ের সন্তান হলেও বাপ সায়েব। তামাটে গায়ের রঙের মেরী আদিবাসী যুবকদের কাছে তাই অনাহুত। আদিবাসীরা তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে কঠোর রীতিনীতি মেনে চলে। গোত্রের বাইরে তারা বিয়ে হতে দেয় না – ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই এ নিয়ম প্রযোজ্য। আদিবাসীদের সব গোত্রের সমাজই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। সামাজিক নিয়মের কঠোরতাই বহু শত বছর ধরে আদিবাসী স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পন্থা হিসেবে কার্যকর থেকেছে। সে-কারণেই নারীদের সম্ভ্রম রক্ষায় তারা সদাসতর্ক। আদিবাসী নারীর ধর্ষণে তারা জ্বলে ওঠে ক্ষোভে। উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম কারণ আদিবাসী নারী ধর্ষণ।

আদিবাসী জীবনে বন-জঙ্গল, বৃক্ষ বিশেষত শালগাছের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহাশ্বেতার বহু গল্প-উপন্যাসে আদিবাসী জীবনে শালগাছের কার্যকারিতার বিবরণ রয়েছে। শালগাছের পাতা, বাকল, ফুল সবই তাদের জীবনে অতি প্রয়োজনীয়। শাল তাই তাদের জীবনে দেবতার স্থান অধিকার করে আছে। পক্ষান্তরে অ-আদিবাসী দৃষ্টিতে শাল একটি নিস্ফলা বৃক্ষ যার কাঠও সেগুনের মতো দামি নয়। মহাজন গোত্রভুক্ত লালচাঁদ আর মুলনি, প্রসাদকে প্রাচীন শালগাছ বেচে ফেলতে পরামর্শ দেয় এ বলে যে, এ গাছে ফুল হয়, ফল হয় না। সুতরাং অদরকারি এ বৃক্ষাদি কেটে ফেলার জন্য বিক্রি করে দেয়াই ভালো। শালগাছের প্রতি আদিবাসী অ-আদিবাসীর দৃষ্টিভঙ্গির তফাত এ দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার পার্থক্যকেই সূচিত করে। এক সম্প্রদায় প্রকৃতি-নির্ভর প্রকৃতি-লালিত, অন্যদল প্রকৃতি বিধ্বংসী। অথচ প্রকৃতির সন্তান এ আদিবাসীদের দারিদ্র্য ও সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের হাতিয়ার করে প্রকৃতি ধ্বংস করে অন্য দল। বনের শালগাছ কাটার ঠিকাদার আদিবাসী মুণ্ডা, ওঁরাও মেয়ে-পুরষদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে। গাছ কাটে অবশ্য অন্য লোক। আদিবাসীরা কেবল কাটা গাছের ডাল-পালা ছেঁটে, কাটা গাছ টুকরো করে ট্রাক পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়। এ কাজে তারা পুরুষদের দেয় দিনে বারো আনা, মেয়েদের আট আনা আর দুপুরে মকাইয়ের ছাতু টিফিন, ছাতুর সঙ্গে লবণ এবং লঙ্কা। দরিদ্র আদিবাসীদের কাছে এ এক অভাবনীয় প্রাপ্তি, বিস্ময়কর দান। তারা কখনও ভেবে দেখেনি বিনিময়ে তারা কী করছে। ভেবে দেখার অবসর বা ক্ষেত্রও নেই তাদের। কারণ আগে তাগিদ পেটের, জীবনের। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন –

> একদা এক আদিবাসী আমাকে বলেছিল, গাছ কাটতে বলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা আমি কেটে দেব। মাথা কাটতে বলো, কেটে দেব। কেননা দিনান্তে পাঁচ টাকা আমার চাই। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৫৬১)

আদিবাসী জীবনে শালের মতো মহুয়ার উপযোগিতাও অনেক। মহুয়া তাদের কাছে ক্যাশ ফল। কেননা মহুয়া থেকে মদ হয়। মহুয়া ফুল শুকিয়ে তা গুঁড়ো করে পিঠা হয়, মহুয়া ফলের কালো বিচির তেল কালচে কাপড়কাচা সাবান তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মহুয়া সুলভও বটে – সরকারি কানুনে জঙ্গল অঞ্চলে কারো বাড়িতেও যদি মহুয়া গাছ থাকে, তাতেও যে তুলবে তারই অধিকার মহুয়া ফুলে। অর্থাৎ কুড়িয়ে নিলেই মালিক বনে যাবে – এ আইন আদিবাসী জীবনে বাঁচবার সুযোগ করে দিয়েছে।

আদিবাসী জীবনের এক আবশ্যিক অঙ্গ শিকার পরব। শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে হোলির দিন শিকার খেলে তারা। হাজার লক্ষ চাঁদ ধরে তারা এ পরব পালন করে এসেছে – যদিও অধিকাংশ আদিবাসী আজ এর ঐতিহ্য তাৎপর্য বিস্মৃত। আদিম জীবনে বন্য এবং বন্য জন্তু শিকার ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। আজ বন শূন্য, শিকার খেলা নিরর্থক। তবুও তারা তাদের এ উৎসবকে যাপন করে আসন্ন প্রাপ্তির উপলক্ষ্য সামনে রেখে এবং একইভাবে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে স্মরণে রেখে। শিকার উৎসবে তারা মানবীয় প্রবৃত্তিকেও শিকার করে। অপরাধের বিচার হয় এ উৎসবের আগে। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করে বা মেনে নিয়ে শুদ্ধ চিত্তে কেবল এ উৎসবে অংশ নেয়।

শিকার খেলার নিয়মে দ্বাদশ বর্ষে আসে জানী পরব মানে মেয়েদের শিকার খেলা। বারো বছর পুরুষেরা এ দিনে শিকারে যায়। বারো বছরে একবার আসে মেয়েদের পালা। পুরুষদের মতো তারাও এদিন পহান নাগারায় ঘা দিতেই কুলকুলি তীক্ষ্ণ আওয়াজে আকাশ চিরে বের হয় বলোয়া-তির ধনুক নিয়ে। জঙ্গলে পাহাড়ে ছোটে ; শজারু, খরগোশ, পাখি যা পায় তাই মারে। তারপর সবাই মিলে বনভোজন করে, মদ খায়, গান গায়, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। তখন হোলির আগুন জ্বেলে ওরা গল্প করতে বসে। গল্প শোনায় বুড়িরা, প্রৌঢ়ারা রাঁধে আর জোয়ান মেয়েরা গান গায় –

> হোলিতে আগুন, রে হোলিতে আগুন
> তুমি দেখে দেখে ঘরে এসো ভুলে থেকো না – (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৩৬২)

গান একটি আবশ্যিক উপাদান শিকার পরবের। অবশ্য সব উৎসব পরবেই তারা গান গায়। আদিবাসীদের লেখার লিপি নেই, যখন যা ঘটে, তাই নিয়ে তারা গান বাঁধে। যুদ্ধ, লড়াই, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আনন্দ, বেদনা – সকল স্মৃতিই ওরা ধরে রাখে গানে গানে।

মেয়েদের শিকারের দিনে পুরুষেরা শিকার খেলে না। তারা মদ খায়, হোলির গান বাঁধে নতুন। সং সেজে গান গেয়ে পয়সা তোলে। এহেন শিকারের দিনেই মেরী শিকার করে সবচেয়ে বড় জানোয়ার

তসিলদারকে। এ কাহিনিবৃত্তে আদিবাসী দৃষ্টিতে নিপীড়ক, নারী ধর্ষক ব্যক্তিকে জানোয়ারের সঙ্গে তুলনীয় করে তাদের নিধন কাম্য বলেই লেখক পাঠকের অনুভূতির সূত্রে একাত্ম হয়েছেন।

৫.২.১০

মহাশ্বেতা বেশকিছু নারীচরিত্রকেন্দ্রিক গল্প রচনা করেছেন বটে তবে আলাদা করে নারী নয়, নর-নারী-শিশু নির্বিশেষে সমগ্র শোষিত সমাজকেই তিনি লেখার বিষয় হিসেবে এনেছেন। নারীদের কেবল যে দাস নয় বরং যৌনদাস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যই এ গল্পগুলোর অবতারণা। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন –

> দৌলতি, বাসমোতি, গোহুমনি নারী চরিত্রই বটে। কিন্তু শোষণ চলছে নরনারী শিশু নির্বিশেষে একটি শ্রেণির উপরেই, সে কথা আমি কখনো লিখতে ভুলিনি। লিঙ্গভেদ কারণে পৃথকীকরণ করিনি। আমি যা দেখেছি, দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে অবস্থিত সমগ্র সমাজটিই শোষিত (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ১০)।

নারী চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পগুলোর যেমন উপজীব্য মূল বিষয় দাস মজুর কিংবা শ্রমিক মালিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, এ বিষয়টি আরও বিস্তৃত হয়েছে আরও বেশ কিছু গল্পে – ‘হুলমাহার মা’, ‘ফারকাটি’, ‘ভাতুয়া’, ‘জাতুধান’, ‘জগমোহনের মৃত্যু’, ‘শিশু’, ‘নুন’, ‘বিছন’, ‘প্রেতোৎসব’ ইত্যাদি গল্পগুলোরও কেন্দ্রবিন্দু দাসমজুর প্রথা এবং তা থেকে মুক্তিকামী জনতার বিদ্রোহ। শোষণ-বঞ্চনা এবং বিদ্রোহের ডামাডোলে ব্যাপৃত আদিবাসী জীবন গল্পগুলোতে শিল্পিত হয়েছে অপার মমতা, সংক্ষোভ এবং ক্রোধের স্ফুলিঙ্গে।

‘হুলমাহার মা’ (১৯৮২ সালে গ্রন্থভুক্ত) এবং ‘ফারকাটি’ (১৯৮১) দু’টি গল্পই ১৮৫৬-র সাঁওতাল মহাবিদ্রোহের পটভূমিতে এবং দাসমজুর বা বান্ধাবেগার প্রথাকে কেন্দ্রে রেখে রচিত। সাঁওতালি ভাষায় হুল মানে বিদ্রোহ আর হুলমাহা মহাবিদ্রোহ। ‘হুলমাহার মা’ গল্পের কেন্দ্রে আছে মহনি নামক নারী – যার বাবা, স্বামী এবং পুত্র – তিন পুরুষের তিনজনই ঋণের দায়ে মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। মহনির বাবা ছটরায় তার অনাগত সন্তানকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে মালিকের ধান বোঝাই গাড়ি উঠিয়ে মৃত্যুবরণ করে। স্বামী ভোমর নতুন করে ঋণগ্রস্ত হয়ে ক্রীতদাস হবার ভয়ে দেশান্তরী হয়, আর পুত্র ছটরায় ক্ষুধার জ্বালায় ধানের বদলে নিজেকে বিকিয়ে দেয় মহাজনের কাছে। মহাজনের অন্যায় জুলুম, শোষণ-বঞ্চনা আর দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যখন সিধু কানুর হুল শুরু হয় ; ছটরায় নিজেকে দাসত্বের শেকল থেকে মুক্ত করে হুলে যোগ দেয় এবং পীরপৈঁতির যুদ্ধে শহীদ হয়। মৃতছেলের কোমর থেকে দাসত্বের চিহ্ন শেকলটি নিয়ে মহনি ছোটে কামারদের কাছে – লোহার শেকলকে যুদ্ধের অস্ত্র তীর, বর্শায় পরিণত

করতে। কাহিনিগ্রন্থিতে প্রতীকায়নের সুযোগ রয়েছে। চিরকালই দাসত্বের বন্ধন থেকেই বিদ্রোহের সূচনা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, যুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত এ নারীকে হুলমাহার মা অভিধায় সম্মানিত করা হয়। গোর্কীর মায়ের সঙ্গে হুলমাহার মায়ের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই সমগ্র জীবন শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছে এবং নিজ সন্তানের শোষণ-বিরোধী সংগ্রামে একাত্ম হয়েছে।

সাঁওতাল সমাজের সবচেয়ে বড় শক্তি তাদের একাত্মবোধ, ১৯৫৬-র মহাবিদ্রোহের নিয়ামক হিসেবেও তা কাজ করেছে। এ বিদ্রোহ হঠাৎ করে একদিনের ঘোষণা বা মুহূর্তের উত্তেজনায় সৃষ্ট নয়। এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল সাঁওতাল সমাজের একত্রিত হবার বহু কাহিনি। মহাবিদ্রোহের বছর খানেক আগে থেকেই সাঁওতালদের মধ্যে ঘরে ঘরে সই পাতানোর রীতি চালু হয়। সই পাতালে একে অপরের পরিবারভুক্ত হয়, সাঁওতালদের মধ্যে দৃঢ় মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়। সকল শ্রেণির সাঁওতালদের মধ্যেই এ সই পাতানো চলে। রাখাল সাঁওতাল ছেলেরা একসঙ্গে গরু চরায় বা গুলিডাব, কাতি খেলা খেলে তো তারা হয় মিতা। মেয়েরা করম পরবে এ ওর মাথায় করমপাতা গুঁজে দেয় তো তারা হয় এ ওর করমডোর ; শালপাতার কোরক পরিয়ে দিলে হয় এ ওর শালপাতা। সই পাতালে জোহার বা সম্ভাষণ করতে হয় ; এ ওকে জোহার করে। এক জন আরেক জনের ঘরে খায় এবং নিজেদের এক পরিবারভুক্ত জ্ঞান করে। বস্তুত আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধিকাংশই কৌমভুক্ত – তাদের একক সত্তার চেয়ে তাদের সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ; যে সমাজে অনাথ বলে কোন কথা নেই, যে সমাজে সবাই সবার জন্য। সই পাতানোর মধ্যে দিয়ে বহু সমাজের একত্রিতকরণ হুলের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে কাজ করেছে এবং সংঘবদ্ধ শক্তির জয়ের ইতিহাসকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

সংঘবদ্ধ জনজীবনে উৎসব বা পরব বিশেষ তাৎপর্য বহন করে ; কেননা এই পরবের সূত্র ধরেই যৌথজীবন বাহিত হয়। সাঁওতাল জীবনে পরবের তাই কমতি নেই – লাঁগড়ে, ঝিকা, বাহা, করম – বহু উৎসবে তারা নাচে, হাঁড়িয়া খায়। সেন্দ্রে রেয়ান, শিকার পরবে গ্রামে শালগাছের ডাল নিয়ে যায় – মহনির বাপ ছটরায়ের মন্তব্যে এ উৎসবগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহনির বিয়ের সূত্রে পাওয়া যায় সাঁওতাল সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠানের আচারাদি ; জন্ম, মৃত্যু এবং বিয়ে – অন্য সব সমাজের মানুষের মতো সাঁওতাল সমাজেও জীবনের এ তিন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব পালিত হয়। সন্তান জন্মের পর ধাই বুড়ি পায় কাপড়, ধান, বালা। প্রথমবার নামকরণের অনুষ্ঠান নাপ্তা, দ্বিতীয় নামকরণকে বলা হয় চাতিয়ার। মেয়ে হলে রাখা হয় ঠাকুমার নামে এবং দ্বিতীয় সন্তান ছেলে হলে নামকরণ করা হয় মায়ের বাপের নামে। মহনির যেমন নামকরণ হয়েছিল তার ঠাকুমার নামে শুকুমনি এবং

মহনির ছেলের নাম তার বাবার নামে ছটরায় নির্ধারিত হয়। সন্তানের জন্মে ও নামকরণে সমাজের লোককে ভোজ খাওয়াতে হয়।

বিয়ের ক্ষেত্রে দু'ধরনের ব্যাপার ঘটে – ত্রিওর বলঃক রেয়ান অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতিতে অথবা ইপুতুৎ রেয়ান অর্থাৎ জোর করে সিঁদুর দেয়া। পারস্পারিক সম্মতির ক্ষেত্রে রায়বারিচ বা ঘটক আসে কনের বাড়িতে। আনুষ্ঠানিক ভাবে জিজ্ঞাসা করে –"আমাদের তো ছেলে আছে। বল তোমার ঘরে আসার পথ কি খোলা আছে ? আমরা তো জানি পথ খোলা আছে" (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৫০২)।

তারপর কনে দেখার পালা। বরপক্ষের আগমনের পথে বাঘের ছাপ থাকা, আসার কালে মেয়েদের জল আনতে দেখা এসব সুলক্ষণ বলে ধরা হয়। অতিথিদের সম্মান দেখাতে মেয়েদের জল আনতে হয়। যে মেয়েকে দেখতে আসে তাকে মাঝখানে রেখে তিনটি মেয়ে জল নিয়ে আসে। তারপর সারসাগুন অর্থাৎ শুভাশুভ বিচার করে দিনক্ষণ ঠিক হয়। বিয়েতে গ্রামসমাজের নেতৃস্থানীয় যারা মাঝি, পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক প্রত্যেকেরই করণীয় থাকে এবং তারা সে-দায়িত্ব পালন করে নিষ্ঠার সঙ্গে।

বিয়ের সময় কনে বরের মায়ের কাছে তেল হলুদ, সিঁদুর নেয় এবং তাকে দেয় ; সকলের সামনে ধর্মমতে স্বামীকে স্বীকার করে নেয় এবং আরও স্বীকৃত হয় যে, স্বামী খেটে পিটে ঘরে এল জল, দাঁতন দেবে এবং শ্বশুরঘরের সকলকে জল দেবে, সেবা করবে। নামকরণ, বিয়ের এ আচারাদি তাদের নিজস্ব ; এ অনুষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়েই তারা তাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে ধারণ করে, লালন করে।

আদিবাসীদের জীবন সাদামাটা, বিলাসব্যসন বর্জিত। কঠোর পরিশ্রমে তারা নিজেরা তাদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি তৈরি করে এবং পারস্পরিক বিনিময় প্রথায় নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। সাঁওতাল সমাজেও নানা পেশার লোক আছে, যেমন টুডুরা লোহার জিনিস বানায়। একসময় সাঁওতালরা নিজেদের কাপড় গামছা বুনে নিত, কুলা-ঝুড়ি-টোকা বানাতো, লবণ মাটি থেকে লবণ নিষ্কাশিত করতো। মুদ্রাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় ছিল না তাদের। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা মেটাতো তারা। কিন্তু দিকু বা অ-আদিবাসীদের আগমনে যখন মুদ্রার প্রচলন হল, মুদ্রার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য হাট স্থাপিত হল এবং নানা বিলাসদ্রব্য যথা কাঁচের চুড়ি, গলার রঙিন কাঁকই, আয়না, পুঁতি ও পিতলের মালা, ঝকঝকে ছবি, গলায় পরার জন্য সুতোয় গাঁথা পিতল ও দস্তার নকল মোহর এল, তখন শস্য বেচা পয়সায় মন-ভুলানো জিনিস কিনে সর্বস্বান্ত হল তারা এবং অবধারিতভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হল।

দিকুদের তৈরি বিলাস-দ্রব্য কেনার আগে যে সাঁওতাল মেয়েরা সজাসজ্জা করতো না তা কিন্তু নয়। তারা হাতে লোহার বালা, কাঠের কাঁকন, কানে শোলার গুঁজি, গলায় কুঁচের মালা, চুলে ফুল পরতো।

সাজসজ্জার এ উপকরণ ছিল তাদের নিজেদের তৈরি বা প্রকৃতি প্রদত্ত ; তাতে তাদের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হতো না।

ঋণগ্রস্ত সাঁওতালরা অনেক সময় দাসমজুর হবার ভয়ে আড়কাঠির খপ্পড়ে পড়ে দূর দেশে চলে যেত এবং আরেক দাসপ্রথার শিকার হতো। আড়কাঠির প্রলোভনে নিজ জাতিগোষ্ঠী, পরিবার সব ছেড়ে চিরদিনের মতো আদিবাসী পরিচয় মুছে কুলি পরিচয় ধারণ করতো। এই ছিল সহজ সরল আদিবাসীদের নিয়তি। গোষ্ঠী-পরিচয় বিলুপ্ত হওয়া কৌমজীবনের অধিকারী এ মানুষগুলোর জন্য মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর।

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবনে নেতৃত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সাঁওতাল সমাজে নেতৃত্বস্থানীয় পদ – পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক। তারা সমাজের সকল ভাল-মন্দে সকলের দেখাশুনা করে। ভাদ্রের ক্ষুধা আর কার্তিকা টান এড়াতেই মানুষেরা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বান্ধাবেগার হয়। সর্বনাশা এ পরিস্থিতির প্রতিরোধে পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক সাঁওতালদের ধান কর্জ দেয় – দেড় গুণ ফেরত পাবার শর্তে, কিন্তু যে পারবে না তাকে সুদ দিতে হবে না, কেবল আসল দিলে চলবে। যে তাও দিতে পারবে না, তাকে দিতে হবে না কিছুই – পারলে গায়ে খেটে সাহায্য করবে। কিন্তু সাঁওতাল নেতাদের সামর্থ্য সীমিত, তারা নিজেরা তো যথেষ্ট ধনী নয়। যতদিন তাদের গোলায় ধান আছে, ততদিনই তারা কেবল এ ব্যবস্থা চালু রাখতে পারে। নেতৃত্বের এ উদারতা গোষ্ঠীবদ্ধ এ সমাজের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ করে পাঠকের হৃদয়।

আদিবাসী গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি তাদের ঐক্যবদ্ধতায়। এ জোরেই তারা একসময় তিরপুরি সাহাবাবুকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে এবং দিকুদের গ্রামে বসতি করতে দেয় না। কিন্তু একসময় বান্ধাবেগারিতে যখন বিপর্যস্ত হয় সামাজিক বন্ধন ; শালগাছে গিরা দিয়ে ডাক দেয় তারা হুলের এবং প্রবলভাবে প্রতিহত করে ঔপনিবেশিক শক্তিকে এবং বাধ্য করে নিজভূম থেকে দিকু মহাজনদের তাড়িয়ে জঙ্গল-মহল প্রতিষ্ঠা করতে।

৫.২.১১

মহা হুলের পটভূমিতে বান্ধাবেগার বা দাসমজুর প্রথার যন্ত্রণাদীর্ণ আরেকটি গল্প 'ফারকাটি'। সাঁওতালি ভাষার এ শব্দটির অর্থ তামাম শোধ। পাঁচ টাকা ধার শুধতে রাম মাঝির জমিজেরাত, হাল বলদ সব কেড়ে নেয় মহাজন উদয় বাবু। তাতেও শোধ হয় না ধার। ঋণগ্রস্ত রাম সমগ্রজীবন বেগার খেটে যখন অশক্ত হয়ে পড়ে – তখনও বাকি থাকে এক টাকা এবং সেই এক টাকা শুধতে রামের তরুণ ছেলে বৃক্ষকে বেগার খাটতে হয়। জীবনব্যাপী দাসত্বের শেকল টেনে অবশেষে বিদ্রোহী রাম উচ্চকিত হয় 'বেগার দিব না আর'

এবং মহাজনকে তুচ্ছ করে চলে আসে নিজ গৃহে। মালিক তবুও মুক্তি দেয় না এক টাকার দায় থেকে। সিদু কানুর হুল শুরু হলে বৃক্ষ উদয়বাবুর ঋণ ফারকাটি করে দেয় তাকে হত্যা করে। জানিয়ে দেয়, মালিক মহাজন বেঁচে থাকতে কোনোভাবেই সাঁওতালের ঋণ পরিশোধ হবার নয় – পুরুষানুক্রমে বহন করতে হয় তাদের পাঁচ টাকা ঋণের দায়ভার। ধান চাল ধার দেবার সময় মহাজন ব্যবহার করে ছোট বৌ অর্থাৎ কম ওজনের বাটখারা আর নেবার সময় বড় বৌ বা বেশি ওজনের বাটখারা। মালিক মহাজনের শোষণের এই অবিশ্রাম চক্রকে নির্মূল করার জন্যই বিদ্রোহ বা হুলের সূচনা। দেবস্থল বা জাহের থানে মশাল জ্বালিয়ে, পুরোহিত বা নায়েকের আশীর্বাদ নিয়ে হুলমাহার গান গেয়ে তারা চলে যায় বিদ্রোহানলে আত্মবিসর্জন দিতে –

> খাঁটি গেকেন হুল গেয়া হো
>
> খাঁটি গেকেন হুল গেয়া হো (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৫০৮)

সাঁওতালদের শামিল হয় এ অঞ্চলের ডোম মুচি কামার কুমার সকল অন্ত্যজ জন। প্রশাসনের ভিত নাড়ানো এ হুলের ফলেই সৃষ্টি হয় সাঁওতাল পরগনা। কাগজের আইন এবং ঢোল শোহরের প্রচারে জানানো হয় যে, সকল সাঁওতাল তাদের গরু-মহিষ ফেরত পাবে মহাজনের কাছ থেকে এবং মহাজন-ব্যবসায়ী নতুন বসত করতে পারবে না তাদের অঞ্চলে। সাঁওতাল পরগণা শাসিত হবে তাদের গোষ্ঠীস্থ নেতা মাঝি পরগনাইতের দ্বারা। কোনো পুলিশ বা সরকারি প্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে তাদের শাসন করতে আসবে না। তবে তাদের সভ্য করে তোলার জন্য আসবে চার্চ মিশনারি সোসাইটি।

হুলমাহায় সাময়িক জয় সাঁওতালদের, তবে চার্চ মিশনারিদের অনুপ্রবেশে ঔপনিবেশিক শাসকরা সুদূরপ্রসারী চাল চালে এবং আদিবাসী সমাজের ঐক্যে বিনাশ সাধনই হয় তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

হুল শেষ হলেও হুলে জ্বালানো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নেভে না এত সহজে। হুল পলাতকদের খাদ্য সাহায্য দিয়ে, হুলে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি সংরক্ষণ করে এক নতুন হুলের জন্য প্রস্তুত হয় রাম মাঝি ও অন্যরা। মহাজন উদয়বাবুর ভাই নব্যমহাজন মতিনবাবুকে হত্যা করে রাম মাঝি ফারকাটি করে তার সমুদয় ঋণের।

৫.২.১২

'ভাতুয়া' গল্পের প্রধান চরিত্র পবন আদিবাসী নয়, অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত চেহারার দাসত্বের বদলে বাৎসরিক চুক্তিমাফিক ঋণগ্রস্তদের পেটেভাতে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ভাতুয়া ছদ্মনামে বনডেড লেবার প্রথাই চালু থাকে যুগ যুগ ধরে। জমিহীনতার কারণে দিনমজুর শ্রমিক সামাজিক

প্রয়োজনে ঋণ নেয় এবং পরিণত হয় বনডেড লেবার বা ভাতুয়ায়। এ গল্পের অন্ত্যজ পবন তার বাবার ঋণকৃত আটশো টাকা শুধতে সাত বছর থেকে বিয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিনাপারিশ্রমিকে শ্রম দিয়ে অন্ধ হয়ে যায়, তবুও ঋণ শোধ হয় না। ভীষণ আক্রোশে পৃথিবীর আলো হারানো প্রায়ান্ধ দৃষ্টি নিয়ে সে মহাজনের ধানের টালের চাল কেটে ধান বিনষ্ট করে, যেন এ ধান দিয়ে মহাজন গরাইবাবু গ্রামের আর কাউকে ঋণগ্রস্ত করে ক্রীতদাসে পরিণত করতে না পারে। দাসমজুর প্রথার মর্মন্তুদ বেদনা ও বিদ্রোহে অনবদ্য 'ভাতুয়া' গল্পটি পাঠকের চেতনাকে জাগরিত করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিঃসন্দেহে।

অন্ত্যজ শ্রেণির পবন ও তার ছেলে ভাগীরথ এ গল্পের মৌল চরিত্র বটে, তবে এ গল্পে পলুস মুর্মু নামে শিক্ষিত এক আদিবাসী যুবকের সন্ধানও পাওয়া যায়। সে-সূত্রে আদিবাসীদের মধ্যেও দাসমজুর সম্পর্কিত জাগরণ ও উদ্যোগের পরিচয় পাওয়া যায়। আদিবাসীরা আজ অধিকার সচেতন হয়ে উঠেছে ; সামান্য সংখ্যক হলেও তারা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে গড়ে তুলেছে 'আদিবাসী কল্যাণ' অফিস। পলুস মুর্মুর মতো শিক্ষিত যুবকেরা দাসমজুর প্রথা সম্পর্কিত সকল আইন-অ্যাক্ট সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে, সংগঠিতভাবে তা প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চালায়। অবধারিত ভাবেই জানা যায় পলুস মুর্মুর কাকা সলপাড়া গ্রামের শিবচাঁদ মুর্মুও একজন ভাতুয়া ছিল – আজ তারও চোখ অন্ধ। শিবচাঁদের বিদ্রোহী ছেলে যুগলকে মেরে ফেলা হয়েছে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গতে চাওয়ার অপরাধে। পলুস মুর্মু আইনের লড়াইয়ের মাধ্যমে নিরোধ করতে চায় তাদের প্রতি কৃত ও চলমান সকল বঞ্চনা-নির্যাতন। এ গল্পে নতুন যুগের আদিবাসীদের নতুন রূপের হুলকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন লেখক।

৫.২.১৩

নৈঋতে মেঘ (১৯৭৯) গল্পগ্রন্থের 'জগমোহনের মৃত্যু' আদিবাসী জীবনসমস্যার প্রামাণ্য গল্প। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'জগমোহন' নামের হাতিটি বিপন্ন আদিবাসীদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আরও আছে সোমরাই গঞ্জু, বুলাকি – অন্ত্যজ তারা, আদিবাসী নয় ; যদিও এ বিষয়টি যথেষ্ট স্পষ্ট নয় বরং বেশ ঘোলাটে। জল ঘোলা করার কাজটি অবশ্য করেছে ভারতীয় আইন প্রণেতারাই। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসের রেকর্ডে গঞ্জু লোকের নাম আছে অর্থাৎ রেকর্ড অনুযায়ী গঞ্জুরাও ট্রাইব বা আদিবাসী অথচ বাস্তব সত্য হলো গঞ্জুরা অচ্ছুত অর্থাৎ হরিজন। উচ্চবর্গীয় আইন প্রণেতারা আদিবাসী হরিজনকে শ্রেণিগতভাবে মেলাতে গিয়ে গোষ্ঠীগতভাবেও মিলিয়ে দিয়েছে। তবে সে-সূত্রে এ গল্পের আদিবাসী প্রসঙ্গের অনুসন্ধান

করা হয়নি – সমগ্র গল্পজুড়ে একক কোন নামধারী চরিত্র হিসেবে নয় ; বর্ণিত অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হিসেবে আদিবাসী জীবনবাস্তবতা, তাদের প্রান্তিকতা ও বিপন্নতাকে প্রত্যক্ষ ও প্রতীকার্থে উপস্থাপনে লেখকের অক্লান্ত প্রয়াস অসাধারণ শৈল্পিক মাধুর্যে রূপ পেয়েছে।

আলোচ্য গল্পটির স্থানিক পটভূমি বিস্তার পেয়েছে কাশী-বানারস থেকে মেদিনীপুরের পথে পালামৌ, চাইবাসা, টাহাড়, তোহরি, বুরুডিহা প্রভৃতি অঞ্চলে। এ অঞ্চলের পূর্বনাম দক্ষিণ বিহার হলেও বর্তমানে তা নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। সময়কাল ১৯৭৭-এর অক্টোবর এমার্জেন্সি-উত্তর ভারতবর্ষ। তখন প্রথম জনতা সরকারের রাজত্ব চলছে। সময় পাল্টেছে, শাসক পাল্টেছে অথচ শ্রেণিবর্গ নিয়ন্ত্রিত সমাজকাঠামো পূর্বের মতোই রয়েছে। হাজার বছরের অবহেলিত নিপীড়িত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আদিবাসীদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি বরং ক্রমোবনতি ঘটছে – এমন ছবি গল্পের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

'জগমোহনের মৃত্যু' গল্পের বৃহৎ প্রেক্ষাপটের কেন্দ্রীয় কাঠামো জগমোহনের জীবনবৃত্তের অনুসরণ। জগমোহনের পরিভ্রমণের সূত্রে অরণ্য ও অরণ্য-সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের মানবেতর জীবন এ গল্পের মৌল অন্বিষ্ট। কাহিনি-বৃত্তে একাধিক উপকাহিনি গ্রথিত হয়েছে এবং মূল ও উপকাহিনির সামগ্রিকতায় অন্ত্যজ আদিবাসী মানুষের প্রতি উচ্চবর্গীয় মানুষের অন্যায় অবিচারের সূক্ষ্ম হিসাব দাখিল করা হয়েছে।

বুরুডিহা গ্রামের স্থানিক পটভূমিতে উচ্চবর্গীয় শ্রেণির শোষণ, ব্রাহ্মণ শ্রেণির ধর্মকেন্দ্রিক নিপীড়ন সমস্তই এ গল্পের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতোয়া এবং বালকৃষ্ণ সিং-র উপাখ্যানদ্বয়ের লোমহর্ষকতা নিম্নশ্রেণিকে পদানত করে রাখার স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে এ গল্পে উপস্থাপিত। সোমরা গঞ্জুর জমিকেন্দ্রিক লড়াই এবং পরাজয় চিরায়ত। গোলবদন সাহুর উপাখ্যান বিদ্রোহ-সংগ্রাম-প্রতিরোধের ইঙ্গিতবাহী। সর্বোপরি হাতিকে বিপন্ন আদিবাসীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবাহী।

আলোচ্য গল্পে জগমোহনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাতি নয়, প্যাকিডার্ম বলে অভিহিত করছেন লেখক। Pachy-derm বলতে হাতি যেমন বোঝায়, তেমনি স্থূলচর্ম চতুষ্পদী যে কোনো জন্তুকেও বোঝায়। আদিবাসীরা সভ্য জগতের মানুষের কাছে চতুষ্পদী জন্তু বলেই গণ্য হয়ে থাকে ; যাদের গায়ের চামড়া মোটা, শত আঘাতেও যাদের নির্বিকারত্ব কাটে না বলেই জানে সভ্য সমাজ। গল্পে জগমোহনের পরিচিতিতে লেখক মন্তব্য করেছেন – "প্যাকিডার্মরা পরিবার নিয়ে থাকতে ভালোবাসে। হাতি খুবই সংসারী ম্যামাল" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩১৫)। এ মন্তব্যটিকে আদিবাসীদের যৌথজীবনের ইঙ্গিতবাহী বলে ধারণা করা অসঙ্গত হবে না। তাছাড়া ম্যামাল শব্দটির ব্যবহারও তাৎপর্যপূর্ণ। এ শব্দ দিয়ে কেবল

হাতি নয়, এ গোত্রভুক্ত মানুষকেও বোঝায়, লেখক সযত্ন সতর্কতায় গভীর দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন প্যাকিডার্ম ও ম্যামাল শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে।

লেখক অন্যত্র আদিবাসীদের প্যাকিডার্মের সঙ্গে তুলনীয় করে একাধিক মন্তব্য করেছেন স্পষ্ট সতেজতায় –

(১) দরিদ্র আদিবাসীদের, আধুনিক ও গতিমান ভারতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, বাউণ্ডুলে প্যাকিডার্মের সংগ্রামের মতোই ভয়ানক ও হিংস্র। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩১৭)

(২) প্যাকিডার্ম এমনিতেই বিলোপের পথে। আদিবাসীদের মতোই একদিন তারাও যুথে-যুথে অরণ্য-ভারত চংক্রমণ করে ফিরত। আজ তারা লুপ্ত প্রায়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩২০)

(৩) হাতি আর মানুষে সাদৃশ্য পয়েন্টগুলি অনুরূপ – পঁচিশে যৌবন, পঞ্চাশে বৃদ্ধ। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩৪৮)

উদ্ধৃতিত্রয়ে লেখকের Point of view থেকে হাতি ও আদিবাসীদের যুথবদ্ধতায়, বিপন্নতায় এবং জৈবিক সাদৃশ্যে সমলগ্ন করা হয়েছে। সেকারণেই আরণ্যক জীবনে আদিবাসী গোষ্ঠীতে হাতি অনেকক্ষেত্রেই গোষ্ঠীচিহ্ন বা টোটেম চিহ্ন হিসেবে গৃহীত হয়েছে ; যদিও টোটেম সংক্রান্ত কোনো তথ্য বা ইঙ্গিত এ গল্প বহন করে না।

জগমোহনের মতোই আদিবাসীরা সভ্য সমাজে প্রয়োজনীয় কিন্তু অবহেলিত। জগমোহনকে তার প্রভু চরণদাসের প্রয়োজন দোল, জন্মাষ্টমী ও দশেরাতে। এ সময় তিনি হস্তীপৃষ্ঠে নগর-গ্রাম পরিভ্রমণ করে নিজের মর্যাদা ও জীবিকাকে সমুন্নত রাখেন। কেননা রথযাত্রার প্রাক্কালে এই হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণের কারণেই বিভিন্নজন তাকে প্যালা বা সম্মানী দেয়। সারাবছর জগমোহনরা আর কোনো কাজে লাগে না বলে তার এবং তার চালক বা মাহুতের খাবারের দায়িত্ব তিনি নেন না ; আবার মুক্তিও দেন না। সারাবছর অরণ্য ও অরণ্য-সংলগ্ন জনপদে ঘুরে ঘুরে পর্বতসম প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে নিজের খাদ্যের সংস্থান করতে হয় তার নিজেকেই। আদিবাসীরাও তদ্রূপ লেখকের ভাষায় 'অত্যন্ত এক্সপেন্ডবল'। উচ্চশ্রেণির মানুষেরা শ্রমের প্রয়োজনে আদিবাসীদের শ্রমিকে পরিণত করে নিজেদের ফায়দা তোলে, অথচ তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলোর সামান্য সংস্থান পর্যন্ত করে না। আদিবাসীদের খাদ্য বিলাসিতায় ঘাটো, বাথুয়া শাক, ভেলিগুড় এটুকুই বৈচিত্র্য। চোরকাঁটার চেয়ে একটু বড়ো ঘাসের মাথার দানা সংগ্রহ করে তা ছাড়িয়ে খোসা বের করে অশক্ত বুড়ো-বুড়ি ও অতি ছোটো ছেলেমেয়েরা সমস্তদিন ধরে। সারাদিন পরিশ্রমে এক খুঁটি দানা মেলে কি, না মেলে। এই দানা জলে সেদ্ধ করে হয় ঘাটো – আদিবাসীদের প্রধান খাবার। এই ঘাটোতে লবণ দিয়ে স্বাদযুক্ত করা তাদের জন্য 'গ্রেট লাকসারি'।

কখনও কখনও তেঁতুল পাতাও স্বাদবর্ধনে প্রযুক্ত হয়। এ হেন খাদ্যাভ্যাসে ওদের শিশুরা অপুষ্টিতে হয়ে যায় বৃদ্ধ। একটিমাত্র পাথরে তৈরি স্তম্ভ বা মনোলিথের মতোই অপুষ্ট, ক্রিমি প্লীহা ও রক্তাল্পতায় আক্রান্ত শিশুগুলো তাদের বয়সানুযায়ী বিভিন্ন কাজে-কর্মে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। পাঁচ থেকে আট বছর বয়সীরা ঘাসের দানা বাছে ; চার বছরের শিশুরা তিন ও দু'বছরের শিশুদের আগলায়, আর আট বছর অতিক্রম করলেই তারা হয়ে ওঠে পরিবারের আর্নিং মেম্বারস – তখন তারা ছাগল বা গাই চরায়, জ্বালানি আনে, আলু জাতীয় কন্দ বা সরস মূলের সন্ধান প্রভৃত কাজ করে বাধ্য হয়ে।

লিখিত ভাষা-লিপিহীন আদিবাসীরা এক অবাস্তব জগতের বাসিন্দা – যে জগতে এত কম খেয়ে, এত কম পেয়ে তারা যে টিকে থাকে সেটাই বিস্ময়। লেখক একাধিকবার জগমোহনের জগৎকে 'আনরিয়াল' বলে অভিহিত করেছেন – একই ভাষ্য আদিবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য। তাদের এ 'আনরিয়াল' জগতে তাদের অস্তিত্বই একমাত্র 'রিয়ালিটি'। বহুকাল ধরেই তারা কৃষিভূমি বঞ্চিত। ওঁরাও, কোল, হো জাতির মানুষেরা অনাদিকাল ধরে জানে তাদের চাষে অধিকার আছে, ভূমিতে বা শস্যে নয় ; শ্রমে অধিকার, পারিশ্রমিকে নয়। দিনমজুরের পাওনাটুকুও সম্পূর্ণ না পেয়ে তারা অর্ধাহারে অনাহারে যে জীবন কাটায় সেখানেও আছে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের মতো সামাজিক প্রয়োজন। আর অনিবার্য এ প্রয়োজন মেটাতে অবধারিতভাবে মহাজনের খাতক এবং পরিণামে দাসে পরিণত হওয়ার চিরন্তন চক্রে তারা বাঁধা পড়ে বারবার। আদিবাসী পুরুষ দাস হলে কেবল ক্রীতদাস কিন্তু নারী হলে ক্রীতদাসী এবং অবশ্যই যৌনদাসী। বিখনি ও শনিচরীর উপাখ্যানে পুনরাবৃত্ত এ কাহিনির আভাস মেলে।

আদিবাসীদের 'আনরিয়াল' জগতে নেই শিক্ষার কোনো স্পর্শ। উচ্চবর্গীয়রা রীতিমতো সতর্ক প্রহরা ও পরিকল্পনায় অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের শিক্ষার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, পাছে তারা তাদের অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্ত্যজগোষ্ঠী সংখ্যালঘু উচ্চবর্গের দাপটে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সরকার স্কুল তৈরি করে দেয় – সে-স্কুলে আদিবাসী অন্ত্যজরা পড়তে পারে না, পড়তে এলেও উঁচু জাতের মাস্টাররা তাদের পড়াবে না। যদি কোন মাস্টার এদের পড়াতে আগ্রহী হয়, তাকে নকশাল আখ্যা দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির কুন্দন অন্ত্যজ নারী ঝালোর গর্ভজাত তার নিজ সন্তান এতোয়াকে হত্যা করে, বৃত্তি পেয়ে সে ভালোতোড়ে উঁচু ক্লাসে পড়তে চেয়েছিল বলে। এতোয়ার লেখার আঙুল তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল কেটে নেয়া হয় – রক্তপাতের ফলে মৃত্যু হয় তার। এ যেন আরেক একলব্য। মহাভারতের একলব্যের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গীয়ের শিক্ষা-বিরোধী মনোভাব কেবল চলমান সময়ের নয়, বহু প্রাচীন। উচ্চবর্গীয়দের এ মনোভাবকে কুন্দন সগর্বে

উচ্চারণ করে –"এ মহল্লার ছত্রিশটা গ্রামের মধ্যে কোনোদিন আমরা গঞ্জু দোসাদকে সরকারি ব্যবস্থায় স্কুলে পড়তে দিই না, আজও দেব না।" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩৩৫)

উচ্চবর্গের সমৃদ্ধির স্বার্থে নিম্নবর্গকে দাবিয়ে রাখা খুব দরকার। তাদের শ্রমিক, মজুর দরকার অল্প খরচে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য। লেখাপড়া শিখে স্ব-অধিকার বিষয়ে ওয়াকিবহাল হলে সস্তাশ্রম দুর্লভ হবে। সুতরাং আদিবাসী গ্রামগুলোতে চলে নিয়ানডারথাল যুগ। সভ্য সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক সুবিধা তারা ভোগ করে না। "জল নেই, মহুয়া তেলে লালচে আলো একমাত্র বাতি, মাড়োয়ার বা ভুট্টা বা চীনাদানার ঘাটো একমাত্র স্টেপল ফুড, লবণ বিলাসিতা। রোগে দুঃখে নয়া ভারতে ঘৃণ্য মিশনারি একমাত্র ভরসা ; সারা বছর ধারকর্জ নিতে জোতদার বা মহাজন একমাত্র সহায়" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩২৯)।

তাদের উন্নয়নকল্পে প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসে স্থান করে নিয়েছে আদিবাসী উন্নয়ন অফিস ; কিন্তু তা স্থাপিত শহরে – আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও জনপদ থেকে লক্ষ-যোজন দূরে। ব্যক্তি উদ্যোগেও এ অঞ্চলে উন্নয়নের কোনো সুযোগ নেই। ঝাঝার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বালকৃষ্ণ সিং আদিবাসী অন্ত্যজদের উন্নয়নকল্পে কাজ করতে চায়। কিন্তু তাকে হত্যা করে তার এই শুভ-সংকল্পের তরুকে চারা অবস্থাতেই উচ্ছেদ করা হয়। রাষ্ট্র-যন্ত্র যেখানে নিরুপায়, ব্যক্তি উদ্যোগ সেখানে কতখানি ফলপ্রসূ হতে পারে – তা খুব সহজেই অনুমেয়। অথচ ভারতের সংবিধানে লেখা আছে –

> এই সকল উপজাতি ও আদিবাসীর সংখ্যা ত্রিশ মিলিয়ন।... দে শুড বি মেড টু এন্‌জয় দি প্রিভিলেজেস্ অফ্ সিটিজেনশিপ অ্যান্ড শুড বি এব্‌ল টু টেক পার্ট ইন দি মেকিং অ্যান্ড স্ট্রেংদেনিং দি ডেমোক্রাটিক ইন্‌স্টিট্যুশন্‌স ইন দি কানট্রি। দে শুড রিয়ালাইজ দি ফুল্ অ্যাডভানটেজ অফ্ অ্যাডাল্ট ফ্রানচাইজ। দে শুড এন্‌জয় দি ফ্রুটস অফ লিবার্টি ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রেটারনিটি (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩১৯)।

সংবিধানে যা-ই লেখা থাকুক আদিবাসীদের জীবনে তা কোনো পার্থক্য তৈরি করে না, লেখক এ বিষয়টি স্বভাবসিদ্ধ তির্যকতায় ব্যক্ত করেছেন –

> কার্যকালে দশকের পর দশক ধরে শব্দগুলি সংবিধানে শোভা হয়ে থাকে এবং আদিবাসীদের দুঃখ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে হতাশা নিয়ে ফিরে এসে আদিবাসীরা স্টেশনে উবু হয়ে বসে থাকে, ট্রেন ধরে, সাঁইত্রিশ লক্ষ মাইল হেঁটে গ্রামে ফেরে এবং অপরিচিত, হিংস্র আলোকোজ্জ্বল নয়া ভারত থেকে স্বীয় পরিবেশের অপরিমেয় অন্ধকারে ফিরে স্বস্তি পায় (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩১৯)।

আদিবাসীরা অতীতে সুখে জীবন কাটিয়েছে এমনটা নয় – ভূমিহীনতার কারণে তারা চিরকালই অনাহার-অর্ধাহারে দিনযাপন করেছে। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে আশির দশকে যে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়, সে-সময় আদিবাসীদের দুর্দশা পৌঁছে চরমে। আদিবাসী আরণ্যক জীবনে নকশাল-সন্ধানী পুলিশ ও

আর্মির তাণ্ডব এবং জোতদার-মহাজনের ভীতিজনিত নির্যাতন মাত্রা ছাড়ায়। সরল আদিবাসীরা বহিরাগতদের দেখে চরম সন্দেহের দৃষ্টিতে। শ্রেণিগতভাবে যারা তাদের সমলগ্ন তাদেরকেই কেবল কিছুটা বিশ্বাস করে তারা। এভাবে এমার্জেন্সি আইন আদিবাসী জনপদে শ্রেণিসচেতনতা সৃষ্টিতে পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

আদিবাসীরা চিরকালই সরল, সহিষ্ণু এবং লড়াকু। নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে বারবার – ইতিহাস সে-কথাই বলে। তাদের কৌমজীবনে প্রচলিত কোল-বিদ্রোহ, খারোয়ার বিদ্রোহ, সাঁওতালী হুল, উলগুলান, বিরসা মুণ্ডার গল্প প্রতিমুহূর্তে তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের গৌরবোজ্জ্বল অধিকার সচেতন অস্তিত্বের কথা। তাই কখনও কখনও আপাত নিরীহ আদিবাসীরাও জোতদার জমিদারের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে। ক্রমবর্ধমান ঋণের অনাচারের প্রতিবাদে এতোয়া তাই বুরুডিহার গোবিন লালাকে হত্যা করে থানায় আত্মসমর্পণ করে। দীপাবলি উৎসবে আদিবাসীরা সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয় মহাজন গোলবদন সাহুকে, কেনন্দ্রা পাহাড় থেকে ক্ষেত্রপালদেব ও সূর্যদেবের প্রতিভূ বিশাল পাথরের উপর ফেলে। পরিণামে গ্রামকে গ্রাম চলে আর্মি-পুলিশি তাণ্ডব – তবুও তাদের এ প্রতিরোধ অন্য মহাজনের মনে ভীতির সৃষ্টি করে।

আদিবাসী জীবনেতিহাস মূলত শোষণ-নিপীড়ন ও নির্যাতনের ইতিহাস। জোতদার মহাজন, ধর্মীয় নেতা, বৈরি প্রশাসন প্রতিটি স্তরেই তারা অনাদৃত, অবহেলিত, নিপীড়িত-নির্যাতিত। এককালে যে জনপদ ছিল কেবল তাদের অধিকারে, আজ সেখানে তারাই অনাহুত। বুরুডিহা, ঝুঝার, ভালাতোড়, কোমন্ডি-ভুরকুন্ড-হেহেগেড়া-জুজুভাত স্থানিক এ নামগুলো আদিবাসী। নামছাড়া অঞ্চলের অন্য কিছুতে বিশেষত ভূমিতে আদিবাসীদের অধিকার নেই – সবই আজ অন্তর্হিত উচ্চশ্রেণি বা দেবতার গ্রাসে। টাহাড় ও পালানি গ্রামের মাঝে বোলডার-আচ্ছন্ন রুক্ষ প্রান্তর অবশ্য জানান দেয় যে, এককালে এখানে মুণ্ডা জনপদ ছিল। মনোলিথ সদৃশ এ বোলডারগুলো মুণ্ডাদের সমাধিপ্রস্তর। জীবিত আদিবাসীদের অস্তিত্ব জানান না দিলেও মৃত মুণ্ডাদের সমাধিপ্রস্তর প্রতিমুহূর্তে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের তাদের অস্তিত্বের, তাদের প্রাচীনত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আদিবাসী পুরুষ ও রমণীদের নাম, সাধারণত জন্ম-বার অনুসরণে হয়। পুরুষদের নাম হয় এতোয়া, সোমাই বা সোমনা বা সোমরা, মংলা বুধনা, বীরসা, শুকিয়া বা শুকরচর, শুকদেও, শনিচর ইত্যাদি। মেয়েদের বেলায় তা-ই একটু পরিবর্তিত হয়ে এতোয়ারী, সুমি বা সোমনী, মুংলি, বুধনি, বিশি, শুকনি বা শুকচরী, শনিচরী প্রভৃতি। সীমিত নামধারী এ মানুষগুলোর সরলত্বের সুযোগে উচ্চবর্গীয়রা খুব সহজেই তাদের মধ্যে ভীতির সংস্কারকে বুনে দিতে পারে। কলেরার প্রতিষেধক টিকা নিলে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট

হবে, এ ধারণা তাদের মধ্যে বিস্তার করা হয় বিনা আয়াসে। জীবনভর বিপর্যয়কে তারা তাদের নিয়তি বলে মানে, এমনকি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেও তারা নিজেদের পাপের শাস্তি বলে মনে করে। যদিও এ সমস্তই তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া উচ্চবর্গীয় সুবিধাবাদী শ্রেণির দমননীতিমূলক প্রচারণা। 'জগমোহনের মৃত্যু' গল্পে জগমোহন নামক হাতি এবং নিরন্ন আদিবাসীদের জীবনসমীকরণের সমলগ্নতার মধ্য দিয়ে লেখক তাদের বিপন্নতার ইতিবৃত্তকে হাজির করেন পাঠকের দরবারে।

৫.২.১৪

'নুন' (১৯৭৮) গল্পের স্থানিক পটভূমি বিহারের পালামৌ অঞ্চলের ঝুঝার নামের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। ওঁরাও এবং কোল গোষ্ঠীর সতেরোটি পরিবারের ছিয়াত্তর জন মানুষ নিয়ে এ গ্রামটি রেল বা বাসপথ থেকে অনেক দূরে অভয়ারণ্যের কোলে অবস্থিত। একসময় এটি কেবল আদিবাসী গ্রামই ছিল – ১৮৩১ সালের কোলবিদ্রোহের পর পরাজিত নেতৃত্বহীন আদিবাসীদের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগে কিছু নব্য পুঁজিবাদী হিন্দু বেনে এ অঞ্চলে আসে এবং আদিবাসীদের জঙ্গল, আবাদি জমি কিনে নেয় দু'হাতে। ঝুঝারে পার্শ্ববর্তী কোয়েল নদীবিধৌত উর্বর চাষজমির স্বত্ব আদিবাসীদের হাতে থেকে উত্তমচাঁদ মহাজনের পূর্বপুরুষের হাতে গেলেও জমিতে চাষের কাজে বরাবর নিযুক্ত থেকেছে আদিবাসীরাই। সামান্য ঋণের জালে একজন আদিবাসীকে জড়াতে পারলে কয়েক পুরুষ ধরে তাদের বেঠবেগারে পরিণত করতে পারা যায়। কেননা আদিবাসীরা জানে না কোনো হিসেব, দলিল-পাট্টা আইন। তাদের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগ নেয় দিকু মহাজনেরা পুরোমাত্রায়। জমি এবং স্বাধীনতা দুই-ই বিকিয়ে যায় তাদের মহাজনের কৌশলে। সরকারি হিসেবের বাইরে বহুদিন অবস্থান করলেও একসময় তারা নাগরিক অধিকার অর্থাৎ ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়। স্বাধীনতার পর তৃতীয় নির্বাচনে ভোটপ্রদানের সুযোগ পেলেও তারা তা প্রয়োগ করতে পারে না, বরং মহাজনের হুকুমে এক টাকায় তা বিক্রি করতে হয়।

ঝুঝারবাসীর জীবনে দেবতার ভূমিকায় আবির্ভূত হয় সাতাত্তরের নির্বাচন-পরবর্তী ক্ষমতাসীন জনতা দলের যুবক শ্রেণি। তারা বেঠবেগারি বন্ধের আইন অনুযায়ী উত্তমচাঁদকে বাধ্য করে ভূমিদাসদের মুক্ত করতে। যেহেতু বারো বছরের বেশি সময় ধরে আদিবাসীরা জমির চাষ করছে, সেহেতু সে-জমির ফসলের আধাভাগ প্রাপ্তিতে মহাজনের স্বীকারোক্তি মেলে। জনতা পার্টির যুবদল কংগ্রেসের মদতদাতা উত্তমচাঁদকে হেনস্তা করতে এ উদ্যোগ নেয় – নাকি সামাজিক দায়বদ্ধতার সূত্রে সত্যিকার অর্থেই নিপীড়িত জনতার ত্রাতা হিসেবেই নিজেদের অধিষ্ঠিত করতে চায় – এ রহস্যের সমাধান মেলে না গল্পের আধারে। তবে

দেবতার বর অভিশাপে পরিণত হবার বাস্তবতার সন্ধান মেলে সহজেই। ক্রুদ্ধ নিরুপায় উত্তমচাঁদ বানিয়া আহত শার্দুলের মতোই ঘোষণা দেয় ; আদিবাসীদের সে হাতে নয়, রুটিতে নয়, নুনে মারবে। ঝুঝার সংলগ্ন পালনি বা মুরুর হাটের সব দোকানই উত্তমচাঁদের। দোকানগুলোতে নুন বেচা বন্ধ করে দেয় সে। ফলে নুনহীন খাদ্যগ্রহণে আদিবাসীরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মরিয়া হয়ে নুনের সন্ধানে বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষিত নুন-মাটি সংগ্রহ করতে গিয়ে হাতির পদতলে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করে। হাতিটিকে 'রোগ' অভিধা দিয়ে গুলি করে মারা হয়। সামান্য লবণ তিন আদিবাসী ও একটি হাতির মৃত্যুর কারণ হয়।

শ্রেণিদ্বন্দ্বের ডামাডোলে এ গল্পে আদিবাসী জীবনের প্রান্তিকতাকে লেখক ক্ষুরধার ভাষায় ও ভঙ্গিতে শিল্পরূপ দিয়েছেন। নুনের মতো তুচ্ছ-সস্তা বস্তুও যে আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে, পাঠক সমাজের সে অভিজ্ঞতা নেই বলেই বিষয়টি অভিনব ঠেকে। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজের তলদেশে যাদের অবস্থান – যাদের খাদ্য তালিকায় দিনের পর দিন কোনো প্রোটিনযুক্ত হয় না, তাদের জীবন নুন ছাড়া অচল। অথচ নুনের এ মূল্য বাবুসমাজের কাছে কোনভাবেই তাৎপর্য পায় না। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন –

> পূর্তি ও বাবুদের মনের গতিপ্রকৃতিতে কোনো আদান প্রদান নেই, থাকে না। পূর্তি কিছুতেই বোঝাতে পারল না, নুন ছাড়া জীবন তাদের অচল। নুনের টাকনা দিয়েই ওরা ঘাটো খায়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩৭৫)

আদিবাসীদের সঙ্গে বাবুসমাজের মধ্যকার অনতিক্রম্য মানসিক দূরত্বের কারণেই তাদের জীবনের ভুল ব্যাখ্যা করা হয় অনেকাংশে। যেমন আদিবাসী জীবন মানেই প্রচুর মদ্যপান এবং মদের নেশাতেই তাদের সর্বনাশ – এমনটা এক প্রচলিত ধারণার বিপরীতে লেখক পূর্তি মুণ্ডার জবানিতে জানান যে, পেটের জ্বালা ভুলে থাকার জন্যই তারা মদ্যপান করে। অর্থাৎ মদ তাদের বিনোদনের উপকরণ নয়, বরং অনাহার-জর্জরিত দারিদ্র্য থেকে সাময়িক মুক্তি। নৈতিক স্খলনের সূত্রে নয়, অনির্বাণ জঠর-জ্বালা প্রতিরোধে মদকে তারা অনেকক্ষেত্রে জীবনের উপকরণে পরিণত করে – একে নেতিবাচকভাবে দেখার আগে বিষয়ের সমগ্রতার গভীর বিশ্লেষণে দেখার পক্ষপাতী লেখক।

মহাশ্বেতা তাঁর একাধিক আদিবাসীকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাসে আদিবাসী জীবনে নুনের দুষ্প্রাপ্যতা ও প্রয়োজনীয়তাকে উল্লেখ করেছেন। অরণ্যকোলে লালিত আদিবাসীরা অরণ্য থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। জঙ্গলে তারা গাই-ছাগল-মোষ চরায়, পড়ে থাকা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে, ঘর ছাইবার পাতা নেয় এবং বাঁশের কোঁড়, কন্দ ও তেঁতুল পাতা চুরি করে। 'চুরি' এ অর্থে যে, জঙ্গলের মালিক সরকার, ঠিকাদার, জঙ্গলরক্ষী – আদিবাসীরা নয়। কখনও কখনও তারা শজারু, খরগোশ, পাখি মেরে তাদের খাদ্য-তালিকায় প্রোটিন যোগ করে। যদিও তা কদাচিৎ ঘটে – কেননা বনের মতো বন্য জন্তুও এখন বিরল।

স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের কল্যাণে আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এ দপ্তর শহরে এবং গ্রামে অবস্থান আদিবাসীদের। দূরত্ব তাদের মধ্যে অনতিক্রম্য – কেউ কারো কাছে পৌঁছতে পারে না। স্থানিক বা মানসিক কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে না কোনো পক্ষই। এ দূরত্বকে লেখক কাব্যময় ভাষায় স্থাপন করেছেন এভাবে –

> ডালটনগঞ্জের চায়ের দোকান, ঝুঝার গ্রাম থেকে কিছু লক্ষ-যোজন দূরে নয়। কিন্তু দুটি জায়গা মহাবিশ্বের দুই নক্ষত্রে স্থাপিত, এবং কে না জানে, আকাশের তারাগুলি নিয়ে যত গান ও কবিতাই লেখা হোক না কেন, ওগুলি কোটি-কোটি সূর্যের চেয়েও তাপবিশিষ্ট এবং তাদের মধ্যবর্তী কালো আকাশ আসলে কোটি কোটি মাইল ব্যবধানে উক্ত ক্রুদ্ধ ও চংক্রমান নক্ষত্রদের তফাতে রেখেছে। ডালটনগঞ্জ গরম, কাঠের ব্যবসার গরমে। ঝুঝার গরম, হতভাগ্য ও আধুনিক ভারত থেকে নির্বাসিত কিছু আদিবাসীর বঞ্চনার উত্তাপে। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩৭৭)

বেঠবেগারি বন্ধ হবার আইন পাশের বহু পর তা জানে ঝুঝারবাসী এবং জেনেও তা প্রয়োগ করার কথা ভাবতে পারেনি তারা। আইন আদালত প্রশাসন কিছুই তাদের জন্য নয় – এ কেবল কষ্ট কল্পিত ভাবনা নয়, বাস্তব সত্য।

উত্তমচাঁদ নুন বেচা বন্ধ করলে তারা জঙ্গলের ঠিকাদারকে প্রস্তাব করেছিল – কাজের বিনিময়ে মজুরি হিসেবে নুন দেবার জন্য, কিন্তু ঠিকাদার মহাজন সমগোত্রীয় হওয়ায় তাদের আঁতাত দৃঢ় এবং আদিবাসীরা বঞ্চিত জীবনের ন্যূনতম চাহিদা নুন থেকে। নুনের অভাবে তারা ক্রমশ দুর্বল, স্থবির এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে। বস্তুত মানবদেহে নুন ও জলের উপযোগিতা বহুমুখী। দেহে লবণের ভারসাম্যতা হারালে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে – নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য, উপাত্ত ও বিশ্লেষণে লেখক এ বিষয়টি গল্পে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং দেখিয়েছেন, কেন তারা নুন যোগাড়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাতির জন্য বনবিভাগের প্রদত্ত নুনমাটি সংগ্রহ করে। ফসলের বিনিময়ে নুন নিয়েও তারা ঠকে ; দুটি মুরগির বিনিময়ে বন্যপ্রাণীদের জন্য নির্দিষ্ট ষোল কিলো খুবই কড়কচ কালো নুন মেলে ফরেস্ট গার্ডের কাছ থেকে এবং যথারীতি ওজনে কম পায় তারা। বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মানসিকতায় ঋদ্ধ নয় বর্তমান আদিবাসীরা। তাদের সকল অপ্রাপ্তিকে তারা নিজেদেরকৃত অপরাধ বলেই মনে করে। লবণের অভাবে তাদের বুকে হাঁপ ধরলে বা হাত পা স্থবির হলে তাদের মনে হয়, এজন্য লবণ নিমিত্ত, আসলে দেব-দেবতা রুষ্ট ; হরম দেওয়ের থানে পূজা দিলে সব বিপদ কেটে যাবে বলে তারা বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস তাদের ধার্মিকতাকে নয়, নিরুপায় নিয়তি নির্ভরতার বার্তা বহন করে।

পূর্তি মুণ্ডাদের লবণ-উপাখ্যানে যূথপতিত্ব এবং দল থেকে নির্বাসিত হাতি যাকে 'একোয়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার একটি ভূমিকা আছে। একোয়া তার ও তাদের প্রাপ্য নুনমাটি চুরির অপরাধে পূর্তি মুণ্ডা

ও তার সহযোগীদের পদদলিত করে। একোয়ার কর্মকাণ্ডে হিংস্রতার চেয়ে নিজ সম্পদ অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টাই প্রবল। একোয়ার সঙ্গে কোথায় যেন আদিবাসীদের মিল রয়েছে। আদিবাসীরাও এ ভূমের অধিকারী ছিল এককালে এবং আজ একোয়ার মতোই নির্বাসিত। ক্রমাগত বঞ্চনা ও অবহেলায় তারাও যে রোখা হাতির মতো হয়ে উঠতে পারে, পদপিষ্ট করতে পারে তাদের বঞ্চনাকারকদের এ সতর্কবাণী কী প্রচ্ছন্ন থাকে এ উপাখ্যানে ?

আদিবাসীদের প্রান্তিকতাকে লেখক যতভাবে সম্ভব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের জীবনে অবিশ্বাস নেই, কথ্য শব্দভাণ্ডার পরিমিত – নানা সীমাবদ্ধতা। অ-আদিবাসী সমাজ আদিবাসীদের 'একজিস্‌টেনস্‌রে' বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করলেও তাদের অস্তিত্ব মিথ্যে হয়ে যায় না। লেখক আদিবাসীদের প্রতি সহমর্মিতায় তাদের বঞ্চনার ইতিহাসকে ধারণ করে সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতার ইঙ্গিত করেছেন–

> প্রত্যক্ষ সত্য হাতিটি পূর্তিদের মেরেছে, ফলে সে মরেছে। পরোক্ষ সত্য যেন অন্য কিছু। নুনের জন্যে এত ! তারা নুন পায় নি। নুন কিনতে পারলে তিনটি মানুষ ও একটি হাতি মরত না। অন্য কেউ দায়ী, অন্য কেউ। যে নুন বেচল না সে ? না অন্য কোনো নিয়ম ? অন্য কোনো ব্যবস্থা ? যে নিয়ম ও ব্যবস্থার প্রচ্ছায়ে থাকলে নুন না বেচলে উত্তমচাঁদের কোনো দোষ হয় না ? (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩৮৩)

নুন যে জান লড়িয়ে দেবার মতো কোনো সমস্যা হতে পারে – অভিজ্ঞতার অভাবে বিষয়টি আমাদের কাছে অবাস্তব। আর এ অবাস্তবতার নিরিখে মহাশ্বেতা আমাদের চিনিয়ে দিতে চান, আদিবাসী জীবনের বাস্তবতাকে।

৫.২.১৫

'শিশু' (১৯৭৮) গল্পের স্থানিক পটভূমি লোহরি। এ জায়গাটি রাঁচি-সরগুজা ও পালামৌ তিন জেলার সীমারেখার মিলিতবিন্দুতে অবস্থিত। লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ এ অঞ্চলটি খরা ও উত্তাপে দগ্ধ প্রান্তর বিশেষ। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে চিরবন্ধ্যা এ অঞ্চলের আদিবাসীরা সংবৎসর সরকার প্রদত্ত রিলিফের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করে। যথানিয়মে রিলিফ চুরি বন্ধে এবং ত্রাণসামগ্রির সুষ্ঠু বন্টনের উদ্দেশ্যে লোহরিতে আসেন এক সৎ ও আদিবাসীদের প্রতি অনুকম্পায়ী রিলিফ অফিসার – রাজ্যমন্ত্রী যার মেসোমশাই। এ অঞ্চলে আসার পূর্বেই এ অঞ্চলের অধিবাসী আগরিয়াদের পৌরাণিক উপাখ্যান, আধুনিক ইতিহাস এবং এক অতিপ্রাকৃত অতিমানুষী শিশু-চোরের আখ্যান তাকে এক ধরনের অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। সকলের ভীতি উপেক্ষা করে কৌতূহল এবং চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এক চরম সত্যকে উদঘাটন

করেন তিনি। শিশু-চোরের পশ্চাদধাবন করতে গিয়ে তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়েন এবং আবিষ্কার করেন যে, এরা দৈহিক আকৃতিতে শিশু-সমতুল্য হলেও প্রকৃতপক্ষে শিশু নয় – বরং পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় মানুষ। চৌদ্দ বছর পূর্বে কুভা গ্রামের আগরিয়ারা তাদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বুরু ধ্বংসের জন্য সরকারি জিওলজিস্টদের কেটে ফেলে জঙ্গলে হারিয়ে যায়। পলাতক দেড়শো মানুষ না খেতে পেয়ে অধিকাংশ মরে যায়। এক যুগেরও অধিক সময় পরে যে জনা চৌদ্দ জন বেঁচে আছে তারা খাদ্যাভাবে ছোট হয়ে গিয়েছে। নগ্ন এ শিশু-সদৃশ মানুষগুলোর শুকনো পুরুষাঙ্গ এবং স্তন, সাদা চুল সাক্ষ্য দিচ্ছে – তারা সকলে পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় মানুষ। রিলিফ চুরি করে খেয়ে তারা আবার বড় হয়ে উঠতে চায়। চরম অবৈজ্ঞানিক এ দৃশ্য নির্বাক রিলিফ অফিসারের মনে অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে। চাঁদের নীচে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে দেখতে, ওদের হাসি শুনতে শুনতে, ওদের পুরুষাঙ্গের ঘষ্টানি খেতে খেতে ভারতের সাধারণ মানুষের অপুষ্ট দেহ ও হাস্যকর দৈর্ঘ্যকে মনে হয় সভ্যতার জঘন্যতম অপরাধ। কেবল আদিবাসীদের প্রতি নয়, সাধারণ ভারতীয়দের প্রতিও জাগে অনুকম্পা। সাধারণ ভারতীয়দের বৃদ্ধি বা দৈর্ঘ্য রুশ-কানাডিয়ান-আমেরিকানদের মতো নয়। তারা জীবনে সে-খাদ্য খায় না, যা ক্যালোরি গুণে মানবদেহের বৃদ্ধির পক্ষে আবশ্যক। ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের মতে যে খাদ্য না খাওয়া অপরাধ। সে-অপরাধে অপরাধী প্রতিটি ভারতীয় মানুষ। খাদ্যাভাব এবং বিশ্বসভ্যতার আস্ফালনের সমীকরণ মেলে না কখনও।

ফিকশনধর্মী এ গল্পে লেখকের বর্ণনার অতিরঞ্জন খানিকটা আছে বটে, কিন্তু আদিবাসী জীবন, তাদের অভাব-দারিদ্র্য, নিরন্তর খরা, রিলিফ, পুরাণ – সমস্তই বাস্তব। লেখক অধিকাংশ রচনায় বাস্তব সত্য ও বিজ্ঞানমনস্কতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, পূর্ববর্তী আলোচিত 'নুন' গল্পেও বৈজ্ঞানিক দীর্ঘ তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশ রয়েছে। এ গল্পে তেমনটা নেই বরং এ ঘটনাংশ বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিপন্থি তাও বলতে দ্বিধা করেননি –

> কেননা এ যদি সত্য হয়, তাহলে সব মিথ্যা। কোপার্নিকাসের বিশ্ববিন্যাস, বিজ্ঞান, এই শতক, এই স্বাধীনতা, এই প্ল্যানের পর প্ল্যান। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১০ : ৩৭৩)

খাদ্যাভাবে মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশের ব্যাহত হবার বৈজ্ঞানিক সত্যকে আসলে উল্টো করে এ গল্পে উপস্থাপন করেছেন লেখক। দেখিয়েছেন যে, প্রবল খাদ্যাভাব, অনাহার এবং উন্মুক্ত প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে না পেরে কুভা অঞ্চলের পূর্ণবয়স্ক আগরিয়ারা দৈর্ঘ্যে হ্রস্ব হয়ে শিশুতে পরিণত হয়েছে। জাদু-বাস্তবতা বা কুহকী বাস্তবতার মোড়কে আদিবাসীদের বিপন্নতা এবং বৃহদার্থে সমগ্র ভারতীয়দের খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিজনিত দৈহিক হ্রস্বতার বিষয়টি ধারণ করা হয়েছে 'শিশু' গল্পের অবয়বে।

আদিবাসী জীবনের বাস্তবতা এবং সভ্য জগতের মানুষের আদিবাসী সম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণার তফাত স্পষ্ট করা হয়েছে এ গল্পে। মূলস্রোতের প্রতিভূ রিলিফ অফিসারের ধারণা ছিল, আদিবাসী পুরুষেরা কেবল বাঁশি বাজায় ও আদিবাসী রমণীরা ফুল পরে নাচে। আদিবাসী জীবনে গানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই তিনি জানতেন। গান গেয়ে তারা পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছোটে – গানের মধ্য দিয়ে আনন্দ ও জীবনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হয় – এ ধরনের ছবিই ছিল তার মনে। মূলত, এ ভাবনাগুলো হিন্দি-ফিল্ম লব্ধ ; বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণই আলাদা। খরা নিপীড়িত লোহরির আদিবাসীরা উলঙ্গ প্রায়, ক্রিমি ও প্লীহাফোলা-পেট মানুষগুলো যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন নয় বরং পীড়াদায়ক। যাদের জীবনে আনন্দ নেই, অনাহার-অনাদর-বঞ্চনা যাদের সম্বল, তাদের কণ্ঠের গান কান্নার মতোই শোনায়। সুরেলা ধ্বনি নয়, লোহরির গ্রামে গ্রামে শোনা যায় এক ভীষণ মৃত্যুসংগীত। খরাপীড়িত এ অঞ্চলে চলতে ফিরতে পারা আদিবাসীরা রিলিফ ক্যাম্পে এসে রিলিফ নিয়ে যায় কিন্তু যারা চলতে পারে না, ক্ষুধা ও বার্ধক্যের করাল গ্রাসে যারা স্থবির প্রায়, সে-সব বৃদ্ধ সকল গোল হয়ে বসে মৃত্যুর গান গায় এবং গাইতে গাইতে একসময় তারা মরে যায়। এক গ্রামে যখনই গান শুরু হয় তো ঐ গ্রামের মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধারা যুবকদের পাঠায় তাদের নিজেদের বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করতে এবং তারা নিজেরাও সামিল হয় বৃদ্ধদের গানে। মৃত্যু আসন্ন জেনেও মানবীয় স্বাভাবিক ধর্মে তারা বেঁচে থাকার চেষ্টা করে না বরং গেয়ে চলে প্রেত-বিলাপে গান। বস্তুত তাদের দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা তাদের নিবৃত্ত করে নিরর্থক জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে।

লোহরির আদিবাসীদের রিলিফ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয় কেবল, প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশে তাদের স্বাভাবিক জীবনের স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। নিরন্ন এ মানুষগুলোর প্রান্তিকতাকে দূর করার জন্য মূল থেকে শুরুর যে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন তা যথেষ্ট দুরূহ। তাদের জমি দিলেও সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জমি বেচে দেবে তারা মহাজনকে – কেননা তাদের হাল-বলদ, বিছন নেই এবং সেচের ব্যবস্থা করার সামর্থ্যও নেই। হাল-বদল, বিছন দিলেও তারা সবই বেচে দেবে – কেননা ফসল ওঠা পর্যন্ত তো তাদের খেতে হবে আর সে জন্য ঋণ করতে হবে মহাজনের কাছে এবং ঋণের দায়ে বেচতে হবে জমি। অর্থনৈতিক প্রান্তিকতার বৃত্তকে ভাঙ্গতে না পারলে তাদের অবস্থানের উত্তরণ সম্ভব নয় ; আর সেজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক উদ্যোগ। এ অঞ্চলটি দগ্ধ প্রান্তর বিশেষ, ভীষণ তপ্ত ; জল এখানে ভীষণই দুর্লভ। লোহরি নদীর বুকে লুক্কায়িত কুণ্ডী ওদের একমাত্র জলোৎস। এখানকার মাটির রংও অদ্ভুত – গাঢ়, বাদামি-লাল। শক্ত, প্রস্তর সদৃশ মাটিতে ফসল ফলানো সহজ নয়। বস্তুত তাদের অনিবারণীয় এ পরিস্থিতির উত্তরণ না ঘটার পেছনে প্রকৃতির বৈরিতার অবদানও সামান্য নয়।

জীবন-যুদ্ধে পরাজিত আগরিয়ারা তাদের জীবনের সব অপ্রাপ্তিকে অপদেবতার খেলা বলে মনে করে। খরা আর আকালও ওদের কাছে অপদেবতার অভিশাপ। নিয়তির কাছে মার খাওয়া এ জনগোষ্ঠীর নিয়তি-নির্ভর হওয়া ছাড়া তো কোন গত্যন্তর নেই। তবুও তারা বাঁচে ; বেঁচে থাকে তাদের পুরাণ, গৌরবোজ্জ্বল অতীত আর সংগ্রামমুখর বর্তমানকে অবলম্বন করে। তাদের পুরাণ-কথাও মূলত দেবতার সঙ্গে মর্ত্যের মানুষের সংগ্রামের আখ্যান। আগরিয়া জাতি লোহার লোক – অসুরের বংশ। ওদের কাজ ছিল মাটি থেকে লোহা উঠিয়ে কামারশালে লোহার জিনিস বানানো। পুরাণমতে, প্রাচীন আগরিয়ারা আগুন খেত, আগুনের নদীতে স্নান করত। ওদের নগর ছিল লোহরি, রাজার নাম লোগুন্ডি। মাটির নীচের অসুররা কেবল আগরিয়াদেরই পাতাল থেকে লোহা, কয়লা উঠাতে দিত। তিন অসুরকে তারা দেবতা বলে মান্য করত – লোহার দেবতা লোহাসুর, কয়লার দেবতা কয়লাসুর এবং আগইয়াসুর হলো আগুনের দেবতা। তাদের বিশ্বাসে জ্বালামুখী পর্বতে এ তিন দেবতার বাস। লক্ষণীয় যে, দেবতার কল্পনাতেও তারা প্রাকৃতিক উপাদানকেই গ্রহণ করেছে, প্রকৃতি-সংলগ্নমানুষের জন্য যা একান্ত স্বাভাবিক এবং অনিবার্য।

আগরিয়াদের আখ্যানে জ্বালামুখী এক বালকের নাম। লোগুন্ডি রাজার ছেলে জ্বালামুখী তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সূর্যদেবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছিল। তাদের যুদ্ধের ফল লোহরির দগ্ধ-প্রান্তর এবং সূর্যের অভিশাপের কারণে আগরিয়ারা আজ নিঃস্ব। তবুও জ্বালামুখীর সংগ্রামশীলতাকে দেখে তারা শ্রদ্ধার চোখে। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত কুভা গ্রামের আগরিয়ারা সূর্যসম সরকারি দলকে কেটে ফেলে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করার দায়ে। খনিজ লোহার খোঁজে আগত একদল সরকারি জিওলজিস্ট ব্লাস্ট করে উড়িয়ে দেয় আগরিয়াদের দেবতাদের বাসস্থল পর্বতকে। প্রতিশোধ নিয়ে কুভা গ্রামের একশো-দেড়শো মানুষ রাতারাতি জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে – কেউ তাদের খুঁজে পায় না। অন্য গ্রামের আগরিয়ারা তাদের পালিয়ে থাকতে সাহায্য করেছে, খাদ্য দিয়েছে কিন্তু স্বাধীনভাবে বিচরণের অনুকূল পরিবেশ দিতে পারেনি। সরকারি রেকর্ড লিপিবদ্ধ করে যে, লোহরির আগরিয়ারা চুরি-রাহাজানি বাটপাড়ি জানে না, কখনও মিথ্যা বলে না। অথচ নিজ গোষ্ঠীর বিদ্রোহী মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রেকর্ডের বিপরীত কাজ করতে দ্বিধা হয় না তাদের। বুরু ব্লাস্ট করে যে জলাশয় সৃষ্টি হয় – প্রবল জলকষ্টেও তা ব্যবহার করে না তারা – এটি তাদের কাছে ট্যাবু বা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা। এ ট্যাবুর মাধ্যমে তারা তাদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবকে প্রকাশ করে।

৫.২.১৬

'অপারেশন বাকুলি' (১৯৭৮) গল্পটি আদিবাসীদের ক্ষেতমজুর আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। গল্পটি *অপারেশন ? বসাই টুডু* উপন্যাসের অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তি বিশেষ। উপন্যাসে বর্ণিত একটি ঘটনাংশকে সামান্য বিস্তৃত করে গল্পের আকার দেয়া হয়েছে। আদিবাসী মজুরদের সংগ্রামশীলতা, ন্যায্য মজুরি না পাওয়ায় দীর্ঘদিনের বঞ্চনা-ক্ষোভের প্রকাশে বাকুলির মহাজন সূর্য সাউকে হত্যা এবং তার বিপরীতে সেনাবাহিনীর বিশেষ দলের অভিযানে নারী শিশু নির্বিশেষে একচল্লিশ জনকে হত্যার ইতিবৃত্ত ধারণ করা হয়েছে এ গল্পের আখ্যানে। তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে বসাই টুডুর অমরত্বের রহস্য। আদিবাসী জীবন-সংগ্রামে মহাশ্বেতা সৃষ্ট বসাই টুডু এক অবিস্মরণীয় অমর চরিত্র। প্রতিবাদ, প্রতিরোধে অকুতোভয় এ সেনানী পুলিশ আর্মির সম্মুখ-সংঘর্ষে নিহত হয়। মৃত্যুর আগে তার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিশেষ ভঙ্গিতে বাতাসের গলা মোচড়াবার ভঙ্গি করে। মৃতদেহ শনাক্ত করে তার এককালের কমরেড কালী সাঁতরা এবং অন্যান্য আদিবাসীরা ; কিছুকাল পরে আবারও সে আবির্ভূত হয় এবং জোতদার মজুরের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। ফিনিক্স পাখির মতো তার বারবার এই পুনরুজ্জীবনের রহস্যের সমাধানের ইঙ্গিত এ গল্পে আছে। এ গল্পে নিজেকে বসাই টুডু বলে ঘোষিত করেছিল বসাইয়েরই সহকর্মী মুসাই টুডু – কালী সাঁতরার এ শনাক্তকরণে স্পষ্ট হয়ে যে, বসাই একটি মিথ এবং আদিবাসীরা বসাইয়ের এ মিথকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে প্রত্যেক সংগ্রামে তার নামের নেতৃত্বকে গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী বসাই নাম গ্রহণ করে নেতৃত্ব দেয়।

এ গল্পের মূল উপজীব্য আদিবাসীদের সংগ্রামশীলতা এবং তাদের উপর প্রশাসনের নিপীড়নের নির্মমতার স্বরূপ উদঘাটন। ১৯৭৩ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মহাজন সূর্য সাউ হত্যার বিপরীতে বাকুলিতে ক্যাপ্টেন অর্জন সিংয়ের নেতৃত্বে আর্মির অভিযানকে 'অপারেশন বাকুলি' নাম দেয়া হয়েছে। এ অভিযানে নারী-শিশু সমেত মোট একচল্লিশ জন আদিবাসী মারা যায় হেভি মেশিনগানের গুলিতে। যদিও পরদিন লাশ গণনার পর মেলে ঊনচল্লিশ – কেননা বসাইয়ের প্রধান সহচর দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলনা মাঝি নিখোঁজ (এ অংশটি পরে বিস্তৃত হয়েছে লেখকের 'দ্রৌপদী' গল্পে)। লাশ থেকে জীবিত মানুষ হয়ে ওঠা বসাই নামধারী এক আদিবাসী যখন এক জওয়ানের গলার নালী দুর্বল হাতে হেঁসো দিয়ে কাটতে যায় – তাকে ধরে পাকুড় গাছের মোটা ঝুরিতে বেঁধে গুলিতে ঝাঁঝরা করা হয় ; ভীষণ আক্রোশে মৃতদেহটিকে বুট দিয়ে মাড়াই এবং আরও নানাবিধ নির্যাতনের মধ্য দিয়ে বিকৃত করা হয়। বসাই তথা মুসাইয়ের এ বিকৃত দেহটিকে কালী সাঁতরার কাছে বইয়ে দেখা মাইকেলেঞ্জেলোর 'পিয়েতো' ছবির মতো মনে হয়ে,

যেখানে অসামান্য রূপসি মেরীর কোলে নিখুঁত যুবক শরীরে শায়িত রয়েছেন যিশু। শোষকের প্রতি শোষিতের প্রতিবাদের সংগ্রামের এ আলেখ্য সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে আজও অমলিন পাঠক হৃদয়ে।

৫.২.১৭

'শূন্যস্থান পূর্ণ করো' (১৯৭৯) ও 'সাগোয়ানা' শাল বনাম সেগুনের লড়াইয়ের গল্প। সিংভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হলদি ও তিতাহুতু গ্রাম এ গল্পদ্বয়ের স্থানিক পটভূমি। 'শূন্যস্থান পূর্ণ করো' গল্পের হলদি গ্রাম অন্যান্য আদিবাসী গ্রামের মতো অনুন্নত এবং বিচ্ছিন্ন। দিল্লির এক সংস্থা থেকে প্রেরিত সাংবাদিক সুকুল হলদি গ্রামে আসে উনিশশো চুয়াত্তরের মার্চ মাসে থেকে নিখোঁজ শশী ও ভুজঙ্গ মাহাতোর খোঁজে। পথে চক্রধরপুরে পুরনো রাজনৈতিক কর্মী আদিবাসী দরদী মতিলাল কোয়ারের সঙ্গে আলাপে ঘটনার সূত্রের সন্ধান পায় সে। মতিলাল জানায় তাকে যে, সাগোয়ানার লড়াইয়ে পুলিশের গুলিতে পাঁচজন আদিবাসী নিহত হয়েছে কিন্তু মৃতের সংখ্যা দু'জন বলে দাবি করেছে পুলিশ। সাগোয়ানা আন্দোলনের নেতা শশী মাহাতো ও ভুজঙ্গকে নিখোঁজ ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক সুকুল হলদি গ্রামে গিয়ে পুলিশি অত্যাচারে নিস্তব্ধ জনগোষ্ঠীর চরম অবিশ্বাসের পাত্রে পরিণত হলেও, পরবর্তী সময়ে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করে শশী ও ভুজঙ্গের সমাধি পাথরে পরিণত হবার ইতিবৃত্ত উদঘাটন করে।

গল্পটি লেখকের অপর একটি বড় গল্প 'সাগোয়ানা'-র সঙ্গে সম্পর্কিত। আপাতদৃষ্টিতে সাগোয়ানার অংশবিশেষ মনে হয় এ গল্পকে ; 'শাল বাঁচাও, সাগোয়ানা হটাও' আন্দোলনের পটভূমিতে উভয় গল্প রচিত এবং মতি কোয়ার, দিল্লী থেকে আগত অনুসন্ধানী সৎ সাংবাদিক মুকুল, ভুজঙ্গ মাহাতো, শশী মাহাতো, পলুস প্রভৃতি চরিত্র দু'গল্পের কেন্দ্রে অবস্থান করে। ঝারি মাহাতো, মহুয়া, ঝারির চায়ের দোকান সব উপাদান দু'গল্পের অবয়বে পাওয়া যায়। তবে ঘটনা এক হলেও উভয় গল্পের বিন্যাস ও অন্তর্নিহিত ভাবে কিছুটা ভিন্নতা আছে। 'সাগোয়ানা'-য় শাল সেগুনের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে ঝাড়খণ্ডি আন্দোলনকে ভাষারূপ দেওয়া হয়েছে ; অন্যদিকে 'শূন্যস্থান পূর্ণ করো' গল্পটি শেষপর্যন্ত 'দিকু হটাও' আন্দোলনে রূপ পেয়েছে।

'সাগোয়ানা' পুরোপুরি রাজনৈতিক গল্প। শশী মাহাতো এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ঝাড়খণ্ডি আন্দোলনের সঙ্গে সাগোয়ানা আন্দোলনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে এ গল্পে। তিতাহাতু গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে শাল কেটে সেগুন রোপণের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে তাতে আত্মাহুতি দেয় বেশ কিছু আদিবাসী প্রাণ। সাগোয়ানার লড়াই ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের একট্টা করে ঝাড়খণ্ডি অর্থাৎ

আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজ্যের আন্দোলনে শামিল করে। সিংভূমের বিস্তীর্ণ অনাবাদি জমিতে সেগুন রোপণ না করে আদিবাসীদের শায়েস্তা করার জন্য শালবন কেটে সেখানে সেগুন রোপণের সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। লেখক এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন –

> সেগুন তো শুধু সেগুন গাছ নয়। সিংভূমে সেগুন, প্রশাসনের অসীম মদমত্ত ঔদ্ধত্যের প্রতীক। .. শাল কেটে ফেলে সেগুন রোপণ করে প্রশাসনই ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকে পরোক্ষ সহায়তা করে – না বুঝেই। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৩৯)

আদিবাসীরাও তাই নারা বা শ্লোগান তুলেছিল –

> শাল আদিবাসী সাগোয়ানা দিকু
> সাগায়োনা রোপাই বন্ধ করো
> হঠাও সাগোয়ানা সিংভূম সে
> সাগোয়ানা রোপাই বন্ধ করো। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৩৯)

মূলত আদিবাসীদের জীবনদেবতাসদৃশ শালগাছ কেটে ফেলার এ হঠকারী সিদ্ধান্তই আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের মানসিক দূরত্বকে পাহাড়সম করে দেখায়। স্বাধীন ভারতবর্ষে আদিবাসী অঞ্চলের প্রশাসনিক পদেও আদিবাসী অফিসারকেই নিয়োগ দিতে হয় কিন্তু সরকারি পোশাকে যে আদিবাসী আসে তাদের শ্রেণিবদল ঘটে যায় আগেই। দৈহিক গড়ন ও জাতিসত্তায় আদিবাসী হলেও মানসিকতায় তারা আর স্বজাতির সমতলে অবস্থান করে না। সরকারের তাবেদার হয়ে তারা স্বজাতির বিরোধিতাই করে। অন্যদিকে আদিবাসী দরদী অনেক অ-আদিবাসীও মানবিক দায়বোধে সামিল হয় ঝাড়খণ্ডি আন্দোলনে। 'সাগোয়ানা' গল্পটি রাজনৈতিক এ প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে।

'শূন্যস্থান পূর্ণ করো' গল্পে আদিবাসী প্রতিরোধ ও আন্দোলন, তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার এবং তাদের নিঃস্ব, শূন্য জীবনকে শব্দ দিয়ে পূর্ণ করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা। শাল বনাম সেগুনের লড়াই আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন বা একটি ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন বলে মনে হলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে আদিবাসী মনস্তত্ত্বে। এ আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের সঙ্গে বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনের সামান্য ঐক্য দেখানো যেতে পারে। উভয় আন্দোলনই স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত হয়। বাংলাদেশের বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন কেবল ভাষা রক্ষার আন্দোলন হিসেবে নয়, বরং পাকিস্তানি ও বাঙালির সংস্কৃতিগত পার্থক্যকে সামনে রেখে বাঙালিদের মনে স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা বপন করেছিল। বায়ান্নোতে যে চারাগাছটি অঙ্কুরিত হয়েছিল পরবর্তী কালে উনিশ শো একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে তা মহীরুহ হয়ে নিজভূমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল এবং নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ন রাখতে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। সায়োগানা হটাও আন্দোলনও তেমনি নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্য ঝাড়খণ্ড বা

অলগখণ্ড প্রতিষ্ঠায় তীব্রতা পেয়েছে। আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ঝাড়খণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনেও শাল বাঁচাও আন্দোলনের ভূমিকা যথেষ্ট।

শাল বনাম সেগুন প্রকৃতার্থে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মানসিকতার বৈপরীত্যের চরম প্রকাশ। আদিবাসী অর্থনৈতিক জীবনে শাল কেবল বৃক্ষ নয় বরং দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। তাদের নিঃস্ব নিরন্ন জীবনে শাল ও মহুয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। শাল কাঠ, বীজ, পাতা কোনকিছুই ফেলনা নয়, এসবই তাদের নানাভাবে বাঁচায়। খরার সময় খাদ্যশস্যহীন আদিবাসীরা মহুয়া ফুল কাঁচা খায়, পাপড়ি শুকিয়ে গুড়ো করে চাপাটিও ভেজে খায়। ফুল থেকে মদ হয় আর ফল ও বীজ থেকে তেল বের করে তাতে প্রদীপ জ্বালে তারা। আদিবাসী অর্থনীতিতে সবচেয়ে মূল্যবান গাছদু'টি কেটে যখন সরকার সেগুন লাগায়, তখন নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্নকারী এ কর্মকাণ্ড বন্ধে তারা আন্দোলন করবে সেটি খুবই স্বাভাবিক।

আদিবাসী অর্থনীতিতে শাল মূল্যবান হলেও জাতীয় অর্থনীতিতে সেগুন সবচেয়ে মূল্য পায়। সেগুনে লাভ শতকরা। সেগুনের দেহজাত আঠা জল ও কীট প্রতিরোধ করে। অত্যন্ত মূল্যবান সেগুন কাঠ স্থায়ী হয় শত শত বছর। মহারাষ্ট্রের কার্লাগুহার অভ্যন্তরে সেগুনের সিলিং দু'হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেগুনের কোনো উপযোগিতা নেই আদিবাসী জীবনে – সে-কারণে সেগুন তাদের কাছে দিকু বা বহিরাগত। শত শত বছর আদিবাসীরা নিজভূমে উদ্বাস্তুর মতো অবস্থান করছে ; জঙ্গল কেটে আবাসভূমি তৈরি করেছে তারা অথচ অ-আদিবাসী মানুষেরা তাদের জমি দখল করে নিচ্ছে তাদের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগে। আদিবাসী জীবনে দিকু সবচেয়ে বড় অভিশাপ। দিকুর মতোই সেগুন আদিবাসী জীবনে অপ্রয়োজনীয়, বাহুল্যমাত্র ; তাই সাগোয়ানার লড়াইয়ে সেগুন হটানোর সঙ্গে সঙ্গে দিকু হটিয়ে নিজভূমে আপনসত্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয় তাদের শ্লোগানে –

> ইস্ পার সে উস্ পার
> যাও বিহারি গঙ্গা পার (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৫৩৩)

সেগুন তাড়ানোর আন্দোলন এভাবেই পরিবর্তিত হয়ে বহিরাগতদের প্রতি বিক্ষোভে রূপ নেয় এবং সেই সঙ্গে নিজভূমে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখার প্রত্যয়কেও ভাষারূপ দেয়।

৫.২.১৮

'ডাইনি' (*নৈঋতে মেঘ*, ১৯৭৯) ও 'প্রেতোৎসব' (*শালগিরার ডাকে*, ১৯৮১) গল্পদ্বয়ের অবলম্বিত বিষয় একই – আদিবাসী জীবনের কুসংস্কার বিশেষত ডান-ডাইনি ভাবনা এবং এ কুসংস্কারজাত-ভীতিকে উপজীব্য করে উচ্চ বা সুবিধাভোগী শ্রেণির ফায়দা তোলার চালচিত্র। দুটি গল্পের পটভূমিই আদিবাসী

গ্রাম। ‘ডাইনি’ গল্পের ঘটনাপটে আছে পালামৌয়ের টাহাড়, কুরুডা, হেসাডি, টুরা, মুরহাই প্রভৃতি আদিবাসী গ্রাম আর ‘প্রেতোৎসব’ গল্পের স্থানিক পটভূমি রাজাপুর নামক সাঁওতাল গ্রাম। উভয় গল্পেই শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তারা, শ্রেণিগতভাবে অবস্থান যাদের উচ্চতর। ‘ডাইনি’ গল্পের ব্রাহ্মণ হনুমান মিশ্র বর্ণগত উচ্চতাকে সম্বল করে সমাজে নেতৃস্থানীয় এবং সে-সূত্রে অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধিশালী। অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের কারণ দর্শায় সে ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় হয়ে। জানায় যে, স্বপ্নদর্শনে সে জেনেছে এ আকালের জন্য দায়ী এক ভয়ংকারা রমণী – ডাইনি। ডাইনিকে খুঁজে তাড়াতে বলে সে গ্রামবাসীকে। ঘটনাক্রমে গল্পের অন্তিমে আবিষ্কৃত হয় হনুমান মিশ্রের বাড়িতে আশ্রিত বোবা হাবা মুণ্ডা যুবতী সোমরাইকে তার ছেলে গর্ভবতী করলে, জঙ্গলে পলাতক এ মুণ্ডা যুবতীকে পূজারী ঠাকুর ডাইনি আখ্যা দিয়ে তার পরিবারের কুকীর্তি চাপা দিতে চেয়েছিল। ডাইনি-ভীতির প্রচার ও প্রসারে আদিবাসী সমাজকে বিভ্রান্ত করে হনুমান মিশ্র নারীবিষয়ে আদিবাসী সমাজের স্বভাবজ প্রতিরোধ সংগ্রামী অবস্থানকে এড়াতে চেয়েছে।

‘প্রেতোৎসব’ গল্পের রাজাবাবু নিজে এক সাঁওতাল। অগাধ জমিজমা এবং অর্থ-সম্পত্তি ও প্রচলিত ধারার শিক্ষার অধিকারী রাজাবাবু স্বগোত্রভুক্ত নয় ; শ্রেণিবদল ঘটেছে তার। কৌম জীবনের সকল নিয়ম-নীতি ভুলে সে কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত – নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে স্বজাতির অন্য কেউ ছটাক পরিমাণ কৃষিযোগ্য জমি ভোগ করুক তা তার কাম্য নয়। ভূমিহীনদের জন্য সরকার প্রদত্ত খাসজমি নিজের মাহিন্দার ও কর্মচারীদের নাম ব্যবহার করে নিজে ভোগ করে। নিজ এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও সে তার অঞ্চলের পথঘাট, জলের ব্যবস্থা, জমির ব্যবস্থা কিছুই করেনি। স্বগোত্রীয় সাঁওতালদের জন্য তো নয়ই, আদিবাসী সমাজেও যাদের অবস্থান সবচেয়ে নিম্নে সেই লোধা-বিরহড়-পাহাড়িয়াদের জন্যও তার বিন্দুমাত্র অবদান নেই। উপরন্তু পার্টির ছেলেদের সহযোগিতায় ভূমিহীন নিঃস্ব মণি খালপাড়ে ভালো জমি পেলে সেটা তার সহ্য হয়নি। নিজ জমিসংলগ্ন লখিন্দরের চার বিঘা জমি গ্রাস করতে এবং মণিকে শায়েস্তা করতে সে গ্রামে ডান-ডাইনের হুজুক তোলে এবং মণি, লখিন্দর আর গোপালীকে ডাইনি সাব্যস্ত করে। সমাজের দরিদ্রতম বৃদ্ধ খোদনের ঝুপার অর্থাৎ ভরগ্রস্ত অবস্থানের মাধ্যমে রাজাবাবুর নির্দেশে সে মণি, লখিন্দর ও গোপালীকে ডান-ডাইনি ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদ যারা করে, রাজাবাবুর পোষা গুণ্ডারা রাতের আঁধারে তাদের মারে। গোকুল, বেলুনচাঁদ ও উদ্ধবকে জরিমানা দিতে হয় প্রকাশ্যসভায় রাজাবাবুর বিরোধিতা করায়। মণির কন্যা রজনী রাজাবাবুর লালসার শিকার হয়ে লাশে পরিণত হলে অবশেষে সমাজে ঐক্য আসে। আদিবাসী সমাজ যে ঐক্যের জোরে বলীয়ান, সে-ঐক্যবদ্ধ সমাজ অতঃপর প্রেতনিধনের উৎসবের সূচনা করে।

'ডাইনি', 'প্রেতোৎসব' উভয় গল্পেরই অন্তিম পরিণতি ঘটে সমাজের মানুষের শুভবোধ উদয়ের মাধ্যমে। কুসংস্কার ও ভীতির বাতাবরণ ভেঙে ঐক্যবদ্ধ আদিবাসী সমাজ প্রতিরোধ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেছে – এমন আবহেই অরুণোদয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে গল্পদ্বয় সমাপ্ত হয়েছে এবং অবধারিত ভাবেই গল্পদ্বয়ে আদিবাসী জীবনবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

'ডাইনি' গল্পের বিস্তৃত কলেবরে আদিবাসী জীবনের দারিদ্র্য, মহাজন-প্রশাসনের নিপীড়ন এবং তাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে অলৌকিকভীতির তাণ্ডবের আখ্যান শিল্পরূপ পেয়েছে। নকশাল আন্দোলন, জে. পি. আন্দোলন, জরুরি অবস্থা-উত্তর আদিবাসী সমাজ বিপন্নতার প্রান্তসীমায় পৌঁছেছে ; স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগেও তারা তখন অসহিষ্ণু। আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতোই তাই হনুমান মিশ্রের ডাইনি-দর্শন তাদের মধ্যে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে। সভ্যসমাজের বিচারে এ অঞ্চলের আদিবাসীরা স্বভাবে অনুভূতিহীন। কেননা দুর্ভিক্ষের সময়ে এরা নিজ শিশুদের মিশনের দরজায় ফেলে রেখে চলে যায়। আগুনে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেলে তারা অন্যত্র বসতি গড়ে, সে-গ্রামে ফেরে না সহজে। এসবের ভিত্তিতে তাদের মানবীয় অনুভূতি বা স্বাভাবিকতায় নেতিবাচকতা আরোপ করা হয়। বস্তুত, শিক্ষিত সভ্যসমাজ তাদের নিজেদের অবস্থানে থেকে উল্লম্ব দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে এ বিবেচনা চাপিয়ে দেয়। আদিবাসীদের সমতলে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে চাইলে তারা দেখতে পেত যে, নিজেদের অক্ষমতা এবং শিশুদের প্রাণ-বাঁচানোর তাগিদেই নির্মমভাবে স্নেহডোর ছিন্ন করে তারা দুর্ভিক্ষের সময় শিশুদের মিশনের দরজায় ফেলে যায়। ঘর পুড়লে তাদের ফেরা হয় না, কেননা ধ্বংসস্তূপে নতুন আবাস সৃষ্টির চেয়ে অন্যত্র ঘর তৈরি সহজ – যেহেতু তাদের ঘর তৈরি হয় মাটি ও গাছের পাতায়। তাছাড়া একটা লোহার কড়াই ও কোমরের বলোয়া (অস্ত্রবিশেষ) ছাড়া তাদের আর কোনো সম্পত্তি থাকে না – যার টানে তারা পুরাতন আবাসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। জীবন-ধারণ সামগ্রীর অপ্রতুলতাই জীবন সম্পর্কে তাদের আশ্চর্য নির্মোহ করে থাকে।

আদিবাসী অঞ্চলে বা গ্রামে কেবল আদিবাসীরাই থাকে তা নয়। বর্তমান আদিবাসী জনপদে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে বাস করে গঞ্জু, দুসাদ-ধোবি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেরাও। তবে তাতে জীবনের কোনো ছন্দপতন হয় না। কেননা 'দারিদ্র্যের কম্যুনিজমে দুসাদ-গঞ্জু-ওঁরাও-মুণ্ডারা এক 'কমরেড' শ্রেণিভুক্ত' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৪৪৫)। অর্থনৈতিক শ্রেণিসমতাই তাদের সহাবস্থানের প্রধান নিয়ামক হিসেবে কার্যকর থাকে। এ সহাবস্থানে তারা পরস্পরের সংস্কার-আচার-প্রথাকে একসঙ্গে পালন করে। 'ওঁরাও বা মুণ্ডাদের প্রধান পুরোহিত পহান্-এর শ্রেষ্ঠত্ব অ-আদিবাসী গঞ্জু দোসাদ ও ধোবিরাও মানে'(মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৪৪৬)। চিরদিন এরা মহাজন জোতদারের শোষণ সয়ে এসেছে – নিয়তির ভবিতব্য হিসেবে

তা মেনেই জীবনধারণ করেছে কিন্তু সত্তর পরবর্তী সময়ে পুলিশের অত্যাচারে তাদের জীবন জ্বলে গেছে। পুলিশি জুলুম এদের জীবনের সকল প্রাণরস শুষে নিয়েছে। তাই এখন মহাজনি উৎপীড়ন, অনশন, আকাল, খরা এদের মনোবল ভেঙে দেয়। সামাজিক নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটলে আজ শাস্তি দেবার উদ্যমটুকু পর্যন্ত তাদের নেই। মুরহাই গ্রামে রামরিক ধোবির ছেলে পরসাদ ও বরম গঞ্জুর বিধবা বোন মানির জাত-পাঁত অসমর্থিত অবৈধ প্রণয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলেও সমাজ তাদের শাস্তি দেয় না, তাড়িয়ে দেয় না। কেননা গ্রাম-অর্থনীতিতে প্রতিটি কর্মক্ষম যুবক-যুবতী আবশ্যিক। কৌম জীবনে ব্যক্তি মানুষের গুরুত্বের বিষয়টি লক্ষণীয় – প্রকৃত অর্থে কাঠামোবদ্ধ সমাজে সক্রিয় প্রতিটি উপাদানই আবশ্যিক। তবে নিষ্ক্রিয় উপাদান তথা বৃদ্ধদের ভূমিকা ভিন্ন। আদিবাসী সমাজে প্রবীণদের সম্মান করা হয়, তবে ক্রমাগত দুর্যোগে তাদের সে মূল্যবোধেও হয়তো ঘুণ ধরেছে – সে আশংকা করা যায়। কর্মঠ-সরল আদিবাসীদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলা হয়েছে –

> একেক জায়গায় একেক বৈশিষ্ট্য। হেসাডির মেয়েছেলেরা খচ্‌ড়ী হয়। কুরুডার ওঁরাওরা কামচোর। বুরুডার পুরুষরা বদরাগী। মুরহাইয়ে বুড়ো-বুড়ি প্রতি দশ-পনেরো বছরে একজন না একজন ডাইন্ বা ডাইনি হয়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৪৪৬)

এ বৃত্তান্তে মুরহাইয়ের বুড়ো-বুড়ির ডাইন-ডাইনি হবার বিষয়টি সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়াবার সুযোগসৃষ্টির ইঙ্গিতবহন করে কি ? আর ডাইনি হয়ে তারা কী অনিষ্ট করে তার বিবরণও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই বুড়ো-বুড়ি ডান-ডাইনি হয়ে অন্যের গাই-মোষকে বাণ মারে, পরের বউকে রাতে বাইরে ডাকে ও কুকুরছানা হয়ে কামড়ে দেয়, নয়তো চুহা হয়ে সবার ধান-ভুট্টার বস্তা দাঁতে কাটে। তাদের জীবনের সকল অপ্রাপ্তির সঙ্গে যুক্ত হয় ডাইনি ভাবনা। তাদের বিশ্বাসে ডাইনি তাড়ালে শরীরের ব্যথা-বেদনা দূর হবে, জল হবে, আবাদ হবে, বনে শিকার মিলবে। জীবনের সকল অপ্রাপ্তিকে দূর করতে তাই তাদের এই ডাইনি শিকার। মধ্যযুগের ইউরোপের উইচ-হান্টিং এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইউরোপের মতোই ধর্মীয় নেতাদের চাপিয়ে দেয়া এ ডাইনি-ভাবনা। জীবনের সব অপ্রাপ্তি, অবিচারজনিত ক্ষোভ-ক্রোধের প্রশমন ঘটে যেন এ ডাইনি নিধনে। লেখক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এ গল্পে প্রশ্ন তোলেন যে, ডাইনি ভাবনা কি কেবল আদিবাসী সমাজের ? শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে যখন মা কারো সামনে ছেলেপিলেকে খেতে দেন না নজর লাগার ভয়ে কিংবা বৌ-মেয়েদের গর্ভাবস্থায় সন্ধ্যায় এলোচুলে বেরোতে দেন না উঠানে কু-বাতাস লাগার ভয়ে – তখন এই নজর বা কু-বাতাসের ধারণা কি ডাইনি-ভাবনার সঙ্গে মিলে যায় না ? শিক্ষিত চেতনায় শিক্ষা যে উপরিস্তরে, তলে যে অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার – লেখক তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে পাঠককে দেখিয়ে দেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়। নিরক্ষর আদিবাসীদের মানসিকতায় বিজ্ঞানের উৎকর্ষের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয় স্বল্প পরিসরে হলেও। ডাক্তার, ওষুধ, ইঞ্জেকশানের প্রতি অবিশ্বাস থাকলেও দাঁতের সেপসিসে অ্যান্টিবায়োটিক, পোড়া ঘায়ে মার্কুরিওকোম গ্রহণে আদিবাসীরা আপত্তি জানায় না। বস্তুত, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় তাদের অংশগ্রহণ নেই, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সংস্পর্শে তারা নেই বলেই তাদের এ ভীতি। মানবসৃষ্ট অর্থনীতির জগতে তাদের কোনো ঠাঁই নেই। ইটভাটি-কোলিয়ারি-বোখারোর ইস্পাত-কাঠের ব্যবসা-রেলপথ-ক্ষেত-শস্য – সবই এদের ফালতু করে রেখেছে। প্রকৃতি এদের একমাত্র উপায়। জল হতে চাষ হয়, বন সরস হয়, কন্দমূল মেলে, নদীতে মেলে মাছ। অনাবৃষ্টিতে প্রকৃতি বিরূপ হলে তাদের অস্তিত্ব হয় বিপন্ন। তাদের জীবনে দুটি মাত্র কথা শাশ্বত ; এক, কিরা লাগেংগা (খিদে পেয়েছে), দুই, মাল কুলার আড়গুড়া (পেট ভরেনি)। এ "দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য চাঁদ-সূর্যের মতো চিরকালীন" (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৪৫৭)। নিরন্তর অভাবের জগতে 'বিখিল' বা চাল তাদের কাছে দূরের স্বপ্ন। পালা-পর্বণে চালের ভাত খায় তারা ; ভুট্টা বা মাড়োয়ার জলীয় ঘাটোই তাদের প্রধান খাদ্য।

চির অভাবের জগতের অধিবাসী আদিবাসীরা জীবনের চলার রথকে থামিয়ে দিতে পারে না – তাই জীবন যাপন করে তারা যথানিয়মে। জন্ম-মৃত্যু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাও পালন করে। আদিবাসী সমাজে মৃতদেহ সমাধি দেওয়া রীতি ; সমাধির ওপর পাথর দেওয়া হয়। শুধু সমাধি দিলেই হয় না ; পরিবারে কেচ্চা (মৃত্যু) ঢুকলে, উল্লোচোত (অশৌচ) শেষ হলে, পূর্বপুরষের সমাধি প্রস্তরে জল, চাল, লবণ রাখে তারা – যাতে পূর্বপুরুষের প্রেত পরলোকে খেতে পায়। এখন হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশে ওলদা (চিতা) জ্বেলেও মৃতদেহ দাহ করা হয়। সৎকার রীতির এ পরিবর্তন মূলস্রোতের সঙ্গে সমলগ্নতার আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে। পাশাপাশি নিজ সংস্কৃতিকেও আঁকড়ে ধরে প্রবলভাবে। শিকার উৎসবে তারা গান গায় ; আনন্দ উদযাপনে মৌয়ার নেশায় মাতোয়ারা হয়। শিল্পের সৃষ্টিও হয় তাদের হাতে ; পুরুলিয়ার মুখোশ শিল্প, পোড়া মাটির ঘোড়া বা পুতুল ইত্যাদি তাদের তৈরি শিল্পবস্তু শহরে 'গণশিল্প'-র আখ্যা পায়। প্রকৃতপক্ষে মূলস্রোতের প্রভাব ও নিজ সংস্কৃতিকে ধারণের দ্বন্দ্বে শেষাবধি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদই জয়ী হয় ; তবু এ টানাপড়েনের কিছু চিহ্ন তো রয়ে যায় তাদের জীবনাচরণে।

নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদেই পূর্বপুরুষের সংগ্রামী ইতিহাসকে আজও তারা জাগিয়ে রাখে গল্পে গানে। ঔপনিবেশিক ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে গিধনা ও কালনা ওঁরাও নিহত হয়েছিল ছিল বলে জানা যায়। তাদের বংশধর হেসাডির পহান আজও শহীদের বংশধর হিসেবে সম্মান পেয়ে থাকে অন্য সকল জাতের আদিবাসীদের কাছ থেকে। গিধনার ফাঁসি ও কালনার গুলিতে মৃত্যু নিয়ে রচিত গান সবাই জানে –

গিধনা, তুমি ভয় পাওনি।

নিজে গলায় পাঁস পরলে

কালনা, তুমি ভয় পাওনি

এগিয়ে গিয়ে গুলি খেলে।

তোমাদের নাম হয়ে গেল গাছের পাতা।

যত বার ঝরে, ততবার গজায়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৪৬৫)

আদিবাসীদের মূল শক্তি তাদের ঐক্য। বিপদে আজও পহান বাজায় চামড়ায় নাগারা – যার সঙ্কেতে সকলে একত্রিত হয়। এ গল্পে টুরা গ্রামের মুণ্ডারা, হেসাডি গ্রামের ওঁরাওরা, কুরুডা গ্রামের আদিবাসীরা একত্রিত হয়ে ডাইনি রহস্যের সমাধান করে এবং হনুমান মিশ্রের বিরুদ্ধে এক অলিখিত বিদ্রোহের প্রত্যয় ঘোষণা করে – মিশ্রের কোলিয়ারিতে তারা কেউ কুলি হিসেবে যাবে না, বাইরের কাউকে যেতেও দিবে না। মিশ্রকে অর্থনৈতিকভাবে মোকাবিলার এ প্রত্যয়ে আদিবাসী জীবনের এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে কিন্তু মাথুর বা সভ্যসমাজের সঙ্গে তাদের কোন মিলনবিন্দু নেই, ওদের সঙ্গে মূলস্রোতের অবস্থান যে চিরকাল রেলপথের মতো সমান্তরাল সে-তথ্যটিও উঠে আসে লেখকের ভাবনায়। বস্তুত, মিলিত হয় না বলেই তারা পরস্পরের ভাবনাকে, অনুভূতিকে, জীবনকে অনুভব করতে পারে না। মহাশ্বেতা তাঁর রচনার মাধ্যমে বারবারই এ মিলনবিন্দু সৃষ্টি করতে চেয়েছেন – তাঁর প্রত্যয়ে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জানার মাধ্যমেই এ সংবাহন-বিন্দু সৃষ্টি সম্ভব।

‘প্রেতোৎসব’ গল্পের প্রেক্ষাপট অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন – যদিও ‘ডাইনি ভাবনা’ এ গল্পের প্রধান অবলম্বন। এটি মূলত রাজনৈতিক কিংবা শ্রেণিদ্বন্দ্বের গল্প। এ গল্পের ব্যতিক্রমী দিক হলো, এ গল্পেই প্রথম এবং একমাত্র শোষক চরিত্রে ধনী আদিবাসীই আবির্ভূত হয়েছে। শিক্ষিত রাজাবাবু রাজনীতি করেন – এ অঞ্চল থেকেই নির্বাচিত হন তিনি। তার ভাইয়েরা সবাই শিক্ষিত – চরণ সরকারি চাকুরে, ক্ষীরোদ কলেজের অধ্যক্ষ, কাকা বিশ্বনাথ অবসরপ্রাপ্ত সাব-জজ, জেঠতুতো দাদা তারানাথ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। রাজাবাবু ও তার পরিবার শিক্ষা ও অর্থবিত্তে গ্রামসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্ত অর্থনৈতিক অবস্থানের মানদণ্ডে স্বজাতি সাঁওতালদের শ্রেণিতে তারা অবস্থান করে না। সময়ের বিবর্তনে যে গুটিকয়েক আদিবাসী শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করে, তারা প্রাচীন কৌম সমাজে নয়, বরং অন্য শ্রেণিতে উন্নীত হয়ে স্বসমাজকে হয় অবহেলা করে, নয়তো শোষণ করে। এ গল্পের রাজাবাবুর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই সত্য হয়েছে। আদিবাসী জীবনে সমাজ সর্বশক্তিমান, তবে স্বৈরতান্ত্রিক নয়। পূর্বে আদিবাসী সমাজ-বৈঠকে কথা বলতে সবাই সমান অধিকারী ছিল ; সমাজে কোনো অবিচার হলে শাল গাছের ছাল বা গিরা পাঠাতো তারা ; গিরা মানে অন্যায়ের প্রতিরোধ, সংগ্রামে শামিল হওয়ার আহ্বান। কিন্তু প্রাচীন আদিবাসী

সমাজের সে-কাঠামো আজ আর বর্তমান নেই ; তাদের নিজেদের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন ঘটেছে। লেখক এ গল্পে এক সরকারি গ্রামীণ দারিদ্র্য সমীক্ষা উদ্ধৃত করে এ বিভাজনের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন –

> ১৯৭৮ সালে সপ্তম ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ দারিদ্র্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান, ভারতবর্ষে দ্বিতীয়। ১৯৭১ সালে দেখা গিয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসী গরিবেরা মাসে মাথাপিছু ১৫ টাকা খরচ করতে অসমর্থ। পশ্চিমবঙ্গে নগরদারিদ্র্যে আর গ্রামদারিদ্র্যে আকাশপাতাল তফাত। ভারতের আর কোনো রাজ্যে বুঝি গ্রামের দারিদ্র্য শহরের দারিদ্র্যের তুলনায় এত বেশি নয়।
>
> ...এই ভারতে, খাওয়ার পিছনে কে কি খরচ করে সে হিসাবে ১৯৭৩-৭৪ সালে শতকরা ৭৫ জন গরিব, একবারে গরিব শতকরা ৬৭ জন আর ভীষণ রকম গরীব শতকরা ৫৯ জন। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ৪৭৯)

শতকরা ৭৫ জন গরিব, রাজাবাবুর মতো ধনী ও ক্ষমতাবান লোককে ভয় করে চলে – সেটাই স্বাভাবিক। সে-কারণেই ব্যক্তিগত প্রতিহিংসায় রাজাবাবু মণিকে ডাইনি সাব্যস্ত করলেও সব জেনে বুঝে তারা চুপ থাকে। যদিও রজনীর মৃত্যু অবশেষে তাদের প্রতিবাদী করে তোলে। তাদের প্রাচীন সংগ্রামী চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ক্ষমতার 'স্বর' এক সময় 'অপর' বা 'ব্রাত্য' হয়ে যায়।

এ গল্পদ্বয়ে আদিবাসী সমাজের ডাইনি-ভাবনাকে পুঁজি করে তাদের প্রতি উচ্চবর্গীয় শ্রেণির নিপীড়নের কাহিনি এসেছে বটে, বাস্তবে আদিবাসী সমাজে ডাইনি বিষয়ক কুসংস্কার প্রবলভাবেই আছে। অসিতবরণ চৌধুরী শুধু মালদহ জেলার একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে ডাইনি-ভাবনার ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন (অসিত ১৯৮৫ : ৭১), মালদহের বরিন্দে গত ত্রিশ বছরের পঁচানব্বইটি নরহত্যার ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ছেচল্লিশটি অবশ্যই ডাইনি সংক্রান্ত ঘটনা, তার মধ্যে বিয়াল্লিশটি ক্ষেত্রে নারী নিহত হয়েছে ; বাকি চারটি পুরুষ। মহাশ্বেতা দেবী নিজেও এক সাক্ষাৎকারে আদিবাসী সমাজের এ কুসংস্কারের প্রাবল্যের উল্লেখ করেছেন।[৬]

৫.২.১৯

'লাইফার' (১৯৮৩) গল্পটি এক সাঁওতালের শেকড়-সন্ধানের কাহিনি। বড়শুলি গ্রামের মাগন সাঁওতাল মুহূর্তের ক্রোধে তার স্ত্রী দনিকে হত্যা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পায়। চৌদ্দ বছর লাইফার হিসেবে কাটিয়ে মাগন যখন জেল থেকে ছাড়া পায়, তখন বড়শুলি গ্রামে কোনো সাঁওতালের বসতি নেই। নকশালী হাওয়ায় বাবুদের উত্তাপে মাঝিরা উচ্ছেদ হয়ে তৃণমূলের মতো উড়ে গেছে কোন প্রান্তরে – তার সন্ধান মেলে না। চৌদ্দ বছর লাইফার হিসেবে বেড়ি পায়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে পা ঘষতে ঘষতে চলায় অভ্যস্ত মাগন – থানার সামনে এলেই পুরাতন লাইফার জীবনে ফিরে যায়। স্বজাতিহীন জীবন তার কাছে জেলবদ্ধ লাইফার জীবন সমতুল্য। কাজের সূত্রে জঙ্গলে কাঠচুরি করতে আসা ভিন গাঁয়ের সাঁওতালদের

সংস্পর্শে এসে মাগন অবশেষে তার পায়ের অদৃশ্য বেড়ি খুলে ফেলতে পারে এবং বড়ো বড়ো পা ফেলে হাঁসদার সঙ্গে পাহাড়ে রামগেরির ঢালে নতুন জীবনের পথে এগিয়ে যায়। যদিও সে-জীবন 'সন্তাল হড়ের দুঃখজর্জর অনিশ্চিত জীবন' ; তবুও সে-জীবনই তার কাম্য। শেকড় সন্ধানী মাগন স্বগোত্রীয় নতুন সমাজেই তার নবজীবন এবং পরিচিত নিমবীজ তেলের গন্ধে জীবনের স্ফূর্ততা খুঁজে পায়। 'লাইফার' গল্পে মাগনমাঝির শেকড় সন্ধানী কাহিনি আদিবাসী সমাজের কৌম জীবন ব্যবস্থাকেই প্রকটিত করে। সমাজবদ্ধতা, স্বজাতির প্রতি আনুগত্য, আদিবাসী সমাজের বড় বৈশিষ্ট্য। ছলচাতুরি, মিথ্যাচারিতা, সাঁওতাল জীবনে প্রায় অনুপস্থিত। খুন করে নিজে যেচে থানায় আত্মসমর্পণ তাদের স্বভাবজ। স্বগোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন কর্মঠ সাঁওতালরা শ্রম দিয়ে বাবুদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে। সে-কারণেই সভ্যসমাজ তাদের পায়ে অদৃশ্য বেড়ি পরিয়ে বন্দি করে রাখে। জল ছাড়া মাছের মতোই সাঁওতালরা বিপন্ন তাদের স্বগোত্রের সংস্পর্শ ব্যতীত। গোষ্ঠীপ্রীতি, গোষ্ঠীবদ্ধতার অনন্য এ উদাহরণ আদিবাসী ছাড়া অন্য কোনো সমাজে বিরল।

৫.২.২০

'নিশাত মাঝির ভুটান যাত্রা' (১৯৭৮) গল্পে আদিবাসী জীবনবাস্তবতার সংগ্রামী অনিশ্চিত যাত্রাকে 'ভুটান' শব্দের মাধ্যমে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। সুদূর অতীতে উত্তরবঙ্গের উত্তরতম এক সীমান্তের লোকেরা ভুটানে চলে যেত নতুন জীবনের সন্ধানে। বর্তমানে ভুটান কথাটি প্রতীকী এবং 'ভোটান যাই' কথাটি ভাগ্যান্বেষণে ভেসে পড়ার সমার্থক। অলিপুরদুয়ার থেকে জয়ন্তির পথে বিস্তৃত বনে যে সকল প্রান্তিকজনের বাস, তারা একাধারে হাতির অত্যাচার ও মহাজনের নিপীড়নের শিকার হয়ে চিরদুর্দশার জীবন যাপন করে। ভুটান সীমান্তে থেকেও তারা আসলে ভুটান যায় না – যায় ভাগ্যান্বেষণে। তাদের ক্ষেত্রে ভুটান হল অন্য কোনো চা-বাগান, জমির আধিয়ারি বা খেতমজুরের কাজ। এ অর্থেই এ গল্পের মুখ্য চরিত্র নিশাত মাঝি তার জেল পলাতক ছেলে ও প্রৌঢ়া স্ত্রীকে নিয়ে ভুটান তথা ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করে।

প্রৌঢ় নিশাত মাঝি একসময় তেভাগা লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল – হেরে গিয়ে তাড়া খেয়ে চিলমারা চা-এস্টেটের প্রান্তিক জনপদে না আধিয়ার, না খেতমজুর হয়ে টিকে আছে। সংগ্রামী বাবার সন্তান সনা ও উপা ১৯৬৭-তে ঝাড়খণ্ডি লড়াইয়ে অংশ নেয়ার জন্য যখন ঘর ছেড়ে বেরোয়, বাবা তাতে সমর্থন জুগিয়েছিলেন। ১৯৭১সালে জেল হাজতে উপার মৃত্যু হয় অনশনরত অবস্থায় জোর করে খাওয়াতে গিয়ে। সনা পালায় জেল থেকে এবং নিশাত মাঝি ও মেঝেন নির্ঘুম প্রতীক্ষায় থাকে তার। এক হাতির পালের সহযাত্রী হয়ে সনা আসে বাবা-মায়ের কাছে। হাতির তাণ্ডবে যখন পুলিশ ও অন্যেরা পালায়,

নিশাত মাঝি তার স্ত্রী-পুত্রসহ যাত্রা করে ভুটানে অর্থাৎ ভাগ্যান্বেষণে। যুগ যুগ ধরে সংগ্রামী চেতনার অধিকারী এ আদিবাসী মানুষগুলো ভাগ্যের অন্বেষণ করেই যায় কিন্তু কখনোই ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের হাতে ধরা দেয় না। তবুও সংগ্রাম ফুরোয় না – বহমান থাকে এবং চলমান সংগ্রামী জীবনের অংশ হয়ে নিশাত মাঝির মতোই আদিবাসী মানুষেরা বিরাজ করে এ ভূমে।

৫.২.২১

অর্জুন (১৯৮৪) গল্পটি পুরুলিয়ার খেড়িয়া শবর সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত। ভারতবর্ষের আদিবাসীদের মধ্যে লোধা ও খেড়িয়া শবর সম্প্রদায় সবচেয়ে অবহেলিত। অপরাধ ও জেল তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অপরাধ তারা করে না, তাদের নিয়ে করানো হয়। এ গল্পের মুখ্য চরিত্র কেতু শবর বারবার জেলে যায় সরকারি জঙ্গল কাটার অপরাধে অথচ তাকে দিয়ে জঙ্গল কাটায় রাম হালদার – এলাকার অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বিশাল মাহাতো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা। রাম হালদার ও বিশাল মাহাতো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের লোক হলেও শ্রেণিগত অবস্থানে এক। লেখকের ভাষায় – "ঝাণ্ডায় ঝাণ্ডায় বাইরে বিবাদ, ভিতরে দুধ কলা"(মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৪৩৭)। স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা সর্বদা এক – বিশাল মাহাতো অর্জুন গাছ কাটালে তা বহন করা হবে রাম হালদারের ট্রাকে। উভয়েই কেতুর মতো নিরন্ন শবরদের ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কেতুরা সব জেনে বুঝেও বাধ্য হয়ে তাদের ক্রীড়াণকে পরিণত হয় – কেননা দিন গেলে চারটি টাকা তাদের চাই আর সেজন্য গাছ, মানুষ যে কোনো কিছু কাটতে তারা রাজী। জীবন ধারণের সংগ্রামে মরিয়া বলেই অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে তারা চিহ্নিত কিন্তু এ তাদের প্রবণতা নয়, এ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে নিয়তির অলঙ্ঘ্য নিয়মকেও তারা মেনে চলে সহজে –

> পুরুলিয়াতে শবর ঘরে জন্মালে জঙ্গলে হাতে দিতেই হবে,
> জেলেও যেতে হবে, এ একবারে নিয়ম। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৪০৪)

অপরাধ করলেও জেল, না করে নেতাদের বিরোধিতা করলেও জেল – এই যেন তাদের ভবিতব্য। একা খেড়িয়া শবর নয়, সব সম্প্রদায়ের আদিবাসীরাই মূলস্রোতের নিপীড়নের শিকার। এ গল্পে উল্লেখিত হয়েছে চন্দ্র সাঁওতালের কথা, আক্ষরিক অর্থেই তার বুকে পাষাণ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। 'ধানকাটা সংঘর্ষে ওরা চন্দ্রের বুকে আধমণি বাটখারা চাপিয়ে চেপে ধরেছিল'(মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৪০৫)। এ ধরনের নির্যাতনের কাহিনি গল্প নয়, রূঢ় হলেও বাস্তব।

এ গল্পে নিরন্ন প্রান্তিক খেড়িয়া শবররা একাত্মবোধ করে কর্তনের জন্য নির্দিষ্ট প্রাচীন অর্জুন গাছটির সঙ্গে। বিশাল মাহাতো এ গাছটি কাটার নির্দেশ ও টাকা কেতু ও দিগা শবরকে দিয়ে ভোটের মিটিংয়ে যায় এবং ফিরে এসে কর্তিত গাছের বদলে আকাশের মানচিত্র আঁকা সন্নত তেজস্বী অর্জুন গাছটি ঘিরে সকল আদিবাসীর উন্মত্ত বাজনা ও ভিড় দেখতে পায়। দিগা শবর স্বপ্নদর্শনে এ গাছটিকে গড়াম (গ্রাম) দেবতা করে দিয়েছে – তাই গাছদেবতাকে ঘিরে জনতার উন্মত্ততা। ধর্মীয় সিলমোহরে সুরক্ষিত অর্জুন গাছ আর কাটা সম্ভব হবে না কারো। এ কাহিনিতে বোকা সেজে থাকা শবরদের ধূর্ততা ও কৌশলে সাময়িক পরাজয় ঘটেছে বাবুশ্রেণির। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা সমাজের আধিপত্যবাদীদের বিপ্রতীপে আদিবাসী মানুষের স্বর প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। সরকার ও সমাজকর্তৃক বারবার উন্মুলিত, জেল ও নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট শবররা সহসা বোঝে যে গাছটির অবস্থা তাদেরই মতো প্রান্তিক – তার এ জ্ঞানই তাদের স্বরকে দৃঢ় করেছে।

যে অর্জুন গাছটি ঘিরে বিয়েতে-পরবে তারা ঢোল ধামাসা বাজায়, মানসিকের চুল ফেলতে অবলম্বিত হয় যে গাছ, সাঁওতালরা বাঁধনা জাগরণে যার তলে গরু নাচায় ; যে গাছটি বহুবছর গৃহহারা আদিবাসীদের আশ্রয় দিয়েছে – সে-গাছটি রক্ষার কৌশল প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টিই প্রতীকায়িত করে। তাদের এ উদ্যোগ বাবুশ্রেণির মনে ভয় ধরিয়ে দেয়, কেননা আজীবন তারা শবরদের সরল, বুদ্ধিহীন, অনুগত রূপ দেখেছে ; সহসা তা অন্তর্হিত হলে তাদের পরিণত কৌশলী মানসিকতা বিশাল মাহাতোর বুকে ভয়ের কাঁপন জাগিয়ে তোলে। সাময়িক এ পরাজয় বৃহৎ পরাজয়ের ইঙ্গিত দেয় বলেই বিশালের এ ভীতি। গল্পের অন্তিমে চরিত্রগুলো যেন পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করে – কেন্দ্র হয়ে যায় প্রান্ত এবং প্রান্তই যেন কেন্দ্র বা প্রধান হয়ে ওঠে। 'অর্জুন' গল্পের ঘটনাংশটি পরবর্তী সময়ে মহাশ্বেতা তাঁর *জঙ্গল* (১৯৮৬) উপন্যাসের শুরুতে ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন বৃক্ষ অর্জুনের প্রতি মমতা বা পরিবেশবাদী চেতনা থেকে নয়, এ কাহিনি একান্তই আদিবাসী জীবনের প্রান্তিকতাকে উন্মোচনের প্রয়াসে রচিত হয়েছে এবং বিপন্ন বৃক্ষ, জঙ্গলের সঙ্গে বিপন্ন আদিবাসীদের সহাবস্থানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

৫.২.২২

'গণপতি কোটাল' (১৯৮৮) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং ঘটনাংশে আদিবাসীদের অবস্থান সহযোগী ভূমিকায়। মূলত চন্দ্রনাথ বেশরা, লক্ষ্মণ ও সাজো সরেনকে দৃশ্যপটের পাশে রেখে গণপতি কোটালের মানসিকতার বিশ্লেষণেই কাহিনি গতি পেয়েছে। কোটাল নদীর দক্ষিণে আদিবাসী অঞ্চলে নেহায়েত দরিদ্র গণপতি কোটাল স্ত্রীসহ বাস করে। উত্তরে তার সম্বন্ধী মন্তেশ্বর প্রভাবশালী বড়লোক। দক্ষিণের বাসিন্দা

গণপতি আদিবাসীদের মাদলের আওয়াজে বিপন্ন বোধ করে নিজেকে বহিরাগত বলে এবং সর্বদাই উত্তরে বাস করার আকাঙ্ক্ষা পুষে রাখে মনে। এক দুর্যোগঘন রাতে তার স্ত্রী অন্ন আগুনে পুড়ে গেলে সে সাঁওতাল প্রধান চন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হয় এবং উত্তরমুখি গণপতির প্রতি সহানুভূতিতে চন্দ্রনাথ তার যথাসাধ্য করে কিন্তু অন্নকে বাঁচাতে পারে না। তিন দিন পর মন্তেশ্বর এসে ভগ্নির গলিত শবদাহ করে ও থানার ঝামেলা মেটায়। জীবিতাবস্থায় যে বোনকে পূজোয় একটি কাপড় পর্যন্ত দেয়নি, সে বোনের পলিথিনে মোড়ানো গলিত শবদেহের উপর স্থাপন করে দামি জরিপেড়ে কাপড় – আয়রনির এ সুযোগ লেখক গ্রহণ করেছেন পরিপূর্ণভাবে। শ্মশানে মৃতদেহের সৎকার হলে উপস্থিত সাঁওতাল প্রধান, লক্ষ্মণ ও সাজোর সঙ্গে এই প্রথম গণপতি একাত্মবোধ করে। তার চরম বিপদের সময়ে অনাত্মীয় এই আদিবাসীরা যতখানি সাহচর্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি দেখিয়েছে তা এই প্রথম উপলব্ধি করে সে। এ গল্পে গণপতি ও আদিবাসী জীবনের একাত্মতার মূলসূত্র তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। চন্দ্রনাথ বেশরা অবস্থাপন্ন সাঁওতাল, অঞ্চল প্রধান, শিক্ষকও বটে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র দোকানি গণপতির সঙ্গে সে তুলনীয় নয় – তবুও সামাজিকভাবে গোষ্ঠীগত চেতনায় সে গণপতির সঙ্গে একাত্ম হয় ; মৃতদেহ আগলে রাত জেগে বসে থাকা গণপতির সঙ্গে বসে থাকে সেও। সাঁওতাল সমাজের অন্য অনেকের চেয়ে অবস্থাপন্ন হলেও আদিবাসী রক্তের ঐতিহ্য বহন করে চন্দ্রনাথ অমানবিক হতে পারে না। চন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সাজোর মানবিকতায় মুগ্ধ গণপতি অবশেষে নিজেকে দক্ষিণের লোক বলে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এ গল্পে আদিবাসী চরিত্রগুলো পাশে অবস্থান করলেও অন্তিমে তারাই কেন্দ্রে চলে আসে তাদের মানবিক ঔদার্য ও সহিষ্ণুতার গুণে। মহাশ্বেতা এ গল্পে আদিবাসী জীবন মাহাত্ম্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন বলা যেতে পারে।

৫.২.২৩

মহাশ্বেতা দেবীর অসাধারণ একটি গল্প ‘সাঁঝ সকালের মা’ (১৯৭০) বিলুপ্তপ্রায় পাখমারা সম্প্রদায়ের এক চরিত্রের কাহিনি। পাখমারারা যাযাবর শ্রেণির, ঘর নেই তাদের, পাখি ধরে বেচে বলে তারা পাখমারা। সরকারি খাতায় তারা সংরক্ষিত উপজাতি। জটি এ সম্প্রদায়ের এক নারী। সম্প্রদায়গতভাবে অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী সে। পাখামারারা তাদের নিজস্ব গোত্রের বাইরে বিয়ে করে না, কিন্তু জটি উৎসব কান্দোরীর ভালবাসার ডাকে সাড়া দিয়ে পালিয়ে তার সঙ্গে ঘর বাঁধে। কান্দোরীদের ব্যবসা চিকনপাটি বোনা। কান্দোরীর গৃহিণী হয়ে পাখমারা জটি প্রথম ঘরের স্বাদ পায় – যদিও তা স্থায়ী হয় বছর পাঁচেক। একমাত্র সন্তান সাধনের মুখপ্রসাদের উৎসবে চোলাই মদ খেয়ে উৎসব মারা যায়। পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে জটি তার পাখমারা সম্প্রদায়কে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় এবং

নিজেকে ও সন্তানকে বাঁচাতে সে আশ্রয় নেয় ধর্মীয় ও অলৌকিকতার বর্মে। নিজেকে ঠাকুরণী বলে প্রচার করে সে। দিনমানে সে জটি ঠাকুরণী – তখন সে সকল পারিবারিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে। সকাল ও সন্ধ্যায় সে মানবী – সাধনের মা ; সাঁঝ-সকালের মা।

ভক্ত ও শিষ্যের মাঝে নিজ সম্প্রদায়ের ঔষধি শিক্ষার গুণে অল্পদিনেই সে ঠাকুরণীর প্রতিষ্ঠা পায়। ওষুধ ও তাবিজের বদলে সে পয়সা নয়, চাল নিত। সে চালে সাঁঝ-সকালে ছেলেকে ভাত খাওয়াতো নিজে অনাহারে থেকে। একসময় অনাহার নামক প্রাচীন রোগেই সে মারা যায়। তিরিশ বছর বয়সী বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী সাধন তার মায়ের শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করে শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে ঘরে ফেরে ভাত খাবে বলে। মায়ের প্রতি ভালবাসা অটুট তার, কিন্তু জীবনের তাগিদও তার প্রবল, তাই "সাধনের মায়ের প্রতি ভালবাসা আর তপ্ত ভাতের প্রতি আসক্তি এ দুয়ের কোনো ব্যবধান নেই, ছেদ নেই। দুয়ে মিলে সাধন সম্পূর্ণ। তপ্ত ভাতের মধ্যে দিয়ে সাধন তার মাকে বারবার ফিরে পায়। জৈবিক ক্ষুধাকে মহৎ মানবিক আবেগে উপনীত করার আশ্চর্য শিল্প নৈপুণ্যে একটি নির্বোধ পাকস্থলীসর্বস্ব যুবক মহৎ আবেগের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে" (অরুণ ১৯৯৫: ৫৫৬)। এ গল্প প্রসঙ্গে লেখক জানাচ্ছেন –

> এই গল্পের সুতো পেয়েছিলাম এক অগ্রদানী পুরুতের কাছে। তিনি এক গরিব পরিবারকে বোঝাচ্ছিলেন যে, শ্রাদ্ধ করছ, অনেক খরচ না করলেও চলে। সামান্য খরচেও স্বর্ণ-গাভী-রজত ও ভূমি দান করা চলে। তাঁর কথাটি আমাকে গল্পটি লিখতে সূত্র দেয়। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৫৫৬)

লেখকের এ বক্তব্যকে আমলে নিয়েও বলা যায় যে, এ গল্পটি সামান্য খরচের শ্রাদ্ধ, প্রান্তিক মানুষের উদরপূর্তির আকাঙ্ক্ষা এবং মাতৃমূর্তির মাহাত্ম্যের বাইরে একটি বিলুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের আলেখ্য হিসেবে স্বতন্ত্র তাৎপর্য পেয়েছে। লেখক মিথের অনুরণনে এ সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তের সন্ধান দেবার চেষ্টা করেছেন। জটির ভাষ্যে পাখমারারা জরাব্যাধের বংশীয় বলে নিজেদের দাবি করে। মহাভারতের ভাষ্যে জরাব্যাধ অজ্ঞানতাবশত কৃষ্ণের পায়ে বাণ নিক্ষেপ করে এবং তাতেই ভগবান কৃষ্ণের প্রয়াণ ঘটে। এ মহাপাপের ফলে কেবল জরা নয়, তার সমগ্র সম্প্রদায় অভিশপ্ত হয়ে দ্বারকা নগরী ছেড়ে পথে নামে এবং যাযাবর হিসেবে রাঢ় বঙ্গে নিজেদের টিকিয়ে রাখে। যদিও কমতে কমতে মরতে মরতে বর্তমানে তারা মাত্র শ'খানেক আছে। গোষ্ঠীবদ্ধতার দৃঢ়তায় আবদ্ধ ওরা কখনও দল ছেড়ে যায় না। লেখক তাদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে –

> সমাজের মধ্যে বিয়ে, শ্মশানের শয্যায় ফুলশয্যা, শ্মশানের কলসিতে বউ ভাত রাঁধে, গাঁইজ্ঞেয়াতির পাতে দেয়। খুব স্বাধীন ওদের মেয়েরা পুরষেরা। ওদের মেয়েদের রূপের শেষ নেই। তামাটে চুল চুড়ো করে বেঁধে ওরা পলাকাটির মালা দিয়ে জড়ায়। ওদের চেহারায় পাথরের মূর্তির মতো স্বচ্ছ সৌন্দর্য। বহু পুরষ ওরা কুল

ভাঙেনি। স্বজাতে বিয়ে করেছে। রক্তের পবিত্রতা ওদের মহাপ্রাচীন। তাই ওদের চেহারা এত সুন্দর। (মহাশ্বেতা ২০০৩/৯ : ৪৩৬)

বর্ণনীয় বিষয়ে অতিশয়োক্তি আছে, অসত্য নেই। বস্তুত একটি অপরিচিত সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত অনুসন্ধানেও এ গল্পটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

৫.২.২৪

'গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটোলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটোলোক'(মানিক ২০০৫/২ : ১৯) – *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ মন্তব্যটি কুবেরের সম্পর্কে করেছিলেন ; কিন্তু এ মন্তব্যটি লোধাদের বেলাতেও সমান সত্য। আদিবাসীদের মধ্যেও লোধা ও শবর খেড়িয়াদের অবস্থান সর্বনিম্নে। মহাশ্বেতা দেবী নিজে বিভিন্ন সময় লোধাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সংবাদপত্রে রিপোর্ট লিখেছেন, তাদের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন এলাকার লোধাদের নিয়ে কল্যাণ সমিতি করেছেন এবং সাহিত্যের বিষয় হিসেবেও লোধা-শবরদের জীবনবাস্তবতা গ্রহণ করেছেন। 'কুড়োনির বেটা' গল্পের উপজীব্য বিষয় লোধাজীবন। এ জীবনের বঞ্চনা ও নিপীড়নের বাস্তবচিত্র, শিক্ষা ও নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত লোধাদের সামাজিক দুর্ভোগ, পরিবেশ বান্ধব বনধ্বংস ও কৃত্রিম বন সৃজনে লোধা জীবনে ব্যাপক বিচ্যুতি, ভূমিসংক্রান্ত আইন ও তার অপপ্রয়োগ এবং মঙ্গলকাব্যের অনুষঙ্গে লোধাদের ঐতিহ্য একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে কাহিনিতে এবং লোধা জীবনের উত্তরণের ইঙ্গিতবাহী হয়ে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

খিয়াসলের লোধা গ্রামে কুড়োনি লোচনের বিধবা। গ্রামের মহাজন মহাপাত্র বাবুর ক্ষেতমজুর লোচন শীতকালে আগুন পোহাবার জন্য বাবুর পালা থেকে কয়েক গাছা খড় নিয়েছিল আর তাতেই তাকে চোর অপবাদে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তার লাশটির সৎকারের অনুমতিও পায় না পরিবার, পুলিশি তদন্ত শেষে তা খাদে বা কাগজকলের বর্জ্যে ফেলে দেয়া হয়। কুড়োনিকে আয়ত্ত করার জন্য এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে আবার লোধাদের চোর হিসেবে গণ্য করার সামাজিক ধারাকে অব্যাহত রাখতেও এ ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনা আছে।

বৃটিশরা লোধাদের অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের গায়ে অপরাধীর যে তকমা লাগিয়ে দিয়েছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষে আইন করে তাদের বিমুক্ত ঘোষণা করলেও লোধাদের গা থেকে অপরাধীর চিহ্ন মুছে ফেলা যায়নি। আজও লোধাদের জন্য সরকারি অনুদানের সব টাকা বাবুরা মেরে দেয়।

আদিবাসী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ বই, খাতা, জামা বাবুশিক্ষকেরা বিক্রি করে টাকা নিজেরা নেয়। এ সব দেখে কুড়োনির মনে যে প্রশ্ন জাগে তা খুবই প্রাসঙ্গিক –

> তবে যে শুনি লধা চুরি করে। বাবুরা চুরি জানে না ? (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৩৪৮)

লোধা সমাজে যে চোর নেই তা নয় ; তবে সবাই চোর তাও তো ঠিক নয়। তবুও প্রতিবছর চোর অপবাদে লোচনের মতো বেশ কিছু লোধাকে পিটিয়ে মারা হয়। তার কোনো প্রতিবাদ হয় না – স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় কোনো ছন্দপতন ঘটে না। লোধা হত্যাকারীদের বিচার হয় না ; যেন লোধারা মানুষ পদবাচ্যের নয়। লোধাদের ভাঙা ঘরে কেরোসিনের অভাবে রাতে জ্বলে না বাতি, ক্ষুধায় জোটে না অন্ন। আজ কী খেয়েছে ?-এর উত্তর পাওয়া যায় লোধার কৌতুকবহ জবানীতে –

> হ্যাঁ হ্যাঁ, সকাল হতে জঙ্গলে যেয়ে গাডের লাঠি খেলাম আমি, কাঠ বেচতে যেয়ে বাবুর হুড়া খেল বউ, আর বাগাল খাটে যে ছেলেটা সে আজ পেল্লায় প্রহার খেল বাবুর ছেলের হাতে। এভাবে গুরুভোজন হয়ে গেল আজ। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৩৪৬)

ধর্মীয় বিশ্বাসে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই আহার দেবেন – তা মান্য করা হয়। কিন্তু এ বিশ্বাস বাবুদের জন্য নির্ধারিত, লোধাদের জন্য নয়, তাইতো এ সরস মন্তব্য –

> তিনি আমাদের সির্জেছেন তো লাথি – লাঠি – দায়ের কোপ – থানার গুঁতা – জেলের প্রহার এমন পঞ্চবেন্নন দিয়ে পাঠিয়েছেন। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৩৪৬)

কৌতুকের তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করেন যেন লেখক সভ্যতা, স্রষ্টা আর গতানুগতিক বিশ্বাসকে।

লোধার মতো আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখে বন। বনের কাঠ কেটে তারা বিক্রি করে। খন্তা দিয়ে তুঙ্গা আলু খুঁড়ে তুলে। এছাড়াও সংগ্রহ করে কাঁটা আলু, চুন আলু, পান আলু, চুরকা আলু – যখন যা পায়। সংগ্রহ করে নানা ফল – কেঁদ, ভুররু, ভুঁইকুমড়া, বেঁইচি, কুল, সেঁয়া কুল, বদা কুল, পিয়াল, আমলকী প্রভৃতি। নানা খাবারে বন তাদের বাঁচিয়ে রাখে বলে বনকে মাতৃমূর্তিতে দেখে তারা, নিজেদের মনে করে বনচণ্ডীর সন্তান। লক্ষ কোটি বছর পূর্বে যখন দেশজুড়ে ছিল বন, সে বনে বিচরণ করতো লোধাদের আদি পুরুষেরা। লোধাদের অতীত টেনেছেন মহাশ্বেতা চণ্ডীমঙ্গলের মিথিকাল অনুষঙ্গে। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা ও কালকেতুর উপাখ্যানের ব্যাধ কালকেতু লোধাদের আদি পুরুষ। সে-ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখে আজও দুর্গাষ্টমীতে লোধারা বনে যায় গোসাপ মারতে। এদিন যে লোধা গোসাপ শিকার করতে পারে, সে হয় কালকেতুর মতো মহাবীর। আজও শিকারে যাবার কালে গোধা দেখতে পাওয়াকে তারা অলক্ষণ মানে।

মঙ্গলকাব্যের ইতিবৃত্তে লোধাদের আদিম পুরুষ কালকেতুর আখ্যানে অভাব-অনটনের চিত্রই মেলে। তখনও দিকে দিকে ভাঙা ঘর, শূন্য গোহান, শূন্য গোলা ছিল ; তখনও বণিকেরা ব্যাধ কালকেতুর লক্ষ কাহন কড়ির ছাল, শিং, মধু, মোম, ধুনা কানাকড়িতে অর্থাৎ অত্যন্ত অল্পদামে কিনত। লোধাদের প্রাচীন ইতিহাসেও অভাব অনটনের উল্লেখ আছে। তবে তাদের ঐতিহ্যে গৌরব করার মতো উপাদান রক্ষিত ছিল। কালকেতু, রাঙাহাড়ি বিষয়চণ্ডী, কালারুদ্র দেবতা তাদের ঐতিহ্যের মূল্যবান রত্ন। লোধাদের ঘরেই রক্ষিত ছিল একসময় দেবতা জগন্নাথ। আজ ব্রাহ্মণরা রথযাত্রায় জগন্নাথকে পুরীধামে নিয়ে যায় আর লোধারা থাকে সবার পেছনে। বিভিন্ন মন্দিরে লোধা পূজারির অবস্থান এ প্রমাণ দেয় যে জাতিগতভাবে লোধারা একসময় উপরে ছিল, এখনকার মতো সমাজের তলায় ছিল না সর্বদা।

অন্নাভাব এতই প্রবল লোধাদের জীবনে যে, বিয়েতে যে আচার পালিত হয়, তাও অধিকাংশ খাদ্যসম্পর্কিত। বিয়ের সময় বিয়ের নিয়মমতো বর উঠবে একচালার উপর আর অভিনয় করে বলবে – আমি পড়ে যাব, পড়লে পরে মরেই যাব। তখন কনে বলে যে, তুমি নেমে এস। তুঙ্গা-আলু জোগাড় করে তোমাকে খাওয়াবো। বিয়ের সময় যে গান গাওয়া হয়, তাতেও প্রতিশ্রুতি থাকে খাদ্য সংগ্রহের –

> পাহাড়ে পর্বতে যামু আলু-তুঙ্গা খামু
> যাহার দেখমু খন্তা-কোদাল তাহার সঙ্গে যামু
> মারিব শাবলের গুঁতা আলু-তুঙ্গা বার করামু,
> আলু তুঙ্গা খামুরে পাহাড়-পর্বত যামুরে (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৩৪৭)।

বন-প্রদত্ত খাদ্য উপাদানে নির্ভরশীল লোধাদের জীবনে বনের আশ্রয়টুকুও বিলীন প্রায়। শালগাছ কেটে ইউক্যালিপটাসের মতো গাছ লাগানোয় বনের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। ইউক্যালিপটাস বনে মাটি জ্বলে যায় – ঝাটিজঙ্গল, কন্দমূল ফল কিছুই থাকে না। পরিবেশবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, লোধাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ইউক্যালিপটাস বিরোধী বা শালবন ধ্বংসের বিরোধী মনোভাব দেখিয়েছেন লেখক।

এ গল্পের অন্তিমে লোধাদের উত্তরণের যে ইঙ্গিত বহন করা হয়েছে তার প্রধান নিয়ামক হিসেবে কার্যকর থেকেছে শিক্ষা। স্বাধীন ভারতভূমে সরকার স্কুল তৈরি করে নানা অনুদান দিয়েছে আদিবাসী এলাকায় – অথচ আদিবাসী ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়তে পারে না। শিক্ষকের আগ্রহ থাকে কম, উচ্চবর্গীয়দের তুষ্টি তাদের কাম্য। আদিবাসী ছেলেরা পড়লে বাবুশ্রেণির বাড়িতে সস্তাদরে কাজের লোক পাওয়া যাবে না। নিজেদের সুবিধা সুনিশ্চিত করতে এবং আদিবাসীদের অধস্তন করে রাখতে শিক্ষার বিপরীতে তাদের অবস্থান। কিন্তু কুড়োনি-লোচনের মতো বোধবুদ্ধিসম্পন্ন লোধারা সময়ের পরিবর্তনে শিক্ষার অপরিহার্যতা

সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজেদের উত্তরণের পথ হিসেবে শিক্ষাকে গ্রহণ করে। নিজ সন্তান জুড়নকে স্কুলে দিতে চায় কুড়োনি। এমনকি ছেলের উপার্জনের সমস্ত টাকা জমা করে হারিকেন কেনে, যাতে ছেলে সন্ধ্যায় পড়তে পারে। মানসিকতার পরিবর্তনই কুড়োনিকে প্রতিবাদী বিদ্রোহী হয়ে উঠতে সাহস জুগিয়েছে। জমিবণ্টন সংক্রান্ত আইনে আদিবাসী এলাকায় কোনো অ-আদিবাসী জমি কিনতে পারবে না। মহাপাত্রবাবু কুড়োনিকে কব্জা করতে নিজ বাড়ির মুনিষ সনাতন মাঝির নামে লোচনের জমি লিখিয়ে নেয়। আড়াইশো টাকার মিথ্যে ঋণ দেখিয়ে সে কুড়োনিকে ফাঁদে ফেলতে চায়, সত্যিটা সকলেই জানে কিন্তু এমনটাই হতে থাকে – এ ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে নিশ্চুপও থাকে। কুড়োনির প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর অবশ্য সকলকে সাহস জোগায় মহাপাত্রের বিরুদ্ধে যেতে। এভাবে সপ্রতিভ লোধা মেয়ে কুড়োনি তথাকথিত উচ্চবর্গীয় মহাপাত্রবাবুকে পরাজিত করে নতুন জীবনের উদ্ভাসে আশান্বিত হয়ে উঠে।

৫.২.২৫

খেড়িয়া শবরদের দুর্দশা ও দুঃসহ জীবন নিয়ে রচিত আরেকটি গল্প 'উদ্ধবের জীবন ও মৃত্যু' (১৯৮৫)। গল্পটিতে বীরগ্রামের উদ্ধব শবর পাগল হয়ে আত্মহত্যা করে ; পাশের গ্রাম লালকুয়ার প্রভাবশালী মাহাতোদের অনুমতি নিয়ে তার লাশ দাহ করা হয়। অথচ মাহাতোরাই আবার থানায় অভিযোগ করে উদ্ধবকে খুনের অপরাধে তার কাকা উকিল শবর ও তার তিন ছেলেকে গ্রেপ্তার করায়। শবরদের মধ্যে উকিল শবর আট বিঘা জমি, গাই গরু ও ছাগলের মালিক বিধায় মাহাতোদের সে চক্ষুশূল। শবরদের মধ্যে কেউ স্বচ্ছল হোক তা চায় না সমাজপতিরা – তাই শবরদের দমিয়ে রাখার জন্য এত আয়োজন। উন্মাদ হয়ে উদ্ধব সমগ্র পৃথিবীতে একটি জায়গার খোঁজ করেছে, যেখানে মাহাতোর মতো শাসকশ্রেণি নেই, যেখানে শবরদের জমি কেউ দখল করে নেয় না, শবরদের ঘরের সামনে গাছে বাঁধা ছাগল দড়ি খুলে টেনে নেয় না। উদ্ধবের পাগলামির পেছনে মাহাতোদের নিপীড়ন ক্রিয়াশীল ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু এ পীড়নের প্রতিকার করাও দুঃসাধ্য।

শবর সম্পর্কিত গল্প-উপন্যাসে মহাশ্বেতা প্রথাগতভাবেই কালকেতু-ফুল্লরার মিথকে ব্যবহার করেছেন। একসময় শবররা ছিল বনের অধিকারী। শবরদের পূর্বপুরুষ কালকেতু বনচণ্ডীর কৃপায় শবর সাম্রাজ্য গড়েছিল, যেখানে লোধা শবররা স্বাধীনভাবে থাকতো, ছিল না কোনো শোষক বা উৎপীড়ক। একসময় এল কাঁকড়া লক (বহিরাগত), তারা তাদের চাতুর্যে লোধা শবরদের সাম্রাজ্য কেড়ে নিল। সরল বিশ্বাসপ্রবণ শবররা বোঝেনি চাতুরী, মিথ্যা, কৌশল। সে-পাপে একদা বন-সন্তান শবররা আজ হাতির পদতলে পিষ্ট হয়ে মরে।

উদ্ধবদের গ্রামের নাম বীরগ্রাম। একসময় ছিল ‘বিরগ্রাম’। সাঁওতালি মুণ্ডারি ভাষায় ‘বির’ মানে জঙ্গল। আদি ‘বিরগেড়্যাকে’ চল্লিশের দশকের শেষ বছরে তৎকালীন নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য রেগে গিয়ে ‘বীরগ্রাম’ নামকরণ করেন। বুনো হাতির উপদ্রবে ভীত ও বিরক্ত হয়ে তিনি বুনো নামের বদলে বীরত্বসূচক সভ্য নাম দিয়ে গ্রামনাম রেকর্ড করান। এভাবে কাঁকড়ালকের থাবা থেকে কেবল শবরদের জমি নয়, তাদের গ্রাম-নাম, তাদের Identity পর্যন্ত রক্ষা করা যায় না। মহাশ্বেতা এ গল্পে জানিয়ে দেন যে, ভারতে সকল আদিবাসীকে হিন্দু জাতি বলে নথিবদ্ধ করা হয় – অর্থাৎ তাদের পরিচয়ের চিহ্নগুলোও পাল্টে দেয় রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিভূরা।

স্বাধীন ভারতবর্ষে আদিবাসীর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয় প্রচুর টাকা কিন্তু তার পাই পয়সার সুবিধাও পায় না তারা। সবই যায় সমাজের প্রভাবশালীদের ভোগে। শবরের নামে কুয়া অনুমোদিত হয়, লালকুয়ার মাহাতোরা তা নিয়ে নেয়। প্রত্যন্ত বীরগ্রামে বনপথে নেউল মাহাতো আসে নানা দু’নম্বরী পণ্য নিয়ে এবং সাবান, পাউডারের মতো বিলাসী দ্রব্য ধারে জোর করে গছিয়ে দেয় শবরদের এবং যথাসময়ে সে ধার উদ্ধার করে বহুগুণ বাড়িয়ে। নেউল মাহাতো কিন্তু লালকুয়ায় ঢোকে না, যদিও তার স্বজাতিরা বাস করে সেখানেই।

বিংশ শতকের শেষপ্রান্তে এসেও শবররা পায় না চিকিৎসার মতো মৌলিক সুবিধাদি। আজও সাঁওতাল গুণিন কেঁদো সরেনের চিকিৎসার উপর নির্ভর করে তারা। কেননা, দেড় মাইল দূরের লালকুয়ার বা নিমপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র গরিব শবর, সাঁওতালদের কাছে শতেক মাইল দূরে। দেড় মাইলের দূরত্ব শতমাইলে পরিণত হয় – মানসিকতার দূরত্বের কারণে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে।

৫.২.২৬

‘ভারতবর্ষ’ (১৯৮৬) গল্পের স্থানিক পটভূমি খারোয়ার, মুণ্ডা, ওঁরাও অধ্যুষিত গ্রাম আঢাই, সময় – বর্তমান (রচনার সময়কাল)। এ গ্রামের রঘুবর খারোয়ারকে তিনবার সুচিকিৎসা দিয়ে বাঁচিয়ে তোলে রামান্দা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার নবীন পরসাদ। প্রথমবার গোখরা সাপে কাটলে, দ্বিতীয়বার মেলায় বিষাক্ত মদ খেয়ে এবং তৃতীয়বার পায়ে কোদালের কোপ খেয়ে রঘুবর যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে, তখন নবীনের আধুনিক চিকিৎসা ও বেঁচে থাকার অসীম প্রত্যয়ে ফিরে এসেছে জীবনের পথে বার বার। রঘুবর খারোয়ার সম্প্রদায়ের প্রতিভূ – যে খারোয়াররা এ ভূমিতে সবচেয়ে আগে এবং মুণ্ডারা সবশেষে এসেছে। চতুর্থবার

কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত রঘুবর মৃত্যুর জন্য নির্জনে অপেক্ষা করে, এবারও ডাক্তার কুষ্ঠ নয় বলে তার মনে বেঁচে থাকার স্পৃহা জাগায় এবং ওষুধে সুস্থ করে তোলে। নবীন নিজেই বিস্মিত হয় রঘুবরের রোগমুক্তিতে এবং এই প্রথম সে মানুষের কাছ থেকে জীবনের পাঠ নেয়।

পালামৌয়ের ভীষণ রুদ্র ভূমিতে আঢাই ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অনন্য। আঢাই নদীর জল জমে এ গ্রামে প্রাগৈতিহাসিক সময়ে তৈরি এক খাদে সৃষ্টি হয়েছে এক সুবিশাল হ্রদ। পালামৌয়ের রুক্ষ ক্রুদ্ধ প্রান্তরে জলের এই সমারোহ আশ্চর্য ব্যতিক্রম এবং অসীম সৌন্দর্যের আধার। বৃদ্ধ মুণ্ডা শুকরা কেরকেটা এ হ্রদ সৃষ্টি বিষয়ক পুরাণের উল্লেখে আদিবাসীদের বিশ্বাস, প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেন। আদিবাসীদের স্রষ্টা দেবতা পৃথিবীর পাপপূর্ণ অবস্থা নিরসনে 'সেঙগেল-দা' বা আগুনের বৃষ্টিতে জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে দেয় সব। আবার সেই দেবতাই জল ঢেলে তপ্ত পৃথিবীকে শান্ত করে। আঢাইয়ের হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে সেই আদিম বৃষ্টির জলে – মুণ্ডাদের তাই বিশ্বাস। রঘুবর খারোয়ার বিশ্বাস করে – ওই জলের নীচে আছে খারোয়ার জাতির যোদ্ধারা ; যারা কখনও স্বাধীনতা হারায়নি। ঘোড়ার হ্রেষা, অসির ঝনৎকার নাকি আজও শোনা যায়। আঢাইয়ে এখনও চলছে মধ্যযুগ। রঘুবরেরা মধ্যযুগ থেকে বিংশ শতকে আসার পথ খুঁজে পায় না।

আজও এ গ্রামে আলো বলতে কেরোসিনের ডিবরি, লণ্ঠন। খাদ্য বলতে মাড়োয়া সেদ্ধ, লবণ, লঙ্কা, চেনা লতাপাতার কন্দমূল, কখনও খরগোশ, সজারু বা পাখির মাংস এবং উৎসবে-ভোজে ভাত। মুণ্ডা, ওঁরাও, খারোয়ার তিন টোলি মেলালে তিনশো মানুষ। গরু নেই একটিও, ছাগল শ'খানেক এবং কিছু মুরগি দেখা যায়। গ্রামে তিনজনের টর্চ আছে, একজনের আছে প্লাস্টিকের হাত পাখা, চারজন যুবক প্যান্ট পরে ; আধুনিক যুগের সঙ্গে সংযোগ তাদের এটুকুই। 'ভারতবর্ষ' গল্পের keyword হল সময়। এ গল্পের পরিকাঠামোয় 'সময়' এক অনিবার্য তাড়না সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার তিরিশ বছর পরেও এ ভূখণ্ডের সকল অধিবাসী স্বাধীনতা পায়নি – তারা পরাধীন থাকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর অজ্ঞতার কাছে। তবুও সময়ের মানদণ্ডে পিছিয়ে থাকা এ মানুষগুলো হার মানে না। কুষ্ঠরোগের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি পর্যন্ত দূরীভূত করতে পারে তারা। তাই তারা নমস্য, অপরাজেয়।

এ গল্পে এ শতকের মানুষ ডাক্তার নবীনের সঙ্গে আদিম জনগোষ্ঠীর রঘুবরের এক সংবাহ তৈরির চেষ্টা হয়েছে। ওদের কোন সংবাহন বিন্দু নেই বলে সংবাহ হয়নি কিন্তু পরস্পরের কাছাকাছি আসায় এক নতুন উপলব্ধি জেগেছে উভয়ের মনে। নবীন স্পষ্টত অনুভব করেছে তাদের মধ্যকার দূরত্ব। তার উপলব্ধিতে জেগেছে –

> হায়, প্রকৃতির মতোই আদিম যারা, যাদেরকে ও মাঝে মাঝে স্টমাকওয়াশ করেছে, সাপ কাটলে ইনেজক্শান দিয়েছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় বাঁচিয়েছে, তাদের শরীর ও ছুঁয়েছে। তাও কাচের দেয়ালের বাইরে থেকে। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ৪৩৩)

প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই তাদের মাঝে বিরাজ করে কাঁচের এক অভেদ্য দেয়াল – যার ভেতর দিয়ে দেখা যায় সবকিছু কিন্তু স্পর্শ করা যায় না।

এ গল্প সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন –

> ‘ভারতবর্ষ’ গল্পের হ্রদ ও জনপদ সত্য। ডালটনগঞ্জ থেকে রামকাণ্ডা যাবার পথে নির্জন অরণ্যে থামবেন, হরিণ পথ পেরিয়ে যাবে, বাঁ দিকে হাঁটবেন। দেখবেন ঢাই গ্রাম, ওই আশ্চর্য হ্রদ, মুণ্ডা জনপদ যা কয়েকটি কুটির মাত্র, যে অঞ্চলে এই নব্বই বছর বয়সি শতক আজও ঢোকেনি (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৫ : ৫৭২)।

বহুস্বরের উপস্থিতি এ গল্পে আদিবাসী জীবনকে স্পষ্ট করেছে। নবীন, রঘুবর, রঘুবরের স্ত্রী, অফিসার, টাইপিস্ট প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সংলাপ প্রক্ষিপ্ত করেছে এবং সব মিলিয়ে সময়ের থেকে বহুদূরের আদিম জনপদের আদিম জীবন-কাহিনি শিল্পরূপ পেয়েছে।

৫.২.২৭

উনিশশো সাতষট্টি সালের নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা আরও একটি গল্প ‘এম ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ’(১৯৭৭)। *অগ্নিগর্ভ* গল্পগ্রন্থের *অপারেশন ? বসাই টুডু* এবং পরবর্তী সময়ের ‘অপারেশন বাকুলির’ কাহিনির সঙ্গে এ গল্পের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। আদিবাসী খেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি বা মিনিমাম ওয়েজ (এম. ডব্লু)-এর জন্য লড়াই এ গল্পে শিল্পরূপ পেয়েছে। লেখকের অন্য অনেক গল্পের মতো এ গল্পেও সামাজিক দায়বোধ ও শিল্পসৃষ্টি একাকার হয়ে গেছে। মহাশ্বেতার *অগ্নিগর্ভ* কোন বিদ্রোহের উপকথা নয় ; এক বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনের ছায়াধর্মী হলেও চিরকালীন ইতিহাস প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটি স্থান-কালের বাঁধন ছাড়িয়ে উঠেছে অথচ উপেক্ষিত হয়নি ব্যক্তি ও তার গহনের রণন। আদিবাসী জীবন সংগ্রামী চেতনায় নিবিড় অবলোকনে অনন্য হয়েছে গল্পটি।

‘এম. ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ’ গল্পের নামকরণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি বা মিনিমাম ওয়েজ সংক্ষেপে এম. ডব্ল্যুকে প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে খেতমজুর লখিন্দের, যে কি না দু’মুঠো চালের জন্য জোতদারের খোঁচড় হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু শ্রেণিগত বোধে জোতদারের চাইতে স্বশ্রেণির প্রতিই তার টান স্বভাবজ। সাঁওতাল ক্ষেতমজুর নেতা বসাই টুরার পরামর্শে সে স্বজাতির স্বার্থে

জোতদারের সঙ্গে খোঁচড়ের অভিনয় করে, তার গোপনীয় কথা জেনে বসাই টুরাকে জানিয়ে দেয়। স্থানীয় এম. ডব্ল্যু ইনস্‌পেক্টর সুবোধ রুইদাসকে সঙ্গে নিয়ে বসাই লখিন্দের সহায়তায় জোতদারকে সাময়িক পরাজিত করে এবং তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করে। কিন্তু দু'দিন পরই বিনা প্ররোচনায় বহিরাগত পেশীশক্তির সহযোগে লস্কর বাহিনীর গুলিতে বসাই আর লখিন্দ প্রাণ হারায়। ক্ষমতার শাশ্বত বিজয় অটুট থাকে গ্রাম জনপদ জুড়ে।

বছরের পর বছর সরকার ক্ষেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ করে দেয়, তা বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে অফিসার নিয়োগ করে কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় না কখনও। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় লখিন্দ, বসাই, গোবিন্দ বাউরির মতো ক্ষেতমজুররা জেনেছে যে, ন্যূনতম মজুরি বা মিনিমাম ওয়েজের সরকারি সিদ্ধান্ত নিতান্তই ফতোয়া, রেডিও এবং খবরের কাগজের সরকারি প্রচার মাত্র। এই আইনকে কার্যকর করার কোন সদিচ্ছা সরকারের নেই কেননা তাতে শ্রেণিস্বার্থে ঘা পড়ে। ক্ষেতমজুররা জানে তারা আটষট্টির হিসাব পায়নি, চুয়াত্তরের হিসাব পায়নি, ছিয়াত্তরের সরকার ঘোষিত রেট আট টাকা দশ পয়সা পায়নি। বছরের পর বছর ক্ষেতমজুর তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনার ইতিহাস মহাশ্বেতা নির্মাণ করেছেন নির্মোহ বাস্তবতা ও কঠিন সততার অকপটতায়। তিনি ইঙ্গিত দেন পুরো প্রক্রিয়াটিই প্রান্তিক মানুষকে আরও প্রান্তিক করার প্রয়োজনে। জোতদার স্থানীয় রাজনৈতিক পার্টির অফিসে পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদান দিতে পারে কিন্তু ক্ষেতমজুরদের প্রাপ্ত মজুরির দশমাংশ দেয় কারণ সে চায় এই শোষণের সামাজিক কাঠামাকে অব্যাহত রাখতে। প্রান্তিক মানুষেরা পেট ভরে খেতে পাক এটিই তার কাম্য নয়। কেননা তাতে এ মানুষগুলো স্বাধীনচেতা হয়ে উঠবে, আর ক্রীতদাসের মতো থাকবে না। বস্তুত এ কেবল জোতদারের নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উপরের দিকের সব মানুষেরই তাই আকাঙ্ক্ষা। এ কারণেই ভূমিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে কৃষকের অধিকারের কথা বলা হয়, ক্ষেতমজুরের নয় ; বাস্তবে দেশে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই বেশি।

মহাশ্বেতা তাঁর একাধিক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রের বিভিন্ন কলামে ধারাবাহিকভাবে নিরন্ন এই ক্ষেতমজুর মানুষের কথা বলেছেন। তাদের ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তাঁর লেখনী সচল থেকেছে ধারাবাহিক নিরবিচ্ছিন্নতায়। এ ধারাতেই এ গল্পটি তাঁর রচনায় স্থান নিয়েছে।

৫.২.২৮

মহাশ্বেতা তাঁর গল্প-উপন্যাসে শোষিত মানুষের আর্তনাদ, শোষকের নিপীড়নের কার্যকারণ যেমন স্থান দিয়েছেন, তেমনি তাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিবৃত্তকেও লেখার সামগ্রী করেছেন নির্দ্বিধায়। 'সমাজবাদ ববুয়া' (১৯৮৩) গল্পটিতে লেখক নিপীড়নের পাশাপাশি প্রতিরোধ সংগ্রামকে উপজীব্য করেছেন।

কাহিনি আবর্তিত হয়েছে জংলি বেসরা নামক এক সাঁওতাল চরিত্রকে কেন্দ্র করে। লেখক চরিত্রটিকে উপস্থাপন করেছেন তাঁর সামগ্রিক পরিচয় সমেত। 'নাম জংলি বেসার, সাঁওতাল আদিবাসী হিন্দু, পিতা-মৃত নন্দ বেসরা, সাকিন হাতিবান্ধা চামরবাশী, থানা-শাঁকরাইল।' স্বজাতীয় গানের সুরে সুরেন সিং-এর কাছ থেকে শোনা একটি গান জংলির সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। বীজমন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছিল তার কণ্ঠে সাঁওতালি করম গীতের মতো –

সমাজবাদ ববুয়া। ধীরে ধীরে আই
জাড়াসে আই
পানিপে আই
চাষিকো কাঁদাইয়ে ঝামেলা পাকাই
সমাজবাদ বাবুয়া...(মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৩৮৮-৩৮৯)

সমাজবাদের প্রত্যাশী জংলির জীবনে অবশ্য সমাজবাদের বাবুরা আসে না কখনও বরং আগমন ঘটে উচ্চবর্গীয় শোষক এবং মধ্যস্বত্বভোগী ঠিকাদার ও তার মাস্তানশ্রেণির। প্রবল ক্ষুধা তাকে তাড়িত করে নিয়ে যায় আসানসোলের কয়লা খাদানে। ন্যায্য মজুরি না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়ে সে বিদ্রোহী হয় – ফলে জেলে যেতে হয় তাকে। তার মুখে সর্বদা উচ্চারিত 'সমাজবাদ ববুয়া' গানটি শোষক শ্রেণিকে ভীষণ অস্বস্তি ও চাপে রাখে। ফলে জেল থেকে বের হয়ে যখন ধানবাদে মাটি কাটার কাজে যুক্ত হয় তখনও মালিক ও ঠিকাদার শ্রেণির প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয় সে। শ্রমিক শোষণের পদ্ধতি অনুধাবন করে জংলি সাধারণ শ্রমিকদের জাগরণের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, 'সমাজবাদ ববুয়া, মাটিতে আই। যত খরা আকাল, যত পেটের জ্বালা, তত মাটি কাটা, তত সমাজবাদ' (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৩৯২)। ফলে সকলে তাকে 'সমাজবাদ জংলি' বলে বিদ্রূপ করে।

খাদানে ঠিকাদারের লোভের ফলে একটি মর্মান্তিক ঘটনায় আঠারো জন নিরীহ শ্রমিক প্রাণ হারালে জংলি ঠিকাদার মুকুটলালকে আক্রমণ করে। জংলির হিংস্র মূর্তি ঠিকাদারের পোষা মাস্তানদেরও হটিয়ে দেয়, ফলে পুলিশ আসে। যথারীতি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের মতো পুলিশ মুকুটলালের পক্ষাবলম্বন করে

জংলিকে দোষী সাব্যস্ত করে। পুলিশ ও মাস্তান বাহিনীর যৌথ নির্যাতনে জংলির কাঁধ ও পিঠের হাড় ভেঙ্গে যায়। লেখকের ব্যাঙ্গাত্মক অভিব্যক্তিতে বিষয়টি এভাবে প্রকাশিত –

> ওর শরীরে সমাজবাদ আসার চিঠি, কপালের ক্ষত, পায়ের ভাঙ্গা আঙ্গুলে, পিঠের ক্ষতচিহ্নে, কাঁধের ডানার অস্বাভাবিক উত্থানে নাকের ভাঙা হাড়ে। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৩৯৪)

এভাবে সমাজবাদের আগমনের প্রত্যাশী জংলি বহুদিন হাসপাতালে কাটিয়ে ন্যুব্জ দেহে ফিরে আসে লোকালয়ে। সহৃদয় ভবানী বাবুর সাহায্যে বেতো গাড়ি ও বুড়ো ঘোড়ার সাহায্যে নতুন জীবিকার্জন শুরু করে। এক রাতে তার গাড়িতে মুকুটলাল আরোহী হিসেবে এলে জংলির গান তাকে ভীত করে। আতঙ্কিত ঠিকাদার পালাবার চেষ্টা করলে জংলি তাকে ধাওয়া করে। গল্পের শেষাংশটি ইঙ্গিতময় –

> সামনে ও চারিদিকে মাঠ। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর।
> দুটি মানুষ। ওদের মাঝখানের দূরত্ব কমে আসতে থাকে।
> সমাজবাদ ববুয়া – দুজনেই দৌড়ায়। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৪ : ৩৯৬)

শোষিত নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামী চেতনার জাগরণ এবং শোষকের পরাজয়কে এখানে চিত্রিত করা হয়েছে। শোষিত মানুষের মুক্তির ইঙ্গিতময়তায় গল্পটি শিল্পনৈপুণ্য লাভ করেছে।

৫.২.২৯

কোর্‌কু আদিবাসী গোষ্ঠীর মাহাদু নামক আদিবাসীকে নিয়ে রচিত ‘মাহাদু : একটি রূপকথা’(২০০০)। বন ধ্বংসের সঙ্গে একটি গোষ্ঠীও যে ধ্বংস হতে পারে তার বাস্তবতাকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেন মহাশ্বেতা এ গল্পের মাধ্যমে।

কোর্‌কু আদিবাসী গোষ্ঠীর আদিবাসভূমি ছিল সম্ভবত নাসিক – হাওড়া রেললাইনের কাছাকাছি অঞ্চলে। রেললাইনের স্লিপার তৈরির জন্য এ অঞ্চলের সেগুন গাছ নির্বিচারে ধ্বংস করা হয়েছিল। বন ধ্বংসের সঙ্গে বনভূমি-নির্ভর কোরকু গোষ্ঠীও ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। একদিকে পালনয়িত্রী বন ধ্বংস তাদের খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন করে, অন্যদিকে সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের ফলে তারা হয় আশ্রয়হীন। এভাবে ক্রমান্বয়ে একটি গোষ্ঠী বিপন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে – গল্পে এ বিষয়টিই মুখ্যরূপে এসেছে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কোরকুদের মৃত্যুর হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলে। তাদের গড় আয়ু সংক্ষিপ্ত হয়, কোরকু যুবক-যুবতীরাও বাঁচে বড়জোর ষোল থেকে কুড়ি বছর। এদের ধ্বংসের মূল কারণ ‘অপুষ্টি’ চিহ্নিত করেন খাদ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দীপক মহাদেব আপ্তে।

কোর্‌কু গোষ্ঠীর জনসংখ্যা কমতে কমতে দাঁড়ায় পাঁচশো বা সাতশো। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ওজন তিরিশ বা চল্লিশ কিলো – শিশু জন্মহার নেমে যায় শূন্যে। এদের ধ্বংসের কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয় আধুনিক সভ্য জগতের মানুষ এবং সে লক্ষ্যে বিস্তর অর্থ অপচয় করে। গবেষণার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে তারা কোরকু গোষ্ঠীর মাহাদুকে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞ চিন্তামণি নারায়ণ ও সুভদ্রা রাতের অন্ধকারে মাহাদুকে গাড়িতে তুলে নেয় এবং মুম্বাইয়ের গবেষণাগারে ঘষা কাচের দেয়ালে বন্ধ কামরায় সকলের দৃষ্টিচক্ষুর আড়ালে রাখে। গবেষণার প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত তার শরীরে খাদ্যের মাধ্যমে লোহা, জিংক, কোবাল্ট ইত্যাদি মানবদেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান প্রবেশ করানো হয়। অত্যাশ্চার্য ফলাফল পাওয়া যায় ; কয়েকদিনের মধ্যে মাহাদুর শরীরের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং দাঁত গজায়। শারীরিক আকৃতি ও সমৃদ্ধিতে সে বর্তমান সভ্যজগতের মানুষের সমকক্ষতা অর্জন করে।

অবশেষে মাহাদু একদিন কাচের দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, চোখ কটাশে, ব্রোঞ্জের মতো গাত্রবর্ণ মাহাদু এক অমানুষিক আর্তনাদে তার ক্ষুধার কথা, খাদ্যের জন্য আর্তি জানায়। গল্পের শিরোনামে একে রূপকথা বলা হলেও আসলে এর মধ্যে নিহিত জীবনের একটি কঠিন নির্মম সত্য – খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত মানুষের নিদারুণ যন্ত্রণা। মহাশ্বেতার **‘শিশু’** গল্পের সঙ্গে এ গল্পের বিষয়গত ঐক্য রয়েছে। উভয় গল্পেই খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে আদিবাসী জনতার হ্রস্ব হয়ে যাওয়ার কাহিনি রয়েছে। আপাত রূপকথার মতো অলৌকিক মনে হলেও আসলে আদিবাসী মানুষের বিপন্নতার, প্রান্তিকতার চিত্রই এ গল্পদ্বয়ে উচ্চকিত হয়েছে।

৫.২.৩০

‘চোর’ গল্পটিতে মহাশ্বেতা দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। গল্পের প্রথমেই শালবন কেটে ইউক্যালিপটাস গাছ রোপণ করে সামাজিক বন সৃজনের সরকারি প্রকল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে ঝাড়খণ্ডিদের তৎপরতাও আভাসিত হয়। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে দূরে, এ গ্রামটি ইউক্যালিপটাস বন হতে পারেনি সাঁওতালদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের তোপে। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখক ইতঃপূর্বে একাধিক গল্প লিখেছেন, যদিও সেখানে শালের বদলে সেগুন রোপণের বিষয় ছিল। এ কারণেই হয়তো এটি এ গল্পের মূল উপজীব্য নয়।

‘চোর’ গল্পটি লোধাদের চোর হিসেবে চিহ্নিতকরণ সূত্রে ব্যাপ্ত। সাঁওতালদের প্রতিরোধ এবং আসন্ন নির্বাচনের কার্যকারণে সামাজিক বনসৃজন-প্রকল্প স্থগিত হলে স্থানটি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে – কেবল

স্থানীয় জোতদার কেবলচাঁদ রোহাতগীর মামা ধুনিচাঁদ তার দুর্গসদৃশ বাড়ি নিয়ে এ অঞ্চলে অবস্থান করে। জনবিরল গ্রামাঞ্চলে তার বাসের পশ্চাতে সে কারণ দাঁড় করায় যে, গ্রাম মায়ের মতো এবং শহরে ধর্মকর্ম নেই বলে সে গ্রামেই থাকে। তার বাড়িতে দারোগা, জঙ্গলবাবু এবং ঠিকাদার সব প্রভাবশালী লোকেরা যাতায়াত করে। লোধাদের জন্যও তার দরজা সব সময় খোলা – কেননা ধুনিচাঁদ প্রকৃতপক্ষে লোধাদের দিয়ে চুরি করায়, চোরাই মাল বিক্রি করে এবং দারোগা ও প্রভাবশালীদের বাট্টা দিয়ে নিজ অবস্থান সুরক্ষিত রাখে।

লোধারা পেটের জ্বালায় চুরি করে এবং ধরা পড়লে গণপিটুনিতে প্রাণও হারায়। মনা নামক এক লোধা যুবকের বাবা গণপিটুনিতে মারা গেলে সে নিজে চুরি ছেড়ে দেয় এবং অন্য লোধাদেরও চুরি থেকে ফেরায়। ধুনিচাঁদ, দারোগা তাতে বেজায় অসন্তুষ্ট – কেননা তাদের তাতে লোকসান হচ্ছে। ধুনিচাঁদের চোরাই মালের ব্যবসা বন্ধ, দারোগা বাট্টা পায় না। তারা প্রত্যেকে চায় লোধারা চুরি করুক। তাদের মতে, 'অন্য জাতি চুরি করলে অধরম। লোধা জাতি চুরি ছাড়লে অধরম।' (মহাশ্বেতা ২০০৫/১৭ : ৩৮০, ৩৮১)

মনাকে মিথ্যে চুরির দায়ে জেলে দিয়ে ধুনিচাঁদ লোধাদের দিয়ে আবারও চুরি করায় এবং তার ব্যবসা টিকিয়ে রাখে। লোধাদের চোর হিসেবে কুখ্যাতির পশ্চাৎ প্রেক্ষাপট মহাশ্বেতা দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন **'চোর'** গল্পে এবং দেখিয়েছেন যে, লোধারা চাইলেও তাদের 'চোর' অপবাদ ঘোচাতে পারে না। এক অদৃশ্য শেকলের বন্ধনে বন্দি তারা। প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সামাজিক কাঠামো তাদের বিমুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয় না। আদিবাসী দরদী মহাশ্বেতা তাই লোধা ও তার পার্শ্ববর্তী সমাজের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন তাঁর সামাজিক দায়বোধের তাড়নায়।

৫.২.৩১

'তারপর' (১৯৮২) গল্পটি লোধাশবর সনাতনের কালকেতু হবার গল্প। যথারীতি অপরাধপ্রবণ জাতি লোধাদের সংকটময় জীবন এ গল্পের পটভূমি। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সরকার, পরাধীন ভারতের বহু আরণ্য আদিবাসীগোষ্ঠী এবং কিছু তফশিলি সংখ্যালঘু জাতিকে 'অপরাধপ্রবণ' বলে ঘোষণা করে। পশ্চিবঙ্গের মেদেনীপুরের লোধাশবর ও পুরুলিয়ার ঘেড়িয়াশবর তেমনি দু'গোষ্ঠী। পঞ্চাশের দশকে 'অপরাধ প্রবণ' শব্দগুলো তুলে নিয়ে এদের 'বিমুক্ত' গোষ্ঠী বলে আখ্যা দেয়া হয় কিন্তু কার্যত তারা বিমুক্ত হয় না। অরণ্যচারী ও অরণ্যজীবী মানুষেরা সমাজ ও পুলিশের চোখে বিমুক্ত নয়। কারাগারে না থেকেও এক

অদৃশ্য শেকলের বন্ধনে বন্দি তারা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েও কোনো স্বীকৃতি তারা আজও পায়নি।

মহাশ্বেতা বিশেষ করে লোধা ও খেড়িয়াশবরদের নিয়ে নানা কাজ করেছেন। তাদের কল্যাণ সমিতি গঠন, শবর-মেলার মাধ্যমে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিল্পের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেয়া – সর্বোপরি অপবাদহীন মানুষ হিসেবে তাদের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করা লেখকের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু গল্প রচনা করেছেন – 'কুড়োনির বেটা', 'তারপর', 'চোর' প্রভৃতি। প্রতিটি গল্পে একই বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে ; যদিও ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বিন্যস্ত হয়েছে।

গল্পের প্রথমেই তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে এভাবে – 'সনাতন দিগার, জাতিতে লোধাশ্বর, এখন বয়স সাতাশ, পিতা মৃত কুরুরাজ দিগার। গ্রাম চারপাড়িয়া, থানা বেলপুর, জেলা মেদিনীপুর।' লোধাশবর শ্রেণির অল্পকিছু সাক্ষর ব্যক্তির মধ্যে সনাতন একজন – সে চতুর্থ শ্রেণি অবধি লেখাপড়া করেছে। তার বিদ্যালাভের ইতিহাস নানা সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার করুণ রসে জারিত। সাঁওতাল শিক্ষক দীননাথ মাণ্ডির অনুপ্রেরণায় সে স্কুলে যাবার সুযোগ পায় এবং অসীম উৎসাহে পরিবর্তিত জীবন লাভের স্বপ্নে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করে। তার এ ব্যতিক্রমী চেষ্টায় ভাবিত ও শঙ্কিত বাবুশ্রেণি তৎপর হয় এ রোধে। বাবা কুরুকাজকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়ে বাবুরা সামান্য একটি হাঁস চুরির মিথ্যে দায়ে পিটিয়ে হত্যা করে তাকে। চোর অপবাদে লোধাদের পিটিয়ে হত্যা তো আকছার ঘটে থাকে – সমাজে তা ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সনাতনের স্কুলে যাওয়াটা তার কাছে একটা দুঃসহ স্পর্ধা বলে মনে হচ্ছিল। (মহাশ্বেতা ২০০৫/১৭ : ৩৭৩)

বাবার মৃতদেহ সৎকারে ব্যয়িত সাতাশ টাকার কর্জ শোধ করতে খুব তাড়াতাড়িই সনাতন স্কুল ছেড়ে বাবুদের বাড়িতে ভাতুয়া বা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। অসাগর কাজের ব্যস্ততায় একসময় রূপকথার লালকমল জাগার কাহিনি আবারও জাগিয়ে তোলে তাকে। তার ভাই রতনের সাহায্যে বাবুদের কাজ সম্পন্ন করে সে আবারও স্কুলে যায় কিন্তু চতুর্থ শ্রেণির পর আর এগুতে পারে না, কেননা এরপর বোর্ডিং খরচ দিয়ে পূর্ণসময়ের ছাত্রত্বের পরিচয় অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য যে, সনাতনের জীবনে সাঁওতাল শিক্ষক দীননাথ মাণ্ডির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মহাশ্বেতা নিজে বিশ্বাস করতেন যে, কোন দান, অনুদান কিংবা বাইরের করুণায় নয়, আদিবাসীরা নিজেদের উন্নয়নে যদি নিজেরাই কাজ করে, সেটিই সর্বোত্তম। তাঁর বিশ্বাসকে তিনি ভাষা দিয়েছেন এভাবে –

> সংখ্যায় যাঁরা কম, তেমন সব আদিবাসী গোষ্ঠীর বেলা শুধু অ-আদিবাসী মানুষদের তরফ থেকে আশ্বাস, বরাভয় ও ভালোবাসা যথেষ্ট নয়। তাঁদের চাই সংখ্যাগুরু, বলশালী সাঁওতাল, ওঁরাও এবং মুণ্ডাজাতির ভালোবাসা, মমতা

> এবং সাহায্য। একজন দরদি সাঁওতাল এগিয়ে এলে লোধা-খেড়িয়া-বিরহড় যত উপকার পাবেন, এমনি অন্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। (মহাশ্বেতা ২০০৫/১৭ : ৫০২)

মহাশ্বেতা তাঁর বিশ্বাস ও মতাদর্শকে এ গল্পের শিল্পভুবনে ঠাঁই দিয়েছেন। তাই লোধা সনাতন শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হয় সাঁওতাল শিক্ষকের অনুপ্রেরণায়। স্বল্প পরিসরেও লেখক দীননাথের তেজস্বী চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন পরম শ্রদ্ধা ও মমতায়। গল্পকথনে ব্যক্ত হয়েছে দীননাথ মাণ্ডি জেদি, জেলখাটা লোক। পরম সাহসী দীননাথ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। নকুল দলুইয়ের ছেলের কান মলে দিয়ে সে গ্রামে হইচই ফেলে দিয়েছিল। আদিবাসী ও তফশিলি ঘরে ঘুরে ঘুরে সে ছেলেদের স্কুলে পাঠাবার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং তারই প্রেরণায় লোধা সনাতন চার শ্রেণি অতিক্রম করে, তুলসী বাবুর সহায়তায় 'কনটিনজেন্সি' পর্যায়ে জঙ্গলরক্ষী নিযুক্ত হয়।

অরণ্যচারী লোধা শবরদের কাছে বন মাতৃসম। তাদের রক্তে বসে আছে যে, বনই তাকে সব দেবে। এককালে বন মা সমৃদ্ধ ছিল, দুহাত ভরে অনেক দিতে পারত তার সন্তান লোধাদের। আজ আর অত দেবার ক্ষমতা নেই। তবু ভয়ে ভয়ে চুরি করে দেয় পাখি, খরগোশ, গোসাপ, কচ্ছপ এবং কেঁদপাতা, শুকনো কাঠ। পেট না ভরলেও জীবন বাঁচে তাতে লোধাদের। সেই বন রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত সনাতন নিজের সবটুকু উজাড় করে নিজ দায়িত্ব পালন করে, এমনকি স্বজাতি লোধাদের পর্যন্ত কোনো ক্ষতি করতে দেয় না বনের।

লোধাদের পুরাণ কথায় তারা কালেকেতুর বংশধর। মঙ্গল কাব্যের যে কালকেতু ব্যাধ বনচণ্ডীর আশীর্বাদে রাজা হয়েছিল, তার গর্বকে ধারণ করে লোধারা আজও কালকেতুর মতো মহাষ্টমী পূজার দিনে গোসাপ শিকার করতে যায়। আজ আর স্বর্ণগোধা দেখা দেয় না লোধাদের জীবনে। স্বর্ণগোধা লোধাদের জীবনে ভূমি বা জমির প্রতীক। লেখক তাই বলেন, 'চারপাড়িয়া গ্রামের তিন ঘর লোধা একদিন স্বর্ণ গোধি দেখল। আমিন বাবু স্বর্ণগোধি ধরে এনে লোধাদের হাতে দিল। আমিন বাবু লোধাদের, সাঁওতালদের, ডোম আর ভূমিজদের জমি দিল বিঘা পাঁচেক করে।' (মহাশ্বেতা ২০০৫/১৭ : ৩৭১)

কিন্তু জঙ্গল সাফ করে সে-জমি যখন আবাদী হল তখনই তা নিয়ে নিল বাবুরা। আবহমান কাল ধরে নিরীহ লোধারা ভূমিহীন হয়ে, ভাসমান হয়ে দিনযাপন করে এবং প্রতি মহাষ্টমীর দিন সন্ধান করে স্বর্ণগোধার – যা বাস্তব জীবনে অধরাই থেকে যায়।

বনরক্ষী সনাতন দিন-রাত বনের পাহারায় থাকে আর সন্ধান করে সৌভাগ্যের। এক রাতে কর্তব্যরত সনাতন বনে পাতা ও গাছ লুটকারী মনোহর দাসকে ধরে ফেলে এবং তার নিযুক্ত গুণ্ডাদের প্রহারে আহত

হয়। লোধা, ভূমিজ, ডোম – যারা পেটের জ্বালায় মনোহরের মজুর হিসেবে এসেছিল, তারাই সনাতনের প্রাণ বাঁচায়। বনধ্বংসী এ চক্রে তার চাকুরিদাতা তুলসী বাবুকে আবিষ্কার করে সনাতন নিথর হয়ে যায়।

আহত সনাতনের 'কনটিনজেন্‌সি' পর্যায়ের চাকরি চলে যায় এবং হাসপাতাল থেকে ফিরে নতুন উপলব্ধিতে উজ্জীবিত হয় সে। চাকরি বা ধারের জন্য সে আর তুলসী বাবুর কাছে যায় না এবং একে বাবু চরম স্পর্ধার প্রকাশ গণ্য করেন।

১৯৮১ সালের মহাষ্টমীর দিন প্রথামত বনে ঢুকে সনাতন তীরবিদ্ধ গোধা নিয়ে ফিরে আসে। অষ্টমীর সন্ধ্যায় গোধা পেলে সে লোধা যুবক কালকেতু হয়, তাই সনাতনও কালকেতু সমতুল্য গণ্য হয় আর তাকে ঘিরে উল্লাসে নাচে সবাই। সনাতনের নেতৃত্বের সম্ভাবনায় তুলসী বাবু থানার সাহায্যে সনাতনকে বনে বেআইনি অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার করায়। তার আর পর থাকে না। কেননা লেখকের ভাষায় এ কাহিনি গঙ্গার মতোই চিরপ্রবহমান। বস্তুত, সনাতনের উত্তরণের কাহিনিই এখানে উপজীব্য হয়েছে এবং লেখক সনাতনের মতোই লোধা শবরদের নতুন বোধে এবং নতুন জীবনে উত্তরণ কামনা করেছেন।

৫.২.৩২

সকালে সংবাদপত্রে অনেক সময়ই খবর আকারে দেখা যায়, কোন অঞ্চলের আদিবাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি করছে। সংবাদপত্রে কেবল তথ্যটি জানানো হয় কিন্তু সে তথ্যের অন্তরালে যে দীর্ঘদিনের শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নের ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে তা প্রকাশ করা হয় না। এমন এক সংবাদের প্রেক্ষিতে সংবাদের পেছনের কাহিনিকে লিপিবদ্ধ করেছেন মহাশ্বেতা 'ধরমারু'(১৯৭৯) গল্পের মধ্য দিয়ে।

সাংবাদিক যশপাল পালামৌয়ের ধরমখুরা গ্রামে যায় তথ্যের সন্ধানে। ১৯৭৬ সালে ধরমখুড়া-বিষয়ক গবেষণার জন্যই যশপাল আজ প্রতিষ্ঠিত। সে বছর যশপালরা ডেপুটি কমিশনারের উদ্যোগে অঞ্চলের একছত্র অধিপতি দনুজমর্দন ত্রিপাঠির পাঁচশো তিরিশ জন কামিয়াকে জানায় যে, তারা মুক্ত। শুধু তাই নয়, পঁয়ষট্টিজনকে নিয়ে সাতদিন ধরে আলোচনায় বসে তাদের অনেককে জমি, মুরগি, শুয়োর ও দুধেলা গাই, মোষ দিয়ে প্রতিষ্ঠাও দেওয়া হয়। সরকারের প্রশাসনের সকল স্তর প্রতিশ্রুতি দেয় তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার। ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ কথা দেয়, ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে জমি সারালো করে দেবে। বি. ডি. ও. কথা দেয় সার, পোকামারা ওষুধ দেবে – সেচের জল না পেলে পলাস দুই নম্বর ব্লকে বড়ো ইঁদারা করে

দেবে। পলাস থানা কথা দেয়, কামিয়া-সেবকিয়া-ধরমারুদের আর্থিক পুনর্বাসনের যে চেষ্টা সদাশয় ডি. সি. করে গেলেন, মালিক তাতে ব্যাঘাত ঘটালেই ঘাসিরা থানায় জানাবে। এহেন সুব্যবস্থা করার দু'বছর পরেই কেন তারা স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি তুলছে – সেটা বিস্ময়কর মনে হয় যশপালের এবং প্রকৃত সত্য জানার উদ্দেশ্যে সে ধরমখুড়া যাত্রা করে।

ধরমখুড়া গ্রামের নেতৃস্থানীয় ঘাসি কালাখাজরি জাতে নাগেসিয়া। তার সাথে আরও দু'জন একই নামধারী আদিবাসী আছে – একজন ওঁরাও, একজন মুণ্ডা। নাগেসিয়া ঘাসি দশ বছর বয়সে ১৯৪৭ সালে কোদাল ও খুরপি মেরামতের জন্য নয় আনা ছাপান্ন পয়সা ধার করেছিল দনুজমর্দনের বাপ ভানুপ্রতাপের কাছে ; ঊনত্রিশ বছর ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করার পর তার সেই ছাপান্ন পয়সা সুদে-আসলে বেড়ে দাঁড়ায় দু-হাজারের ওপর। ঊনচল্লিশ বছর বয়সে সে কামিয়া থেকে মুক্ত হয় প্রশাসনের আনুকূল্যে – মুক্ত হবার আগে দু'বার পালাবার চেষ্টা করায় সে 'ধরমারু' অর্থাৎ 'ধর এবং মার' হয়ে যায়। আর যাতে পালাতে না পারে সেজন্য বলদের জায়গায় জুতে ফসলবোঝাই গাড়ি টানানো হতো তাকে দিয়ে। মুক্ত হবার পর তাকে ছয় বিঘা জমি দিয়েছিল প্রশাসন। বেজায় নিরীহ সে ঘাসি খাজরি আজ ধরমখুড়ার বিক্ষুব্ধ আদিবাসী নেতা – যশপালের কাছে সবই বিস্ময়কর মনে হয়। বাস্তবে ঘাসির সঙ্গে দেখা হলে সে জানতে পারে, সদাশয় ডি. সি. বদলি হবার সঙ্গে সঙ্গে দনুজমর্দন হাতি দিয়ে ধরমখুড়া গ্রাম মাড়িয়ে কৃষিযোগ্য ক্ষেত তৈরি করেছে এবং সমস্ত প্রশাসন আছে তার সঙ্গে। পুলিশ তার ক্ষেত পাহারা দেয়, বি. ডি.ও. ধরমখুড়ায় কুয়ো তৈরি করেছে দনুজমর্দন তা দখল করার পর – অথচ কথা ছিল কুয়ো হবে চাষের জন্য, আদিবাসীদের জন্য।

দনুজমর্দন কেবল ভূমি নয়, আদিবাসীদের সকল অস্থাবর সম্পদ গ্রাস করে তাদের আবারও কামিয়ায় পরিণত করেছে। এবার আরও বেশি কঠোর সে – সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়ে দেয় কেবল আধা সের ভুট্টা ; প্রতিবাদ করলেই নেমে আসে অশেষ নির্যাতন। নাগেসিয়া ঘাসি এ থেকে পরিত্রাণ পেতে পালিয়ে গিয়েছিল রাঁচি, চাইবাসা। সেখানে স্বতন্ত্র আদিবাসী রাজ্যদলের সংস্পর্শে এসে বিদ্রোহের বীজমন্ত্রকে ধারণ করে সে এবং নিজগ্রামে ফিরে এসে তা ছড়িয়ে দেয় সকলের মধ্যে। সকল আদিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে সে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। এবার পাশার ছক যায় উল্টে। একসময় আদিবাসী ছিল ধরমারু আর আজ সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে তারা নিপীড়নকারীদের করেছে ধরমারু। তাদের ভাষায় –

> মোদের বিটিদের ইজ্জত লিবা ? ধর আর মার। গরু-মহিষ কাড়ি লিবা ? ধরমারু কর্ শালোদের। ঘর হতে টানি লয়ে বেগার খাটাবা ? ধরমারু কর শালোদের। তুরা না-মারলে ভি মার খাবি, মেরে মার খা কেনে ? তা উরাদের

> সকল তেজ বন্দুক লাঠিতে। এক শৎ মরদ 'ধারমারু করি দিব' বলি আগালে ডরে পলায়। (মহাশ্বেতা ২০০৫/১৭ : ৩৬৯)

আদিবাসীদের এই সশস্ত্র সংগ্রামে সমর্থন জানিয়েছেন মহাশ্বেতা পূর্বাপর। তিনি সবসময় বলেছেন যে, বাইরে থেকে করুণা বা ভিক্ষে দিয়ে আদিবাসীদের উত্তরণ সম্ভব নয় বরং তারা নিজেরা সচেতন ও সংগঠিত হবার মধ্য দিয়ে নিজেদের উন্নয়ন করতে পারে। মহাশ্বেতার এ ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে 'ধরমারু' গল্পে।

৫.২.৩৩

'ঘণ্টা বাজে'(১৯৮০) কাহিনিটি আদিবাসী জনস্রোতের সামগ্রিক ইতিহাস পরিক্রমায় সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিন্যস্ত। কাহিনির সূত্রপাত বিরহা গ্রামসংলগ্ন পাহাড়ে স্থাপিত প্রাচীন ঘণ্টাকে কেন্দ্র করে। মোঘল আমলে আওরাংজেবের রাজত্বের শেষ দিকে জগৎবল্লভ ভূঞা এ ঘণ্টাটি স্থাপন করেন বিরহা নদীতে হড়পা বানের আগমনী সংকেত জানাতে। বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতায় এ কাজটি অর্থাৎ বিপদে অন্যকে সতর্ক করে দেওয়ার ব্যাপারটি অনেক বেশি মানবিক বলে বোধ হয়। ইংরেজ শাসনামলে শাসকবর্গের অরাজকতায় বিপন্ন জনপদ ঘণ্টার ব্যবহার ভুলে যায়। ঘণ্টাটির গুরুত্ববহ ভূমিকা আবার পাওয়া যায় কোম্পানি আমলে। ইতোমধ্যে আসে ১৮৫৫ সাল – সাঁওতালদের হুলের ডাক বা শালগাছের গিরা এসে পৌঁছালে আবারও ঘণ্টা বাজে। সমবেত আদিবাসীকে বিদ্রোহের সঙ্গে একাত্ম করে ঘণ্টা বাজতেই থাকে। হুলের সময় কোম্পানির সেপাইরা যখন নদী পার হয়ে আসতে থাকে তখনও ঘণ্টা বাজিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। পুলিশ, সেপাই জনশূন্য গ্রামগুলিতে হাতি দিয়ে ঘর ভাঙে, ধানের টাল নষ্ট করে। তীর ধনুকে সাঁওতালরা যখন হাতিসহ সৈন্যদের মোকাবেলা করে তখনও ঘণ্টা বেজে চলে। হুলের শেষে আবার সব নীরব। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ ঘণ্টা বাজে না, তবে অন্য কোনো ঘণ্টা নিশ্চয়ই বেজে চলে সিপাহীদের মনে। লেখক সাঁওতালি হুল ও সিপাহী বিদ্রোহকে সমান্তরালে রেখে দেখিয়েছেন, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আদিবাসী ও সিপাহীরা একই ভুবনের বাসিন্দা। লেখকের ভাষায় –

> জমির হকে বঞ্চিত বলরাম পাঠায় শালগাছের ছালে গিঁঠ বেঁধে গিরা। জমির হকে বঞ্চিত, ফৌজি হকে বঞ্চিত সেপাই পাঠায় রুটি আর পদ্মের পাপড়ি। আরেক লড়াই। শুধু সেপাইরা আর বলরামরা জানতে পারে না বিরহার বালির চরেই হোক বা কানপুরের গঙ্গার ধারেই হোক, ওদের দাঁড়াবার কথা পাশাপাশি, মুখোমুখি নয়। কলকাঠি যাদের হাতে, তারা জানতে দেয় না। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ২৯৯)

লেখক শ্রেণি-বিভাজিত সমাজে নিম্নবর্গীয় বা শোষিত শ্রেণিকে এক করে দেখতে চেয়েছেন এবং তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের কামনা করেছেন। মূলত, শাসকরা চিরকালই শোষিত শ্রেণির একপক্ষকে অন্যপক্ষের পানে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের অবস্থানকে সুরক্ষিত রাখতে চায়। সে-কারণেই সেপাইরা হামলা চালায় আদিবাসীদের উপর, আবার নিজেদের হক আদায়ের লড়াইয়ে তারা আবার মুখোমুখি হয় শাসকবর্গের অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণির সৈন্যদের – এ চক্র চলতেই থাকে।

অতীত রোমন্থনের পর্যায় থেকে লেখক একটানে নিয়ে আসেন সত্তরের দশকের উত্তাল সময়ে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম যখন উত্তপ্ত নকশাল আন্দোলনের হাওয়ায়। মুণ্ডা প্রধান ভরত সিং-এর ছেলে সুবল সিং স্কুলের লেখাপড়া শিখে চাকুরি না পেয়ে গ্রামে এসে থিতু হয়। গ্রামের চার ক্লাশ পড়া তপা, সদনের সঙ্গে মিলে সুবল সমগ্র গ্রামবাসীকে সংগঠিত করে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দিতে বাধ্য করে নবা ভূঞাকে। সরকারের খাস জমি বরাদ্দ নিয়ে তারা সকলে একসঙ্গে চাষ করে ফসল ধর্মগোলায় তোলে। বস্তুত সাম্যবাদী সমাজ গড়ার এ পরিকল্পনা তাদের নিজস্ব। তবে মজুরি বিষয়ক দাবিতে তারা পরামর্শ পায় পিপলে স্থিত নকশালপন্থী যুবকদের। তারা এসে বিরহা গ্রাম-সংলগ্ন জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।

বিরহা গ্রামের আদিবাসী-অন্ত্যজের মহামিলন, নিজেদের নামে খাসজমি রেকর্ড করানো, ন্যায্য মজুরির আন্দোলন – এসব প্রশাসনকে অসন্তুষ্ট ও সন্দিহান করে। বিরহার নবজাগরণের পশ্চাতে তারা নকশালপন্থীদের অবদান ধারণা করে। ফলে গ্রামের সন্নিকটে তাবু পড়ে পুলিশের স্পেশাল বাহিনীর। আরও আসে পাগলা ভোলা চেহারার নৃতত্ত্ববিদ প্রভাস ভূঞা। আদিবাসীদের জীবনাচরণ নিরীক্ষা করার প্রয়োজনকে সামনে রেখে সে আদিবাসীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। তার ফাঁদে পা দেয় সুবল এবং নিজের অজান্তেই পুলিশ ও প্রভাসের যৌথ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে। ফলাফল দাঁড়ায় খুবই নির্মম। তপা ও সদন মারা যায় – পুলিশি অভিযানে গ্রাম ও জঙ্গলে মরে আরও বিশজন। সমগ্র গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

বিরহা গ্রামের ধ্বংসস্তূপে ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে ডেকে সুবলের বাবা মুণ্ডা প্রধান ভরত সিং তার ছেলে সুবলকে গ্রাম ও সমাজ থেকে বের করে দেয়। পরদিন ভোরে ঘণ্টার শিকলে ফাঁস দিয়ে সুবল আত্মহত্যা করে। তার লাশের সৎকার হয় না, জঙ্গলে ফেলে দেয়া হয় ; কেননা আদিবাসী সমাজে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোনো মৃতাশৌচক্রিয়া নেই।

প্রায় একদশক পর আবারও ভরত সিং ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে ডেকে সাবধান করে দেয়। জানিয়ে দেয়, আবারও এক আদিবাসী-গবেষক আসছে তাদের এলাকায়, যে সাঁওতাল মুণ্ডার জাত-জনম, পূজারপরব,

রীতকরণ জেনে যাবে। ভরত মনে করিয়ে দেয় প্রভাস ভূঞার কথা যে 'পণ্ডিত সজ্জন সাজি আদিবাসীর বন্ধু সাজি আসছিল।' (মহাশ্বেতা ২০০৪/১৩ : ৩২০)

প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের বন্ধু সেজে, দরদী সেজে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে যারা আদিবাসীদের চরম সর্বনাশ করে, তাদের থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশই ধ্বনিত হয় প্রাচীন মুণ্ডা ভরতের কণ্ঠে। মহাশ্বেতা এ গল্পে তথাকথিত আদিবাসী দরদীদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন – যারা দেশে বিদেশে আদিবাসী বিশেষজ্ঞ হিসেবে সম্মান ও সুবিধাপ্রাপ্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের তারা চরম দুশমন।

এ গল্পে কেবল আদিবাসী নয়, আদিবাসী অন্ত্যজদের যৌথজীবনকে মহাশ্বেতা পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন, জানিয়েছেন দলিত শ্রেণি যদি এক হয় তো তারা মূল শক্তিকে আতঙ্কিত করে তুলতে পারে। সংগ্রাম প্রতিরোধের আখ্যানে আদিবাসী জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য গ্রথিত করেছেন মহাশ্বেতা এ গল্পে। প্রকৃতপক্ষে একটি গোষ্ঠী কখনও কেবল নাম দিয়ে চিহ্নিত হয় না, নানা আচার, সংস্কৃতির বাহক হিসেবেই স্বতন্ত্র মর্যাদায় উদ্ভাসিত হয়। লেখক তাঁর আদিবাসী বিষয়ক গল্প-উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের নানা প্রান্ত বারবার উল্লেখ করেছেন, কখনও কখনও তাতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কিন্তু তাতেও লেখক জানিয়ে দিয়েছেন যে, আদিবাসী কৌম গোষ্ঠী মূলত একই ধারার সংস্কৃতিকে বহন করে। আদিবাসী গ্রামগুলোতে সাধারণত কোন বৃক্ষকে গ্রামদেবতা হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে ঘিরে সকল উৎসব-পূজা পালিত হয়। বিরহা গ্রামে বৃক্ষ নয়, ঘণ্টাটিকে যেন গ্রাম-দেবতার প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। কেননা ঘণ্টাকে ঘিরে মাঝিপাড়ার জাহের থান হয় ; সাঁওতাল সমাজের এ পরবে সবাই আসে। গ্রামের মুণ্ডাদের সিংদের বাহ্ পরবও হয় কাছাকাছি। তখনও সবাই আসে। ডোম ও বাউরিদের ধর্মপূজো ও জয়চণ্ডী পূজোও সম্মিলিত উৎসব। সবার পরবেই নাগারা, ধামসা আর ঢোল একই সঙ্গে বাজে। মিশ্র গ্রাম বিরহার ধর্মীয় পরবগুলোতে সকলে একত্রিত হয় বলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ নেই বরং একতা আছে। তাই মকর পূজা, মাঘ-সীম, বাহা প্রভৃতি পরবপূজা হয় তাদের ঘণ্টার সামনে।

উৎসব ভিন্নতা না থাকলেও বিবাহাদির ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মিশ্র প্রভাবে নিজেদের ক্রিয়াকর্মে যাতে কোন খুঁত না থাকে, সে-জন্য তারা যথেষ্ট সতর্ক। মুণ্ডা সমাজের গঠ্‌ড়ায় যেমন তাদের বিবাহ-পণ বিষয়ক কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয় – যাতে নিজ সমাজের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব না থাকে। মুণ্ডা বিয়েতে কন্যাপণ দিতে হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, কন্যাপণ সর্বাধিক বারো টাকা, মা-মান্য দুই টাকা, আতেয়ার তিন টাকা, জিয়া শাড়ি একটি, শ্যালক বরণের ধুতি একটি, সমাজ শাড়ি জামা, এই সব খরচ হবে। পাত্র বা পাত্রী দেখতে তিন থেকে পাঁচ জনের বেশি লোক যাবে না। বিধবা মেয়ের ক্ষেত্রে পণ ছয় টাকা। দোজবরের বেলা অনূঢ়া কন্যাপণ আঠারো টাকা। নতুন দিনের আরেক সংকল্প ; বিয়ে বাড়িতে, উৎসব-

পার্বণে হাঁড়িয়া ও মদ একেবারে বন্ধ থাকবে। এটি অবশ্য বিরসা গ্রামের সমকাললগ্ন হবার ইঙ্গিত – কেননা আদিবাসী বিয়েতে হাঁড়িয়া ও মদ আবশ্যিক অঙ্গ।

এ গল্পে ঘণ্টার আর্কেটাইপাল ইমেজে আদিবাসী জীবনের সংগ্রামশীলতাকে ধারণ করা হয়েছে। হড়পা বান বা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের সূত্রে ঘণ্টার স্থাপন – পরবর্তী কালে সাঁওতালি হুল, সিপাহি বিদ্রোহ, আধুনিক কালে নকশাল আন্দোলন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদিবাসী জনজীবনের সংগ্রামশীলতাকে ঘণ্টার ইমেজে ধারণ করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে আদিবাসী জীবনের বঞ্চনা ও সংগ্রামের ইতিবৃত্তকে ধারণ করে ঘণ্টাটি জড়বস্তুর ইমেজ ভেঙে আদিবাসী লোকজীবনবৃত্তে মিশে গেছে। এ গল্প সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ –

> ঘণ্টা বাজে লেখা হয়েছে তাতে দেখা গেছে বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আদিবাসীদের অবস্থান প্রায় একই জায়গায় পড়ে রয়েছে। ঘণ্টা বাজে আজকের দিনের প্রেক্ষিতে, তাদের জীবনের উপর কি কি আঘাত এসে পড়েছে আমাদের মূল স্রোতের কাছ থেকে তারই কাহিনি। (শিপ্রা দত্ত ২০০৯ : ৩৩২)

কেবল বঞ্চনা-নিপীড়ন নয়, তার বিপরীতে বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তাঁর মানসে ধারণ করেন। বিপ্লবের পথ একদিনের নয়, বহুযুগের ধারাবাহিকতায় বিপ্লব আসে বলে তিনি অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত করে আদিবাসী মানুষের বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে কেন্দ্রীভূত করে থাকেন।

৫.৩

মহাশ্বেতা আদিবাসীদের দেখেছেন তেতলার উচ্চতা থেকে নয়, বরং ভূমি সমতলে তাদের সঙ্গে জীবন-যাপনে শরিক হয়ে, তাদেরই অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে। একুশ শতকের সূচনালগ্নে আজও যে সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকার ন্যূনতম মজুরিটুকুও পায় না, সভ্য সমাজের কাছে যাদের টিকে থাকাই অলীক বা রূপকথা – সেইসব সর্বহারা শ্রমজীবী আদিবাসী মানুষ মহাশ্বেতার কথাসাহিত্যের উপজীব্য। তাঁর লেখায় বার বার আসে বনডেড লেবার প্রথা, ন্যূনতম মজুরির সংগ্রাম, অপরাধপ্রবণ লোধা শবরদের ইতিবৃত্ত। আদিবাসী জনবৃত্তের জীবন মোটামুটি অনুরূপ। মুণ্ডা, নাগেসিয়া, সাঁওতাল, লোধা – সকলের জীবনেই ভাত স্বপ্নমাত্র। শ্রমে তাদের অধিকার, পারিশ্রমিকে নয়, চাষে অধিকার – ভূমিতে বা শস্যে নয়। তাই তাদের জীবন কাহিনির সাদৃশ্য অনেকসময় পাঠকের কাছে পুনরাবৃত্ত মনে হতে পারে। আবার বিষয়ের গুরুত্বানুযায়ী লেখক নিজেও একই বিষয় বারবার টেনেছেন গল্পের অবয়বে। যেমন – বনডেড লেবার বা কমৌয়তি প্রথা নিয়ে তিনি একাধিক গল্প লিখেছেন। সব গল্পেই শোষণের একই ধারা – কেবল বিন্যাসে হয়তো ভিন্নতা আছে। আবার আদিবাসী নামগুলো অনুরূপ – তাই শনিচরী আছে একাধিক গল্পে, ঘাসি

নামটি ধারণ করে একই সঙ্গে নাগেসিয়া, ওঁরাও ও মুণ্ডা – শোষকের ভূমিকায় একাধিকবার পাওয়া যায় হনুমান মিশ্রকে। আদিবাসীদের ভূমিহীনতা, জলের অভাব, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চনা, লোধাদের 'চোর' হিসেবে চিহ্নিতকরণ – এসমস্ত ঘুরে ফিরেই মহাশ্বেতা অবলম্বন করেছেন ; শিল্পের প্রয়োজনে নয়, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বোধে। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য –

> আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বার বার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি, 'The Vioceless Section of Indian Society' – এই অংশ এখনো নিরক্ষর, স্বল্পসাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূলস্রোত থেকে এরা বড়ই বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না। (মহাশ্বেতা ১৯৯০ : ১)

সামাজিক দায়বোধ অনেক সময়ই তীব্রতর হয়েছে শৈল্পিক দায়বোধ অপেক্ষা। সে-কারণে তাঁর অনেক গল্প দীর্ঘতায় উপন্যাসসম হয়েছে এবং অনেক উপন্যাস গল্প কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু তাঁর আদিবাসী প্রীতি প্রশ্নাতীত মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে পাঠক হৃদয়ে।

উনিশ শতকে শিল্পসাহিত্যে যে আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু হল ; তার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যকে প্রায় পুরোপুরি আত্মস্থ করে বাংলা কথাসাহিত্যের ভিত তৈরি হয়েছে। আধুনিক কথাসাহিত্য বিষয় ও আঙ্গিকের সৌষ্ঠবে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে সহজে। মহাশ্বেতা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাননি, তাঁর কথাসাহিত্যে আঙ্গিক মুখ্য নয়, বিষয়ই সর্বেসর্বা। বিষয় নির্বাচনেও তিনি ইতিহাস ও প্রান্তিক জীবনকেই এগিয়ে রেখেছেন। উপন্যাসের মতো তাঁর প্রায় সব গল্প পাঠ করা যায় সাবঅলটার্ন তত্ত্বের বিশ্লেষণে, একই সঙ্গে আদিবাসী জীবনের সংগ্রাম-প্রতিরোধ ও ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সংরক্ষণে উত্তর-উপনিবেশী মননের সন্ধান পাওয়া যায়। শিল্পের প্রয়োজনে নয়, জীবনের প্রয়োজনে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সগর্বে তা প্রচারও করেছেন।

মহাশ্বেতার গল্পে বিষয়ের প্রতাপ এতই প্রবল যে চরিত্রগুলো অনেকক্ষেত্রে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি বেশিরভাগ সময়ে পাঠকের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। পাঠক চরিত্রগুলো দেখতে পায়, ঘটনার বিবরণে তাকে চিনতে পারে বা তার কার্যধারার যৌক্তিকতাকেও অনুভব করে কিন্তু তার মনের গভীরের সন্ধান পায় না। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মনস্তত্ত্বের আলোড়নকে গল্পের মধ্যে খুঁজে না পাওয়া গেলেও আদিবাসী চরিত্রের জীবনাচরণ, তাদের শোষণ-বঞ্চনার নির্মম বাস্তাবকতাকে লেখকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শাণিত তীক্ষ্ণ ভাষার মধ্য দিয়ে অনুধাবন করে বরং পাঠকের মনস্তত্ত্ব আলোড়িত হয় এক অনাবিষ্কৃত সত্যের অনুভবে। লবণের জন্য হাতি পদতলে পিষ্ট হওয়া, খাদ্যের অভাবে ক্রমে শিশুতে রূপান্তরিত হওয়া, দৈনিক ছয় আনা মজুরিতে দিনমজুর খাটার আলেখ্য পাঠকের পরিচিত জগতের কাঠামোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে পাঠকের মধ্যে প্রথমে হতবিহ্বলতা, ক্রমে আদিবাসীদের জন্য গভীর

মমতার জাগরণ এবং শেষে লেখকের মতো সূর্যসমক্রোধের প্রজ্বলনে বিভাজিত সমাজ-কাঠামোর বৃত্তকে ভেঙ্গে ফেলার সদিচ্ছা জাগে। মানবিক বোধের উজ্জীবনে মহাশ্বেতার উপন্যাসের মতো গল্পগুলো কেন্দ্রাভিসারি ও রসঘন রূপ পেয়েছে।

১. মহাশ্বেতা দেবীর মোট গল্পসংখ্যা কত তা নির্ভুলভাবে বলা সম্ভব নয়। ৯১ বছরের সুদীর্ঘ জীবনে লিখেছেন তিনি দু'হাতে। গ্রন্থাকারে ও রচনাবলিতে স্থান পাওয়া ১৭৩ টি গল্পের নাম পাওয়া যায় অমর দে সম্পাদিত গল্পসরণি, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ : বার্ষিক সংকলন : ১৪১৮-এ, সেই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আরও বহু গল্প অগ্রন্থিত আছে ।

২. উদ্ধৃতিটির উল্লেখ রয়েছে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবন ও সৃষ্টির নিয়ম-অনিয়ম' (*পঞ্চাশের দশকের কথাকার*, ২০০০) প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা গ্রন্থে।

৩. সাঁওতালদের মধ্যে অবয়বগত বৈসাদৃশ্য কম। "এদের চেহারা সাধারণত কালো, নাক কারো কারো চেপ্টা, ঠোঁট মোটা, চুল কোঁকড়ানো এবং দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের।" (আবদুল জলিল ১৯৯১ : ১)

৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে আলাপচারিতায় মহাশ্বেতা দেবী মালদার জিতু সাঁওতালের কাহিনি বলেছেন। ১৯২১ সালে গান্ধী যখন সত্যাগ্রহ ডেকেছে তখন জিতু সমগ্র সাঁওতাল সমাজকে সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। কপটচারী প্রশাসন যখন গুলি না করার শর্তে জিতুকে আলাপের জন্য ডাকে এবং সরল বিশ্বাসে জিতুও আসে আদিনা মসজিদের পেছনের টিলায়, তখনই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তার উপর গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ জিতু 'মা হো' বলে ভীষণ চিৎকারে তার সহযোগীদের সতর্ক করে লুটিয়ে পড়ে। মহাশ্বেতা এ কাহিনির স্মৃতিকে জাগরিত করে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। (সমীরণ ১৯৯৭ : ৯৪-৯৫)

৫. 'থীমা' থেকে প্রকাশিত 'ইমাজিনারি ম্যাপ্‌স' (১৯৯৩) গ্রন্থে লেখক মহাশ্বেতা দেবী ও অনুবাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর একটি কথোপকথন (দ্য অথর ইন কনভারসেশন) মুদ্রিত হয়েছে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় এই কথোপকথন টেপরেকর্ড করা হয় ইংরেজিতে। নির্মল ঘোষ – *মহাশ্বেতা দেবী: অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ*, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮ গ্রন্থে এর বঙ্গানুবাদ থেকে উদ্ধৃতাংশটুকু মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, দশম খণ্ড ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৬. 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও মহাশ্বেতা দেবীর আলাপ'– সাক্ষাৎকারটি সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি শ্রুতিলিখন করেছেন মশিউল আলম। এ গ্রন্থের পৃ. ১০৪-এ শবরদের কুসংস্কারের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি তাদের ডাইনি-ভাবনার পরিচয়ও দেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী ভাষা

৬. ১

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কথাসাহিত্যে নিজস্ব ভাষারীতির অধিকারী। প্রচুর ইংরেজি শব্দ, প্রমিত বাংলা এবং অনিবার্যভাবে আদিবাসী ভাষার শব্দের সমবায়ে তিনি আদিবাসী জীবনকে ধারণ করেছেন তাঁর সাহিত্যে। মূলত পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। পালামৌ, সিংভূম, রাঁচি এই বেল্টের সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, লোধা এবং শবর খেড়িয়া সম্প্রদায়ের কৌম জীবন তাঁর গল্প-উপন্যাসে বৃহৎ জায়গা অধিকার করে আছে। এছাড়াও মধ্য প্রদেশের নাগেসিয়া (*টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা*) এবং হো, কোর্কু (মাহাদু : একটি রূপকথা) আগারিয়া (শিশু), পাখামারা (সাঁঝ সকালের মা) প্রভৃতি বিলুপ্তপ্রায় আদিবাসী সম্প্রদায়ও তাঁর রচনায় ঠাঁই পেয়েছে পরম মমতা ও গভীর আন্তরিকতায়।

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে যেহেতু অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠী বিদ্যমান, সঙ্গতকারণেই তাঁর সাহিত্যে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা-পরিবারের উল্লেখই বেশি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাসমূহকে – (১) অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং (২) চীনা-তিব্বতি এই প্রধান দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে (সৌরভ, ৮-৯), ১৯৯১ সালে ভারতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারের মোট ভাষার সংখ্যা ৬৫ এবং এ ভাষাভাষীর সংখ্যা মোট ৬১৯৫২৪৯৫ এবং চীনা-তিব্বতী গোষ্ঠীর মোট ভাষার সংখ্যা ২২৬, ভাষীর সংখ্যা ৩১৭২০৭০০, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা আছে ৫৩টি, ভাষী রয়েছে ১০৭৪১০৮২০ জন, ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষার সংখ্যা ৫৭৪ এবং ভাষীর সংখ্যা ৩২১৭২০৭০০।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা সমূহ আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত –

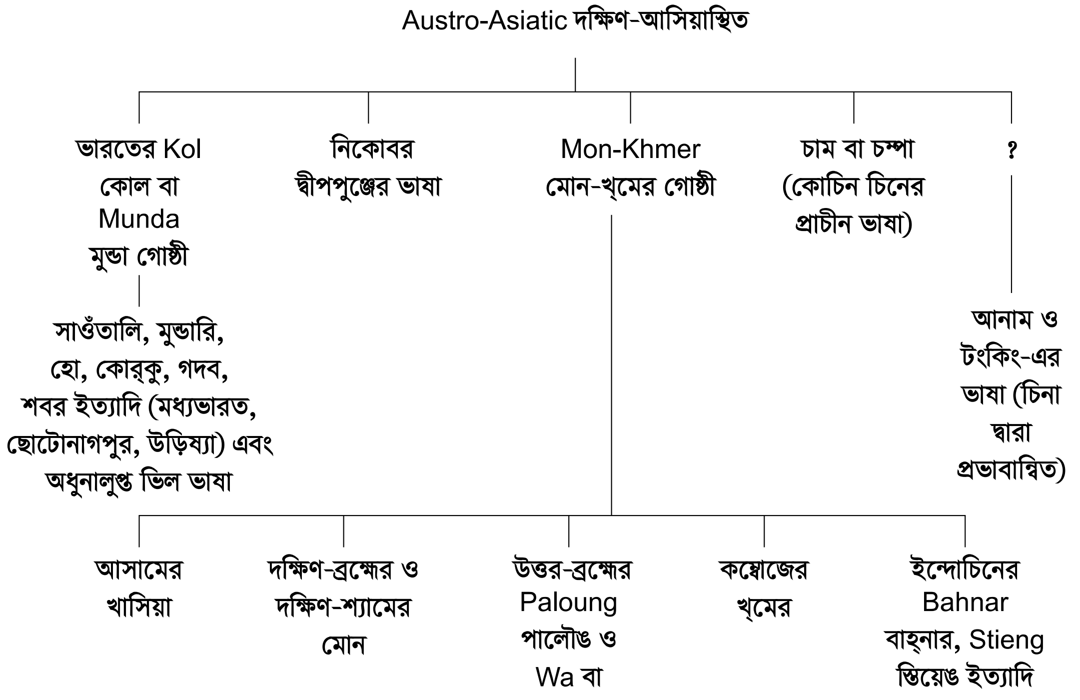

(সূত্রঃ সুনীতিকুমার ২০০৫ : ১১৮)

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীভাষীর প্রাধান্য বেশি। সংগত কারণেই আমাদের আলোচনা কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীভাষা বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৬.২

ভারতের কোল-বংশীয় দক্ষিণ-জাতির ও কোল ভাষার সম্বন্ধে হাঙ্গেরীয় লেখক Vilmos Hevesy মত দিয়েছেন (সুনীতি ২০০৫ : ১২০) যে, কোল ভাষা Ural (অথবা Finno-Ugrian) গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, মোন্‌খমের ও Austronesian দক্ষিণ দ্বীপাশ্রয়ী ভাষাগুলোর সঙ্গে নয়। হেভেশির মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই Finno-Ugrian ভাষী কোনো জাতি নিজ ভাষা নিয়ে ভারতে আসে এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে কোনো জাতিতে পরিণত হয়। তবে হেভেশির মত অর্থাৎ ফিন্নো-উগ্রীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে কোল ভাষার সংযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি।

কোলদের নাম থেকে ছোটনাগপুরের একটি অঞ্চলের নাম হয়েছে কোলহান অর্থাৎ কোলদের দেশ। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এই 'কোল' শব্দটি মধ্যযুগের ভারতীয় আর্যভাষার (প্রাকৃতের) 'কোল্ল' শব্দ থেকে উদ্ভূত। মধ্য ভারতের অরণ্যবাসী অনার্য নিষাদগণকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে 'ভিল্ল' ও 'কোল্ল' বলে উল্লেখ করা হত। 'কোল' শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃতে পাওয়া যায় – যার অর্থ 'শূকর'। এটি একটি জাতিবাচক নামের ঘৃণাপ্রকাশক অপপ্রয়োগ মাত্র। তবে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (সুনীতি ২০০৫ : ১২০) মতে, 'কোল্ল' শব্দকে প্রাচীন কোলভাষায় মানব-বাচক শব্দ বলে ধরা যেতে পারে। সাঁওতালরা নিজেদের 'হড়' বলে, মুণ্ডারা বলে 'হোড়ো', হো-দের ভাষায় 'হোও' বা 'হো' (হো ভাষায় ড়-ধ্বনি লোপ পায়) এবং কোরকু-রা বলে 'কোরো'; এদের ভাষার নিজেদের পরিচয়জ্ঞাপক শব্দটির অর্থ হলো – মানব বা মানুষ। বহু জাতির মধ্যে স্বকীয় নাম হিসেবে নিজেদের ভাষার মানব বাচক শব্দ ব্যবহৃত হতো, 'কোল' জাতি তাদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং সুনীতিকুমারের এ মতের পক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি রয়েছে।

কোলদের দৃষ্টিতে সমগ্র মানব জাতি দুটি ভাগে বিভক্ত – এক, সত্যিকারের মানুষ 'হোড়ো, হড়, হো, কোরো' (যাদের ভাষা তারা বোঝে, যারা তাদের আপনজন) এবং দুই, যাদের ভাষা বোঝে না, যারা পর, তারা হচ্ছে 'দিকু'। অর্থাৎ ভাষা আদিবাসী জীবনের পরিচয়জ্ঞাপক একটি উপাদান হিসেবে গৃহীত। ভাষাগত অল্প-বিস্তর পার্থক্য ধরেই কোন জাতির গণ-সমূহকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি গোষ্ঠী হল – ১. সাঁওতাল, ২. মুণ্ডা, ৩. হো, ৪. ওঁরাও

৬.৩

সাঁওতাল, দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও মোঙ্গল নির্বিশেষে ভারতের Abroginies আদিবাসী বা ভূমিপুত্রদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাঁওতাল পরগনায়, মানভূমে, সিংভূমে, উড়িষ্যা ও আসামের চা-বাগানসমূহে সাঁওতালদের বাস। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (সুনীতি ২০০৫ : ১২২) মতে, বাংলার 'সামন্ত' বা 'সমন্ত' অর্থাৎ সীমাসংলগ্ন ভূমিতে যে কোল জনতার বাস, দুই হাজার বছর আগের বঙ্গদেশের আর্য-ভাষীরা তাদের নাম দেয় 'সামন্ত-পাল'। এ শব্দটি প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলায় 'সাঁওতাল' শব্দে রূপ পেয়েছে। সাঁওতালদের মধ্যে সম্মানসূচক পদবি যে মাঝি তা অর্থগত দিক থেকে বাংলা মুসলমান পদবি 'মিয়ার' অনুরূপ। 'মাঝি' আর্যভাষার শব্দ মধ্য-মাধ্যিক থেকে উৎপন্ন। ফারসি ভাষায় 'মিয়া' অর্থ মধ্য বা মধ্যস্থ। ধারণা করা যেতে পারে যে, এ পদবিদ্বয়ের মাধ্যমে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যস্থ বা অন্তর্গত – এমনটি বোঝানো হয়।

সাঁওতালি ভাষায় কোনো নিজস্ব বর্ণমালা নেই। খ্রিস্টান মিশনারিরা সাঁওতালদের কথা, কাহিনি ও গান সংগ্রহ করে রোমান হরফে তার লিখিত রূপ দেন। "১৮৬৯ সালে ভারতের সাঁওতাল পরগনার লুথারিয়ান মিশনে স্থাপিত একটি ছাপাখানা থেকে প্রথম সাঁওতাল ভাষার ব্যাকরণ ও অন্যান্য বই প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে রঘনাথ মুর্মু, 'অলচিকি' নামে সাঁওতালি বর্ণমালা তৈরি করে এবং তার সরকারি স্বীকৃতিও লাভ করে"। (সৌরভ ২০১১: ১১)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সুনীতি ২০০৫ : ১৩২-৩৩) জানান, ১৮৭০-৭১ সালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মিশনারি Rev. L. O. Skrefsrud কলেয়ান (কল্যাণ) নামে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল গুরুর কাছ থেকে সাঁওতালদের পুরাণ-কথা ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং জীবন-যাত্রার পদ্ধতি শুনে লিখে নেন এবং তা মূল সাঁওতালি ভাষায় রোমান হরফে একটি বইয়ে সন্নিবেশিত করে ১৮৮৭ সালে প্রকাশ করেন। বইটির নাম 'হড়ুকো-রেন্‌মারে-হাপ্‌ড়াম্‌-কো রেআঃক কথা' অর্থাৎ 'সাঁওতালদের পূর্বপুরুষদের কথা'। এছাড়া আরেক স্ক্যান্ডিনেভীয় মিশনারি Rev. P. O. Bodding অসলো এবং কোপেনহেগেন থেকে কয়েক খণ্ডে সাঁওতালি উপাখ্যান, মূল সাঁওতালি ও ইংরেজি অনুবাদসমেত প্রকাশ করেন। তাঁর সংগৃহীত সাঁওতাল গল্পের কিছু অংশের ইংরেজি অনুবাদ Cecil Henry Bompar কর্তৃক Folklore of the Santals নামে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। Rev. Dr. Campbell নামে আরও একজন ১৮৯১ সালে কতকগুলো সাঁওতালি কাহিনি প্রকাশ করে। এভাবে মিশনারি সাহেব ও অন্যান্যদের সহায়তায় সাঁওতাল ভাষা, কথাকাহিনি গান বিশ্বদরবারে শ্রুত হয়েছে।

নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের অনেকের[১] মতেই সর্বপ্রথমে নেগ্রিটোদের মতো এক বা বহু জাতি ভারতের অধিবাসী ছিল। এরপরই বর্তমান মুণ্ডা-গোষ্ঠীর জাতিদের পূর্বপুরুষেরা ভারতে আসে। কোন পথে তারা ভারতে এসেছে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে। কেউ মনে করেন তারা ভারতের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এ-দেশে এসেছে, কারো মতে, উত্তর-পশ্চিম দিক তাদের আগমনের পথ। উত্তর-পূর্ব পথে আগমনের সপক্ষে পণ্ডিতেরা (শরৎচন্দ্র ২০০৫ : ৯৪) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারতের পূর্বস্থ মলয়-দ্বীপের সাকেই (Sakei) ও সেমাং (Semang) জাতিদের ভাষা ব্রহ্মদেশের ওয়া (Wa), পালৌঙ্গ (Palaung) প্রভৃতি ভাষা, পেগুর মন্স (Mons) বা তেলাইঙ্গ (Telaing) ভাষা ও আসামের খাসি ভাষার সঙ্গে ভারতের মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাগুলোর গঠনে ও কিছু কিছু বিশেষ শব্দাবলিতে সাদৃশ্য দেখা যায়। মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা মুণ্ডারি ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। "প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগে পিজিন ভাষা হিসেবে মুণ্ডা ভাষার প্রচলন হয়েছিল" (সৌরভ ২০১১: ১১)। মুণ্ডা ভাষার কোনো নিজস্ব হরফ নেই। তাই লিখিত সাহিত্য বা ইতিহাসও নেই। তবে মুখে মুখে রচিত গান ও কবিতা এ জাতির সাংস্কৃতিক

সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "মুণ্ডারি ভাষায় রচিত গান, সরল ও আদিম কবিতার অতি মনোহর নিদর্শন রূপে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য" (সুনীতি ২০০৫ : ১২৮)। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী Hoffmann চৌদ্দ খণ্ডের বিশাল Encyclopaedia Mundarica পাটনা থেকে প্রকাশ করেছেন ১৯৩০-৩২ সালে, W. G. Archer সাহেব মুণ্ডারি, খাড়িয়া, সাঁওতালি ও হো ভাষায় চারখণ্ডে প্রচলিত গীতিকবিতার সংগ্রহ বিহার প্রাদেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ করেছেন।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হো জাতি বাস করে মূলত সিংভূম অঞ্চলে। এদের নিজস্ব ভাষা আছে, তবে যথারীতি লিখিত লিপি নেই। W.G. Archer হো ভাষার প্রচলিত গীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন (সুনীতি ২০০৫ : ১২৮)। হো-ভাষায় হো বা হোরো শব্দের অর্থ মানুষ। (সুনীতি ২০০৫ : ১২১)

দ্রাবিড়ভাষা পরিবারভুক্ত ওঁরাওদের ভাষার নাম কুড়ুখ বা সাদরি (সৌরভ ২০১১ : ২৬)। ওঁরাওদের মূল আবাস ছোটনাগপুর। (পরমেশ ২০০৫ : ৯৮)

৬.৪

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে এই চারটি গোষ্ঠীর ভাষাই পাওয়া যায় গান এবং চরিত্রসমূহের কথোপকথনে। গানের ক্ষেত্রে লেখক তার সংগৃহীত গানের অবিকল উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিবাসী ভাষার গানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তার অনূদিত রূপটিও দেয়া হয়েছে। কথোপকথন বা বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি আদিবাসী শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং রচনার শেষে পাদটীকায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ সংরক্ষণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, মহাশ্বেতা কেবল আদিবাসী ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন, সম্পূর্ণ বাক্য নয়। সম্পূর্ণ বাক্য পাওয়া যায় গানে আর পাওয়া যায় একটি গল্পের (ডাইনি) দুটি বাক্যে – কিরা লাগেংগা (ক্ষুধা পেয়েছে) এবং মালু কুলার আড়গুড়া (পেট ভরেনি)। লেখক মূলত আদিবাসী জীবনে খাদ্যাভাবের বাস্তবতাকে এ দুটি বাক্যে প্রকটিত করেছেন।

আদিবাসী জীবনভিত্তিক গল্প ও উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী মূলত ব্যবহার করেছেন সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো এবং ওঁরাও ভাষা। *শালগিরার ডাকে*, *হুলমাহা*, 'হুলমাহার মা', *অপারেশন বসাই টুডু*, *আক্রান্ত কৌরব*, 'লাইফার', 'ফারকাটি', 'নিশাত মাঝির ভুটান যাত্রা', 'সমাজবাদ ববুয়া', 'এম. ডব্লু বনাম লখিন্দ' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে সাঁওতাল চরিত্র ও জীবন অবলম্বিত হয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে ব্যবহৃত হয়েছে সাঁওতালি শব্দ। লক্ষণীয় যে, আদিবাসী জীবন অবলম্বিত হলেও মহাশ্বেতা যাদের জন্য লিখেছেন তারা বাঙালি। আদিবাসী জীবনের অন্তরঙ্গতাকে ধারণ করতে তাকে আদিবাসী ভাষার শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে, সেই

সঙ্গে বাঙালি পাঠকের সুবিধার্থে প্রায় সব আদিবাসী ভাষার শব্দই বাংলায় তর্জমা করে দেয়া হয়েছে। কখনও রচনার মধ্যেই মূল শব্দের পাশে বন্ধনীর মধ্যে, কখনও সম্পূর্ণ পাঠশেষে শব্দার্থের পশরা সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। কখনও পরবর্তী লাইনে পূর্ববর্তী শব্দের অর্থ গেঁথে দেয়া হয়েছে। যেমন –

> তিলকার চোখে এই অরণ্য পৃথিবী অনেক মায়ায় ঢাকা। চেঁড়ে, পাখি হয়ে উড়ে দেখে আসতে সাধ যায় অরণ্যের সীমা। বিইং, সাপ হয়ে ঢুকে যেতে সাধ যায় মাটির গহ্বরে। হাথ্হি, হাতি হয়ে প্রবল দাপে মাটি কাঁপিয়ে চলতে সাধ যায়। দারে, গাছ হয়ে উঠে যেতে সাধ যায় আকাশপানে। বির, বন হয়ে ঢেকে ফেলতে সাধ যায় রুক্ষ মাটি মত। (মহাশ্বেতা ২০০৪/১১ : ৪২২)

বিদ্রোহের মূলশ্লোগান ধারণ করা হয়েছে সাঁওতালি ভাষায় –

> 'দেলায়া বিরিদ্ পে, দেলায়া তিঙ্গুন পে।' (মহাশ্বেতা ২০০৪/১১ : ৯৭)

হুলমাহা উপন্যাসের শেষে মোট ১৯টি সাঁওতালি শব্দের অর্থসহ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যেও কিছু শব্দার্থ বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন –

> এমন সময়ে রায়বারিচ (ঘটক) কোথা, সারসাগুন (শুভাশুভ) কে দেখে, হরঃ চিন্হা (আশীর্বাদ)– টাকা চাল্ – এত নিয়ম হয় কি করে ? (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ১০৮)

কাহিনির বয়ানে যে শব্দগুলোর অর্থ গ্রথিত করা বা বিস্তৃত করা সম্ভব হয়নি, কেবল সেগুলোই কাহিনি শেষে দেওয়া হয়েছে।
তেমনি 'হুলমাহার মা'-র শেষে ৭টি এবং 'ফারকাটি' গল্পের শেষে ১১টি শব্দের অর্থ দেয়া আছে।

৬.৫

আদিবাসী জীবনকে বাস্তব ও জোরালো করার জন্য আদিবাসী শব্দের বা ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে তবে তা যেন বাঙালি পাঠকের বোধগম্যতার বাইরে না যায় বা রচনার রসাস্বাদনে যেন বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে সে বিষয়েও লেখক সচেতন ছিলেন পূর্ণমাত্রায়। মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত সাঁওতালি শব্দের একটি তালিকা দেয়া হলো –

হুলমাহা	– সাঁওতাল বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ
উখইড়তে	– উপড়ে ফেলে দিতে

এরঃকসিম পরব – ফসল ভালো হবার কামনায় আষাঢ় মাসে জাহের থানে মুরগি বলি দিয়ে পূজা করা

কাঁথ – ঘরের বাইরে মাটির দাওয়া, মাটির দেওয়াল

ছিটাভিটা – ছিন্নভিন্ন

কাই – পাপ

বুলুং – লবণ

কাঁড় – তীর

ফারকাটি – তামাম শোধ

বির্ আড়াং – অরণ্য মর্মর

কোড়া – চাবুক

কুড়া – বিঘা

কীয়াপুতা – চিরজীবী পুত্র

নায়কে – ধর্মীয় পুরোহিত

ঘিসুড় – শুয়োর

বলোয়া – বিদ্রোহ (সশস্ত্র)

খিলখুঁট – বংশ ও গ্রাম

চাতিয়ার – দ্বিতীয়বার নামকরণ। এটি না হলে বিয়ে হয় না

জয়ার – ধন্য ধন্য

জোহার – সম্ভাষণ, নমস্কার, সম্মান জানানো

ধান বাড়ি – ঋণ হিসাবে দেওয়া ধান, যা পরিশোধের সময় পরিমাণে বেশি দিতে হয়

নপ্তা – লপ্তা, জন্মের পরে নখ কেটে জন্মশৌচ কাটানো

নাপ্তা – নামকরণ

সার সাগুন – শুভাশুভ

রায়বারিচ – ঘটক

হরঃ চিন্‌হা – আশীর্বাদ

ঝেকাচেকা – জ্বালাপোড়া, ব্যতিব্যস্ত

ডাহ্‌রা – যাওয়া, এগিয়ে যাওয়া, নিশানা

ডহর – পথ

দিশুম – দেশ

দেশমাঝি – গ্রাম-প্রধান, দেশ-প্রধান

দোকর লোকসান – দ্বিগুণ লোকসান

পারিস – আত্মীয়তা

মুর্মু – পদবী

পেড়াই করি – পিষে

বির্‌ – জঙ্গল

ভদরী – ভান্ডান (বড় শ্রাদ্ধ)

সুজাওয়াল – সান্ত্রিবিশেষ

হড়হপন – মানব সমাজ, সাঁওতাল জনগণ

বিটলাহা – সমাজচ্যুত

আঁধি – বিপদ, সঙ্কট

গিরা দেওয়া – শালগাছের ছাল পাঠিয়ে বিদ্রোহের জন্য সকলকে ডাকা

আপুং – বাবা

আয়ু – মা

গড়ম্ আয়ু – ঠাকুমা

বিইং – সাপ

চেঁড়ে – পাখি

দারে – গাছ

মারাংবুরো – বড় পাহাড়

তালা দাই – মেজদিদি

হাথ্হি – হাতি

তারুপ – বাঘ

কাডি – মোষের বাচ্চা

দেলায়া বিরিদ্ পে, দেলায়া তিঙ্গুন পে – এসো ওঠ। জাগো, এসো উঠে দাঁড়াও

সাঁওতাল গানগুলো প্রায় সবই বাংলায় অনূদিত। কোথাও অবশ্য দু'এক চরণ খাঁটি সাঁওতালি ভাষায় রক্ষিত আছে। যেমন –

'খাঁটি গেকেন হুল গেয়া হো' (মহাশ্বেতা ২০০৩/১৩ : ৫০৮)

সাঁওতাল বিদ্রোহের সম্পূর্ণ আবহকে ধারণ করে মূল ভাষার গানের এ চরণটি পাঠকের বোধগম্যতার বাইরে হলেও এর ভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না মোটেও।

৬.৬

মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার* ও *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* উপন্যাসদ্বয়ে মুণ্ডাজীবনের সংগ্রামশীলতা উপজীব্য হয়েছে। অনিবার্যভাবেই এ উপন্যাসদ্বয়ে লেখক মুণ্ডারী ভাষার ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয় যে, *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭) লেখকের আদিবাসী জীবনভিত্তিক প্রথম দিককার উপন্যাস। এ উপন্যাসটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা, সমালোচকদের স্তুতি ও পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং সর্বোপরি আদিবাসীদের কাছে তাকে দেবীর আসনে পৌঁছে দেয়া – সমস্তই ঘটেছে উপন্যাস প্রকাশের পর[২]। *অরণ্যের অধিকার* মহাশ্বেতা দেবীকে আদিবাসীদের 'মারাংদাই' বা বড়দিদিতে পরিণত করেছে এবং মুখ্যত সে-সময় থেকেই আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে বা আদিবাসীরা তাকে নিজেদের একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বলে গ্রহণ করেছে। এ উপন্যাসটি রচনার পূর্বেও অবশ্য লেখক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তথ্য-উপাত্ত এবং কথা-কাহিনি সম্বলিত গান সংগ্রহ করেছেন কিন্তু আদিবাসী জনজীবনের সঙ্গে সরাসরি ব্যক্তিগত আন্তরিক সম্পর্ক তখনও গড়ে ওঠেনি। সে-কারণেই হয়তো এ উপন্যাসদ্বয়ে মুণ্ডারি ভাষার খুব বেশি ব্যবহার দেখা যায় না, কেবল কিছু মুণ্ডারি শব্দ পাওয়া যায়। বীরসাকে নিয়ে রচিত কিছু গান, বাংলায় তরজমাসহ *অরণ্যের অধিকার*-এ পাওয়া যায়। চোট্টি মুণ্ডাকে নিয়ে লেখা সব গানই বাংলায় – স্বভাবতই, কেননা চোট্টি তো বীরসার মতো ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র নয় যে তাকে নিয়ে মুণ্ডারি ভাষায় রচিত গান মুণ্ডা জনপদে প্রচলিত থাকবে ; এ চরিত্রটি একান্তই লেখকের নিজের সৃষ্টি। এ উপন্যাসে মুণ্ডারি ভাষার ব্যবহার আরও কম। চোট্টিরা যে ভাষায় উপন্যাসে কথা বলে বা মহাশ্বেতা যে ভাষায় চোট্টিদের সমগ্র জীবনকে মিথ-বিশ্বাস, সংগ্রাম-ইতিহাস বা দৈনন্দিন জীবন-যাপনের বিবরণের সমবায়ে প্রকাশ করেন, তাকে আপাত পাঠে ছোটনাগপুরের আঞ্চলিক বা উপভাষা বলে মনে হতে পারে, এ ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে, এটি মুণ্ডাদের কথ্য ভাষা।[৩]

অরণ্যের অধিকার ও *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* গ্রন্থে ব্যবহৃত মুণ্ডারি ভাষার একটি তালিকা দেওয়া হল –

আরান্দি – বিয়ে।

আবা – বাবা।

আড়কাঠি – কাজের লোভ দেখিয়ে আদিবাসীদের দূরের চা-বাগানের শ্রমিক হিসেবে নিয়ে যাওয়ার দালাল।

কুচিলা – একপ্রকার বিষ বা বিষে জারিত তির।

করম	– উৎসবের নাম।
খুটকাট্টি	– খুঁটি গেড়ে নির্দেশিত আদিবাসী কর্তৃক স্থাপিত গ্রাম।
খুঁচি	– পাত্র।
ঘাটো	– চিনা ঘাসের দানা সেদ্ধ।
চেচক	– বসন্ত।
পহান	– গ্রাম-প্রধান।
বোরা	– ঝাঁকা।
বুরুজ	– ছোট পাহাড়, টিলা।
বলোয়া	– ধারালো অস্ত্র।
বলোয়া উঠানো	– সশস্ত্র সংগ্রাম।
ভুঁকে	– না খেয়ে।
মানকি	– গোষ্ঠী প্রধান।
রোঁয়া	– আত্মা।
রিষ	– ঈর্ষা।
লাকড়া	– বাঘ।
হায়জা	– কলেরা।
শোঁসানবুরু	– মৃতদের স্মরণে কবরে স্থাপিত পাথর বা ফলক।
সোহ্‌রাই	– উৎসবের নাম।
সিংবোঙা	– প্রধান দেবতা।

ড. সুনীতিকুমারের (সুনীতি ২০০৫ : ১২৫) মতে, সিং অর্থ দিবা বা সূর্য আর বোঙা শব্দটি সাধারণত দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মুণ্ডারি ভাষার প্রাচীন প্রয়োগ দেখে মনে হয়, 'বোঙ্গা' শব্দের মূল অর্থ ছিল চাঁদ। সাঁওতালি বা মুণ্ডারি প্রভৃতি ভাষায় 'চাঁদ' ও 'সূর্য' উভয়কে বোঝাবার জন্য আর্যভাষার শব্দ 'চান্দো', 'চান্দুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়। সিং-বোঙা বা সিং-চান্দো – 'চান্দো' এখানে সূর্য অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। সে-অর্থে সিং বোঙা অর্থ 'দিনের বা আলোর দেবতা'। তবে আক্ষরিক অর্থে সূর্য-চাঁদ বা দিন-রাত আদিবাসী কল্পনায় ঐশী শক্তির দুইটি বিকাশ রূপেই অনুভূত হয়েছে। মূলত, সিং-বোঙার কল্পনায় যে কোনো সভ্য সমাজের মানুষের উপযোগী একটি দেব-কল্পনায় কোল জাতি এসে উপনীত হয়েছে বলে সুনীতিকুমার মত প্রকাশ করেছেন।

অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে অনেক গ্রাম বা স্থানের নাম উল্লেখিত হয়েছে, যেগুলো মূলত আদিবাসী ভাষার অন্তর্গত। বোর্তোদি, আয়ুভাতু, মারাংহাড়া, চাইবাসা, চালকাড়, সেরাংদি, তিলাডুবু, রোগেতো, গুইপাই, কোটাগারা, সঙ্করা, তুরাবু, যমকোপাই, হেসাদি, হাগাদা, হুটুবদাগ, পাতরা, কারিকা, সোৎরা, জালমাই, সেন্‌ত্রা, খুনটি, লোহাজিমি প্রভৃতি ছোটনাগপুরের স্থানিক আদিবাসী নাম মনে করিয়ে দেয় যে, অঞ্চলটির আদি বাসিন্দা বা ভূমিপুত্র কারা। আজ হয়তো তারা প্রান্তিক কিন্তু একসময়ে তারাই জঙ্গলাকীর্ণ এ অঞ্চলকে বাসোপযোগী করে তুলেছে। মুণ্ডারি ভাষার দৈন্য এবং শক্তিকে বীরসার কথনে রূপ দিয়েছেন মহাশ্বেতা *অরণ্যের অধিকার-এ* এভাবে–

> দিকুদের ভাষায় হাজার-লক্ষ শব্দ ! আমার মুণ্ডারীতে অত শব্দ নাই হে ! লিখবার অক্ষর নাই ! যত শব্দ দেখ, সব মোদের আঁত ছিড়া, রক্তে ভিজায়ে সির্জানো ! মোরা লিখি না, গান সির্জাই !" (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ২০৪)

মূলত গানের মধ্য দিয়েই মুণ্ডাসহ সকল আদিবাসীরা তাদের আপন অনুভূতি ব্যক্ত করে ; তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-নানান ঘটনার বিবরণ ধরে রাখে। এ উপন্যাসে তিনটি মুণ্ডারি ভাষার গান রক্ষিত আছে – অবশ্য বাঙালি পাঠকের বোধগম্যতার কারণে বাংলা ভাষায় অনূদিতও হয়েছে।

প্রথম গানটি স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের বার্তা বহন করে, যদিও গানটি গাওয়া হয়েছে বীরসার উদ্দেশ্যে – বীরসাকে ভগবান পদবাচ্যে ভূষিত করে। ভরমির কণ্ঠে দুর্বোধ্য মুণ্ডারি ভাষায় কান্নার মতো সুরে, মন্ত্রের মতো গভীরতায় উচ্চারিত হয়েছে –

> হে ওতে দিসুম সিরজাও
> নি' আলিয়া আনাসি
> আলম আনদুলিয়া
> আমা'রেগে ভরোসা

বিশ্বাস মেনা !’

অর্থাৎ

হে পৃথিবীর স্রষ্টা
আমাদের প্রার্থনা ব্যর্থ ক’রো না
তোমাতে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস !! (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ৭৯)

দ্বিতীয় গানটি শোনা যায় ধানী মুণ্ডার কণ্ঠে। নবতরুণ সুনারার মৃতদেহ কোলে নিয়ে ধানী গেয়ে ওঠে ‘উলগুলান’ বা মহাবিদ্রোহের সেই বিখ্যাত গানটি –

‘বোলোপে বোলোপে হেগা মিসি হোন্ কো।
হোইও ডুডুগার হিজু তানা।
বোলোপে।
ওতে রে ডুডুগার সিরমা রে কোআন্সি।
দিসুম তাবু বুয়াল তানা
বোলোপে...
তাইওম্ তে দো হোরা কাপে নামিয়া।
দিসুম তাবু নুবা জানা।
বোলোপে...’

‘ও ভাই, ও বোন, ও ছেলেরা, ছুটে যা, প্রাণ বাঁচা
আঁধি উঠেছে।
ও ভাই...
ঝড় মাটির বুকে, আকাশ ঢাকা কুয়াশায়।
আমাদের দেশ দেখ্ ওই ছিনে নিয়ে গেল।
ও ভাই...
পরে আর পথ পাবি নে রে।
সব যে আঁধারে আঁধারে !
ও ভাই...’ (মহাশ্বেতা ২০০৩ / ৮: ৮৮)

‘বোলোপে’-র এ ধ্বনিকে রক্তে ধারণ করে, মন্ত্রের মতো জপে মুণ্ডারা মহাবিদ্রোহ ‘উলগুলানে’ অংশ নিয়েছিল – মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বানিয়ে অকুতোভয় মুণ্ডারা লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়েছিল। খুনটি থানা আক্রমণকালে তির ও ধনুক, ঢাল ও তলোয়ার, বর্শা ও বলোয়া সূর্যের দিকে তুলে তারা সশস্ত্র বিদ্রোহের গান ধ্বনিত করেছে সম্মিলিত কণ্ঠে –

‘জিলিবা জিলিবা

জোলোবা জোলোবা

পানতিয়াকানালে বীরসা হে !

তিরোদা সেন্‌দেরা

লেংগা তিরিয়া

জোম তিরেসার

পানতিয়াকানালে বীরসা হে !’

‘মোদের হাতিয়ার জ্বলছে হাতে

ও বীরসা ! আমরা চলেছি সার বেঁধে।

বাঁ হাতে ধনুক ডান হাতে তির

মোদের হাতিয়ার জ্বলছে হাতে

ও বীরসা ! আমরা চলেছি সার বেঁধে !’ (মহাশ্বেতা ২০০৩/৮ : ২০০)

এ তিনটি গান থেকেই বোঝা যায় যে, বাংলাভাষী বাঙালির কাছে মুণ্ডারি ভাষা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। যদিও বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে বহু মুণ্ডারি শব্দ। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাষা আয়ত্ত করা আমাদের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। সে কারণেই হয়তো ঔপন্যাসিক মুণ্ডা জীবন ও বিদ্রোহকে উপন্যাসের উপজীব্য করলেও মুণ্ডা ভাষাকে মুণ্ডা চরিত্রের মুখে দেননি। এ উপন্যাসের মুণ্ডার মুখের সংলাপ মূলত বাংলা, তবে তার সঙ্গে কিছু আঞ্চলিক ও সামান্য মুণ্ডারি শব্দের মিশেল রয়েছে।

৬.৭

অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত লড়াকু হো জাতির সংগ্রামী জনজীবনভিত্তিক উপন্যাস নির্মাণ করেছেন মহাশ্বেতা সমসাময়িক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চেরো বাঁধ তৈরির প্রকল্পে শত আদিবাসী গ্রাম অধিগ্রহণের সূত্রে যে সংগ্রাম গড়ে ওঠে, তা *সুরজ গাগরাই* উপন্যাসের উপজীব্য। সংগ্রাম ও জীবনচিত্রের সূত্রে এ উপন্যাসেও বেশ কিছু হো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও হো চরিত্রগুলো যথারীতি কথা বলেছে বাংলায়। *সুরজ গাগরাই* উপন্যাস ও ‘শনিচরী’, ‘রাজাবাসার গল্প’, ‘ইটের পর ইট’ প্রভৃতি গল্পে ব্যবহৃত হো শব্দের নমুনা দেয়া হল –

আজি – দিদি

উন্দি – ছোটো ভাই

কিমিন – ছোটো ভাইয়ের বউ

কোচে দিকু – প্যাঁচালো ও ধূর্ত দিকু

গোরো ওতে – ডাঙা জমি

সোখা – ভূত তাড়ানোর ওঝা

দেওনা – চিকিৎসক

মুণ্ডা – গ্রাম-প্রধান (জাতি বা গোষ্ঠী অর্থে নয়)

মায়লে – এম. এল. এ.

জানুম – কাঁটা

বাহ্ – ফুল

জাতিএত্কা – জাতিবহির্ভূত / একঘরে করা

জিয়াতাতা – পূর্বপুরুষ

জালোম ফান্দা – কঠিন ফাঁদ

তাতা – ঠাকুরদা

বাউহোনিয়ার – ভাসুর

মানকি ব্যবস্থা – গ্রামের জমি বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত লোক মানকি

সার্জোম বাহা – নতুন ফুল-পাতার বসন্ত উৎসব

মানগিরা – মান্য করতে হয় এমন গিরা বা বার্তা

বালাবানু – পাগল

লড়কা হো – লড়াকু হো

টোপাজাং – অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

ডিয়াং – একপ্রকার পানীয়, মদ

ডোংগোল – চাইবাসার হো নাম

চাকা – চক্রধরপুরের হো নাম

এছাড়াও বেশ কিছু স্থানের আদিবাসী নাম পাওয়া যায় এসব রচনায়। যেমন –

চেরো, বড়া বানো, বানো, বিরজিলুহাতু, বিন্দিবাতু, বিচাবুরু, টোপাবুরু, লাটারবুরু, সালাংগিবুরু, সিমঝেরা প্রভৃতি।

'ইটের পর ইট' গল্পে একাধিক গান রয়েছে – যদিও সবই বাংলায়। তবে খাদে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি গানের সূচনায় আদিবাসী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে –

উড়িষেরেন ডালমিয়া দিকু
কাদানা যে কুলায়োতানা –

অর্থাৎ

উড়িষ্যা কোম্পানী দিকু ডালমিয়া
এসে খাদানটি খুলল। (মহাশ্বেতা ২০০৩/১১ : ২৯২)

৬.৮

সীমিত হলেও অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুণ্ডারি ও হো ভাষার শব্দ ছাড়াও দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের ওঁরাও ভাষার কিছু ব্যবহার পাওয়া যায় 'শিকার', 'শনিচরী', 'ডাইনি' প্রভৃতি গল্পে। ওঁরাওদের ভাষার নাম কুঁড়ুখ – এ ভাষার কিছু শব্দ এ গল্পগুলোতে পাওয়া যায় –

এং আজ্জি – ঠাকুমা

জোংখা-এরপা – হো, ওঁরাও ছেলেদের ঘোটুল বা যৌথগৃহ

পেল্-এরপা – হো, ওঁরাও মেয়েদের ঘোটুল বা যৌথগৃহ

গোহুমন – গোখরা সাপ

খাদ – ছোটো ছেলে

মুক্কাহিনি – ছোটো মেয়ে

বিখিল – চাল

ওলদা – চিতা

কেচ্চা – মৃত্যু

উল্লোচোত – অশৌচ

আন্ধি ধুকায় – আঁধারে

বিনকো – মেঘ

বাদালি – বৃষ্টি

বেড়ে – আকাশ

বিল্‌কো – তারা

চান্দো – চাঁদ

কা – হাওয়া

এছাড়াও 'ডাইনি' গল্পে দুটি সম্পূর্ণ বাক্যও পাওয়া যায় –

কিরা লাগেংগা – খিদে পেয়েছে।

মালু কুলার আড়গুড়া – পেট ভরেনি।

এ দুটি বাক্যকে লেখক আদিবাসী জীবনে চাঁদ-সূর্যের মতো ধ্রুব বা চিরন্তন বলে অভিহিত করেছেন। বাস্তবিক আদিবাসী জীবনের প্রান্তিকতায় খিদে পাওয়া ও পেট না ভরার বিষয়টি চিরন্তনই বটে। এ বাক্যদ্বয়ের উল্লেখে আদিবাসী জীবন-বাস্তবতা স্পষ্ট ও নিখুঁত হয়েছে।

৬.৯

মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে সাঁওতালি, মুণ্ডারি, হো ও কুঁড়ুখ ভাষার শব্দ ব্যবহারে আদিবাসী জনজীবনের চিত্র পূর্ণতা পেয়েছে। এসব রচনায় উল্লিখিত আদিবাসী শব্দের অধিকাংশই তাদের সম্পর্ক, আচার, উৎসব বা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত নানা উপাদান বা ক্রিয়াকে নির্দেশ করে। এ শব্দগুলোর ব্যবহারে আদিবাসী জীবনের নানা প্রথা বা দিক পাঠকের সামনে উঠে আসে।

লক্ষণীয় যে, মহাশ্বেতা তাঁর আদিবাসী জীবনভিত্তিক কথাসাহিত্যের কোন চরিত্রের মুখেই তাদের গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষাকে ব্যবহার করেননি। আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে, লেখক বর্ণনায় প্রমিত বাংলা ব্যবহার করলেও সংলাপে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন। হয়তো তা কখনও কখনও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে কিন্তু সে জীবন আরও বেশি ঘনিষ্ঠ বা বাস্তব বোধ হয় এবং বারংবার পাঠে অপরিচিত দুর্বোধ্য ভাষাটাও একসময় পাঠকের বোধগম্য হয়, যদিও তা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। কিন্তু মহাশ্বেতা তাঁর কোন রচনাতেই সংলাপে আদিবাসী ভাষা ব্যবহার করেননি। কোনো কোনো বর্ণনায় আদিবাসী শব্দ এসেছে তাও বন্ধনীতে বাংলা অনুবাদসহ। শব্দের বেলায় পাঠকের বোধগম্যতায় যে কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে তা-কি সংলাপের বেলায় হতে পারতো না ? অর্থাৎ সংলাপটিতে আদিবাসী ভাষা ব্যবহার করে বন্ধনীতে অনূদিত বাংলা ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল না। একসময় মহাশ্বেতার আদিবাসীভিত্তিক কথাসাহিত্যের পাঠক এ ভাষার সঙ্গে পরিচিত হলে আর বন্ধনী চিহ্নে অনূদিত বাংলারও প্রয়োজন হয়তো হতো না। শব্দের বেলায় যেমন একই শব্দ বারবার ব্যবহৃত হলে পরবর্তীতে আর বাংলার তরজমা পাশে দেয়া হয়নি অথবা বেশ কিছু রচনার শেষাংশে বিভিন্ন আদিবাসী শব্দের অর্থ রক্ষিত হলেও পরবর্তী সময়ের রচনাগুলোতে তার প্রয়োজন হয়নি। এমনিতেও এ রচনাগুলোতে চরিত্রের মুখের সংলাপ যথেষ্ট কম, লেখকের নিজস্ব কথন বা বর্ণনা-বিশ্লেষণ বেশি। কেবল *অপারেশন বসাই টুডু* উপন্যাসে বসাই টুডুর দীর্ঘ সংলাপ পাওয়া যায় – যা তার রাজনৈতিক দর্শনকে প্রতিফলিত করে। তবে বসাইয়ের মুখের ভাষাও হিন্দি-ঘেঁষা বাংলা, কেননা বসাই কথা বলছে বাঙালি কালী সাঁতরার সঙ্গে। কিন্তু সে যখন নিজস্ব গোষ্ঠীর কারো সঙ্গে মত বিনিময় করছে তখন সে গোষ্ঠীগত ভাষাতেই কথা বলবে – সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মহাশ্বেতার রচনায় তা আসেনি। আদিবাসীভিত্তিক রচনার মনোযোগী পাঠকের প্রত্যাশা অন্তত ভাষার ক্ষেত্রে পূর্ণতা পায়নি। তবে আদিবাসীরা অনেক ক্ষেত্রে দ্বিভাষিক[৪]; নিজ সম্প্রদায়গত ভাষা ছাড়াও তারা মূলস্রোতের ভাষাও আয়ত্ত করে জীবনধারণের প্রয়োজনে। সেক্ষেত্রে মহাশ্বেতা সৃষ্ট আদিবাসী চরিত্রের মুখে বসানো ভাষা অলীক নয়, বাস্তবতার যথেষ্ট ভিত্তিও তাতে আছে।

প্রকৃতই বাংলা অঞ্চলের আদিবাসীরা নিশ্চয়ই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলার চর্চা করে – কেননা বাঙালিদের সঙ্গে কর্মসূত্রে বা অন্য প্রয়োজনে তাদের যোগাযোগ হয় কিন্তু নিজ গোত্রের কোনো অনুষ্ঠানে বা গৃহস্থালি ব্যবহারে তারা অবশ্যই নিজস্ব ভাষারীতিতে কথা বলে । মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কথাসাহিত্যে সীমিত পরিমাণে হলেও যদি চরিত্রগুলোর মুখে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করতেন তাহলে তাদের জীবনবৃত্তান্ত পূর্ণাঙ্গতা পেত বলেই আমাদের ধারণা।

টীকা

১. রোমিলা থাপার (রোমিলা ২০০২ : ১১), সুবোধ ঘোষ (সুবোধ ২০০০ : ৬৫), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (সুনীতি ২০০৫ : ১১৩) সবাই এ ব্যাপারে একই মত দিয়েছেন।

২. এ সম্পর্কে কৃপাশঙ্কর চৌবের মূল্যায়ন (কৃপাশঙ্কর ১৯৯৯ : ৪৫-৪৬) গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে –

> ’৭৯ সালে বইটি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলে আদিবাসীরা বিভিন্ন জায়গায় নাগাড়া বাজিয়ে আনন্দ করল,‘আমরা সাহিত্য অ্যাকাডেমি পেয়েছি’। ‘মুণ্ডা’ নাম নিয়ে এই প্রথম তাদের মধ্যে জেগে উঠল অসীম গৌরববোধ। যে মুণ্ডা ভূমিজ নামে সরকারি খাতায় লেখা ছিল, সে দরখাস্ত করল তার নাম ‘মুণ্ডা’ হিসেবে লেখার জন্য। মহাশ্বেতাকে তারা আমন্ত্রণ জানাল মেদেনীপুরে অভিনন্দন জানানোর জন্য। ‘৭৯ সালে সেই অভিনন্দন-সভায় বক্তারা জানালেন, ‘সমাজের উঁচুতলার মানুষ কখনোই কোনো স্বীকৃতি দেয়নি আমাদের। এমনকী ইতিহাসেও আমরা ছিলাম না। তুমি আমাদের নিয়ে লিখে স্বীকৃতি দিলে প্রথম’। আনন্দে ছলছল হয়ে উঠল মহাশ্বেতার চোখ। এত খুশি তিনি অ্যাকাডেমি পাওয়ার পরও হননি। অনুভব করলেন, আদিবাসীদের জন্য দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল তাঁর।

মহাশ্বেতা আদিবাসীদের আরো কাছাকাছি এলেন। আরো কাছ থেকে একাত্ম হয়ে তাদের জানার চেষ্টা করলেন।

৩. প্রাবন্ধিক মহুয়া চক্রবর্তী ‘*অরণ্যের অধিকার*-এর ভাষা : লেখকের আবেগ-বিশ্বাস আর কর্তব্যবোধ’ শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, এ উপন্যাসের ভাষা-আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি মহাশ্বেতা দেবীকে প্রশ্ন করেছিলেন – “যে ভাষাটা মুণ্ডা চরিত্রগুলির মুখে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা কি ছোটনাগপুরের উপভাষা ?” এতে তিনি উত্তর দেন যে, “ না, ওরা এরকম করেই কথা বলে।” লেখকের এ বক্তব্যকেই প্রামাণ্য ধরেছেন প্রাবন্ধিক। (মহুয়া ২০০৫ : ১৪১)

৪. আদিবাসীদের দ্বিভাষিকতার ব্যাপারে সুবোধ ঘোষ তথ্য-প্রমাণসহ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন (সুবোধ ২০০০ : ০৮) –

> অধিকাংশ আদিবাসী যারা নিজস্ব গোষ্ঠীগত ভাষায় কথা বলে, তারা স্থানীয় সমতল অঞ্চলের আর একটা সাধারণ (Non-Aboriginal) ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা রাখে। একটি গোষ্ঠীগত জাতীয় মাতৃভাষা এবং একটি শহরবাজারের বিজাতীয় ভাষা – আদিবাসীর মুখে দ্বিভাষিতার (Bilingualism) ব্যাপার দিন দিন বেড়ে চলেছে।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র ঘরানার লেখক মহাশ্বেতা দেবী। দীর্ঘকাল ধরে তিনি আদিবাসী প্রান্তিক মানুষের জীবন-সংগ্রামকে তাঁর কথাসাহিত্যের অঙ্গীভূত করেছেন। সমাজের মূলস্রোতের একজন হিসেবে 'অপর' বলে প্রান্তে ঠেলে দেয়া আদিবাসীদের প্রতি প্রবল দায়বোধ ; একইসঙ্গে তাদের সাম্যবাদী সামাজিক দর্শন এবং সহজ-সরল-আড়ম্বরহীন জীবনের প্রতি আকর্ষণ – এ দ্বিবিধ কার্যকারণ ক্রিয়াশীল থেকেছে তাঁর সাহিত্য-রচনায় পূর্বাপর। আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রযন্ত্রের বঞ্চনা, প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণ, পুলিশি সন্ত্রাস প্রভৃতির পাশাপাশি – সরল, সত্যনিষ্ঠ আদিবাসীদের ঋণগ্রস্ত হয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া, শিক্ষার অপ্রতুলতা, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, ডাইনি ভাবনা ইত্যাদি তিনি কথাসাহিত্যের আখ্যানে স্থান দিয়ে পাঠকসমাজকে এক অনাবিষ্কৃত জগতের সন্ধান দিয়েছেন।

মহাশ্বেতার সৃষ্ট আদিবাসী চরিত্রগুলো কল্পিত নয় – কিছু ঐতিহাসিক এবং অধিকাংশই লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা জারিত। তাঁর গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলিও অধিকাংশ বাস্তব পটভূমিতে নির্মিত। আদিবাসীদের শোষণ-বঞ্চনা, অভাব-নিরন্নতার বিবরণ লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এ সূত্রে তাঁর বেশ কিছু রচনায় রিপোর্টাজধর্মিতা লক্ষিত হয়। তবে সাহিত্যিকের চেয়ে সাংবাদিক পরিচয় খুব বেশি উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি কখনওই। যদিও আদিবাসী জীবনের অন্দরমহলের কথাকার হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর সাংবাদিক-বৃত্তি অবশ্যই সক্রিয় থেকেছে।

ইতিহাসপ্রিয় মহাশ্বেতা ইতিহাসের উপাদান নিয়েই প্রথম আদিবাসী চরিত্রভিত্তিক উপন্যাস *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু* (১৯৬৭) রচনা করেন ; পরবর্তীকালে *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭)-এর বীরসাকে নিয়েছেন সংগ্রামী-লড়াকু ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবেই। বীরসা-কাহিনি মহাশ্বেতাকে সাহিত্যিক হিসেবে যেমন শক্তভূমিতে দাঁড় করিয়েছে, তেমনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একান্ত আপনজন 'মারাংদাই' বা 'বড়দিদি'-তে পরিণত করেছে। এ পর্যায়েই আদিবাসী জনজীবনের অন্দরে প্রবেশের সুযোগ পান তিনি এবং আদিবাসীরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তাদের পরম হিতৈষীরূপে গ্রহণ করে। আদিবাসীদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে এবং তাদের জীবনাচরণ-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করে গভীর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রত্যাশী মহাশ্বেতা আদিবাসী কৌমজীবনে তাঁর অভীষ্ট জীবন খুঁজে পান। সত্তরের উত্তাল, বিধ্বংসী ও রক্তাক্ত রাজনৈতিক পটভূমিতে

আদিম অনগ্রসর অবহেলিত জনজাতির যাপিত জীবনে আকাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থার প্রতিবিম্ব অবলোকনে সে-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন তিনি তাঁর সাহিত্যের আখ্যানে স্থান দিয়ে।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যারা তির-ধনুকের মতো আদিম অস্ত্র নিয়ে আধুনিক মারণাস্ত্র শোভিত ইংরেজ বাহিনীর মোকাবিলা করেছে অকুতোভয়ে এবং এ ভূমিকে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত করতে অকাতরে জীবন দিয়েছে ; স্বাধীন ভারতে তারা আজ ন্যূনতম নাগরিক সুবিধাটুকু থেকেও বঞ্চিত। ভূমি, শস্য এমনকি জলেও তাদের অধিকার নেই। মূলধারার মানুষেরা তাদের 'অপর' বলে প্রান্তে ঠেলে রেখেছে। মূলধারার একজন মানুষ হিসেবে মহাশ্বেতা দায়বোধ করেছেন তাদের প্রতি এবং তাদের বঞ্চনা-শোষণ ও প্রতিবাদ-সংগ্রামের মুখপাত্র হয়ে সাহিত্যে তাদের স্থান দিয়েছেন অপার মমতা ও গভীর আন্তরিকতায়। একুশ শতকের প্রান্তে এসে কৃষিপ্রধান, ধান্যবহুল অঞ্চলের যে সমস্ত মানুষের জীবনে 'ভাত' স্বপ্নমাত্র, বেঁচে থাকা যাদের অভ্যাস – অধিকার নয় ; জলটুকুও যারা রেশন করে খায় – সে-সমস্ত অবহেলিত, প্রান্তিক মানুষের জীবন পৌনঃপুনিকভাবে ওঠে এসেছে মহাশ্বেতার কথাসাহিত্যে – কেবলমাত্র দায়বোধের তাড়নায় নিশ্চয়ই নয়। বিশ্বায়নের এ আগ্রাসী যুগেও যারা নিজ সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-পরিচিতি আজও অক্ষুণ্ন রেখেছে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে যারা বিলিয়ে দেয়নি পরিবর্তনের স্রোতস্বিনীর প্রবাহে, তাদের মধ্যে লেখক ভারতীয় সংস্কৃতির শেকড়ের সন্ধান পেয়েছেন। আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উৎসে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেছেন বলেই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এবং অন্যেরা মহাশ্বেতার সাহিত্যকে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। বস্তুত আজকের উত্তর-উপনিবেশবাদ এবং সাবঅলটার্ন তত্ত্ব দুটোই মহাশ্বেতার কথাসাহিত্যের ভূমিতে স্থান অধিকার করে নিয়েছে জোরালোভাবে – তা কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে কোনো তত্ত্বের প্রতি তাঁর যে দায় বা অনুরাগ নেই – তা তিনি বারবার বিভিন্নভাবে বলেছেন। তিনি নিজে সচেতনভাবে কোনো তত্ত্ব ব্যবহার না করলেও তাঁর সাহিত্যকে মার্কসবাদ, পোস্ট-কলোনিয়ালিজম, সাবঅলটার্ন স্টাডিজ প্রভৃতি তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করতে বাধা নেই। নিপীড়িত মানুষগুলোর যে জীবনবাস্তবতাকে তিনি গ্রহণ করেছেন, সে-বাস্তবতা সুখপ্রদ নয়, তবুও রূঢ় বাস্তব ও শিল্পের মেলবন্ধনে অপরূপ হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্য।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় আদিবাসী নারীর অবস্থানকে এনেছেন মহাশ্বেতা তাঁর কিছু ছোটগল্পের অবয়বে। এ নারীচরিত্রগুলো কেবল নারী হিসেবে নয়, শ্রেণিবিভাজিত সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ততোধিক প্রান্তিক উপাদান হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। মহাশ্বেতা অবলম্বিত প্রায় সব আদিবাসী গোষ্ঠীই পিতৃপ্রধান – যেখানে নারীর সম্মান থাকলেও নীতিনির্ধারকের ভূমিকা নেই। সাঁওতাল সমাজে নারীকে ঘরের 'জিনিস কানা কু' অর্থাৎ সামগ্রী (শিপ্রা ২০০৯ : ৫৮) হিসেবে অভিহিত

করা হয়, যদিও পারিবারিক জীবনে সব কাজে বা সিদ্ধান্তে তার মত জিজ্ঞেস করা হয়। তবুও পিতৃপ্রধান পরিবারে নারীর অবস্থান তো আরও প্রান্তিক। আদিবাসী পুরুষেরা যেখানে ঋণের দায়ে বেঠবেগার বা শ্রমদাসে পরিণত হয়, নারীরা সেখানে কেবল শ্রমদাসী নয়, যৌনদাসী হতে বাধ্য হয়। আদিবাসী শ্রমজীবনে নারীর এ অবস্থানকে মহাশ্বেতা তাঁর কয়েকটি গল্পের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন – 'দৌলতী', 'শনিচরী', 'রাজাবাসার রূপকথা', 'ইটের পর ইট', 'এজাহার' তেমনি কিছু গল্প। তবে এ গল্পগুলোতে নাম ও কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আদিবাসী নারীচরিত্র স্থান পেলেও, ব্যক্তিত্বময়ী কোনো নারী আসেনি, ব্যতিক্রম কেবল 'দ্রৌপদী' ও 'রুদালী' গল্পদ্বয়। 'দ্রৌপদী' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী নারীত্বের বি-নির্মাণ ঘটিয়েছেন সত্য কিন্তু এ গল্পে দ্রৌপদী অনেকবেশি প্রতীকধর্মী। গল্পের অন্তিমে নগ্ন দ্রৌপদীর সেনানায়কের দিকে দৃপ্তপদে অগ্রসর হওয়া – বৃহত্তর অর্থে নিরন্ন, নগ্ন আদিবাসী বা অন্ত্যজ সমাজকেই প্রতীকায়িত করে – যারা অকুতোভয়ে সামনে পা বাড়ালে পেশীশক্তি, অস্ত্রশক্তির প্রতিভূরা ভীত হয়ে পিছু হটে। 'রুদালী' গল্পেও শনিচরীর নারীত্বের পরিচয় ততটা প্রকটিত নয় ; অন্ত্যজ শ্রেণির একজন সংগ্রামী মানুষ হিসেবেই তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। গল্পে কিছুটা এলেও আদিবাসী জীবনভিত্তিক কোনো উপন্যাসেই নারী-চরিত্র কেন্দ্রে স্থান পায়নি বা কোনো নারীর উপর বিশেষ আলোকসম্পাত করা হয়নি। মহাশ্বেতা অবশ্য বিভিন্নভাবে বারবার নারীবাদে নয়, মানবতাবাদে তাঁর প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। সে-সূত্রে লেখকের এ প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিন্তু এর পেছনে অন্য কোনো প্রবণতা প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে কী ? মহাশ্বেতা যেসময়ে তাঁর সাহিত্যিক-জীবন শুরু করেন, সে-সময়ে নারী-লেখককে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হতো। শুরু থেকেই মহাশ্বেতা নারী-লেখক নন, কেবল লেখক হতে চেয়েছেন। সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থেকেছেন নারীসুলভ ভাবালুতা কিংবা দুর্বলতা যেন তাঁর লেখায় প্রকাশিত না হয়। প্রথমাবধি তাঁর নারী চরিত্রগুলো তাই প্রথাগত নারীত্বের কাঠামোয় সীমাবদ্ধ নয় – 'ঝাঁসির রানী' লক্ষীবাঈ একজন স্বাধীনতাকামী বীরযোদ্ধা, *হাজার চুরাশির মা-এর* সুজাতা কেবল সন্তানহারা মা নন, বরং সত্তরের উত্তাল সময়ের অস্থির রাজনীতি ও নৃশংস সময়ের একজন ন্যারেটর ; 'দ্রৌপদী' গল্পের দ্রৌপদী শোষিত জনতার প্রতীক। নারী-লেখক হিসেবে চিহ্নিত না হওয়ার সতর্ক সচেতনতাই কী তাকে নিবৃত্ত করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-জীবনের দ্বন্দ্ব-টানাপড়েন, তাদের সামাজিক-পারিবারিক প্রতিকূলতার বিপরীতে ব্যক্তি হয়ে ওঠার সংগ্রামী ইতিবৃত্তকে ধারণ করা থেকে ? মহাশ্বেতা-মানসের এ প্রবণতার সম্ভাবনাও কিন্তু একেবারে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

মহাশ্বেতা-সৃষ্ট প্রায় সব আদিবাসী চরিত্রকে 'টাইপ' চরিত্র বলা যায়। নেতিবাচকতার বিন্দুমাত্র স্পর্শহীন এ চরিত্রগুলো সৎ, সরল, সত্যবাদী, মানবিক ইত্যাদি গুণের অধিকারী। আদিবাসী চরিত্র ও জীবনের কোন প্রান্তেই কোনো কলুষতা, কোনো অসঙ্গতি কিংবা ব্যতিক্রমতা নেই। সকলেই এক, অভিন্ন এবং নিজ

ঐতিহ্য-সংস্কৃতির গৌরবদীপ্ত ধারক ও বাহক। অসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে মহাশ্বেতা আদিবাসীদের সম্পর্কে অ-আদিবাসী পাঠকের মনে যে বিশাল ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তার পূর্বশর্ত হিসেবেই তিনি সচেতনভাবে এ ধরনের চরিত্র নির্মাণ করেছেন। তাঁর রচনার রিপোর্টাজ ও ডকুমেন্টেশনধর্মিতা শিল্প-রস সৃষ্টির অন্তরায় বলে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তবে এ নিয়ে মহাশ্বেতা কখনওই ভাবিত হননি বরং আদিবাসীজীবনের উৎকর্ষ সাধনের যে ব্রত নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন, তা পূরণ করতেই তিনি তৎপর ছিলেন। মহাশ্বেতার সাহিত্যভুবনের নিজস্ব নান্দনিকতা প্রচলিত ও অভ্যস্ত সাহিত্যভাবনার সঙ্গে মেলে না বটে কিন্তু প্রচলিত ধারণার ধোঁয়াশা সরিয়ে নতুন দৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্য মূল্যায়নে অগ্রসর হলে বাংলা সাহিত্যই বরং ঋদ্ধ হবে।

আদিবাসী জীবনের কথাকার মহাশ্বেতা তাঁর কথাসাহিত্যে ভাষার ঋজুতায়, ব্যঙ্গবিদ্রূপের কঠোরতায় এবং অজস্র ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে নিজস্ব গদ্যরীতি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নির্মেদ, আপাত নির্লিপ্ত, কঠোর তীক্ষ্ণ ভাষা এবং বিষয়ের ভিন্নতা তাঁকে নারীলেখকের সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে লেখক পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অধিকাংশ রচনায় তাঁর নিজের ভূমিকা একজন ন্যারেটরের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথের ঋদ্ধতায় তাঁর বক্তব্যধর্মী সাহিত্য পাঠকের মনোজগতকে আন্দেলিত করে। "তিনি রোমান্টিকের আবেগ ও কল্পনাপ্রবণতা, রিয়্যালিস্টের শুকনো বিশ্লেষণ এবং স্যাটিরিস্টের শাণিত বিদ্রূপ একসঙ্গে মেশানোর চেষ্টা করেছেন"(দীপেন্দু, উদ্ধৃত, রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড: ৫৫৩)। আদিবাসী জীবন-বাস্তবতাকে তিনি সাহিত্যের পরিসরে ঠাঁই দিয়ে বাঙালি পাঠককে এক অনাবিষ্কৃত জগতের সন্ধান দিয়েছেন। আদিবাসী জীবনের দৈন্য-নিপীড়ন ও বঞ্চনা এবং এ থেকে উত্তরণের সংগ্রামী কথামালাকে তিনি সম্পূর্ণতা দিয়েছেন তাদের ব্যক্তিগত গোষ্ঠীগত জীবনাচরণের অনুষঙ্গে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে লেখকের এ প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে সাহিত্য-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে। অনিবার্যভাবেই সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ আছে ; তবে তা খুবই সীমিতভাবে। একজন সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক গবেষকের পক্ষে এবিষয়কে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব। ভবিষ্যতে মহাশ্বেতা-সাহিত্যের আদিবাসী জীবন কেবল সাহিত্যিক নয়, পুরোপুরি সমাজতত্ত্ব কিংবা নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হিসেবে গৃহীত হলে এ বিষয়ের নতুন প্রান্ত উন্মোচিত হবে বলে মনে করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কর্মী-লেখক মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বিপুল কর্মের মাধ্যমে আদিবাসীদের মধ্যে এক শ্রদ্ধেয় আসন অধিকার করেছেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তকের জায়গা করে নিয়েছেন। বাস্তব ও শিল্পের মেলবন্ধনে অনন্য মহাশ্বেতার কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে প্রসারিত ও ঋদ্ধ করেছে। সময় ও সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে মহাশ্বেতা-কথাসাহিত্য অনাগতকালের মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে পৌঁছে যাবে এবং মূলস্রোত ও আদিবাসীদের মধ্যে এক সংবাহনবিন্দু সৃষ্টি হবে – মহাশ্বেতার এ প্রত্যাশার বাস্তবায়নেই হয়তো তাঁর আদিবাসীজীবন-ভিত্তিক কথাসাহিত্য পূর্ণতা পাবে, অমর হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস

মহাশ্বেতা দেবী
২০০২, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *ষষ্ঠ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৩, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *অষ্টম খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৩, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *নবম খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৩, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *দশম খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৩, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *একাদশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৩, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *দ্বাদশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৪, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *ত্রয়োদশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৪, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *চতুর্দশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৪, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *পঞ্চদশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৫, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *সপ্তদশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৭, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *ঊনবিংশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ,

দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০০৮, *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, বিংশ খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সহায়ক-গ্রন্থ

ক. বাংলা বই

অজয় ভট্টাচার্য	১৯৮৯, *কুলিমেম*, দ্বিতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা
অতুল সুর	১৯৭৯, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা
অভিজিৎ চৌধুরী	২০১০, *মহাশ্বেতার মহাবিশ্ব*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
অমলেন্দু সেনগুপ্ত	২০০৬, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, প্রতিভাস, কলকাতা
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৯৫, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
অরুণ চৌধুরী	২০০৬, *সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীয়দের সংগ্রাম*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
অরূপ কুমার দাস	২০০৪, *অরণ্যের অধিকার ইতিহাসের কণ্ঠস্বর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
অসিতবরণ চৌধুরী	১৯৮৫, *সাঁওতাল সমাজ ডাইনি ও বর্তমান সংকট*, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

আজিজুল হক	২০০২, *নকশালবাড়ি : তিরিশবছর আগে এবং পরে*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
আনিসুল হক	২০১৩, *চিয়ারি বা বুদু ওঁরাও কেন দেশত্যাগ করেছিল*, তৃতীয় মুদ্রণ, সময় প্রকাশন, ঢাকা
আলাউদ্দিন আল আজাদ	১৯৯৯, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, গতিধারা, ঢাকা
আবদুস সাত্তার	১৯৭৫, *আরণ্য জনপদে*, আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ঢাকা
	১৯৮০, *গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
আশুতোষ ভট্টাচার্য	১৯৬৪, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, চতুর্থ সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা
ইরফান হাবিব	১৯৯৯, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, তৃতীয় মুদ্রণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা
	২০০৬, *প্রাক-ইতিহাস(ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস-১)*, ভাষান্তর – কাবেরী বসু, চতুর্থ মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
	২০০৫ *সিন্ধু সভ্যতা (ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস-২)*, ভাষান্তর – কাবেরী বসু, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ,ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
	২০১৪, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, অনু. কাবেরী বসু, পঞ্চম মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর	২০১৩, *বৈদিক সভ্যতা (ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস-২)*, ভাষান্তর– কাবেরী বসু, পঞ্চম মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

ইরফান হাবিব ও বিবেকানন্দ ঝা — ২০০৯, *মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ(ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাস-৪)*, ভাষান্তর – কাবেরী বসু, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

কণিকা বিশ্বাস — ২০১১, *ছায়া দর্পণে মহাশ্বেতা*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

কৃপাশংকর চৌবে — ১৯৯৯, *মহাঅরণ্যের মা*, ভাষান্তর : শংকর ঘোষ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা

কমল চৌধুরী — ২০০৬ (সম্পাদিত), *বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রাচীন যুগ থেকে ইংরেজ আমল)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২০০৮ (সম্পাদিত), *মেদেনীপুরের ইতিহাস (প্রথম পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২০১১ (সম্পাদিত), *সাঁওতাল বিদ্রোহ সমাজ ও জীবন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ — ১৪০৬, *স্বপ্ন-প্রতীক*, ভাষান্তর : অরূপরতন বসু, দীপায়ন, কলকাতা

ক্যাম্প — ১৯৯৮ (সম্পাদিত), *অরণ্য-সন্তান শবর খেড়িয়া, মা-মহাশ্বেতা ও আরও কয়েকজন*, ক্যাম্প, কলকাতা

খন্দকার সাখাওয়াত আলী — ২০১১ (সম্পাদিত), *আন্তোনিও গ্রামসি জীবনসংগ্রাম ও তত্ত্ব*, প্রথম বর্ধিত সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

গিয়াস শামীম — ২০০২, *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

গোলাম মুরশিদ — ২০০৬, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর, ঢাকা

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় — ১৯৯৮ (সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী — ১৯৮৬, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

তারাপদ রায় — ১৯৯৯, *সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০০৫, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-১*, পুনর্মুদ্রণ, ভূমিকা : বিষ্ণু বসু, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

১৯৯৯, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-২*, প্রথম প্রকাশ, ভূমিকা : হাসান আজিজুল হক, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

তপোধীর ভট্টাচার্য — ১৯৯৬, *বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

তাসাদ্দুক হোসেন — ১৩৬৩, *মহুয়ার দেশে*, প্রথম প্রকাশ, কোহিনুর লাইব্রেরী, ঢাকা

তাপস ভৌমিক — ২০০৩ (সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা*, কোরক, কলকাতা

দীপংকর গৌতম — ২০০৭, *আদিবাসী গণসংগ্রাম*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা

দীপঙ্কর ঘোষ — ২০০৫ (সম্পাদিত), *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / রমাকৃষ্ণ মৈত্র — ১৯৯৩, *পৃথিবীর ইতিহাস*, অনুষ্টুপ সংস্করণ, অনুষ্টুপ, কলকাতা

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে — ১৯৯৯, *আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড)*, তৃতীয় সংস্করণ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

নির্মল ঘোষ — ১৯৯৮ *মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

নীহাররঞ্জন রায় — ১৪১২, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, পঞ্চম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নিতাই বসু — ১৯৯৯, *কথাশিল্পীর অ্যালবাম*, অভিজাত প্রকাশনী, কলকাতা

পম্পা মুখোপাধ্যায় — ২০১৩, *মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতি*,

দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯৯১, *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

১৯৯৭, *পোস্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য*, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

পিয়ের বেসেইনে — ১৯৭৭, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*, অনু. সুফিয়া খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রফুল্ল রায় — ১৪০৮, *প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র-১*, ড. বিষ্ণু বসু সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ফ্রাঞ্জ ফেনো — ১৯৮৮, জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত, অনু, আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বদরুদ্দীন আহমদ — ১৯৬৩, *অরণ্য মিথুন*, প্রথম প্রকাশ, পাকিস্তান বুক ডিপো, ঢাকা

বিপ্লব মাজী — ২০১১, নিম্নবর্গের ইতিহাসঃ চূয়াড় বিদ্রোহ ও রানি শিরোমনি, কোডেক্স, কলকাতা

বিনয় ঘোষ — ১৪০৬, *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*, তৃতীয় মুদ্রণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯৯৬, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, হায়াৎ মামুদ (সম্পাদিত), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

বুদ্ধদেব বসু — ১৯৭৬, *আমার যৌবন*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল — ১৯৯৯, *আধুনিক বাংলা কবিতা ও মিথ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী — ২০১১, *বাংলা আখ্যান : বহুমাত্রিক পাঠ*, রত্নাবলী, কলকাতা

মহাশ্বেতা দেবী — ১৯৯০, মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রা. লি. কলকাতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০০৫, মানিক-রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল জলিল — ১৯৯১, *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান — ১৯৯৪, *নৃ-বিজ্ঞানের রূপরেখা*, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

মেসবাহ কামাল, আরিফাতুল কিবরিয়া — ২০০৯ (সম্পাদিত), *বিপন্ন ভূমিজ: অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ: বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র,* প্রথম অ্যাডর্ন সংস্করণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

রতনলাল চক্রবর্তী — ২০০০, *সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র,* দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১৪০২, *রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

১৪০২, *রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড*, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

১৪০২, *রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড*, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

রামকান্ত সিংহ — ২০০৯, *বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী*, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা

রামশরণ শর্মা — ২০০১, *আর্যদের ভারতে আগমন*, অনুবাদ-গৌতম নিয়োগী, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা

রিজিয়া রহমান — ১৯৮৪, *একাল চিরকাল*, মুক্তধারা, ঢাকা

রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০০৫, *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

রোমিলা থাপার	২০০২, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, অনু. কৃষ্ণা গুপ্তা, সপ্তম মুদ্রণ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা
লোকনাথ দত্ত	১৯৯৮, সাঁওতাল কাহিনী (বনবীর-গাথা), অরুণ চৌধুরী সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা
শঙ্খ চৌধুরী	২০০২, *স্মৃতি বিস্মৃতি*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৯৯, *ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
শামসুদ্দীন আবুল কালাম	১৯৮৬, *সমুদ্র বাসর*, পুথিঘর লি. ঢাকা
শিপ্রা দত্ত	২০০৯, *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন*, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪০৯, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*, প্যাপিরাস সংস্করণ, প্যাপিরাস, কলকাতা
শিরিন রত্নাগর	২০০৯, *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে: বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকায়*, ভাষান্তর – কাবেরী বসু, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৮৪, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
সতীনাথ ভাদুড়ী	১৯৯৯, *সতীনাথ গ্রন্থাবলী-২*, সম্পাদনা- শঙ্খ ঘোষ, নির্মাল্য আচার্য, চতুর্থ সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা
সমীরণ মজুমদার	১৯৯৭ (সম্পাদিত), *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ*, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা
সায়েমা খাতুন ও মাহমুদুল সুমন	২০১৪ (সম্পাদিত), *আদিবাসী আছে? ...আছে! (আদিবাসী নাম-বিতর্কের প্রবন্ধ)*, সংবেদ, ঢাকা

সিগমুন্ড ফ্রয়েড	১৯৯৩, *টোটেম ও ট্যাবু*, ভাষান্তর : ধনপতি বাগ, প্রথম প্রকাশ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা
সুকুমার সেন	১৪০৩, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
সুপ্রকাশ রায়	২০০৯, *সাঁওতাল বিদ্রোহ*, দ্বিতীয় প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা
	২০১২, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, প্রথম র‍্যাডিক্যাল সংস্করণ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা
সুবোধ ঘোষ	২০০০, *ভারতের আদিবাসী*, চতুর্থ মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
সুবোধ দেবসেন	২০১০, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
	২০১৫, *মহাশ্বেতা জীবন ও কথাসাহিত্যে ভিন্ন মুখ ভিন্ন স্বর*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়	২০১২, *প্রসঙ্গ আদিবাসী*, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা
সুমিতা চক্রবর্তী	১৯৯৮, *উপন্যাসের বর্ণমালা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
	২০১০, *উপন্যাস বহুরূপে*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা
সুহৃদকুমার ভৌমিক	১৯৯৬ (সম্পাদিত), *সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন*, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী
	১৯৯৯, *আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা*, মারাংবুরু প্রেস, কলকাতা
সেলিনা হোসেন	২০০১, *দশটি উপন্যাস*, অনন্যা, ঢাকা
সোহিনী ঘোষ	২০০৫ (সম্পাদিত), *মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার : বাস্তবতার সন্ধান*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

খ. বাংলা প্রবন্ধ

আনিসুর রহমান — ২০১৩, 'বিকল্প আখ্যানের পরিসরে নিম্নবর্গের ইতিহাস ও মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী অন্বেষণ : টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা', *আধুনিক বাংলা উপন্যাস : স্বতন্ত্র জীবনের ধারাভাষ্য*, শেখ রেজওয়ান ইসলাম সম্পাদিত, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা

গিরিবালা দেবী — ২০০৫, 'সিংভূমের কোলজাতি', *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

জগন্নাথ পাথে — ১৯৯২, 'দ্য আইডিয়া অব ট্রাইব অ্যান্ড ইন্ডিয়া সিন', বি. চৌধুরী সম্পাদিত *ট্রাইবাল ট্রান্সফরমেশন ইন ইন্ডিয়া, ৩য় খণ্ড*, ইন্টার-ইন্ডিয়া পাবলিকেশন্স, নিউ দিল্লী

পরমেশপ্রসন্ন রায় — ২০০৫, 'ছোটোনাগপুরী হো', *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

প্রভাসচন্দ্র রায় — ২০০৫, 'সাঁওতালগণের বিবরণ', *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

প্রশান্ত ত্রিপুরা — ১৯৯৩, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান বিষয়ে', *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী: অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত*, হাফিজ রশিদ খান সম্পাদিত, বাংলাদেশ উপজাতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য পর্ষদ, ঢাকা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০০২, 'মহাশ্বেতা দেবী : ব্যক্তি ও ইতিহাসের মেলবন্ধন', *এবং মুশায়েরা ৩য়/৪র্থ সংখ্যা*, ১৪০৩, গ্রন্থভুক্ত *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড*, ২০০২, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

বি. কে. রায়বর্মণ — ২০০৯, 'পূর্ব-ভারত ও বাংলাদেশের আদিবাসী ও উপজাতি জনগণঃ আদিবাসীকরণ বনাম বিশ্বায়নের বিকল্প নকশা', *বিপন্ন ভূমিজ : অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজ : বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া সম্পাদিত, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

বিপ্লব মাজী — ২০০৫, 'মহাশ্বেতার ক্ষুধা উপন্যাস', *অমৃতলোক, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা*, ৩০ বছর ২য় ও ৩য় সংখ্যা, সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদেনীপুর

বেগম আকতার কামাল — ২০০৫, 'মহাশ্বেতা দেবীর সাঁওতাল বিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব', *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

মহাশ্বেতা দেবী — ১৯৯৬, 'এক জীবনেই', *প্রমা*, সম্পাদক-সুরজিৎ ঘোষ, মে-জুন, কলকাতা

১৯৮৭, 'বকলমে', কলেজস্ট্রীট, মে, কলকাতা

১৯৮৮, 'বকলমে', কলেজস্ট্রীট, এপ্রিল, কলকাতা

মহাদেব চক্রবর্তী — ২০০৯, 'আদিবাসী প্রশ্ন ও কতিপয় সমস্যা : প্রসঙ্গ ত্রিপুরা', *বিপন্ন ভূমিজঃ অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজঃ বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া সম্পাদিত, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

মেসবাহ কামাল — ২০০৯, 'বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের আদিবাসীর সাম্প্রতিক সমস্যাবলীঃ একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক পর্যালোচনা, '*বিপন্ন ভূমিজঃ অস্তিত্বের সংকটে আদিবাসী সমাজঃ বাংলাদেশ ও পূর্ব-ভারতের প্রতিচিত্র*, মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া সম্পাদিত, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী — ২০১৪, 'আদিবাসী নাম-বিতর্ক ', *আদিবাসী আছে?...আছে!*, সায়েমা খাতুন ও মাহমুদুল সুমন সম্পাদিত, সংবেদ, ঢাকা

রণজিৎ গুহ — ২০০১, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

রাহুল দাশগুপ্ত — ১৪১৮, 'আখ্যানের পরিসরে ইতিহাসঃ মহাশ্বেতা দেবীর কয়েকটি উপন্যাস', *গল্পসরণি*, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ : বার্ষিক সংকলন, কলকাতা

শরৎচন্দ্র রায় — ২০০৫, 'ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি', 'ওরাওঁদের ঐতিহ্য', 'মুন্ডা জাতি', *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

শাওনী চক্রবর্তী — ১৪১৮, 'ইতিহাসের মুখোমুখি চোট্টি মুণ্ডা', *গল্পসরণি*, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, ষোড়শ বর্ষ : বার্ষিক সংকলন, কলকাতা

শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত — ২০০০,'মিথ', *ধ্রুবপদ*, *বার্ষিক সংকলন ৪*, *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, সম্পাদক. সুধীর চক্রবর্তী, কলকাতা

স্টিফেন মুর্মু — ১৯৯১, 'আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা', গ্রন্থভুক্ত মুহম্মদ আবদুল জলিল রচিত *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ক

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী — ২০০২, 'নিম্নবর্গের উত্তরণের প্রচেষ্টা বাংলার মধ্যযুগ ও মহাশ্বেতা দেবী', *পরিকথা*, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭, মে ২০০০, গ্রন্থভুক্ত *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র*, *ষষ্ঠ খণ্ড*, ২০০২, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ২০০৫, 'কোল-জাতির সংস্কৃতি', *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা*, দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত,লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

সুব্রত চন্দ — ২০১২, 'অরণ্যের অধিকার : নামকরণ', *মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার : বাস্তবতার সন্ধান*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পাদনা- সোহিনী ঘোষ, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

হরিসাধন দাস — ২০১১, 'রানি শিরোমণি : ব্রিটিশ বিরোধী চূয়াড় বিদ্রোহ', *রানি শিরোমণি ও চূয়াড় বিদ্রোহ*, সম্পাদনা. বিপ্লব মাজী, কোডেক্স, কলকাতা

গ. সাক্ষাৎকার

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক — ১৪১৮,'ইতিহাস কথন', মহাশ্বেতা দেবী ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কথোপকথন, 'সীগাল বুকস' থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কর্তৃক মহাশ্বেতা দেবী রচিত *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ *Chotti Munda and his arrow* গ্রন্থে এ সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুবাদ : কিশোরকুমার বিশ্বাস, গল্পসরণি, ষোড়শ বর্ষ : বার্ষিক সংকলন, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা

নবীন কিশোর — ১৪১৮, 'কথার পিঠে কথা', অনুবাদঃ কিশোরকুমার বিশ্বাস, গল্পসরণি, ষোড়শ বর্ষ: বার্ষিক সংকলন, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা

পবিত্র সরকার — ১৯৯৭, 'খেড়িয়া-শবর সমিতিই আমার জীবনের শেষ বাস স্টপ', আজকাল, ১০ আগস্ট, ১৯৯৭, কলকাতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় — ১৯৮৭, 'মহাশ্বেতা দেবী : নির্যাতিত মানবতার খোঁজে এক মানবী', কলেজ স্ট্রীট, ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

বদরুন নাহার ২০১৫,'চোট্টি মুণ্ডা আমার সমগ্র আদিবাসী চিন্তার সমাহার', কালি ও কলম, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : আনিসুজ্জামান, সম্পাদক : আবুল হাসনাত, দ্বাদশ বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, ঢাকা

মহাশ্বেতা দেবী ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আলাপ ১৯৯৭, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ, সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদেনীপুর

ঘ. পত্রিকা

অমৃতলোক, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ৩০ বছর ২য় ও ৩য় সংখ্যা, ২০০৫, মেদেনীপুর

গল্পসরণি, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, অমর দে সম্পাদিত, ষোড়শ বর্ষ: বার্ষিক সংকলন : ১৪১৮, কলকাতা

ধ্রুবপদ, বুদ্ধিজীবীর নোটবই, সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, বার্ষিক সংকলন ৪, ২০০০, কলকাতা

কালি ও কলম, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : আনিসুজ্জামান, সম্পাদক : আবুল হাসনাত, দ্বাদশ বর্ষ : একাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৫, ঢাকা

ঙ. ইংরেজি গ্রন্থ

Edith Hamilton	1969, *Mithology*, New American Library, Reprint of a hardcover edition, New York and Scarborough, Ontario
Frantz Fanon	1963, The Wretched of the Earth, Translated by C. fsrrinton, Grove Press, New York
	1968, Black Skin White Musk, Translated by Charles Lam Markmann, First Evergreen Black Cat Edition, 9th printing, Grove Press, Inc. New York
Irfan Habib	2007, *Essays in Indian History*, 7th reprint, Tulika, New Delhi
Jon Platania	1997, *The Dynamic of the Archetype*, Jung for Bigginers, Orient Longman
Kumar suresh Shing	1966, The Dust Storm and The Hanging Mist, Firma
Mahasweta devi	2009, *Bitter Soil*, Third Edition, Translated by- Ipsita Chanda, Seagull books, Calcutta.econd
Mahasweta devi	2002, *Bashai Tudu*, Second impression, Translated by - Samik Bandyopadhyay and Gayatri Chakravorty Spivak, Thema Kolkata 2002.
Mahasweta Devi	2003, *Chotti Munda and his arrow*, translated and introduced by Gayatri Chakraborty Spivak, Blackwell Publishing , U.K.
Martin Blumer and	1999, *Ethinic and Racial Studies Today*, Routledge, John Solomos London and New York
N. Kaviraj	2001, *Santal Village Community And The Santal Rebellion of 1855*, Subernarekha, CalCutta
Richard Jenkins	2008, *Rethinking Ethnicity*, 2nd Edition, SAGE Publications, Los Angeles, London,

Dhaka University Institutional Repository

New Delhi, Singapore

S.T. Das — 1986, *Tribal Life Of North-Eastern India*, Gian Publishing House, Delhi

Surajit Sinha — 1987, *Tribal Politics and State Systems In Pre-colonial Eastern and North Eastern India*, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

W.W. Hunter — 1968 *The Annals of Rural Bengal*, Smith, Elder and Co, London. https:// archive.org/...

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS STATISTICS DIVISION Government of India, (2013), *STATISTICAL PROFILE OF SCHEDULED TRIBES IN INDIA 2013*, Designed and produced by DAVP, Ministry of Information and Broodcasting, Govt. of India and printed at Chaar Dishayen Printers, Noida

চ. ইংরেজি প্রবন্ধঃ

Mircha Eliad — 1949, *Standard Dictionary of folklore, Mythology and Legend(vol.2)* Maria Leach(Edited), Funk and Wagnalls Company, New york.

Das Victor — 1990 `Jharkhand movement from Reaslism to Mystification', *Economic and Political weekly*, July 28

people's union for Democractic Rights — 1983 *AND QUIET FLOWS THE GANGA*, A documentary reports on the political killing in Rural Bihar, September, Published by : Gobinda Mukhoty, president, Pudr, Delhi

Rasmussen, H. & Roy, C. — 2000 ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989,[No. 169]: a manual. *International Labour Organisation, Geneva*.

Dhaka University Institutional Repository

The UN Draft Universal Declaration of the Right of Indigenous People, UN Document, No. CNA/SUB.2/1993/21-ADD 8, Para-179

Romila Thapar 1996, Jan. - Mar., *The Theory of Aryan Race and India: History and Politics*, Social Scientist, Vol. 24, No. 1/3, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3520116